

উ প ন্যা স স ম গ্র

২

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সূচি

জাদুর দেশে জগন্নাথ
স্বপ্নের জাদুকরী
টোরা আর বাদশা
খুদে যাযাবর ইসতাসি
আবু ও দস্যু-সর্দার
ইতিমিচি সাহেব

https://boierhut.com/fb

ওর নাম যদি জগন্নাথ হয়, তবে ওর বন্ধুর নাম মানিক।

অবিশ্যি মানিক বললে অনেকেই তাকে চিনবে না। কেননা, মানিক ওর ভালো নাম। ওর ডাক-নাম মাকু। মানিককে কেউ মাকু বলে ডাকলে রাগে জ্বলে যায় জগন্নাথ। ও বুঝেই পায় না, এমন একটা সুন্দর নাম অমন কুচ্ছিত হয়ে যায় কী করে! ভীষণ খারাপ লাগে জগন্নাথের। ওর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, তোমরা ওকে মাকু বলে ডাকবে না। ওর নাম, মানিক, বুঝলে!

বুঝবে কে? বুঝবে তো মুখের এই ঠোঁট দুটো। কিন্তু তারাই যদি বেঁকে বসে থাকে! এই ঠোঁট দুটোই যদি এঁকে-বেঁকে মানিককে মাকু বলে মুখের ফাঁকে নাচতে থাকে! তবে কী করা! যাই বল, ঠোঁটের কেরামতি আছে। নইলে, ঝকমককান্তি মানিকের ঘষা-কাচের মতো এমন ম্যাড়মেড়ে বেহাল অবস্থা হয়!

সে যাই বলুক, ওকে মানিক বলেই ডাকে জগন্নাথ। ডাকতে ভালো লাগে। যেমন ভালো লাগে মানিককে, তেমনি ভালো লাগে ওর নামটা। মাঝে-মাঝে জগন্নাথের মনটা যখন দুঃখে ভার হয়ে যায়, ঠিক তখনি হঠাৎ যদি মানিকের মুখটা ওর চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে, তখন যেন আবার আলোয় ভরে যায় ওর মন। মানিকের রঙিন আলোয়! তখন যেন আরও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে মানিককে। আর ভাবতে ইচ্ছে করে, ওর নামটা যদি জগন্নাথ না হয়ে সোনা হত! মানিক যদি জগন্নাথকে সোনা বলে ডাকে! বেশ হয়! জগন্নাথ সোনা, আর ও মানিক!

কিন্তু তা তো হয় না। হবে কেমন করে? জগন্নাথের মনের কথা তো আর মানিক জানে না। নিজের মনের কথা বলতে ভারি লজ্জা করে জগন্নাথের। মানিক যদি হাসে! হয়তো, যখন খুব ছোট্ট ছিল জগন্নাথ, তখন তোমাদের মতো জগন্নাথের মা-ও হয়তো ছেলেকে কোলে নিয়ে 'সোনা-সোনা' বলে কত আদর করেছে! কিন্তু মায়ের সেই আদরের সোনা-ডাক কোনোদিনই জগন্নাথের নাম হল না। কেউ ডাকেনি ওকে সোনা বলে।

সত্যি, জগন্নাথ নামটা কেমন যেন! নাম শুনলে হাসি পায়! তোমাদের আর দোষ দেব কী! নিজের নাম শুনলে জগন্নাথের নিজেরই হাসি পায়! অবিশ্যি নামটা যে খুব খারাপ, তা কেউ বলতে পার না। তবে হ্যাঁ, একটু সেকেলে-সেকেলে! তবু যতই হোক ঠাকুরের নাম তো! তাই বলে যেন ভেবে বসো না, ঠাকুরের মতো আমাদের জগন্নাথও জবুথবু! ঠাকুর-জগন্নাথ কেন যে অমন হাত-পা খুইয়ে চুপটি করে বসে থাকেন, তা জানে না ও। শুধু জানে, ঠাকুর ঠাকুরই। তিনি যা করেন, সবার ভালোর জন্যেই করেন।

জগন্নাথ ঠিক তোমাদের মতো। মানে, তোমাদের চেয়ে কিছুতেই বড়ো হবে না। মানিকও তাই। মাথায় অবিশ্যি মানিক একটু ঢ্যাঙা। কিন্তু তাই বলে যেন মনে করো না, মানিক জগন্নাথের চেয়ে বড়ো। তোমরা প্রথম চোটে দেখলে ভাববে, মানিকের বুঝি বয়সের গাছ-পাথর নেই। ওকে দাদা বলা উচিত।

আসলে কী জানো, এক-একজন এমনি হয়। বয়সের নামে খোঁজ নেই, কিন্তু গতরখানি মা-দুর্গার অসুর। অবিশ্যি মানিককে অসুর কেউ বলছে না। ওকে অসুর না বলে বরঞ্চ জগন্নাথকে কেউ যদি বলে হাড়গিলে, তবে, একটুও রাগ করবে না জগন্নাথ। করবে কেন? যা রোগা-প্যাঁটকা চেহারা! সত্যি বলতে কী, ছেলেরা যদি হাড়ে-মাসে একটু শক্ত-সমর্থ না হয়, তো কেমন যেন ফ্যাকলা-ফ্যাকলা লাগে। ছেলেদের ধকল সামলাতে হয় কত! স্বাস্থ্য না-থাকলে দুর্দশার একশেষ! এই ধরো না, জগন্নাথকেই একবার যা ফ্যাসাদে পড়তে হয়েছিল! কী পিটুনিই খেয়েছে। খেয়েছে মানে কী আর যার-তার হাতে, একেবারে খোদ মানিকের হাতে! অবাক হয়ে ভাবতে বসলে তো? ভাবছ বোধ হয়, যাকে এত ভালো লাগে, তার হাতেই মার খেল!

মানিককে কস্মিনকালেও চিনত না জগন্নাথ। মানিকের সঙ্গে ভাব হওয়ার আগে ওর বন্ধু ছিল কোয়া। কোয়া জগন্নাথের কুকুর। কোয়া যখন খুব ছোট্ট, সবে হাঁটতে-চলতে শিখেছে, তখন ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিল জগন্নাথ।

সেবার খুব শীত। যাকে বলে শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। রাত হয়েছে। কুয়াশায় ছেয়ে গেছে চারিদিক। চোখের দৃষ্টিতে দেখাও যায় না কিচ্ছু। কোয়া রাস্তায় পড়ে-পড়ে কোঁকাচ্ছিল। আর মাঝে-মাঝে ঠান্ডাটা যখন দুষ্টুমি করে ওর গায়ে চিমটি কেটে দিচ্ছিল, তখন বেদম চেঁচিয়ে শীতটাকে ধমক মারছিল। কী সুন্দর দেখতে কুকুরটাকে। গায়ের রংটা ভেলভেটের মতো কুচকুচে কালো। কানের পাশ দুটো সাদা ধবধবে। গোলগাল, নাদুস-নুদুস। কুকুরটার ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল জগন্নাথ। ওইটুকুন একটা কুকুরছানার কষ্ট দেখে ওরও ভারি কষ্ট লাগল। ভেবেছিল, আশেপাশে হয়তো ওর মা-ও আছে। গায়ে যে হাত দিয়ে একটু আদর করবে, সে আর সাহস হল না। বলা যায়, খ্যাঁক করে তেড়ে এসে কামড়ে দিলে! যতই হোক, ছেলে তো!

কিন্তু বড্ড মায়া লাগছিল জগন্নাথের। ঠান্ডায় ভারি কষ্ট হচ্ছে কুকুরটার। অত কী, জগন্নাথই ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। তা কুকুরকে কী আর দোষ দেব! ও তো এইটুকুনি একটা বাচ্চা প্রাণী। এই হাড়কাঁপুনি শীত সহ্য করা কী আর ওর কম্ম! আহা!

'আ-তু-তু-তু', হাত বাড়িয়ে ডাক দিল জগন্নাথ।

ল্যাজটা নেড়ে দিল কুকুরটা। চোখ দুটো পিটপিটিয়ে নেচে উঠল। ও যেন উঠে বসবার চেষ্টা করল। জগন্নাথ আবার ডাক দিল, 'তু-তু।'

সত্যিই, উঠে বসে জোরে-জোরে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওর গালটা টিপে দিয়ে এত আদর করতে ইচ্ছে করছে জগন্নাথের। হাত বাড়াল জগন্নাথ। বাচ্চাটা মুখ বাড়িয়ে জগন্নাথের হাতে মাথা ঠেকাল। জগন্নাথ ওকে কোলে তুলে নিল। জগন্নাথের কোলের মধ্যে গোল্লা পাকিয়ে সেঁদিয়ে গেল বচ্চাটা। ঠান্ডায় জগন্নাথের কোলের মধ্যে ও যেন ডুবে যেতে চাইছে। জগন্নাথ আদর করে ওর মুখখানা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'তোর মা কোথায়?'

বাচ্চাটা কী বুঝল কে জানে, চেঁচিয়ে উঠল, 'কোয়া, কোয়া!' কোয়া! কোয়া! কী যে বলতে চাইছে কুকুর-ছানা জগন্নাথ আর বুঝবে কী করে! তাই আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছিস?'

কুকুর ডাকল, 'কোয়া, কোয়া!'

'খিদে পেয়েছে?'

'কোয়া, কোয়া!' 'যাঃ বাববা!' হেসে ফেলল জগন্নাথ, 'কী মজা দেখ, যা-ই জিজ্ঞেস করি, কোয়া! কোয়া!'

জগন্নাথ হেসে ফেলতেই কুকুরটাও ওর হাতটা চেটে দিল। জগন্নাথ বলল, 'হাত চাটলে কী করব। খাবার-দাবার কিচ্ছু নেই। আমার হাতও ফোক্কা, ট্যাঁকও ঢুনঢুন। তোর না কী?'

'কোয়া, কোয়া,' চিৎকার করে উঠল জগন্নাথ। দু হাত দিয়ে লুফে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কোয়া, কোয়া! কে রাখল তোর এমন নাম?'

জগন্নাথের বুকটা জড়িয়ে ধরেই কুকুর-ছানা ল্যাজ নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে উঠল, 'কোয়া—কো—য়া!' যেন আনন্দে উপছে উঠছে তার মনটা।

জগন্নাথও খুশিতে চেঁচিয়ে ওরই মতো করে ডাকল, 'কোয়া—কো—য়া। আমিও তোকে কোয়া বলেই ডাকি। চ, শুবি চ।'

শোবে আর কোথায়! শোবে তো এখানেই। যেখানে ও শুয়েছিল। এই রাস্তায়।

রাস্তার ওপরই শুইয়ে দিল জগন্নাথ কুকুর-ছানাটাকে। ছানাও লক্ষ্মীটির মতো শুয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াল জগন্নাথ। তারপর পথ হাঁটল।

জগন্নাথ একটুখানি পথ হেঁটেছে কি হাঁটেনি, এই দেখ, কুকুর-ছানাটাও পিছু হাঁটছে। একেবারে জগন্নাথের পায়ে-পায়ে। প্রথমটা টেরই পায়নি। কিন্তু হঠাৎ যখন আলটটকা কুকুর-ছানার মাথাটা ওর পায়ে ঠেকল, জগন্নাথ চমকে উঠেছে। ফিরে দেখেছে। অমনি কুকুরটা ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিল।

জগন্নাথ চেঁচাল, 'এই কোথা যাচ্ছিস? পালা, পালা।'

থমকে দাঁড়িয়ে ছানাটা চেয়ে রইল জগন্নাথের চোখের দিকে, আর জোরে-জোরে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

জগন্নাথ ওকে তুলে নিল। 'ওরে, তুই তো ভারি দুষ্টু' বলতে-বলতে যেখানে ও শুয়েছিল, সেখানে নিয়ে চলল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরিয়ে এনে কুকুরকে শোয়াতে-শোয়াতে বলল, 'ফের দুষ্টুমি

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করলে কান মলে দেব। চুপটি করে শুয়ে থাকবি!' বলে জগন্নাথ নিজে ফিরে দাঁড়াল। কুকুর-ছানা ডেকে উঠল, 'কিঁউ— কোয়া।'

জগন্নাথ আবার হেসে ফেলল। মনে-মনে ভাবল, 'না, বেশি আদর না দেওয়াই ভালো। যতই হোক কুকুর তো! একবার পেয়ে বসলেই মুশকিল, মাথায় উঠবে।'

জগন্নাথ হাঁটতে লাগল। এবার একটু জোরে-জোরে। কুকুরও ছুটে এল নড়ে-নড়ে। জগন্নাথ ছুট দিল। কুকুরও ছুটল। ছুটল বটে, কিন্তু জগন্নাথের তো লম্বা পায়ের লম্বা ছুট, ওই ছোট্ট কুকুর কেমন করে পাল্লা দেবে! কাজেই কুকুর খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে ছুটতে-ছুটতে কুঁকয়ে-কুঁকিয়ে কাঁদতে লাগল। জগন্নাথের ছোটা হল না। দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবল, ব্যাপারটা কী! কুকুরটারও কি আমার মতো মা নেই! বুকটা চমকে উঠল জগন্নাথের।

সত্যি মা নেই। কুকুরের নেই। জগন্নাথেরও নেই।

জগন্নাথ জ্ঞানে কখনো মাকে দেখেনি। মা কেমন, মায়ের আদর কেমন, জগন্নাথ জানে না। অন্যের মাকে দেখলে ও ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। জগন্নাথ ভাবে, ওর মা-ও কী আর সকলের মায়ের মতো অমনি।

অমনি কিনা জানে না জগন্নাথ। শুধু জানে তার মা নেই। মাঝে-মাঝে যখন চুপটি করে ভাবে মায়ের কথা, ভাবে, ওই গাছগাছালি মাঠের দিকে চেয়ে, কিম্বা রাতের আঁধারঘেরা আকাশের দিকে চেয়ে, তখন কেমন আনন্দ-খুশিতে ওর মনটা আর ছোট্ট এই বুকটা দুলে ওঠে। ও বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'বাবা, মায়ের গল্প বলো।'

বাবার কাছে গল্প শুনতে-শুনতে ওর মায়ের মুখটি যেন স্বপ্নের মতো ভেসে উঠত ওর চোখের পাতায়। মায়ের পরনে নীল রঙের শাড়ি। পায়ে ঝুমুর-ঝুমুর মল। হাতে বালা। কপাল-জোড়া টকটকে লাল সিঁদুরের ফোঁটা।

কিন্তু আর কিছু জানে না জগন্নাথ। জানে না, ও যখন ছোট্ট ছিল, ওর কপালে মা আদর করে চুমু খেয়েছে কি না। কিম্বা নিজঝুম রাতে গুনগুন গান গেয়ে ওর চোখের তারায় স্বপ্ন-সোনা ঘুমের জাদু ছড়িয়ে দিয়েছিল কি না!

কুকুরটা আবার ডেকে উঠল, 'কোয়া, কোয়া।'

জগন্নাথের হাসি পেয়ে গেল। ইচ্ছে হল কুকুরের সঙ্গে মজা করে। ছুটল জগন্নাথ। কুকুরটাও পিছু নিল। লুকিয়ে পড়ল জগন্নাথ। কুকুরটাও দেখতে পেল। লাফ দিল জগন্নাথ। কুকুরটাও লাফিয়ে উঠল। হেসে উঠল জগন্নাথ। কুকুরটাও ডেকে উঠল। খুশির ডাক। তারপর জগন্নাথের কোলের ওপর লাফিয়ে ওঠার জন্যে দু-পা বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। জগন্নাথ লুফে নিল দু হাত বাড়িয়ে কুকুর-ছানাকে। নিজের কাঁধের ওপর বসিয়ে বলল, 'চ তুই আমার সঙ্গে। তোকে পোষ মানাব।'

https://boierhut.com/fb

কুকুর-ছানা কী বুঝল কে জানে। জগন্নাথের ঘাড়ে বসে কান চেটে দিল। জগন্নাথ হাঁটতে লাগল। তারপর শুরু করে দিল। জগন্নাথ গাইতে জানে। তবে কী আর তেমন! ওর বাবা গান গান গাইত। যুদ্ধের গান। কদম-কদম পা ফেলে ওর বাবা সৈনিকদের যে-গানটা গাইত, সেই গান। একটাই গান জানত ওর বাবা। জগন্নাথও জানে সেই একটা গানের আধখানা। সেই আধখানা গানই কদম-কদম পা ফেলে এখন ও গাইতে-গাইতে চলবে। চলবে কুকুরকে কাঁধে নিয়ে।

কোথায় চলবে?

তা কেউ জানে না। এই রাতের অন্ধকার অথবা ওই ভোরের আকাশ, কেউ ওকে বেঁধে রাখবে না। রাখতে পারে না। কেননা, কেউ নেই ওর। ও একা। যার কেউ নেই, তাকে কে বাঁধতে পারে?

অবিশ্যি জগন্নাথ আগে ভাবত, ওর কেউ নেই। এখন আর ভাবে না। আগে তো জগন্নাথ আরও ছোট্ট ছিল, তাই ভাবতে-ভাবতে ওর চোখ দুটি ছলছল করে বুজে আসত! এখন? চোখে জল আসে না। এখন ও জানে যে পথ চলে গেছে সামনে দিয়ে এ পথ দিয়ে ও যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে। কেউ বকবে না। আর সবার মতো এ-পথটাও জগন্নাথের নিজের। খুব আপনার। এ-পথ ছাড়া ওর আর কিচ্ছু নেই। কেনই বা বলি কিচ্ছু নেই? বরঞ্চ এতদিন বলা যেত ওর কিচ্ছু ছিল না। আজ আছে। একটা কুকুর-ছানা, কোয়া। আপাতত কোয়া ওর কাঁধে চড়ে চলবে—চলবে—চলবে। চলবে কোথায়, কোন দেশে কেউ জানে না।



কুকুর-ছানা নিজেই ডাকল ‘কোয়া...কোয়া’...

কোয়া নামটা জগন্নাথ ভালোই রেখেছে। কিন্তু ভালো নামটা রাখতে জগন্নাথকে তো আর মাথা ঘামাতে হয়নি। কুকুর-ছানা নিজেই ডাকল 'কোয়া, কোয়া', আর অমনি ওই কোয়া ডাকটা নাম হয়ে জগন্নাথের মুখ ফুটে বেরিয়ে এল। এতে জগন্নাথের বাহাদুরিটা কী আছে! এখন তাকে অবশ্য মাথা ঘামাতে হচ্ছে, অন্য কথা ভেবে। কথাটা হচ্ছে, এখন কুকুরকে সে খেতে দেবে কী! নিজে না হয় দুদিন পেট কোলে করে বসে থাকা যায়, কিন্তু কুকুর? কুকুর তো আর শুনবে না। তাছাড়া কুকুরের কাছে ওরও তো একটা মান-সম্মান আছে! যতই হোক কুকুর এখন তার অতিথি। খাতির-যত্ন ঠিক-ঠিক না হলে লোকে নিন্দে করবে না! আর কুকুরই বা কী ভাববে!

সত্যি কথা বলতে কী, এর-ওর কাছে হাত পাততে জগন্নাথের ভীষণ ঘেন্না লাগে! সে কি ভিখিরি! যারা দুবেলা হাত পেতে ভিক্ষে করে বেড়ায়, তাদের দু-চক্ষে দেখতে পারে না জগন্নাথ। লোকগুলোর হাত আছে, পা আছে, খেটে খেতে পারে তো! চেয়ে খেতে লজ্জা করে না!

না-খেতে পেলেও জগন্নাথ মুখ বুজে পড়ে থাকবে, তবু কাউকে কিছু বলবে না। তবে ও পারে, খুব খাটতে পারে! খাটতে পারে বলেই, এর-তার বাড়িতে কাজ খুঁজে বেড়ায়। হয়তো কারো বাড়িতে ক-বালতি জল তুলে দিল, কিম্বা ফুল-বাগানে মাটি কেটে দিল। আর না হয় তো, কেউ বললে, ছাগল চরাতে মাঠে চলল। যদি কিচ্ছু না জোটে রাস্তা থেকে ছেঁড়া-ফেলা কাগজ কুড়িয়ে, থলে ভরতি করে, বাজারে ছেঁড়া কাগজের খরিদ্দারকে বেচে এল। এতে ওর লজ্জা নেই। এ-কাজ করতে ওর ভালো লাগে। ওর বাবা বলেছে, কাজ ছাড়া কে বাঁচতে পারে। আকাশের ওই সূর্যটা সারাদিন ধরে আলো দিচ্ছে, সে কাজ করছে। আমাদের এই পৃথিবীটা সারা বছর, সারাক্ষণ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সে-ও কাজ করছে। তাই দিন হচ্ছে, রাত আসছে। গ্রীষ্ম যাচ্ছে, বর্ষা ফিরছে। মাঠে ফসল ফলছে। শরৎ আসছে, পুজো হচ্ছে। আর চেয়ে দেখলেই চোখে পড়বে, গাছের ফাঁকে খড়-কুটোর বাসায়, মা-পাখি ছানার মুখে খাবার দিচ্ছে। কাজের কি শেষ আছে! আর ওই দেখ না, জগন্নাথের কাঁধে বসে কোয়া কেমন চলতে-চলতে দোল খাচ্ছে! দোল খেতে খেতে কেমন ফসকে গড়িয়ে পড়ছে। মাটিতে ডিগবাজি খাবার আগেই আবার কেমন জগন্নাথের কাঁধটা খামছে ধরছে! এটাও তো কাজ!

কাজ কিনা কে জানে। তবে জগন্নাথের কাঁধে চেপে দুলতে দুলতে চলতে একটুও ভয় করছে না কোয়ার। উলটে মজাই লাগছে। যতই হোক নিজেকে তো আর কষ্ট করতে হচ্ছে না। ঠিক এই মুহূর্তে ও যদি কুকুর না হয়ে মানুষ হত, তাহলে এতক্ষণে হয়তো 'হ্যাট হ্যাট' করে চেঁচিয়ে উঠত। আর জগন্নাথও তাহলে কোয়াকে পিঠে নিয়ে ছুটত। ঘোড়-দৌড়ের মতো কুকুর কাঁধে মানুষ-দৌড়!

ঘোড়া মানুষকে পিঠে নিয়ে ছোটে, সেটার না হয় মানে বুঝি। কিন্তু এখন মানুষ একটা কুকুর-ছানাকে কাঁধে নিয়ে হাঁটছে, এর কি কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছ? না, হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ছ?

শীতটা জব্বর পড়েছে। পেটে কিছু না পড়লে, সে তবু কথা শুনবে। কিন্তু এই কনকনে ঠান্ডা, সে তো আর বাগ মানবে না। শীতকে এখন যদি জগন্নাথ বলে, 'ও বুড়ি, শীত বুড়ি, তুমি এখন ঘরে যাও তো, কোয়ার বড্ড কষ্ট হচ্ছে' তা হলে পত্রপাঠ বুঝি শীতবুড়ি জগন্নাথের কথায় সুড়সুড় করে ঘরে সেঁদিয়ে পড়বে! আর সঙ্গে-সঙ্গে ফুরফুর করে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করবে। সে-গুড়ে বালি। ভগবান মুখ দিয়েছেন কথা বলতে, মন দিয়েছেন ভাবতে, ভাবো না যা খুশি। তাতে শীতও যাচ্ছে না, বসন্তও আসছে না। আপাতত কোয়া নামে ওই কুকুর-ছানাকে কাঁধে নিয়ে লটর-পটর করে, এই শীতের মধ্যে, জগন্নাথকে হাঁটতেই হবে। একটাই শুধু ভয়। কুকুরটার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। বুকে সর্দি বসলে সে আর এক ফ্যাসাদ। ও তো আর এখন একা নয়। সঙ্গে কোয়া। একা হলে ওর কিচ্ছু ভাবনা ছিল না। রাস্তা-ঘাটে যেখানে হোক একটা মাথা গোঁজবার মতো ঠাঁই পেলেই নিশ্চিন্ত। আচ্ছা, কোয়াও কি জগন্নাথের মতো হারিয়ে গেছে?

একে বলে কপাল। তা ছাড়া কী বলি! জগন্নাথ যদি হারিয়ে না যেত, তাহলে কি আর কোয়ার জন্যে এমন করে ভাবতে হত! সেই ছোট্ট বাড়িটা ওদের। এখনও চোখের ওপর স্পষ্ট ভাসছে জগন্নাথের। সামনে পলাশ-গাছ। বসন্তের দিনে ফুলে-ফুলে গাছ ভরে যেত বকুল-গাছের নীচ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কতদিন ও বাবাকে বলেছে, 'আঃ! কী মিষ্টি গন্ধ বাবা।' বকুল-গাছের পাতার আড়াল থেকে নীল আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে এত ভালো লাগত জগন্নাথের।

ওর বাবা ছিল সৈনিক। দলের নায়ক। দু-দুবার যুদ্ধে গেছল ওর বাবা। দুরন্ত মরুভূমির যুদ্ধে ওর বাবা শত্রুকে ঘায়েল করে পেয়েছিল বীরচক্র। হয়েছিল একটা গোটা দলের নায়ক। সত্যিই বীরের মতো বুক ফুলিয়ে জগন্নাথের বাবা যখন শত্রুর ঘাঁটির দিকে এগিয়ে চলত, দেখে মনে হত, মরতে ভয় নেই নায়কের। থমকে দাঁড়াতে জানে না নায়ক।

সত্যিই তাই। থমকে দাঁড়াতে জানে না বলেই একবার শত্রুর কামানের মুখোমুখি পড়ে গেছল নায়ক আর তার গোটা দলটা। সেবার যুদ্ধ হয়েছিল গভীর জঙ্গলে। জঙ্গলের যুদ্ধে লুকিয়ে-ছাপিয়ে শত্রুকে খতম করা যেমন সহজ, তেমনি ভয় তো নিজেদেরও অনেক। কারণ জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড় থেকে কখন শত্রু আচমকা আক্রমণ করে বসবে, সে তো কেউ জানে না। কোথায় শত্রু-সৈন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে, তার টের পাওয়াই মুশকিল।

সেদিন সেই যুদ্ধের রাতে চাঁদ উঠেছিল। জঙ্গলে অসংখ্য গাছ মাথা তুলে চাঁদের আলো আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও-কোথাও যেখানে যুদ্ধের আগুনে গাছের পাতা ঝলসে ঝরে পড়েছে, কিম্বা বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত গাছ লুটিয়ে পড়েছে, সেখানে মুঠো-মুঠো চাঁদের আলো ছড়িয়ে-ছড়িয়ে পাতা-বাহারের আলপনা এঁকেছে। আর ছায়া-ছায়া গাছের পাতা সেই আলপনার ওপর ঝুনঝুনি বাজিয়ে নাচছে। বেশ কিছুটা দূরে এই জঙ্গলের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। নদীর ওপারে শত্রু-ঘাঁটি। নদীটার ড় এপার- ওপার খুব চওড়া না-হলেও, খুব গভীর। কেউ

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যদি স্রোতের টানে বেসামাল হয়ে পড়ে, তা হলে তার রক্ষে নেই। অতল জলে হাবুডুবু খেতে-খেতে নির্ঘাত মরবে। নদীর ওপর একটা কাঠের তৈরি সাঁকো। এই-পারের জঙ্গলের রাস্তা ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে ওপারের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। হুকুম হয়েছে, সে-রাত্রে নদী পেরিয়ে ওপারের শত্রু-ঘাঁটি আক্রমণ করতে হবে।

জঙ্গলে রাতের নিস্তব্ধতা। এই নিস্তব্ধতা ভেঙে-ভেঙে ঝিঁঝির ডাক এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসছে। মাঝে-মাঝে পাতার ফাঁকে-ফাঁকে পাখ-পাখালির ডানা নাড়ার শব্দ। চাঁদের আলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে জোনাকিরা নেচে বেড়াচ্ছে।

বীর নায়ক এগিয়ে চলেছে আগে-আগে। তার পেছনে দলের আর সকলে। কী সাবধানে পা ফেলছে ওরা। আলতো-আলতো ডিঙ্গি মেরে। হঠাৎ যদি অজানা কোনো শব্দ কানে আসে, নায়ক থমকে দাঁড়ায়। সঙ্গে-সঙ্গে নায়ক ইশারা করলেই ওরাও থামছে। আবার হাঁটছে। লক্ষ্য নদীর ওপর ওই কাঠের সাঁকো। শত্রু টের পাবার আগেই ওই সাঁকো পেরুতে হবে। কোনো কথা নেই কারো মুখে। শুধু ওই কজন জওয়ানের নিশ্বাসের শব্দ। ওদের পায়ের চাপে ঝোপ-ঝাড়ের ডাল-পালায় হঠাৎ-হঠাৎ যে শব্দটুকু উঠছে তাতেই যেন জঙ্গলের বুকেও চমক লাগছে।

হঠাৎ খসখস! কীসের যেন আওয়াজ শোনা গেল। হাঁটতে-হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নায়ক। দাঁড়াল সৈনিকের দল। ঝটপট শুয়ে পড়ল বুকের ওপর ভর দিয়ে। জমাট নির্জনতা। নেকড়ে বাঘের মতো ওঁত পেতে ওরা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রইল। না, কিছুই নজরে পড়ল না। আর কোনো খসখসানিও শোনা গেল না। তবু এখনই দাঁড়িয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এগোলে চলবে না। তাই বুকের ওপর ভর দিয়েই ওরা এগোতে লাগল। মাত্তর একটুখানি গেছে, ওই দেখ একটা ভালুক! হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। বুঝতে বাকি রইল না, এই ভালুক-মহারাজই ওদের ভড়কি দিয়েছে। যখন ভালুক দেখা গেছে, তখন নিশ্চয়ই আরও ভয়ংকর কোনো জন্তুও থাকতে পারে এই জঙ্গগলে। কথায় বলে বাঘ-ভালুকের জঙ্গল। তা বললে কী হবে! জন্তুর ভয়ে তো আর সৈনিক পালাবে না। যুদ্ধও থামবে না। সৈনিক এগিয়ে যাবে।

নায়ক এবার উঠে দাঁড়াল। নায়কের সঙ্গে আর সকলে। বন্দুকের নল উঁচিয়ে পা ফেলল।

আর-একটু এগোতেই কাঠের সাঁকোটা ওদের নজরে পড়ল। নায়ক দেখল, নদীর জলে ভাঙা-ভাঙা ঢেউয়ের গায়ে জ্যোৎস্নার আলো বিন্দু-বিন্দু লক্ষ-লক্ষ মুক্তার মতো দোল খাচ্ছে।

নায়কের নির্দেশে থমকে দাঁড়াল গোটা দলটা। গাছের আড়ালে-আড়ালে আড়ি পাতল। সাঁকো পেরুবার আগে সব কিছু আর-একবার ভালো করে দেখে নিতে হবে। দেখতে হবে সামনের পথ পরিষ্কার কি না, শত্রু কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কি না। থমথম করছে চারিদিক। শুধু ছলছলিয়ে নদীর জল উপছে পড়ছে পাড়ে-পাড়ে। নজরে পড়ল, একটা হরিণ-ছানা আর তার মা মুখ নীচু করে জল খাচ্ছে! চুকচুক! ওরা ভারি নিশ্চিন্ত। জানে না, একটু পরে এই জঙ্গল তোলপাড়

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

করে বাঁচা-মরার লড়াই শুরু হয়ে যাবে। সৈনিকের দল গাছের আড়াল থেকে সতর্ক পা ফেলে বেরিয়ে এল। বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে দেখলে। সজাগ কান। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওরা। নায়কের সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয় চলল সৈনিকের দল।

কিছুটা এগোতেই নাগালের মধ্যে পেঁছে গেল সাঁকোটা। ওই তো দেখা যাচ্ছে। এবার অত্যন্ত সাবধানে উঠে দাঁড়াল। ওদের সন্ধানী চোখের দৃষ্টি নদীর ওপারে স্টিথর হয়ে চেয়ে রইল।

গুড়ুম—গুড়ম!

ও দিক থেকে আচমকা গুলি ছুটল।

'ক্যাঁচ-ক্যাঁচ', একটা পেঁচা ডেকে উঠে ঝটপট উড়ে পালাল। ঝটর-পটর ডানা ঝাপটা দিয়ে আর কিচির-মিচির করতে-করতে পাখি—পাখি, অসংখ্য পাখি নিজেদের বাসা ছেড়ে চাঁদের আলোয় ছোটাছুটি লাগিয়ে দিল। এতক্ষণে হয়তো সেই হরিণ-ছানা আর তার মা প্রাণপণে ছুট দিয়ে পগারপা। সৈনিকের দল এই আচমকা আক্রমণে প্রথমটা হকচকিয়ে গেছল। কিন্তু তারপরেই ঝুপঝাপ মাটির ওপর শুয়ে পড়ল। এখানে কোথাও-কোথাও নদীর জলে কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। আবার কোথাও-বা কাঁটা-ঝাড়।

আবার গুড়ুম—গুড়ম!

এবার এদিক থেকে উত্তর গেল, কড়-কড়-কড়-ড়-ড়! গুড়ুম— গুড়ুম!

তারপর গুড়ুম—গুড়ুম!

কড়-কড়-ড়-ড়।

গুড়ুম!

ঠাঁই—ঠাঁই—ঠাঁই!

যুদ্ধ লেগে গেল। নিস্তব্ধ, নির্জন জঙ্গল চকিতে গোলা-বারুদের আগুনে ঝলসে উঠল। আকাশের চাঁদের আলো, মিশকালো বারুদের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল।

নায়কের হুকুম, যেমন করেই হোক নদীর ওই সাঁকো তাদের দখলে আনতে হবে। বন্দুকের গুলির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে তারা এগোবার চেষ্টা করছে। শুরু হয়ে গেল মুখোমুখি লড়াই। এক তিল মাটির জন্যে গুড়ুম—গুড়ুম!

গাছে-গাছে আগুন লেগে গেছে। দাউ-দাউ করে জ্বলছে। আগুন মাথায় নিয়ে চুপচাপ ঝলসে-ঝলসে পুড়তে লাগল বনের গাছগাছালি। নায়ক এগিয়ে গেল সাঁকোর দিকে। ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে। নায়কের সঙ্গে এগিয়ে চলল সৈনিকেরা। ওরা আর থামবে না। শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে ওরা পৌঁছে যাবে নদীর ওপারে!

হ্যাঁ, ওই তো সটান সাঁকোর ওপর উঠে এসেছে! এবার নির্ঘাত ওরা পৌঁছে যাবে সাঁকোর ওপারে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আনন্দে চিৎকার করে নায়ক হেঁকে উঠল, 'আগে বাড়ো।'

আগে এগিয়ে চলল সৈনিকের দল।

গুড়ুম—গুড়ুম!

চারিদিক থেকে গুলি ছুটে-ছুটে আসছে। তবু ওরা তিরের মতো ছুটে চলল—নায়কের সঙ্গে সাঁকোটা জয় করতে। ওরা চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজ করে কী যেন ফেটে পড়ল—দুম!

আগুন—আগুন। যেদিকে চাও আগুন। কুণ্ডুলি পাকিয়ে, ঘন কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে ওই ধোঁয়ার কুণ্ডুলি শূন্যে মিলিয়ে যেতেই নজরে পড়ল, সাঁকোটা ভেঙে গুঁড়িয়ে মুখ থুবড়ে নদীর ওপর পড়ে আছে। শত্রু উড়িয়ে দিয়েছে সাঁকোটা। সেইসঙ্গে ছিটকে গেছে নায়ক আর তার গোটা দলটা। কে মরল, কে বাঁচল তখন আর ভাববার সময় নেই। বিপদ দেখে ভয় পেলেও চলবে না। তাই যারা বেঁচে রইল, তারা স্থিরহয়ে নায়কের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

নায়ক নেই। ওই সাঁকোটা বোমার ঘায়ে ধবংস হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নায়কও নদীর জলে ছিটকে পড়েছে। নায়ক আর আদেশ দেবে না ওদের। শুধু নদীর জলে ভেসে যাবে।

নায়ক সাঁতার জানে। নদীর জলে ভাসতে-ভাসতে ভীষণ কষ্ট করে, সাঁতার কাটতে লাগল। কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। নায়কের রক্তে নদীর জল রঙিন হয়ে উছলে উঠল। নায়ক কি বাঁচবে না?

জলে ভাসতে-ভাসতে অনেকদূরে চলে গেছে নায়ক। রক্ষে এই, শত্রুর নজর পড়েনি তার দিকে। তাহলে হয়তো গুলির পর গুলি ছুড়ে ওর বুকখানা ঝাঁঝরা করে দিত।

ভাসতে-ভাসতে অনেকক্ষণ পর নদীর পাড়ে গিয়ে যখন তার দেহটা এলিয়ে পড়ল, তখনও ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। মাথা ঘুরছে নায়কের। মাথা আর তুলতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে গেল!

আর কিছু জানে না নায়ক। জানে না, কখন তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল দলের লোকেরা।

বেঁচে গেল নায়ক। ঘরেও ফিরে এল। কিন্তু আর তাকে কোনোদিন যুদ্ধে যেতে হল না। কেননা, নায়কের ডান-পা সাঁকো-জয়ের যুদ্ধে গুলির আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সে-পা কাটা গেছে।

যুদ্ধের নায়ক, জগন্নাথের বাবা এখন খোঁড়া! কিন্তু এর জন্যে জগন্নাথের বাবার মনে কোনো খেদ নেই। কারণ বাবা জানে, দেশের জন্যে যুদ্ধ করতে-করতে যে মরে, সে তো বীর! তবু তার ভাবনা একটাই? এই খোঁড়া পা নিয়ে ছেলেটাকে সে মানুষ করবে কী করে! জগন্নাথ এখনও ছোটো। বাবার খোঁড়া পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে জগন্নাথ, আর ভাবে, একদিন সে-ও যুদ্ধে যাবে। তার বাবার পা যারা খোঁড়া করে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে ও লড়াই করবে।

https://boierhut.com/fb

সহজে মুষড়ে পড়ার মানুষ ছিল না জগন্নাথের বাবা। পা নেই তো কী হয়েছে! তার এই চওড়া বুকখানা তো আর দুমড়ে ভেঙে পড়েনি। এই হাত দু-খানার তাগদ যতদিন আছে, সে কাকে ভয় পায়! সে যোদ্ধা। অনেক ঝড়ঝাপটা তার এই মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। অসংখ্য গোলাবারুদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে। তোয়াক্কা করেনি মরতে। বিপদ মাথায় নিয়ে এগিয়ে গেছে। বিপদকে জয় করে বাঁচার মধ্যে যে আনন্দ, সেই আনন্দকেই যেন খুঁজে বেড়ায় জগন্নাথের বাবা। ও জানে, তার ছেলেও একদিন বিপদকে জয় করতে শিখবে। বীরের ছেলে, সে-ও হবে বীর!

একটা গাড়ি কিনল জগন্নাথের বাবা, আর একটা ঘোড়া। কী সুন্দর হালকা নীল রঙের গাড়িটা! ঘোড়াটা যেমন সুন্দর, তেমনি ডগমগিয়াল। ঘোড়ার গায়ের রং বাদামি। তাই সে ঘোড়ার নাম রেখেছে, বাদামি। গাড়ির সামনে ঘোড়া জুতল জগন্নাথের বাবা। তারপর নিজে বসল কোচোয়ান হয়ে। সোয়ারি নিয়ে গাড়ি ছোটালে, 'হ্যাট হ্যাট।' ঘোড়া ছুটল, টগবগ টগবগ।

পা গেছে বলে বসে-বসে, কপাল চাপড়ে হা-হুতোশ করার লোক ছিল না জগন্নাথের বাবা। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া খাটিয়ে, উত্তরপাড়ার লোক দক্ষিণপাড়ার পৌঁছে দিয়ে, ছেলেকে মানুষ করতে লাগল।

গাড়ি ছুটছে। দেখে মনে হয়, রাজপথে রাজার রথ ছুটছে। ঝকমক গাড়ি, টগবগ ঘোড়া। যার যখনই দরকার পড়ছে, তখনই জগন্নাথের বাবার কাছে ছুটছে। কেউ যাচ্ছে মামার বাড়ি, কেউ চলেছে দেশের বাড়ি, কেউ চলেছে হাওয়া খেতে, কেউ-বা যাচ্ছে বিয়ে খেতে। আর গাড়ি যখন ছুটত না, তখন জগন্নাথের বাবা জগন্নাথকে কোলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে শহর ঘুরতে বেরুত। পা গেছে তো কী হয়েছে? সারাদিনে খুঁটিনাটি হাজারটা কাজ করত জগন্নাথের বাবা ওই ঘোড়ার পিঠে চেপে। খোঁড়া পায়ে পথ চলতে ঘোড়া তার বন্ধু হয়ে গেল।

একবার জগন্নাথের বাবার ডাক পড়ল বিয়েবাড়িতে। কী করতে হবে? গাড়ি করে কনেকে বরের সঙ্গে বরের ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। কাল বিয়ে হয়েছে, সানাই বেজেছে। আর আজ সানাই থেমেছে, কনে গাঁটছড়া বেঁধে, মা-বাবার মায়া কাটিয়ে পরের ঘরে পর হয়ে চলে যাবে।

ফুল-পাতা দিয়ে গাড়ি সাজানো হল।

ঘোড়ার মাথায় রঙিন-পালকের সাজ পরানো হল। ঘোড়ার গলায় রেশমি কাপড়ের ঝিলিমিলি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। ঘোড়ার গলায় ঘুঙুর—ঝনঝন বাজতে লাগল।

জগন্নাথের বাবাও সাজল। যতই হোক, নতুন বিয়ের বর-কনে আজ তার গাড়িতে চেপে বাড়ি যাবে। সে না সাজলে, বিয়ে-বিয়ে মানাবে কেন? তাই জগন্নাথের বাবা চুরিদার পাজামাটা পরে নিল, আর সঙ্গে নিল রুপো বাঁধানো লাঠিটা। পা যেদিন থেকে গেছে সেদিন থেকে লাঠিটাই ওর চলার সাথি।

ভারি মানিয়েছে কিন্তু জগন্নাথের বাবাকে!

'হ্যাট-হ্যাট,' বর-কনেকে নিয়ে গাড়ি ছুটল। অমনি ইংরেজি-বাজনার ব্যাগপাইপ বেজে উঠল, প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ, ভ্যাঁপ্পো-ভ্যাঁপ্পো! সহিস হাঁকল, 'সামনেসে হট যাও।'

ঘোড়া ছুটছে, টগবগ, টগবগ। গাড়ি ঘুরছে, চটপট, ঝটপট।

আলোর রোশনাই ঝকমক-ঝকমক।

ছুটতে-ছুটতে গাড়ি রাস্তার খানা-খন্দে যখনই টাল খাচ্ছে, কনের গা-ভরতি সোনার সাজ টুংটাং করে বেজে উঠছে।

ছুটতে-ছুটতে ঘোড়া যখনই কদমে পা ফেলছে, গলার ঘুঙুর ঝমঝম করে নেচে উঠছে। বর-কনের ঘর-যাত্রা বেড়ে লাগছে দেখতে!

খানিকটা এসে, শহরটা শেষ হতেই, মাঠ পড়ল। তখন তো সাঁঝ নেমেছে, তাই মাঠ ধু-ধু গা-ছমছম! লোকে বলে, বদনাম আছে এ- মাঠের। এ-মাঠ পেরুতে দুগগা নাম জপতে হয়। এ-মাঠে ভয় আছে।

ভয় আছে না ঘেঁচু আছে। জগন্নাথের বাবার ওসব থোড়াই কেয়ার। বুক ফুলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'সামনেসে হটো।'

'সামনেসে হটো,' সত্যিই তো, চেঁচায় কেন সহিস? সামনে ওরা কারা? কপাল ভরতি রক্তের ফোঁটা। কানে দুলছে রুপোর মাকড়ি। হাতে ঘুরছে লোহার বালা।

'হা-রে-রে-রে,' করে হাঁক পেড়ে লাফিয়ে পড়ল গাড়ির সামনে। ঘোড়া চিঁহিহি করে দুপা তুলে, দাঁড়িয়ে পড়ল পথের মাঝখানে। তারপর 'মার মার' করে সেই রক্তের ফোঁটাপরা লোকগুলো লাঠি ঘোরাতে লাগল।

জগন্নাথের বাবার বুঝতে বাকি রইল না, এরা কারা। নতুন কনের সোনার সাজ এরা লুঠ করবে। এরা লুঠেরা। নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে জগন্নাথের বাবা। বুঝেছে, বর-কনেকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে নিজের রুপো-বাঁধানো লাঠিটা হাতে নিয়ে 'তবে রে শয়তান' বলে গাড়ির ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর এক পায়ে খাড়া। লুঠেরার দল হুংকার দিয়ে উঠল। হুংকার দিতে-দিতে লাঠি ঘোরাতে লাগল। অমনি জগন্নাথের বাবার হাতের লাঠি সাঁই-সাঁই করে গর্জে উঠেছে। তিরের বেগে লাঠি পড়ল কারো ঘাড়ে, কারো মাথায়। কেউ ছিটকে পড়ল মাটিতে, কারো মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরল। কেউ পড়ে-পড়ে বেদম মার খেল। বাকিরা যে-যেদিকে পারল মারল ছুট। ঘোড়া চার পা তুলে লাফিয়ে উঠে চিৎকার শুরু করে দিল চিঁহিহিঁ। জগন্নাথের বাবা সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া গাড়ি নিয়ে কদম-পায়ে ছুট দিল। জগন্নাথের বাবা লাঠি ঘোরাতে-ঘোরাতে হাঁক পাড়ল, 'সামনেসে হটো-হটো'।

কোথায় গেল ইংরিজি-বাজনার ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপ্পো আর কোথায় গেল সেই রং-বেরঙের আলোর রোশনাই! বাজনদার আর আলোর বাহক দে চম্পট! আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

কী সাহস জগন্নাথের বাবার! মানুষটার একটা পা। এক পায়ে এ যে ভেলকি দেখাল জগন্নাথের বাবা। গাড়ি ছুটছে। গাড়ির ভেতর বসে-বসে বর কাঁপছে ঠকঠক করে। কনে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। লুঠেরা তাদের গায়ে হাত ছোঁয়াতে পারেনি। কী বাহাদুরি জগন্নাথের বাবার।

গাড়ি যখন বরের বাড়ি পৌছল, তখন জগন্নাথের বাবার গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। বর-কনেকে ঘরে তুলে দিয়ে যখন বিদায় নেবে, তখন কনের জ্ঞান এসেছে। ছুটে এসে জগন্নাথের বাবার পায়ের ওপরে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে ফেলল। জগন্নাথের বাবা দুহাত দিয়ে কনেকে তুলে নিল। মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'বোকা মেয়ে, কাঁদছিস কেন? আমি থাকতে তোর গায়ে কে হাত দেবে! জানিস, আমি সৈনিক। যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার পা গেছে। পা থাকলে প্রাণ নিয়ে কেউ পালাতে পারত! কাঁদিস না মা। যা, ঘরে যা। তোদের আর ভয় নেই।' বলতে-বলতে জগন্নাথের বাবারও চোখ ছলছলিয়ে উঠল। মাথায় হাত রেখে কনের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, নিজের চোখের জল চোখে নিয়ে, গাড়ি ছুটিয়ে বাড়ি ফিরল।

আজ বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জগন্নাথের বাবা। ঘোড়াকে রোজকার মতো দলাই-মালাই করে, দানাপানি দিয়ে ছেলের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। জগন্নাথ ঘুমিয়ে পড়েছে। এত ক্লান্তির মধ্যেও মনটা তার আজ ভারি তৃপ্ত। ভারি হালকা। মনে হচ্ছে, আজ যেন সত্যিকারের একটা কাজের মতো কাজ করতে পেরেছে জগন্নাথের বাবা। ওই লুঠেরাদের সে শায়েস্তা করেছে। ওদের শয়তানি টুকরো-টুকরো করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওই খোঁড়া মানুষটা।

কখন যে ঘুম আপনি এসে চোখের পাতায় ডুব দিল, বুঝতে পারে না জগন্নাথের বাবা। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। এখন ওই ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালে মনে হবে, ওর মতো এমন সুখী মানুষ বুঝি আর দুটি নেই। যতক্ষণ বুকের কাছে ওই ছেলেটা রয়েছে, ততক্ষণ কাকে ভয় করে সে! ভাবনা শুধু ছেলেটার জন্যে। এখনও সমর্থ হয়ে উঠতে তার অনেক দেরি। থাক দেরি, তবু নিশ্চিত জানে, এ ছেলে একদিন বড়ো হয়ে উঠে তার খোঁড়া বাপের দুঃখ ঘোচাবে। কোন বাপ না ছেলের কথা ভেবে স্বপ্ন দেখে? কে না ভাবে, তার ছেলে পাঁচজনের একজন হবে? জগন্নাথের বাবাও ভাবে। জগন্নাথের বাবাও স্বপ্ন দেখে। দেখে সেই ঝলমল আর সুন্দর দিনের ছবি। একদিন জগন্নাথের বিয়ে দিয়ে ঘরে বউ আনবে। তার শূন্য ঘরে আলো ফুটবে। কত আনন্দ, কত খুশি—

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জগন্নাথের বাবার। চোখের ভেতরটা এত জ্বলে উঠল কেন? চোখ মেলেই উঠে পড়েছে। হকচকিয়ে গেছে!

এত ধোঁয়া এল কোত্থেকে ঘরের ভেতরে! তড়িঘড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। ঘরের দরজা খুলতেই চমকে গেছে। একি! দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে যে আস্তাবলে, আগুন লেগেছে তার সাধের ঘোড়ার গাড়িতে। চিৎকার করে উঠল, 'আগুন।' সেই চিৎকার শুনে আস্তাবলের ঘোড়াও চিঁহি-চিঁহি ডাক ছেড়ে লাফালাফি লাগিয়ে দিল। আগুনও লাফিয়ে-লাফিয়ে তার ঘরের দিকে ছুটে আসছে। বুকটা দুর-দুর করে শিউরে উঠল। ঘরে যে তার ছেলে ঘুমুচ্ছে! তাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু তার আগেই ওর মাথার ওপর লাঠি পড়ল, ধাঁই! ছিটকে পড়ে গেল ওই লম্বা-চওড়া মানুষটা। ওর ঘাড়ের ওপর কে যেন পা তুলে চাপ দিল। চেয়ে দেখল জগন্নাথের বাবা। দেখল, সেই লুঠেরাদের সর্দার।

অত সহজে হেরে যাবার মানুষ নয় সে! একটা পা গেছে তার। কিন্তু হাত দুটো তো নুলো হয়ে যায়নি। দু-হাত দিয়ে জাপটে ধরেছে সর্দারের ঠ্যাংটা। তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে চাপ দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে সর্দারকে ছিটকে ফেলে দিল সাত হাত দূরে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে কোঁকাতে লাগল সর্দার।

জগন্নাথের বাবা ছুটে ঘরে ঢুকে গেছে। ছেলেকে নিমেষের মধ্যে পিঠে তুলে নিল। এক পায়ে লাফ দিতে-দিতে ঘরের বাইরে। ততক্ষণে দুরন্ত আগুন ঘরের মধ্যে দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে।

ভেবে পাচ্ছে না, এখন কী করবে সে! লুঠেরার লাঠির ঘায়ে তার মাথা দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে! বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সেদিকে তাকাবার আর ফুরসত নেই। ও বুঝতে পেরেছে, ওই লুঠেরার দলই এই নিশুতি-রাতে তার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। হয়তো এবার তারা ওদের দুজনকেও মেরে ফেলবে। না, জগন্নাথকে মরতে দেবে না সে। ছেলেকে লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু কোথায়?

ওই যে লুঠেরার দল। সামনে একটু দূরে ওরা দাঁড়িয়ে। ওদের হাতে বন্দুক! না, ভয় পেল না। কারো কাছে কোনোদিন মাথা হেঁট করেনি জগন্নাথের বাবা। বুক ফুলিয়ে, ওদের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবল, এখন বোকার মতো মুখোমুখি লড়াই করলে নিশ্চিত বিপদ! তাই ও চিৎকার করে ডাক দিল তার ঘোড়াকে, 'বাদামি।'

বাদামিও তার হাঁক শুনে ডাক ছাড়ল, চিঁহি-চিঁহি-হি! ঘোড়া চোখের পলকে ছুটে এল তার কাছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে বাবা এক পায়ে ভর দিয়েই লাফিয়ে উঠল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া সেই ধোঁয়ার কালো-ছায়ার আড়ালে ছুট দিল। লুঠেরার দল চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগলো, ভাগলো!' সর্দার হুংকার দিল, 'মার ডালো, মার ডালো!'

ঘোড়া তখন ছুটতে-ছুটতে রাস্তায় নেমেছে। সর্দারের হুকুম পেয়ে লুঠেরার দলও ঘোড়ার পিছু ছুট দিয়েছে। ওরা চেঁচাল, 'থামো, থামো, নইলে জান যাবে।'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

থামবে না জগন্নাথের বাবা! ওদের হুকুম তামিল করবে একজন সৈনিক? ও ভয় পাবে ওই নীচ লুঠবাজদের?

গুড়ুম—গুড়ুম! গুলি ছুটল।

ওই অত বড়ো বিশাল দেহটা নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘোড়া। ওর পায়ে বন্দুকের গুলি লেগেছে। ছেলেকে কোলে নিয়ে জগন্নাথের বাবাও হুড়মুড়িয়ে পড়ল মাটির ওপর। তাড়াতাড়ি উঠতে গেল। পারল না। কে যেন তার মাথায় বাড়ি মারল। মাথা ঘুরে গেল। নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল সেইখানে। ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা।' বাবা সাড়া দিল না। বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছে!

কিছুই করতে পারল না জগন্নাথও। নিমেষের মধ্যে ওই লুঠেরার দল ছুটে এসে, ছোঁ মেরে ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল। জগন্নাথ কিছু বোঝবার আগেই ওরা ওকে একটা বস্তার মধ্যে পুরে ফেলল। জগন্নাথ ঘাড়ে-গর্দানে এক হয়ে বস্তার মধ্যে হাঁসফাঁসিয়ে চিৎকার শুরু করে দিল! কিন্তু কে শুনছে সে চিৎকার!

জগন্নাথের বাবা পড়ে রইল অজ্ঞান হয়ে রাস্তায়। আর বস্তায় বেঁধে ওরা জগন্নাথকে ধরে নিয়ে এল নিজেদের আস্তানায়।

চেঁচাতে-চেঁচাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জগন্নাথ। আর যেন গলা ওর কথা বলতে পারছে না। ও যেন ঝিমিয়ে পড়ল।

এ কোথায় নিয়ে এল ওরা জগন্নাথকে। অন্ধকার রাত। বোঝা-ই যায় না। ওরা বস্তাটা ধপাস করে আছড়ে শান বাঁধানো মেঝের ওপর ফেলল। লাগল জগন্নাথের। লেগেছে মাথায়। তবু একটুও শব্দ বেরুল না ওর মুখ দিয়ে।

বস্তাবন্দি হয়ে মেঝের ওপরই পড়ে রইল জগন্নাথ সেই অন্ধকার রাত্রে। জগন্নাথ আসলে কিছুই বুঝতে পারেনি। বোঝবার সময়ই-বা পেল কই? তাছাড়া সব কিছু বোঝবার মতো সময়ও তার হয়নি। এখনও। সব কিছু কেমন যেন ওর ঘুম-জড়ানো চোখের ওপর আচকা ঘটে দোল, কী সে হল, কেন য়েতাদের বাড়িতে আগুন লাগল আর বাবা যে কেন জগন্নাথকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে ছুটছিল, এসব 'কেন'র কিছুই উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না জগন্নাথ। শুধু ওর বাবার মুখখানা যখনই হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছিল, তখনই বস্তাটা ছিঁড়ে ফেলার জন্য ওর ছোট্ট হাত দুটি আঁকপাক করে টানাটানি লাগাচ্ছিল। টানলে কী হবে! বস্তা ছিঁড়ছে না। সে-শক্তি তার নেই। ওর যেন দম আটকে আসছে।

কখন অজানতে অন্ধকার রাতটা কেটে গেল। জগন্নাথ বুঝতে পারল, এখন সকাল হয়েছে। কেননা, কাক ডাকছে। হঠাৎ যেন মনে হল, কারা ফিসফিস করে কথা বলছে!

https://boierhut.com/fb

হ্যাঁ, কথাই বলছিল লুঠেরার দল। ওরা জগন্নাথের বস্তাটা টেনে তুলে নিল। এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলল জগন্নাথকে। ও আর একবার সেই বস্তার মধ্যে তেড়েমেড়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করল, পারল না। বুকটা ওর কেঁপে উঠল, ভয়ে। হাঁপাতে লাগল জগন্নাথ!

ওকে একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে এল লুঠেরার দল। মস্ত চত্বর। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। পাঁচিলের একদিকে একটা লোহার ফটক। সেই চত্বরের মাঝ-বরাবর ওরা বস্তাটা ছুড়ে ফেলল। তারপর বস্তার মুখটা খুলে, জগন্নাথকে টেনে বার করল। জগন্নাথের চোখ দুটি এতক্ষণ অন্ধকারে বন্ধ ছিল। হঠাৎ খোলা আলো চোখে পড়তেই ঝলকে উঠেছে চোখ দুটি। চাইতে পারছে না। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল জগন্নাথ। পা দুটি টলছে তার।

জগন্নাথের চোখের দৃষ্টি ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল আলোয়। ও দেখল, একটু দূরে, একদল লোক তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখগুলো লাল টকটক করছে! জগন্নাথ বুঝতে পারল না এরা কারা। শুধু এইটুকু বুঝল, কাল রাত্রে ওরাই তার বাবার মাথায় লাঠি মেরে রক্ত বার করে দিয়েছে। বুঝল, ওরাই জগন্নাথকে ধরে এনেছে। কিন্তু এখন যে সে কী করবে, সেটাই ঠিক করতে পারছে না। বুঝতে পারছে না, এখান থেকে ছুটে পালাবে কি না। পালাবেই বা কোথা? চারপাশের পাঁচিল এত উঁচু, লাফালেও নাগাল পাবে না। তাছাড়া লাফানোর কথা এখন ওঠেই না। ওর বলে দাঁড়াতেই কষ্ট হচ্ছে! তবু সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতেই পা ফেলবার চেষ্টা করল।

হঠাৎ কোথাও কিচ্ছু নেই, কাড়া-নাকাড়া বাজলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি একটা ভয়ংকর শব্দ করে বাজনা বেজে উঠল। জগন্নাথ চমকে চাইতেই দেখল, সামনে একটা ষাঁড়! তার দিকে শিং উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটা থতমত খেয়ে গেছে জগন্নাথ। নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলে জগন্নাথ সেই দোমড়ানো-মোচড়ানো শরীরটা সিধে শক্ত করে নিল। ষাঁড় ছুটে এল জগন্নাথের দিকে। জগন্নাথ হকচকিয়ে গেছে। বুঝল তার বিপদ। তখন আর কিছু ভাববার সময় নেই তার। ও লাফ দিয়ে সরে গেল। ষাঁড়টা জগন্নাথকে মারতে গিয়ে নিজেই মারল এক গোঁত্তা পাঁচিলের গায়ে। আর বলব কী, সঙ্গে-সঙ্গে ওই কাড়া-নাকাড়ার শব্দটা যেন দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠল। ষাঁড়টাও রেগে কাঁই! চার পা তুলে ভীষণ দাপাদাপি শুরু করে দিল। ওই পাগলা ষাঁড়কে সামাল দেবার সাধ্যি আছে জগন্নাথের! আবার তেড়ে আসছে ষাঁড়! দিল গুঁতিয়ে! না, এবারও সামলে নিয়েছে জগন্নাথ। কিন্তু এ কী! হঠাৎ জগন্নাথ ষাঁড়ের পেছনে ছুটল কেন?

এক লাফ মারল সে! ছেলের কী সাহস দেখা! লাফ দিয়ে সে ষাঁড়ের পিঠের ওপর বসে পড়েছে! বসেই ষাঁড়ের ল্যাজে পাক মেরেছে! আর কে দেখে ! ষাঁড় তিড়িং-বিড়িং ঠ্যাং ছুড়ল এদিক -ওদিক ছুট মারল! চত্বরের চারপাশে চরকি খেতে লাগল। তখন ষাঁড়ের সামনে যাবে কে? গুঁতিয়ে নাড়িভুঁড়ি বার করে দেবে না! জগন্নাথ কিন্তু ছাড়বার পাত্তর নয়! পিঠে বসে, ষাঁড়ের ল্যাজে পাক দিতে-দিতে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল শিবঠাকুরের বাহনটিকে! ঠ্যাংই ছোড়ো আর লাফই মারো, জগন্নাথ ছাড়ছে

না! এ তো দেখি উলেটো বিপত্তি! কোথায় জগন্নাথকে ঠান্ডা করার জন্যে ষাঁড়কে আনা হল, এখন তো জগন্নাথই ষাঁড়কে জব্দ করে ছাড়ছে। এবার যদি ষাঁড় কেটে পড়তে না পারে, তো নির্ঘাত ষাঁড়-বাবাজির প্রাণ বেরুবে! কিন্তু কাটবে কোন দিকে! এদিক-ওদিক সব দিকে ছুট মেরে ষাঁড় যখন কিচ্ছু কূল-কিনারা করতে পারল না, তখন মারল ঢুঁ ওই লোহার ফটকে। ফটক ভাঙল না। জগন্নাথ ভাবল, এই তো তাল। ল্যাজটা এবার আরও জোরে দিয়েছে পেঁচিয়ে। ষাঁড় আবার হুড়মুড়িয়ে ফটকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তবুও ফটক ভাঙল না। তবে আর একবার দে নাচিয়ে! ষাঁড় থাক-প্রাণ যাক প্রাণ করে ফটকের ওপর এমন ছিটকে পড়ল যে ফটক ধড়মড় করে মাটির ওপর চিৎপাত! আর দেখতে, ষাঁড়ও ল্যাজ তুলে ভাঙা ফটক টপকে মার ছুট! জগন্নাথ ছুটন্ত ষাঁড়ের ল্যাজ মুড়িয়ে আরও জোরে ছোটার জন্যে চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাট, হ্যাট।'

ষাঁড় জগন্নাথকে পিঠে নিয়ে তিরের মতো ছুটতে লাগল!

লাল টকটকে চোখওলা মানুষগুলো তো তাই দেখে থ। তাদের কিছু বোঝার আগেই ষাঁড় পগারপার। আর এমনই বরাত, হাতের কাছে একটা বন্দুকও রাখেনি কেউ! কে আর ভেবেছিল বন্দুক লাগবে? ভেবেছিল, ষাঁড়ের গুঁতোতেই ছেলের পিণ্ডি চটকে যাবে! কিন্তু এখন নিজেরাই ভোঁতা মুখে থোঁতা হয়ে বসে থাকো!

কিন্তু বসে থাকার জন্যে তো আর জন্মায়নি ওই লুঠেরার দল। যখন দেখল, সত্যিই ষাঁড়ের পিঠে চেপে ছেলেটা ভাগছে, তখন তারাও 'ধর ধর' করে তাড়া লাগাল। কিন্তু ধরবে কে? আর কাকেই বা ধরবে। একটা পুঁচকে ছেলের পাল্লায় পড়ে ষাঁড়-বাবাজি নাস্তানাবুদ। ঈশ কী ঘেন্না! ঘেন্না যত পাচ্ছে, ষাঁড়ের গোঁ তত বাড়ছে। গোঁ তো গোঁ, ষাঁড়ের গোঁ! মোচড় খেয়ে ল্যাজই ছিঁড়ুক, কী হোঁচট খেয়ে থুবড়ে মরুক, উনি থামবেন না! দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটবেন।

ষাঁড়ের সঙ্গে ছুটে লুঠেরার দল পারবে কেন? তারা একেবারে বেপাত্তা! এখন ভাবছে, ছেলেটা যাক ক্ষতি নেই। ষাঁড়টা ফিরলে বাঁচি!

আর ফিরেছে! বাঁটকুলে ষাঁড় বেঁটে ঠ্যাং-এ দৌড় মেরে, রাস্তাঘাট, দোকান-মাঠ ছাড়িয়ে-ছুড়িয়ে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চোঁচা পিটটান!

নিশ্চিন্ত হল জগন্নাথ। লোকগুলোকে আর দেখাই যাচ্ছে না। জগন্নাথ ভাবল, এখন থামা যায়, ষাঁড়ের পিঠ থেকে নামা যায়! তাই পেছনবাগটা আর একবার ভালো করে পরখ করে জগন্নাথ ষাঁড়ের ল্যাজের থেকে হাত সরিয়ে প্যাঁচ মারা থামাল। কিন্তু কই, ষাঁড় তো থামল না? যেমন ছুটছিল তেমনিই ছুটছে। জগন্নাথ ভাবলে, এ তো দেখি উলটো ঝঞ্ঝাট! ষাঁড়টা শেষে খেপে গেল নাকি! তাই ষাঁড়ের মেজাজটা ঠান্ডা করার জন্যে ও নরম সুরে তাল দিল, 'আ-আ! থাম-থাম!'

ষাঁড়ের বয়ে গেছে। সে যেমন ছুটছিল, তেমনিই ছুটছে। জগন্নাথ থামবার জন্যে যতই 'আই-আই' করে, ষাঁড় ততই পাঁই-পাঁই ছোটে। এবার কিন্তু ভয় পেয়ে গেল জগন্নাথ! দেখেশুনে মনে

হচ্ছে, ষাঁড় বুঝি আর থামবেই না। তা হলে এখন কী করা যায়! এ তো আর ছাগল-ভেড়া নয় যে, ধমক দিয়ে সামলে নেবে! এর নাম ষাঁড়! বিগড়োলে আর রক্ষে নেই। কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে বিগড়েই গেছে! এখন কী করবে জগন্নাথ। ওর পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়বে নাকি। কিন্তু হাত-পা ভাঙলে?

একে বলি ভাগ্য! কেননা, পড়বি তো পড়, সামনে রাস্তার গায়ে, একটা গাছ। একটা ডাল নিচু হয়ে ঝুলে আছে। রাস্তায় ওপর। চট করে মাথায় বুদ্ধি এসে গেল জগন্নাথের। করেছে কী, গাছের নীচ দিয়ে ষাঁড়টা যেই ছুটতে যাবে, জগন্নাথ অমনি ঝপাং করে একটা ডাল ধরে ফেলেছে। ধরেই পড়েছে ঝুলে ষাঁড়ের পিঠ থেকে গাছের ডালে! ঝুল-ঝুল বাদুড়-ঝোলা! কিন্তু এ কী! তবুও তো ষাঁড় থামল না। ল্যাজ উঁচিয়ে যেমন ছুটছিল তেমনিই ছুটছে। ছুটতে-ছুটতে নিশ্চিন্দিপুর! পেছন ফিরে একবার দেখলেও না যে, পিঠ থেকে লাফ মেরে তার সওয়ার জগন্নাথ ঠ্যাং-ঝোলা হয়ে গাছে দোল খাচ্ছে!

ষাঁড় তো গেল, সে না হয় হল, কিন্তু এমনি করে বাঁদরের মতো ডাল জাপটে জগন্নাথ আর কতক্ষণ থাকতে পারে? কষ্ট তো হচ্ছে বটেই। তা ছাড়া ওর তো আর জানতে বাকি নেই, ষাঁড় খুঁজতে সেই পাজি লোকগুলো এক্ষুনি এসে পড়বে! তাই চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে তরতর করে গাছের মগডালে উঠে পড়ল। পাতার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে রইল। এখানে আর ওকে খুঁজে পেতে হচ্ছে না!

রাস্তাটা নাক-বরাবর সিধে চলে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে অনেকদূর অবধি স্পষ্ট দেখা যায়! সুতরাং কেউ যদি এদিকে আসে, অনেক দূর থেকেই জগন্নাথ দেখতে পাবে। ষাঁড়ের হাত থেকে এখন সে না হয় নিস্তার পেল। কিন্তু কে ভরসা দিতে পারে যে, ওই লুঠেরাদের খপ্পর থেকে জগন্নাথ রক্ষা পাবে! এই সময় যদি একটা বন্দুক থাকত জগন্নাথের কাছে! তাহলে লুঠেরাই আসুক, কী ভূতেরাই আসুক, গুড়ুম—গুড়ুম! জগন্নাথের কাছে সব ঠান্ডা! ওর বাবা যখন যুদ্ধ করত, বন্দুক ছিল। জগন্নাথ কতবার সেই বন্দুক হাত দিয়ে দেখেছে। বন্দুকের ভেতর চোখ রেখে কেমন করে শিকার টিপ করতে হয় তা ও জানে।

বলো, এইভাবে গাছের ডালে বসে থাকা যায়? অনেকক্ষণ তো কাটল, তবু তো প্রভুরা এখনো এলেন না! তবে কি তাঁরাও ষাঁড়ের মায়া ত্যাগ করে, ঘরের ভেতর নাকডাকতে শুরু করে দিয়েছেন? হুঃ ! গেছে তো ভারি একটা ষাঁড়! ওরা অমন ইচ্ছে করলে, একশো-দুশো ষাঁড় নিয়ে তুলকালাম কাণ্ডশুরু করে দিতে পারে। সে না হয় ঠিক আছে। একশো-দুশোর জায়গায় পাঁচশো-ছশো ষাঁড় আসুক। ষাঁড় নিয়ে যত পারে ষণ্ডাষণ্ডি করুক, কিন্তু এখন যে জগন্নাথের দফা-রফা হয়ে যাচ্ছে। ভেবেই পাচ্ছে না জগন্নাথ, কখন বাবার কাছে ফিরে যাবে। তাছাড়া কোন রাস্তা দিয়ে যে ও ফিরে যাবে, তাও বুঝতে পারছে না। এ কোথায় যে এসে পড়েছে সে, কে জানে!

না, এখনও যখন এল না, মনে হচ্ছে আর কোনো ভয় নেই। ভয় থাক আর নাই থাক, জগন্নাথ আর গাছের ডালে এমন হনুমানের মতো বসে থাকতে পারছে না। কী ঝকমারি! ভালোরে-ভালো, কাল সারারাত বস্তাবন্দি হয়ে কোনোরকমে প্রাণটি নিয়ে বেঁচে ছিল। তারপর ষাঁড়ের গুঁতো! আর এখন? এ আবার কোন গাড্ডায় পড়ল বলো?

'এই জগন্নাথ।'

বুকটা ধড়াস করে উঠেছে। কেউ ডাকল নাকি তার নাম ধরে! চোখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখলে জগন্নাথ। কিন্তু কেউ নেই তো!

'এই জগন্নাথ!'

সত্যিই তো, আবার ডাকল! আর কথা আছে! গাছ থেকে দুড়দাড়িয়ে লাফ মেরে দে লম্বা! জগন্নাথ টেনে ছুট মারল।

ছুটুক। কিন্তু ছুটবে কোথায়? বিপদ যখন আসে তখন তো আর একদিক থেকে আসে না। সাঁড়াশির মতো দাঁত খিঁচিয়ে চারদিক থেকে তেড়ে আসে! তা না হলে জগন্নাথ ওই লুঠেরাদের ভয়ে যতক্ষণ গাছের ডালে বসে ছিল, ততক্ষণ তাঁদের টিকিটি দেখা যায়নি! যেই না ও গাছ থেকে নেমেছে অমনি একেবারে সামনা-সামনি! এই রে! কে জানে ওরা জগন্নাথকে দেখতে পেল কি না! কিন্তু জগন্নাথ তো দেখে ফেলেছে। আর দেখতে আছে? জগন্নাথ দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে দে ছুট!

বলব কী, সঙ্গে-সঙ্গে আবার সেই ডাক। এবার যেন একটু ব্যস্ত হয়ে ডাকল, 'এই জগন্নাথ, পালাচ্ছিস কেন? দাঁড়া, দাঁড়া!'

এ কী রে! এ যে একটা বাঁদর!

বাঁদর! তাই তো, তাই তো! বাঁদর-মহারাজই তো গাছের ডালে আগ বাড়িয়ে ডাকছে! এ আবার কোন দেশি বাঁদর রে বাবা, কথা বলে!

জগন্নাথ জানে, যে পালায় সে বাঁচে, সুতরাং, এখন তার পিছুই ডাকো আর সামনে হাঁকো, কিছুই সে দেখল না ছুট-ছুট-ছুট।

অমন করে ছুটে পালালে কার নজরে না-পড়ে। ঠিক দেখতে পেয়েছে লুঠেরার দল। আর কথা আছে! ওরাও দিয়েছে ছুট জগন্নাথের পিছু। কিন্তু যেতে তো হবে এই গাছের নীচ দিয়ে! যাক না একবার! গাছের ওপর বাঁদর-মহারাজ! তিনি তো কোমর বেঁধে তৈরি। হাতে তার ভাঙা ডাল। তাই যেই না প্রথম জন গাছের নীচ দিয়ে ছুটে গেল, ধাঁই! মাথায় গাছের ডালের ঘা পড়ল। ধপাস! লোকটা পড়ে গেল। যেই না দ্বিতীয় জন ছুটে জগন্নাথকে ধরতে গেল, ঠকাস! ঘাড়ে লাঠি পড়ল। মটাস! ঘাড় ভাঙল। তারপর বাঁদর-মহারাজ আনতাবড়ি সাঁই-সপাসপ, ধাঁই-ধপাধপ করে গাছের ওপর লাঠি ঘুরিয়ে লাঠালাঠি শুরু করে দিল! আরে সববনাশ! দেখো, দেখো, কী বেদম ঠেঙানি দিচ্ছে!

ঠেঙানি খেতে-খেতে বাঁদরের কাছে লুঠেরার দল যখন হেরে গো-হারান হয়ে গেছে, তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালা, পালা, পালা! পিটুনির ঠেলায় বাপ বলতে তর সইল না! কারো হাড় ভাঙল। ঘরে ফিরে ভাঙা হাড়ে মালিশ করতে বসল। কারো গা কাটল। কাটা ঘায়ে মলম-পটি বাঁধতে লাগল।

লুঠেরার দল ভেগে পড়তেই, বাঁদর গাছ থেকে মেরেছে লাফ। লাফ মেরেই জগন্নাথের পিছু ছুটল। ডাক দিল, 'জগন্নাথ জগন্নাথ। দাঁড়া, দাঁড়া।'

জগন্নাথ চেয়েই দেখল না। ছুটতে-ছুটতে জগন্নাথও চেঁচাল, 'বাবা, বাবা!'

ছেলে বিপদে পড়ে বাবাকে হাঁক পেড়ে ডাকছে, এ তো আর কোনো আশ্চর্য কথা নয়। কিন্তু একটা বাঁদর জগন্নাথের নাম ধরে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ছুটছে, এ দেখলে তো লোকে তাজ্জব বনে যাবে!গেলে আর কী করা ! ওই তো ডাকছে। কেউ তো আর কানে তুলো গুঁজে বসে নেই যে, শুনতে পাবে না!

বাঁদরের সঙ্গে ছুটে জগন্নাথ পারবে কেন? ওরা যেমন ছুটতে পারে, তেমনি লাফ মেরে হাঁটতে পারে। কাজেই জগন্নাথ যতই ছুটুক, বাঁদর ঠিক ধরে ফেলবে।

ধরে ফেলবে বলি কেন, ওই তো ধরেই ফেলেছে। জগন্নাথের একদম কাছাকাছি এসে পিছন থেকে বাঁদর চেঁচাল, 'এই জগন্নাথ।'

জগন্নাথ চেঁচানি শুনল না।

বাঁদর তখন জগন্নাথের মুখের সামনে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কোথা যাচ্ছিস?'

জগন্নাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে। বাঁদরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল! ভাবল, এতক্ষণ কি তা হলে বাঁদরটাই তার নাম ধরে ডাকছিল! কিন্তু বাঁদর কথা বলতে পারে, এমন কথা তো ও কস্মিনকালেও শোনেনি।

বাঁদর ব্যস্ত-গলায় আবার বলল, 'পালাতে হবে। এক্ষুনি ওরা এসে পড়বে। আমার পিঠে চাপ।'

জগন্নাথ ভাবল, যাঃচ্চলে! বাঁদরটা তো বেশ স্পষ্ট-স্পষ্ট কথা বলছে! মুখের ফাঁকে ফসকাচ্ছে না, আটকাচ্ছেও না। আর এতই যখন গায়ে পড়ে ভাব করতে চাইছে, তখন বাঁদরের সঙ্গে কথা বলতে তার কোনো কিন্তু-কিন্তু না-করাই ভালো। তাই বলল, 'তুই কোন দেশি বাঁদর রে, কথা বলছিস?'

বাঁদর উত্তর দিল, 'বাঁদর আমি বিদেশি, তবে কথা বলছি এ-দেশি। আমি লেখা-পড়া জানা বাঁদর কিনা!'

জগন্নাথ জিজ্ঞেস করল, 'তুই লেখাপড়া জানিস?'

'নির্যস! আর, জানি বলেই তো তোকে পিঠে চাপতে বলছি।' উত্তর দিল বাঁদরটা। জগন্নাথ বলল, 'আমি তোর চেয়ে বড়ো। আমার ভার সামলাবি কী করে? তুই মুখ থুবড়ে পড়লে, আমি মরব যে।'

বাঁদর উত্তর দিল, 'আমার পিঠে চাপলে তোর পড়ার ভয় নেই। তবে না-চাপলে চ্যাঁক-চুঁক হয়ে যাবার যথেষ্ট কারণ থেকে যাচ্ছে!'

বাঁদরের কথা শুনে জগন্নাথ ফ্যালফেলিয়ে গেল। কেননা, চ্যাঁক-চুঁক কথাটা তো সে কোনোদিন শোনেনি। কথাটার যে কী মানে তা-ও সে জানে না! না-জানলেও জিজ্ঞেস করা যাচ্ছে না। তাহলে বাঁদরের কাছে মুখ থাকে না। বাঁদর বিদেশি হয়েও যে-কথাটা জানে, জগন্নাথ এ-দেশি হয়েও সে-কথাটা জানে না, এ-কথাটা জানাজানি হয়ে গেলে লোকে থু-থু করবে! তাই জগন্নাথ ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বাঁদরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর পিঠে চাপলে বাবাকে খুঁজে পাব?'

বাঁদর বলল, 'দেখা যাক, মঙ্গলে ক্ষুধা, বুধে পাঁউরুটি! নে তো, এখন পিঠে বস।'

এ- কথা বলতেই হবে, কথা-বার্তায় বাঁদরটা জগন্নাথকে কাত করে দিয়েছে। কারণ 'মঙ্গলে ক্ষুধা, বুধে পাঁউরুটি' এ- সব কথা জগন্নাথ শোনেইনি কোনোদিন। তাই আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না-করে ওর পিঠের ওপর উঠে পড়ল!

বাঁদর বলল, 'আমার গলাটা হাত দিয়ে যথেষ্ট জড়িয়ে ধরবি।'

জগন্নাথ যথেষ্ট জড়াল কি না বলা যথেষ্ট শক্ত, কিন্তু দেখা গেল বাঁদরটা ওকে পিঠে নিয়ে লাফিয়ে, খানাখন্দ পেরিয়ে বেমালুম বেপাত্তা হয়ে যাচ্ছে। জগন্নাথ যেন হালকা ফুস, একটা চড়াই পাখি!

জগন্নাথ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে বাঁদর?'

বাঁদর উত্তর দিল, 'আজ একাদশী? সব কথা বলতে নেই, শুনতেও নেই। পেটের যেমন উপোস, মুখেরও তেমনি হা-হুতাশ!'

জগন্নাথ চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো গোল্লা-গোল্লা করে বলল, 'অ!'

বাঁদরটা আবার বলল, 'তবে আমাকে তোর বাঁদর বলা উচিত নয়। কেননা, বাঁদর আমার নাম নয়। অসভ্য, অশান্ত, অবাধ্য, ইত্যাকার বিভিন্ন প্রকারের বালক-বালিকাদের বাঁদর বলে। আমি আসলে মাংকি।'

জগন্নাথের মুখ ফসকে আবার ফুট করে বেরিয়ে এল, 'অ!'

লাফাতে-লাফাতে ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ বাঁদরটা একটা পেয়ারা গাছের নীচে ঝুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছ থেকে একটা পেয়ারা ছিঁড়ে জগন্নাথকে বলল, 'খা।'

জগন্নাথ মুখটা বিচ্ছিরি করে বলল, 'খেতে ইচ্ছে নেই।'

বাঁদর বলল, 'খেয়ে নে। এখনও অনেকটা যেতে হবে!'

'কেন, আমাদের বাড়িটা কি এখনও অনেক দূরে?' জিজ্ঞেস করল জগন্নাথ।

সিধে সাফ-সাফ উত্তর না দিয়ে, বাঁদরটা বেঁকা মুখে কেমন 'হুঃ! হুঃ!' করে হেসে দিল। তারপর জগন্নাথকে পিঠে নিয়ে আবার লাফ মারল।

বাঁদরের হাসি দেখে জগন্নাথের খুবই সন্দেহ হয়েছে। জগন্নাথ আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমায় নামিয়ে দাও, তোমার মতলব খারাপ।'

জগন্নাথের চেঁচানি শুনেই বাঁদরটা কেমন চুপসে গেল। জগন্নাথকে কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'তুই বিশ্বাস কর, রামছাগলের দিব্যি করে বলছি, সেরকম আমার কোনো অসৎ অথবা অন্যায় ইচ্ছাও নেই, অনিচ্ছাও নেই। তবে কী জানিস, তোর বাবাকে তো আমি খুঁজে দিতে পারব না, তাই তোকে আমার তাল-ফুলুড়ি মামার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। মামার তো অফুরন্ত বুদ্ধি, মামা টুসকি মারতে-মারতে বলে দেবে কোনদিকে তোদের বাড়ি।'

জগন্নাথ বাঁদরের কাকুতি-মিনতি শুনে ঠান্ডা হলেও ওর কেমন যেন কান্না-কান্না পাচ্ছিল। কতক্ষণ বাবাকে দেখেনি। আর এমন করে, বাবাকে হারিয়ে, বাঁদরের পিঠে চেপে তাকে তাল-ফুলুড়ি মামার কাছে যেতে হবে, এ-কথা ভাবতে-ভাবতে ওর পিঠটা যেন টনটন করে উঠল। জগন্নাথ পিঠটা টানটান সিধে করতেই বাঁদর বলল, 'কী রে, উচ্চিংড়ির মতো অমন চিংকিড়ি, চিংকিড়ি করছিস কেন?'

জগন্নাথ এবার মরিয়া হয়ে গেল। পেয়ারাটায় তেড়েমেড়ে একটা কামড় দিয়ে বলল, 'ছাই-ভস্ম কী যে বলছিস তুই, কিছুই মানে বুঝছি না।'

বাঁদর জিজ্ঞেস করল, 'কীসের মানে?'

'চিংকিড়ি, চিংকিড়ি!'

'এই রে, সমূহ আকুপাংচার! তুই যদি চিংকিড়ি কথাটার মানে না বুঝিস, তা হলে তো তোর দারুণ বিপদ! তাল-ফুলুড়ি মামা তো তোকে তাল ঠুকে থ্যাবড়া করে দেবে।'

'তাহলে থাক, তোমার মামার কাছে গিয়ে কাজ নেই।' বিরক্ত হয়েই জগন্নাথ উত্তর দিল।

বাঁদর বলল, 'দেখ, তুই মিছিমিছি হুজ্জুতি করছিস। আমি তোর হিতের জন্যেই তোকে পিঠে নিয়ে মামার কাছে যাচ্ছি। এতে কি আমি দুটো পয়সা পাব? না, আমার সোনার সিংহাসন হবে? তোকে দেখে আমার মনটা দুঃখু-দুঃখু পাচ্ছিল বলেই এই ঝক্কি আমি নিয়েছি। নইলে আমার অত কী দায় পড়েছে! যাই হোক, এবার আমায় ভালো করে বাগিয়ে-বুগিয়ে ধর, মামার বাড়ি এসে গেছে।'

এসে গেছে বলতেই জগন্নাথ ঝটপট মুখের ভেতর থেকে পেয়ারার ছিবড়েগুলো থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল। এতক্ষণ ধরে চিবুচ্ছিল। বাঁদরটা থপাস করে একটা বাড়ির ছাতের ওপর লাফ দিল। জগন্নাথ একটু টাল খেয়ে সামলে নিতেই বাঁদরটা বলল, 'এবার নাম।'

জগন্নাথ কি অতশত বুঝেছে! ভালোমানুষটির মতো বাঁদরের পিঠ থেকে নেমে যেই ছাতে পা দিয়েছে অমনি সড়াত! ছাত ফুটো হয়ে জগন্নাথ নীচের দিকে গোঁত্তা খেল! তারপর পা ফসকে আলুর দম। ছাত থেকে সটান ডিগবাজি!

কী কাণ্ড দেখো! জগন্নাথ যে পড়ল, তা দেখে বাঁদরটা কোথায় ভয় পাবে, তা না ব্যাটা তেঁতুলের মতো হেসে উঠেছে! এমন ন্যাকা বাঁদর জন্মে কেউ দেখেছে! ছেলেটার হাত ভাঙল, না পা মচকাল সেদিকে খোঁজখবর নেই, বেহায়ার মতো চিল্লিয়ে-চিল্লিয়ে হাসছে!

কিন্তু এ কী ব্যাপার!

কী ব্যাপার!

জগন্নাথের হাতও ভাঙল না, মাথাও ফাটল না। পা হড়কে সটান একটা ঘরের মধ্যে পড়ল। পড়ল ঠিকই, কিন্তু অবাক কথা—একটুও লাগল না! মনে হল, একটা নরম গদির ওপর বসে পড়েছে জগন্নাথ। নিজের চোখ দুটো কচলিয়ে ভালো করে চেয়ে দেখতেই জগন্নাথ হাঁদাগঙ্গারাম! দেখে কী, সে একটা দোলনার ওপর বসে-বসে দোল খাচ্ছে! আর একটা লোক তার সঙ্গে দুলে-দুলে নাড়ি টিপে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন অদ্ভুত আর উদ্ভুট্টি গোছের লোক জগন্নাথ এর আগে আর কক্ষনো দেখেনি। লোকটার মাথার চুলগুলো শজারুর কাঁটার মতো খাড়া-খাড়া। কান দুটো অনেকটা গাধার কানের মতো লম্বা। ঠোঁট দুটো থ্যাবড়া বন-মানুষ! নাক নিয়ে কথা না-বলাই ভালো। কারণ তিনি আছেন কি নেই, বোঝাই দায়! হাতের নোখগুলো কতদিন কাটেনি যেন। ময়লা জমে কী যাচ্ছেতাই নোংরা হয়ে আছে! কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, জগন্নাথ দেখে কী, লোকটার ছেঁড়া তাপ্পিমারা প্যান্টের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট একটি ল্যাজ উঁকি মারছে। আর ছাগলের যেমন ল্যাজের ডগায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লোম থাকে, তেমনি গুটিকয় লোম ফিরফির করছে!

জগন্নাথ মনে-মনে ভাবল, মানুষেরও ল্যাজ হয়!

হঠাৎ লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়, হয়।' চেঁচানোর সঙ্গে-সঙ্গে লোকটার মুখ দিয়ে ভক-ভক করে এমন বিটকেল গন্ধ বেরিয়ে এল! একেবারে জগন্নাথের নাকে! আর একটু হলেই ওয়াক থু!

সামলে নিল জগন্নাথ। ভাবল, লোকটা ওর মনের কথা কী করে জানতে পারল! লোকটা তুক-তাক জানে নাকি!

আসলে জগন্নাথের মনের কথাটা ও মোটেই জানতে পারেনি। জগন্নাথ তো বোকা নয়। তাই যেই লোকটা আবার কথা বলেছে, জগন্নাথ বুঝে নিয়েছে। লোকটা বলল, 'হয়, হয়, নানান কারণে অসুখ হয়। যেমন ধরা যাক ক্লাসের পড়া না করলে, ইসকুল যাবার ভয়ে, অসুখ হয়! খুব ঠকঠকানি শীতের দিনে চান করতে ভয় থাকলে অসুখ হয়। কিংবা গরমের দিনে নিম-পাতার ঝোল মেখে ভাত খেতে বললে, অসুখ হয়। অথবা—অথবা—অথবা' বলতে-বলতে লোকটা গন্ধওলা মুখটা হাঁ করে জগন্নাথের দিকে এগিয়ে এল। জগন্নাথের গাটা ঘিনঘিনিয়ে উঠেছে! তিড়িং করে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল জগন্নাথ। চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমার অসুখ করেনি, আমার অসুখ করেনি।'

চিৎকার করতেই হঠাৎ পেছন থেকে এমন এক ঝাপটা খেয়েছে জগন্নাথ যে, হুমড়ি খেয়ে টলে পড়ল! বেচারা কুপোকাত! পেছন ফিরে চেয়ে দেখে আঁতকে উঠেছে! আরি ব্যস! ইয়া পেল্লায় একটা

পাখি! পাখি বলবে না পাখিটাকে দানো বলবে, বুঝে উঠতে পারছে না জগন্নাথ! দেখলেই শিউরে উঠতে হয়! কেননা, এত বড়ো পাখি জগন্নাথ দেখেইনি জন্মে! কী তাগড়াই চেহারা! প্রায় জগন্নাথের মাথার সমান ঢেঙা। ভয়ংকর হিংসুটে চোখ দুটো! ঠোঁটটা বেল-পাড়া-আঁকশির মতো বেঁকে চেপটে আছে মুখের সঙ্গে! পায়ের নোখগুলো বেঁকাতেড়া। গুনছুঁচের মতো খোঁচা-খোঁচা! আর খুব ঝড় উঠলে তালগাছের পাতাগুলো যেমন ঝটাপটি খেয়ে হাঁসফাঁস করে, তেমনি তার ডানা দুটো জগন্নাথের ঘাড়ে ঝাপটা মেরে ঝটপটাচ্ছে! জগন্নাথ তাই দেখে চিৎকার করে উঠল! জগন্নাথের চিৎকার শুনে পাখিটা ক্যাঁক-ক্যাঁক করে মারল এক ধমক। জগন্নাথের পিলে চমকে উঠেছে। থমকে গেল জগন্নাথ। আর তাই দেখে, লোকটার দাঁত ছরখুট্টে সে কী হাসি, হে-হে-হে! তার বত্রিশপাটি দাঁতের দিকে জগন্নাথের চোখ পড়তেই নাক সিঁটকুলে। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, দাঁতে ছ্যাতলা পড়েছে! মাছি ভ্যান-ভ্যান করছে! লোকটা বোধহয় সাতজন্মে চান করে না, দাঁত মাজে না।

হাসতে-হাসতে লোকটা টপাস করে জগন্নাথকে জড়িয়ে ধরল। জগন্নাথ কিছু বোঝবার আগেই, খোঁচা-খোঁচা নোখ দিয়ে এমন কাতুকুতু দিতে আরম্ভ করল যে, জগন্নাথের প্রাণ যায়? নোখের খোঁচা খেয়ে জগন্নাথের যেমন লাগছে, আঃ, আঃ। কাতুকুতু খেয়ে তেমনি হাসছে, হাঃ হাঃ! হাসতে-হাসতে, কাঁদতে-কাঁদতে বেচারা মাটিতে গড়াগড়ি! তাই দেখে পাখিটার কী নাচন-কোদন দেখো!

মশাই, চিল চেঁচিয়ে পাখি বাড়ি মাথায় করছে! আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়!

হাসতে-হাসতে কিংবা কাঁদতে-কাঁদতে জগন্নাথ যখন নাস্তানাবুদ, মানে, দম প্রায় ফেটে পড়ে, ঠিক সেই সময় বাঁদরটা প্রায় লাফ মেরে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই লোকটাকে জাপেটে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'করছেন কী, করছেন কী, তাল-ফুলুড়ি মামা! ছেলেটার যে বাবা হারিয়ে গেছে! আপনার কাছে এসেছে বাবার খোঁজ করতে!'

সঙ্গে-সঙ্গে সেই তাল-ফুলুড়ি মামা নামে লোকটা জগন্নাথকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'সে-কথা আগে বলবি তো! রামোচন্দর, রামোচন্দর, আমি যে ছেলেটাকে ছুঁয়ে ফেললুম!'

'মামা, ছুঁলে কোনো দোষ হবে না. ছেলেটা যে জগন্নাথ।'

ততক্ষণে জগন্নাথ কাপড়-জামা ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়াল। অমনি পাখিটা আবার খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠেছে! হাসতে-হাসতে এমন বিচ্ছিরি গলায় 'জগন্নাথ' বলে ডাকল যে, তাই শুনে জগন্নাথের গা-পিত্তি জ্বলে গেল! মনে হল ঠাস করে চড়িয়ে দেয়!

হয়তো দিত চড়িয়ে। কিন্তু হঠাৎ তাল-ফুলুড়ি মামার কানের দিকে নজর পড়তে ওর চক্ষু চড়কগাছ! মামার কান দুটো, যেমন গাধা কিংবা গোরু-ভেড়ার কান নড়ে, তেমনি নড়তে শুরু করে দিয়েছে। একী রে! মানুষের কান নড়ছে! জগন্নাথ তো কোনোদিন মানুষের কান নড়তে দেখেনি! মানুষের কান নড়ে নাকি!

তাল-ফুলুড়ি মামা কান দুটো তেমনি নাড়তে-নাড়তে বাঁ হাতটা ঝাঁ করে ডান দিকে ছুড়ে তারপর ডান হাতটা ধাঁ করে বাঁ দিকে টানল। টেনেই ঝপ করে একটা কৌটো কোত্থেকে বার করে ফেলল। কৌটোটা ছোট্ট। কিন্তু কোত্থেকে যে বার করল, জগন্নাথ বুঝতে পারল না। সেটার দিকে তাকিয়ে তাল-ফুলুড়ি মামা জগন্নাথকে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বাবার বয়স কত?'

জগন্নাথ উত্তর দিল, 'জানি না।'

সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা হাতের কৌটোটা ডুগডুগি বাজানোর মতো নেড়ে দিল। কৌটোর ভেতরে টুং টুং করে ঘন্টা বেজে উঠল। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাপ কতটা লম্বা?'

জগন্নাথ বলল, 'জানি না।'

ঘন্টা বাজল টুং টুং।

'কতটা বাঁটকুল?'

'জানি না।'

টুং টুং!

'কতটা খায়?'

এবার যেন জগন্নাথ রেগেমেগে মরিয়া হয়েই উত্তর দিল, 'যতটা খিদে পায়!'

তাই শুনে হঠাৎ তাল-ফুলুড়ি মামা বাঁদরের মাথায় ঠকাস করে গাঁট্টা মেরে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'মনকি!' মনকি!'

মনকি মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে জিজ্ঞেস করল 'কন কী? কন কী?'

'দেখ, দেখ,' বলে কৌটোটা বাঁদরের চোখের সামনে তুলে বলল, 'ছেলেটার নাম যদি জগন্নাথ হয়, তবে ওর বাবার নাম বাবা! ওর বাবা যদি এইখানে থাকে, তাহলে ওদের বাড়িটা ওইখানে। ওদের বাড়িটা যদি ওইখানে হয়, তবে রাস্তাটা এইখানে।

মানে বুঝলি?'

বাঁদর বললে, 'আজ্ঞে মামা, মানে তো বোঝবার জন্যে নয়। মানে তো মানে-বইয়ে লেখা আছে। মুখস্থ করার জন্যে।'

কৌটো দেখে জগন্নাথের মনও তো আগের থেকেই ছুঁক-ছুঁক করছিল। তার ওপর মামার কথাগুলো শুনে আর থাকতে পারে! পড়ি-মরি আগবাড়িয়ে ছুটে এসে বলল, 'কই দেখি?'

তাল-ফুলুড়ি মামা চট করে কৌটোটা ওপর বাগে তুলে ধরে বলল, 'অমনি অমনি! একি মগের মুল্লুক! ভারি স্যায়না ছেলে দেখছি।'

পাখিটাও নিজের গলা মামার মতো করে পোঁ ধরল, 'ভারি স্যায়না ছেলে দেখছি!'

মামা জিজ্ঞেস করল, 'ট্যাঁকে টাকা আছে? কৌটো দেখতে পাঁচ সিকের পুজো লাগবে।'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আসলে তখন পাঁচ সিকে ছেড়ে জগন্নাথের ট্যাঁকে এক সিকেও ছিল না। পয়সা-কড়ি নিয়ে কি সে বেরিয়েছে! হঠাৎ বিপদে পড়ে তাকে এখানে আসতে হয়েছে। তা-ও বাঁদরের কথায়। তাই জগন্নাথ জিজ্ঞেস করল, 'কৌটোটা এখন দেখে, পুজোটা পরে দিলে চলবে না?'

কথাটা শুনে তাল-ফুলুড়ি মামার সঙ্গে সেই ঢ্যাপসা-চুসকো পাখিটাও এমন খ্যাল-খ্যাল করে হেসে উঠল যে, জগন্নাথের মনে হল তখনই তাকে পটকে দেয়! অবশ্য বাঁদরটা হাসেনি। কিন্তু তাই বলে জগন্নাথের জন্যে যে সে দয়ায় গলে পড়ছে, তার মুখ দেখে এ-কথাও কেউ বলতে পারে না। কেননা, বাঁদরের মুখ তো! দয়া-মায়া, হাসি-কান্না, সে মুখ দেখে বোঝা যায় না। জগন্নাথ তবু রাগটা মনের মধ্যে সামলে নিয়ে বলল, 'দেখুন, আমি তো পয়সা-কড়ি সঙ্গে আনিনি। বাড়ি ফিরে পাওনা-গণ্ডা আমি সব মিটিয়ে দেব।'

মামা জিজ্ঞেস করল, 'ধার?'

অমনি পাখিটা বলে উঠল, 'এখানে ধারে কারবার নেই। ফেলো কড়ি মাখো তেল।'

এবার সত্যিই জগন্নাথ ভীষণ চটে গেছে। তেড়েমেড়ে পাখিটাকে বলল, 'তুই চুপ কর তো! তখন থেকে খালি ভাংচি দিচ্ছে। আঃ গেল যাঃ!'

পাখিটা ঝুঁটি ফুলিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'এই, তুই-তোকারি করছিস কেন রে! কালকের ছেলে, ছোটো-বড়ো জ্ঞান নেই! গুরুজনদের মান্যি করতে জানিস না!'

জগন্নাথ উত্তর দিল, 'আহা রে, কী আমার গুরুজন! ভারি তো একটা পাখি, সে আবার গুরুজন!'

ঝগড়াটা আর একটু হলেই দানা বেঁধে উঠত। বাঁদরটা তখন চট করে জগন্নাথ আর পাখিটার সুমুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দুজনকে থামিয়ে-থুমিয়ে বলল, 'আরে, আরে, করছিস কী! নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করতে আছে? তারপর জগন্নাথের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'দুর বোকা, খেপছিস কেন? এক কাজ কর, মামার কথাও থাক, তোর কথাও থাক, পাঁচ সিকের জায়গায় পাঁচটা পয়সা দিয়ে দে।' বলে মামাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী মামা, ঠিক আছে?'

মামা চোখ দুটো স্বগগে তুলে যেন রাজিও নয় আবার গররাজিও নয়, এই ভাব দেখিয়ে বলল, 'অন্য কেউ বললে আমি কক্ষনো রাজি হতুম না। তুই যখন বলছিস—'

জগন্নাথ তখন বাঁদরকে কাকুতি-মিনতি করে বলল, 'দেখ ভাই, সত্যি বলছি, আমার কাছে একটা কানা-কড়িও নেই। বাড়ি ফিরে পাই-পয়সা সব আমি চুকিয়ে দেব।'

মামা চিৎকার করে উঠল, 'না, না, না। নগদা-নগদি ছাড়া আমি কাজ করব না। আমার কাছে আজ নগদ, কাল ধার।'

সেই কথা শুনে হঠাৎ যে এমন দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে জগন্নাথ খেপে উঠবে, কে বুঝতে পারে! তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, তাল-ফুলুড়ি মামার তাপ্পিমারা জামাটা টেনে ধরে বলল, 'আমি বার-বার

https://boierhut.com/fb

বলছি বাড়ি গিয়ে দাম শোধ করে দেব, আমার কথা গ্রাহ্যি করছেন না! কৌটোটা আমায় দেবেন তো দিন, নইলে কেড়ে নেব।'



মামা মেরেছে এক ধাক্কা! জগন্নাথ ছিটকে দুম-পটকা।

খেপে গেলে মানুষের জ্ঞান-গম্যি যে একেবারে লোপ পায়, জগন্নাথকে তখন দেখলে এ-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাল-ফুলুড়ি মামা ওর চেয়ে কত বড়ো, ষণ্ডা-মার্কা চেহারা! জগন্নাথ কখনো মামাকে বাগে আনতে পারে! মামা মেরেছে এক ধাক্কা! জগন্নাথ ছিটকে দুম-পটকা। মামা ডান হাতের কৌটোটা ধাঁ করে বাঁ হাতে নিতেই ফুস! মানে, দেখতে-দেখতে কোথায় লুকিয়ে ফেলল। জগন্নাথের যেন কেমন সব তালগোল পাকিয়ে গেল! জগন্নাথ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল লোকটার খালি হাতের দিকে। কিন্তু লোকটা দাঁড়িয়ে রইল না। মুখটা খিঁচিয়ে জগন্নাথের দিকে তেড়ে এল। জগন্নাথের কানটা ধরে হিড়হিড় করে টান দিয়ে বলল, 'চোট্টামি করবার জায়গা পাসনি। ফের এমনি করবি তো পুলিশে দিয়ে দেব। আমায় চিনিস না!'

ভীষণ অপমান লাগল জগন্নাথের। কিন্তু কিচ্ছু বলল না। কারণ জগন্নাথ বুঝেছে লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে লড়াই করা তার কম্ম নয়!

লোকটা জগন্নাথের কানে টেনে এক হ্যাঁচকা মারল! উঃ! কী ভীষণ লেগেছে জগন্নাথের। জগন্নাথকে টেনে চ্যাংদোলা করে তুলে বাঁদরকে বলল, 'এই ধর।' বলে বাঁদরের দিকে তোল্লাই ছাড়ল। বাঁদর আলুগপ্পা লোফার মতো জগন্নাথকে লুফে নিয়ে দুম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ পর্যন্ত পাখিটা কোনো ক্যাঁচর-ম্যাচর করেনি। বাঁদর ঘর থকে বেরিয়ে যেতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'দিলে না কেন ছেলেটার তুবড়ি ফাটিয়ে! উঃ কী ঘেঁচড়া ছেলে রে বাপ! সাতজন্মে দেখিনি।'

বাঁদরটা জগন্নাথকে নিয়ে এল আর একটা ঘরে। পাশেই ঘরটা। ঘরে নিয়ে এসে বলল, 'এখানেই থাকতে হবে তোকে। পুজোর পয়সা না ছাড়লে, তোর ছাড়ান নেই। ভুল করলি, পয়সা ছাড়লে তো আর এত ঝামেলা হত না!'

জগন্নাথ এবার ভীষণ চটিতং। বলল, 'তোকে এখানে কে নিয়ে আসতে বলেছিল! তখন থেকে বলছি আমার কাছে পয়সা নেই, তবু ভ্যাজাড়ং ভ্যাজাড়ং করেই চলেছে! তোদের মগজে কি কিচ্ছু ঢোকে না!'

বাঁদর ফট করে বলে বসল, 'টংকা মানেই লবডংকা।'

কথাটা যে কেন বলল, জগন্নাথ বুঝতে পারল না।

তারপরে বাঁদরটা আবার বলল, 'এইখানে বসে-বসে ধ্যান কর। যদি মা-লক্ষ্মীর দয়া হয় বেঁচে যাবি । নইলে এইখানেই খাবি খেতে-খেতে অক্কা পাবি।' বলে বাঁদরটা একটা বিচ্ছিরি নোংরা ঘরে জগন্নাথকে ফেলে রেখে চলে গেল।

জগন্নাথ হন্তদন্ত হয়ে ডাক দিল, 'এই বাঁদর, শোন, শোন।' বাঁদর সাড়া না দিয়েই ভোঁ-কাট্টা।

ঘরটা সত্যিই যা-তা। স্যাঁতস্যাঁতে! আলো-বাতাস কিচ্ছু নেই। ঝুল আর মাকড়সার জালে এ-কোণ, ও-কোণ ছেয়ে আছে। কী বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধ! ঘরের মধ্যিখানে একটা ছেঁড়া চাটাই পাতা। অবিশ্যি দরজাটা খোলা, এই যা! চাটাইয়ের ওপর ঠুঁটোর মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে জগন্নাথ ভাবতে লাগল, এখন সে কী করবে! পালাবার ইচ্ছে থাকলেও পালাতে পারছে না। কেননা, একেবারে অচেনা জায়গা। কোনখান দিয়ে সে এখানে এল, আর কোনদিক দিয়ে যে সে বেরিয়ে যাবে, কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না। অগত্যা ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর বসে পড়ল। ভয় তার মোটেই পাচ্ছিল না। শুধু পা দুটো ভারি টনটন করছিল। পায়ের আর দোষ কী! কাল রাত থেকে যা ধকল যাচ্ছে! জগন্নাথ বলে তাই। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে ফুট-কড়াই হয়ে যেত!

জগন্নাথের চোখদুটো যেন ছলছল করছে! কাঁদছে নাকি জগন্নাথ? ও তো সে-ছেলে নয়! অত সহজে তো সে মুষড়ে পড়ে না!

কিন্তু বলো, বাবার জন্যে কার না মন কেমন করে? ও নিজের চোখে দেখেছে, ঘোড়ার পিঠ থেকে বাবা ছিটকে পড়েছে। জগন্নাথও পড়েছিল। তবে জগন্নাথের একটুও লাগেনি। কিন্তু আর উঠতে পারেনি ওর বাবা। তারপর ওর বাবার যে কী হল, কিচ্ছু জানে না জগন্নাথ। ভাবতে-ভাবতে সত্যিই ওর চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছে। চাটাইয়ের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল জগন্নাথ। হয়তো কেঁদে ফেলল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে। চমকে গেছে। কখন যে দিন ফুরিয়ে রাত ঘনিয়ে এসেছে, সে কিছুই জানতে পারেনি। কী ঘুম দেখো!

উঃ কী জমাট অন্ধকার! চোখ মেলে কিছুই দেখা যায় না! এই অন্ধকার ঘরে মানুষ থাকে! এটা মানুষের বাসা, না চামচিকির আড্ডাখানা বোঝাই দায়! ঝাঁকে-ঝাঁকে চামচিকি ঘরের চারপাশে গোঁত্তা মেরে উড়ে বেড়াচ্ছে! চাটাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জগন্নাথ। কী মনে হল, দরজা ডিঙিয়ে ঘর থেকে চুপিসাড়ে বেরিয়ে এল। উঁকি মারল। কাউকে দেখতে পেল না। জগন্নাথ বুঝতে পেরেছে অনেক রাত হয়েছে। কিন্তু সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে কি না, সেটা জানতে পারছে না। সকলে বলতে তো সেই বাঁদরটা, পাখিটা আর তাল-ফুলুড়ি মামা। তাছাড়া অন্য কাউকে তো সে এখানে দেখেনি! কিন্তু বলো, তাল-ফুলুড়ি মামা লোকটা কী রকম পয়সা-পিশাচ। কিছুতেই কৌটোটা দেখাল না। জেনেশুনে জগন্নাথের মতো একটা ছোট্ট ছেলের কাছে অমন হ্যাংলাপনা করতে তোর একটু বাধল না? তা যেমন মানুষের ছিরি, তার চাল-চলনও তো তেমনি হবে! ওদের আবার লজ্জাশরম! নাই থাক। কিন্তু ওই কৌটোটা জগন্নাথের চাই-ই চাই। ওই কৌটোটার মধ্যে সত্যিই ওদের বাড়ির রাস্তাটা দেখা যায় কি না, ও দেখবে! দেখবে কৌটোর মধ্যে সত্যিই ভেলকি আছে না, লোকটা ভড়কি মারছে! বিশ্বাস নেই কিছুই। যতই হোক বাঁদরের মামা তো!

যদিও অন্ধকারটা বাইরেও ঘুটঘুট করছিল, কিন্তু ঘরের মতন অমন জমাট না। জগন্নাথ ঠুক-ঠুক করে পা বাড়িয়ে এগিয়ে এল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কোনদিকে যাবে, কোনদিকে সেই তাল-ফুলুড়ি মামার ঘরটা! সত্যি অন্ধকারে সব ধাঁধিয়ে যাচ্ছে!

অবিশ্যি এটা তো আর গড়ের মাঠ নয় যে, এ-পার থেকে ও-পার যেতে ঘড়ির কাঁটা ঝুলে পড়বে। তাই অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ে, আলতো পায়ে ডিঙি মারল! না, কাছে-পিঠে কোনো নজরদারই জগন্নাথের নজরে পড়ছে না। তাই আরও এগিয়ে চলল।

কিন্তু হঠাৎ যে এমন হাত ফসকে আলটপকা হুমড়ি খাবে জগন্নাথ, বুঝতে পারেনি। অন্ধকারে একটা অন্য ঘরের ভেজানো দরজায় হাত পড়ে গেছে। হাট হয়ে দরজাটা খুলে যেতেই জগন্নাথ টাল খেতে-খেতে বেঁচে গেছে। ভাগ্যিস ডিগবাজি খায়নি! তাহলে আবার যে কী কাণ্ড হত, কে বলতে পারে!

দরজাটা হাট হয়ে খুলে যেতেই, ঝট করে আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে জগন্নাথ। নিঃসাড়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। না, মনে হচ্ছে কেউ টের পায়নি। উঁকি মারল জগন্নাথ। ঘরের ভেতরে টিমটিম করে লম্ফ জ্বলছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। ঘরে কেউ নেই। কিন্তু বুঝতে তার কষ্ট হচ্ছে না, এইটাই সেই তাল-ফুলুড়ি মামার ঘর। এই ঘরেই সেই কৌটোটা আছে! জগন্নাথের বুকের ভেতরটা ঢিপ-ঢিপ করে নেচে উঠল। হয়তো ওই কৌটোটার কথা ভেবে, আনন্দে! তবু হুট করে ঘরে ঢুকতে সাহস হল না। আরও কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল জগন্নাথ ঘাপটি মেরে।

ঘরে যে কেউ নেই, ও ঠিক বুঝতে পেরেছে। থাকলে কি এতক্ষণ জগন্নাথকে ছেড়ে কথা বলত! ঘাড় ধরে টানতে-টানতে কখন জেলখানায় পাঠিয়ে দিত। যে-মানুষের ল্যাজ গজায় তার কাছে আবার দয়া-মায়া!

জগন্নাথ সুড়ুত করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখতে পেল না, তার পেছনে একটা ছায়া। জগন্নাথ লম্ফটা তাড়াতাড়ি হাতে নিল। খুব সাবধানে পা ফেলে-ফেলে সেই কৌটোটা খুঁজতে লাগল। জগন্নাথের পেছনে-পেছনে সেই ছায়াটাও নড়ে-নড়ে ঘুরছে। ঘরের মধ্যে ছিল একটা উঁচু চৌকি, একটা কাঠের দেরাজ, কতকগুলো কাচের গেলাস, কাঁচি, ছুরি আরও সাতসতেরো নানান জিনিস। জগন্নাথ দেরাজের হাতলটা ধরে টান দিল। চাবি আঁটা। উঁচু চৌকিটার নীচের দিকে একটা তোরঙ্গ। টেনে বার করল। তার ভেতর ছেঁড়া-ময়লা কাপড়-চোপড়। দেরাজের মাথায় একটা মাটির হাঁড়ি উলটে পড়ে আছে। কৌটোটা ওর ভেতর লুকানো থাকলেও থাকতে পারে। জগন্নাথ উঁচু চৌকিটার ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। অমনি আচমকা—ঠকাস! জগন্নাথের পিঠে যেন কে খোঁচা মারল। চমকে হাত ফসকে লম্ফটা মাটিতে পড়েই দপ করে নিভে গেল। জগন্নাথ ধড়ফড়িয়ে উঠেছে! চৌকি থেকে তড়াং করে লাফিয়ে পড়েছে। পালাতে যাবে কি, দেখে দুটো ভাটার মতো জলজ্যান্ত চোখ অন্ধকারে জ্বলছে। জগন্নাথ বুঝতে পারেনি, এটা সেই ঢ্যাপসা-ঢুপসো পাখির চোখ। পাখিটা এতক্ষণ জগন্নাথের অজানতে, ছায়ার মতো ওর দিকে নজর রেখে যে ঘুরছে, জগন্নাথ সেটা টেরই পায়নি।

আচমকা একেবারে ঝপ করে পাখিটা ডানা দিয়ে জগন্নাথকে জাপটে ধরল। ঝাড়লে ঠোঁটের বাড়ি এক ঠোক্কর! উফ! আর একটু হলেই চোখটা খাবলে দিয়েছিল। একটি ঘায়েই কুপোকাত জগন্নাথ! মাথাটা ঝনঝন করে উঠেছে। সামলাতে-না সামলাতে পাখিটা মারল আর এক ঘা! এবারে জগন্নাথের মুখের ওপর। আর রক্ষে আছে! জগন্নাথ মরিয়া। জগন্নাথের হাত দুটো যদিও পাখির ডানার মধ্যে জাপটানো ছিল, কিন্তু পা দুটোর তো কিচ্ছু হয়নি। জগন্নাথ তেড়েমেড়ে লাফিয়ে উঠে, নিজের পা দিয়ে দিয়েছে পাখিটার ঠ্যাং মাড়িয়ে! এমন মাড়ান মাড়াল যে, পাখির ঠ্যাং চেপটে চিঁড়ে চ্যাপটা! যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে, পাখি ডানার ভেতর থেকে জগন্নাথকে ছেড়ে দিতেই, জগন্নাথ চোখের পলকে পাখিটাকে জড়িয়ে ধরেছে। ধরেই চিৎপটাং! কিন্তু পাখিও কি ছাড়বার পাত্তর! ফড়ফড়িয়ে লাফিয়ে উঠে জগন্নাথের সঙ্গে ঝটাপটি লাগিয়ে দিল। পাখিও ছাড়ে না, জগন্নাথও হারে না। পাখির অপলকা পালকগুলো জগন্নাথের হাতের টানে ছিঁড়ে ফড়-ফড় করে উড়ে পড়ছে! তবু কি গোঁ ছাড়ছে!

কিন্তু যতই হোক, পাখি তো! তার কত ক্ষমতা! কতক্ষণ যুঝবে জগন্নাথের সঙ্গে! মানুষের কাছে দমে পারে! হাঁপিয়ে গেছে। তাল পেয়ে জগন্নাথও ধরেছে পাখির গলাটা টিপে! পাখি আর ট্যাঁও করতে পারে না, টুঁও করতে পারে না! জগন্নাথ তখন রাগ দেখিয়ে চাপা গলায় দাঁত কড়মড় করতে-করতে বলল, 'এবার তোকে কে বাঁচায়? বল সেই কৌটোটা কোথায়?'

পাখিটা জগন্নাথের হাতের রামটিপুনি খেয়ে বলল, 'লক্ষ্মীটি, আমায় মারিসনি বাপ! একটা তুচ্ছ কৌটোর জন্যে একটা পাখির প্রাণ নিসনি! আমায় ছেড়ে দে! আমি তোকে কৌটো দেব।'

জগন্নাথ পাখিটার গলায় আর একটা টেনে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'মিথ্যে বলছিস?'

পাখির চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। ঢোঁক গিলে উত্তর দিল, 'কক্ষনো না! হরে-কেষ্ট! আমি মিথ্যে বলি না।'

ঠাকুর-দেবতার নাম করলে, কে আর অবিশ্বাস করে! জগন্নাথও পাখির কথায় বিশ্বাস করে, ওর গলাটা ছেড়ে দিল। বেশ সাহসের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলল, 'বার কর কৌটো!'

জগন্নাথের কোঁতানি খেয়ে বেচারা পাখি একদম ঠান্ডা! বয়েস যে হয়েছে, তা দেখলেই বোঝা যায়! কোঁকাতে-কোঁকাতে জগন্নাথকে বলল, 'আয় বাছা, ইদিকে আয়।'

জগন্নাথ জিজ্ঞেস করল 'কোনদিকে?'

পাখি উত্তর দিল, 'ইদিকে।'

জগন্নাথ সেদিকে গেল।

পাখি বলল, 'এইখানে হাঁটু মুড়ে বস।'

জগন্নাথ সেইখানে হাঁটু মুড়ে বসল।

পাখি বলল, 'এইটারে ধরে প্যাঁচা।'

জগন্নাথ সেইটারে ধরে প্যাঁচাল। হুস-স-স!

দেওয়ালের গায়ে একটা আংটা। জগন্নাথ পাখির কথা শুনে আংটাটা প্যাঁচাতেই চিচিং ফাঁক। দেওয়ালের ভেতর সুড়ঙ্গ! পাখি ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গের ভেতরে! ঢুকতে-ঢুকতে জগন্নাথকে বলল, 'ঝটপট চলে আয়!'

জগন্নাথ প্রথমটা দোনোমনো করেছিল। কারণ ভেতরটা ভীষণ অন্ধকার! কিন্তু ভয় পেলে চলবে কেন! কৌটো তার চাই-ই চাই। তাই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে জগন্নাথও সুড়ঙ্গে সেঁদিয়ে গেল!

জগন্নাথ সেঁদিয়ে গেলে পাখি জিজ্ঞেস করল 'ভয় করছে?'

জগন্নাথের একটু-একটু গা-ছমছম করলেও জানতে দেবে কেন পাখিকে! গলায় বেশ জোর দিয়েই বলল, 'না।'

তখন পাখি বলল, 'দেখ জগন্নাথ, তোর সাহস দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি! তুই যে আমায় গায়ের জোরে কাত করে দিয়েছিস এতে আমার একটুও লজ্জা নেই। আমি যদিও পাখি, কিন্তু জানিস, এককালে বাঘা-বাঘা দত্যি-দানো গায়ের জোরে আমার কাছে কানা হয়ে ঘরে ভেগেছে। অবিশ্যি এখন আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বয়েস হয়ে গেছে তো! এই আজকে আমার বয়েস হল সাতশো সাতান্ন বছর আট দিন।'

পাখির বয়স শুনে অন্ধকারেও হাঁ করে জগন্নাথ পাখিটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাখি আবার শুরু করল, 'আসলে কী জানিস, আমি এখানে চাকরি করি! চাকরি করি মানে, এই যে কৌটোটা চাইছিস, সেইটার নজরদারি করা। দেখ, কৌটোর দিকে নজর রাখতে-রাখতে আমার নিজের নজরটাও এত ছোটো হয়ে গেছে যে, মনে হয় এই পৃথিবীটাই বুঝি একটা কৌটো! এখন আমার মনে হচ্ছে আমি তোর সঙ্গে পালাই!'

জগন্নাথ বলল, 'চলুন।'

এতক্ষণ জগন্নাথ পাখিটাকে 'তুই-তুই' করছিল। হঠাৎ চলুন বলতে পাখি বলল, 'ভদ্রতা করলি বুঝি?'

জগন্নাথ উত্তর দিল, 'দেখুন, আমার বয়েস সবে সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে। আর আপনার সাতশো সাতান্ন বছর আট দিন। এ-কথা তো মানতেই হবে, বয়েসে আমি আপনার কড়ে আঙুলেরও যুগ্যি নই! আপনার বয়েসটা আগে জানতুম না বলেই তখন তুই-তোকারি করে ফেলেছি!'

'এই নে।' পাখির ঠ্যাংঙে কৌটো!

আরে! এ যে সেই কৌটোটা। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। কৌটোটা হঠাৎ কোত্থেকে বার করল পাখি? জগন্নাথের চোখ দুটি কৌটো দেখে চকচক করে উঠল। হাত বাড়াল জগন্নাথ। কিন্তু হাত পৌঁছল না কৌটো পর্যন্ত। থমকে গেছে জগন্নাথের হাত। কেন? হঠাৎ যেন দুটো হিংসুটে জ্বলন্ত চোখ অন্ধকারে ড্যাব-ড্যাব করে লক্ষ করছে তাদের দিকে! জগন্নাথ স্পষ্ট দেখল, একটা চকচকে ছুরি! আরি সববনাশ! এ যে তাল-ফুলুড়ি মামা! ছুরি উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে! পাখি চিৎকার করে উঠল, 'জগন্নাথ, পালা!'

জগন্নাথ তাপ্পি খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করল, 'কো-কো কোন দি-ই-ই কে?'

পাখি চেঁচিয়ে বলল, 'এইদিকে।'

এইদিক মানে সেইদিকে দেওয়ালের ভেতর দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা যেদিকে! জগন্নাথ পাখির ঠ্যাং থেকে কৌটোটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে দে ছুট! মামা তাই দেখে ছুরি উঁচিয়ে, ধাঁ করে দেওয়ালের গর্তে সেঁদিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে ধপাস। পাখি মামার ঠ্যাং-এ মেরেছে এক লেংগি! মামা চিৎপটাং! তারপর লেগে গেল ঝটাপটি! পাখি মামার ঠ্যাং ধরে টানে, তো মামা পাখির ল্যাজ ধরে ঝোলে! টেনে-ঝুলে, গড়িয়ে-শুয়ে মামাতে-পাখিতে মারামারি লেগে গেছে! আর এদিকে ততক্ষণে জগন্নাথ হাওয়া!

অবিশ্যি হাওয়া হব বললেই হাওয়া হওয়া যায় না। কেননা, সুড়ঙ্গটা পেল্লাই লম্বা! শেষ হয় না। জগন্নাথ ভেবেছিল এক ছুটেই কেল্লা ফতে করে ফেলবে। কিন্তু শেষ হওয়া তো দূরের কথা, যেন বেড়েই চলেছে! বাবা! যেন ধাঁধা!

না, ধাঁধা নয়! ও যতই ছুটছে সুড়ঙ্গের অন্ধকার ততই একটু-একটু করে কেটে যাচ্ছে। অন্ধকার থেকে ও যখন বাইরে পৌঁছল, তখন রাত গড়িয়ে আকাশে সকালের আলো ফুটছে! দিন আসছে।

https://boierhut.com/fb

জগন্নাথ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! ও এখন থামল। ভাবল, হয়তো আর বিপদ নেই। রাস্তা-ঘাটে লোকজন চলাফেরা করছে। অনেক লোকের মুখ দেখে ওর বুকের ভারটাও যেন অনেক হালকা হয়ে গেছে। এখন ও নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারবে। যদিও সে এদিককার রাস্তা-ঘাট কিছুই চিনতে পারছে না, তবু তার ভাবনা নেই। কেননা, তার হাতে কৌটো। কৌটোর ভেতরে যন্তর-মন্তর। এতক্ষণে কৌটোটা ভালো করে দেখার সুযোগ পেয়েছে জগন্নাথ। কৌটোটা এমন কিছু বড়ো না। হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ওই কৌটো দিয়ে কী করতে হয়, তাতো জানে না জগন্নাথ। ও বাবার কাছে গল্প শুনেছে, আরব দেশের ছেলে আলাদিন মাটিতে এক আশ্চর্য প্রদীপ ঘষল, অমনি এক বিরাট দত্যি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর, হুকুম তামিল করার জন্যে আমি হাজির। আজ্ঞা করুন কী করতে হবে?' এই কৌটোটাও বোধ হয় তেমনি। প্রদীপের মতো। কৌটোর মধ্যে হয়তো জাদু আছে। তবে তখন সে নিজের কানে শুনেছে, তাল-ফুলুড়ি মামা নাড়া দিতেই, কৌটোর ভেতর টুংটুং করে ঘন্টা বেজে উঠছিল। জগন্নাথেরও ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই নাড়া দিয়ে ঘন্টা বাজায়। কিন্তু সাহস হল না। কেননা, এই এত সব লোকজনের সামনে ঘন্টা বাজালে, আবার যদি কিছু অঘটন ঘটে যায়! কে বলতে পারে!

একটা খুব নিরিবিলি জায়গা খুঁজে বার করল জগন্নাথ। এদিকে কেউ নেই। মনে হয়, কেউ আসবেও না। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভালো করে কৌটোটা পরখ করল। দেখল, কৌটোটা কাঠের। চেপে বন্ধ করা। ঢাকনিটা টান দিল জগন্নাথ। খুলল না। আবার চেষ্টা করল তবু খুলল না। এঁটে গেছে, না চাবি আঁটা জগন্নাথ বুঝতে পারে না। তখন মনে-মনে ভাবে, নেড়ে দেখি, ঘন্টা বাজে কি না! হাত ঝাঁকাল জগন্নাথ।

হাত ঝাঁকাতেই, হো-হো-হো!

চমকে গেছে জগন্নাথ। কে যেন হেসে উঠল! হাসি শুনে আর দাঁড়ায় জগন্নাথ! পাঁই-পাঁই করে মারল ছুট!

ছুট দিতেও, হাসিটা থামল না। তেমনি হো-হো- করে গড়িয়ে-গড়িয়ে জগন্নাথের কানে তাড়া লাগাল। তারপর দম ফুরিয়ে গেলে কলের-পুতুল যেমন করে হঠাৎ থেমে যায়, তেমনি করে হঠাৎ আবার হাসিটা থেমে গেল!

জগন্নাথও থামল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে একদম হাঁদা হয়ে গেছে সে। ও বুঝতেই পারল না, কোত্থেকে হাসি এল! কেউ তাকে দেখে হাসল না কেউ হাসতে-হাসতে তাকে দেখল, এ-কথা ও ভেবেই পাচ্ছে না। সুতরাং ও আবার হাঁটল। ভাবল, এক জায়গায় বোকার মতো বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে লোকের তো সন্দেহ হতে পারে! কী বিপদ দেখ! কোথায় ও এতক্ষণে ঘরে পৌঁছে যাবে, তা না, খালি একটার পর একটা বাধা আসছে! নিরিবিলি জায়গার আর দরকার নেই। সামনে

একটা ফাঁকা জায়গা। জগন্নাথ এবার সেইখানেই দাঁড়াল। আর ভাবল, এবার কৌটোটা নাড়া দেওয়া যেতে পারে।

এবার সত্যি-সত্যিই জগন্নাথ কৌটোটায় ঝাঁকানি দিল। কিন্তু আশ্চর্য, ঘন্টা বাজা দূরে থাক, কৌটোর ভেতর থেকে ফুট-ফাট কি খুট-খাট একটু আওয়াজ পর্যন্ত বেরুল না। জগন্নাথ ঘাবড়ে গেছে। কীরে বাবা! শেষকালে পাখিটা কি তার সঙ্গে হুড়কুষ্টি করল! এ-কথা মানতে মন চায় না জগন্নাথের। মানতে মন চায় না যে, পাখিটা তার হাতে একটা নকল কৌটো ধরিয়ে দিয়ে তাকে ধাপ্পা দেবে! তা যদি হত তাহলে মামা যখন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ছুরি নিয়ে তেড়ে এল, তখন ইচ্ছে করলে তো পাখি তাকে মামার হাতে মার খাওয়াতে পারত! তবে বাবা কার ভেতর কী আছে, কে বলতে পারে! মানুষের কথাই মানুষ বলতে পারে না, তো পাখি! সে তো একটা তুচ্ছ জীব!

পাখিকে এত বিশ্বাস করেছে বলেই জগন্নাথ আরও কবার চেষ্টা করে কৌটোটা নাড়ল, উলটে-পালটে দেখল। ঢাকনিটা নিয়ে টানাটানি করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তখন ভীষণ মন-মরা হয়ে জগন্নাথ ভাবল, ভালো মনে বিশ্বাস করলে, এই ফল! দূর ছাই, এই জঞ্জাল থাকার চেয়ে, যাওয়াই ভালো! কৌটোটা ছুড়ে ফেলে দিল জগন্নাথ। কৌটোটা ছোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ফেলিস না, ফেলিস না।'

জগন্নাথ থতমত খেয়ে গেছে। বারণ করলে কী হবে! ততক্ষণে তো ফেলা হয়েই গেছে! কিন্তু কথা বললে কে? কাছে-পিঠে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, আড়ালে বা আশে-পাশে কেউ যে লুকিয়ে থাকবে, এটা তেমনও জায়গা নয়! তবে কি কৌটোটার ভেতর থেকে কেউ চেঁচাল!

ছুট্টে গিয়ে কৌটোটা কুড়িয়ে নিল জগন্নাথ। অবাক হয়ে কৌটোটার দিকে তাকিয়ে 'কী করি, কী করি' ভাবতে-না-ভাবতেই জগন্নাথ শুনতে পেল কৌটোটার ভেতর থেকেই কে যেন কথা বলল। বলল, 'জগন্নাথ, আমার নাম কর্বুর। আমার হাত নেই, পা নেই. মাথা নেই, ধড় নেই। আমি শুই না, জাগি না। খাই না, ফেলি না। কিন্তু আমি জানি, যারা একটুতেই ভেঙে পড়ে, তারা যা চায়, তা পায় না।'

জগন্নাথের বুকের ভেতরটা কীরকম ছটফট করে উঠল। ভয়ে না আনন্দে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তার খালি মনে হচ্ছে, তবে কি সে-ও আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো, একটা আশ্চর্য কিছু পেয়েছে! সে-কথাটা মনে হতেই বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল জগন্নাথ। বেশ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, 'শোনো কর্বুর, আমার নাম যদিও জগন্নাথ, আমার দুটো হাত, দুটো পা। একটা মাথা, একটা ধড়। আমি রোগা যত, ছোট্ট তত। আমার খিদে পায়, ঘুমও পায়। আমি খেলতে পারি, পড়তে পারি। আমি জানতে চাই, আমার বাড়ি কোনদিকে? আমার বাবা কোথায়?'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কৌটোর ভেতর থেকে তখন সেই কর্বুর উত্তর দিল, 'কোনো কাজ কঠিন নয়, কোনো কাজ সহজ নয়। যে-রাস্তা লম্বা যত, সে-রাস্তা খাটো তত। কোনো চেষ্টা নিষ্ফল নয়, কোনো কাজই বিফল নয়। তবে এখনও অনেক বাধা পেরুতে হবে, অনেক কাঁটা ভাঙতে হবে।'

জগন্নাথ কর্বুরের কথা শুনে কেমন যেন চাঙ্গা হয়ে বলল, 'আমি বাধা পেরুব, আমি কাঁটা ভাঙব, তুমি আমায় সাহায্য করবে?'

'তোমার মুখখানা আমি একবার দেখব।' কর্বুর বলল।

'কেন, দেখতে পাচ্ছ না? তুমি আমার নাম জানতে অথচ মুখটা কেমন জানতে না?' জগন্নাথ উত্তর দিল।

কর্বুর আবার বলল, 'জগন্নাথ, আমার নাম কর্বুর। নাম আমি সবার জানি। কিন্তু মুখ কারো দেখতে পাই না। দেখা সম্ভবও নয়। এই কৌটের মধ্যে আমি বন্দি হয়ে আছি। চারিদিকে জমাট অন্ধকার। এখান থেকে কিচ্ছু দেখা যায় না।'

'কিন্তু আমিও তো এই কৌটোটা খুলতে পারি না।'

কর্বুর বলল, 'জগন্নাথ, আমি তো তোমায় আগেই বলেছি, কোনো কাজ কঠিন নয়, কোনো কাজ সহজ নয়! তাই খোলা যত সহজ, ঠিক তত কঠিন।'

'কেন?'

'কেননা, তুমি ভালো করে দেখনি, কৌটোটা প্যাঁচ দিয়ে আটকানো। চাকার মতো ঘুরুলেই যে খুলে যাবে, এটা তুমি জানবার চেষ্টা করনি।'

জগন্নাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাই না কি! তাহলে এতক্ষণ আমি হাঁদার মতো কৌটোটা টানামানিই করেছি!'

'যারা দেখেশুনে, বুঝে-সুঝে কাজ করতে চায় না, তারা কাজ নিয়ে টানামানিই করে।'

'আচ্ছা কর্বুর, আমি যদি কৌটোটা খুলে দিই, তুমি পালিয়ে যাবে না তো?'

'আমি পালাবও না, পালালে হারাবও না।'

কর্বুরের এই কথাটা শুনে জগন্নাথের কেমন যেন সন্দেহ হল। বলল, 'তুমি এমন হেঁয়ালির মতো কথা বলছ কেন? তোমার মতলবটা খুলে বল তো!'

'আগের কথা আগে, পরের কথা পরে।'

'আগের কথাটা কী শুনি? সোজা কথা সোজাসুজি না বললে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'মনে বিশ্বাস রেখে আমায় যদি তোমার মুখখানা দেখবার জন্যে এই কৌটোটা খুলে দাও, তবে তোমার ভালো হবে।'

'ঠিক বলছ?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'কর্বুর কখনও বেঠিক বলে না।'

'বেশ খুলে দিচ্ছি।' বলে, জগন্নাথ কৌটোটার প্যাঁচ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুলতে লাগল। খুলতে-খুলতে ভাবতে লাগল, 'কী জানি বাবা, ভেতরে আবার কী দেখি!'

প্যাঁচ খুলে গেল। জগন্নাথ কৌটোর ঢাকনিটা টেনে তুলতেই, ঝন-ঝন করে ঝংকার দিয়ে এক ভয়ংকর বাজনা বেজে উঠল। তারপরেই জগন্নাথের চোখ ঝলসে সেই ছোট্ট কৌটোটার ভেতর থেকে এক ঝলক রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে এল। কত রকমের রং, লাল, নীল, হলদে, সবুজ। সেই রঙের ধোঁয়া হাওয়ার সঙ্গে মিশে জগন্নাথের মাথার ওপর ঘূর্ণি খেয়ে ভাসছে! ভাসতে- ভাসতে জগন্নাথের চোখের সামনে এক ময়ূরকণ্ঠী রঙের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! জগন্নাথ চেঁচিয়ে উঠেছে, 'তুমি কে?'

মূর্তি বলল, 'আমি কর্বুর।'

'তুমি এত সুন্দর?'

'জগন্নাথ, আমি তোমারই জন্যে সুন্দর হয়েছি। তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছ। আমি সাতশো আটান্ন বছর আট দিন এই কৌটোর মধ্যে বন্দি ছিলুম। আজ আমার ছুটি।'

'তুমি এই কৌটোর মধ্যে আর থাকবে না?'

'না।'

'তাহলে তুমি আমায় মিথ্যে বললে?'

'না, জগন্নাথ। এই কৌটোর মধ্যে না-থাকলেও আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার যখন বিপদ হবে, আমি আসব।'

জগন্নাথ বলল, 'আমার এখনই তো বিপদ! আমার বাবা কোথায়, বাড়ি কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না। এর চেয়ে বড়ো বিপদ মানুষের আর কী আছে?'

কর্বুর উত্তর দিল, 'জগন্নাথ, বলেছি তো অত সহজে মুষড়ে পড়লে চলবে না। পথ হাঁটতে আরও কত বিপদ আসবে। বিপদের মধ্যে সাহসে বুক বেঁধে যারা হাঁটে, তাদের জয় হবেই। আমি তোমার মনের ভেতরটা দেখতে পেয়েছি। তুমি সাহসী, বীর, সৎ আর সুন্দর। যারা সৎ তারা কখনও হার স্বীকার করে না। তারা এগিয়ে চলে। তোমাকেও এগিয়ে যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'সামনে।'

'আর তুমি?'

'তুমি আমায় দেখতে পাবে, আকাশের ওই নীলে, কিম্বা কালো মেঘের জটায়, রঙিন ফুলের পাপড়িতে অথবা সবুজ পাখির পালকে!'

'তোমায় ডাকব কেমন করে?'

https://boierhut.com/fb

'শোনো জগন্নাথ, দেখ, ওই কৌটোর মধ্যে রেশমি সুতোয় বাঁধা ছোট্ট একটা ঘুঙুর আছে। ওইটা বার করে তোমার কাছে রাখো। ওই ঘুঙুর তুমি বাজালেই বাজবে না। ঠিক সময়ে, ঠিক দরকারে যদি নাড়া দাও, ওই ঘুঙুর বাজবে। আর তখনই আমি আসব। আমি জানি, তুমি ঠিক বুঝবে, কখন ওটিতে নাড়া দিতে হবে। জেনো, যারা বার-বার নাড়া দেয়, তারা ভীরু! বিপদকে জয় করতে তারা পারে না। তবে একটা কথা শুনে রাখ জগন্নাথ, যারা অন্যের উপকার করার জন্যে, অন্যের ভালোর জন্যে ওই ঘুঙুর বাজায়, তাদের কাছে আমি আসি। যারা অন্যের ভালো করতে চায় তাদের সঙ্গে আমি সব সময় আছি। তুমি এগিয়ে চল জগন্নাথ, এগিয়ে চল।' বলতে-বলতে সেই রঙিন ময়ূরকণ্ঠী মূর্তি জগন্নাথের চোখের সামনে থেকে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল। জগন্নাথ অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেইদিকে। তারপর সেই ছোট্ট কাঠের কৌটোর ভেতর হাত দিয়ে দেখল, সত্যি তার ভেতর রেশমি সুতোয় বাঁধা একটা সোনার ঘুঙুর। ঝকঝক করছে। জগন্নাথ চটপট সেটা বার করে কোঁচড়ে বেঁধে ফেলল। ফেলে দিল কৌটোটা। হাঁটা দিল জগন্নাথ। এগিয়ে চলল আর মনে-মনে ভাবতে লাগল, আশ্চর্য প্রদীপের মতো এও যেন আর এক আশ্চর্য সোনার ঘুঙুর!

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। কর্বুরের কথামতো সে অনেক পথ হেঁটেছে। অনেক কাঁটা সে পথের থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কিম্বা ভেঙে ফেলেছে। এমনি হাঁটতে-হাঁটতে একটা গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা এসেছে। শরৎ কাটল। তবু সে বাবাকে খুঁজে পায়নি। সে হয়তো কেঁদেছে। কিন্তু জগন্নাথের সেই চোখের জল কেউ দেখেনি কোনোদিন। পথ হারিয়ে ও একা-একা কাজ করেছে। হাত পাতেনি কারো কাছে। বিপদ এসেছে। কিন্তু বিপদের কাছে হার মানেনি জগন্নাথ। কর্বুর বলেছে বিপদের মধ্যে সাহসে বুক বেঁধে যারা হাঁটে তাদের জয় হবেই। তাই কর্বুরের কথায় বিশ্বাস করেই জগন্নাথ ওর কোঁচড়ে বাঁধা সোনার ঘুঙুর কোনোদিনই বাজায়নি। ও বাজাবে সময় এলে। কিন্তু সে সময় কবে আসবে?

সেই সময় এল না। কিন্তু শীত এল।

সেদিন যখন সেই শীতের রাতে একা-একা হাঁটছিল জগন্নাথ, তখনই সে কোয়াকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। কোয়াকে বুকে নিয়ে সে হাঁটছিল। খুঁজেছিল একটু আশ্রয়, নিজের জন্যে নয়, ওই ছোট্ট কুকুরছানা কোয়ার জন্যে।

'ঘেউ, ঘেউ!' হাঁটতে-হাঁটতে অনেকক্ষণ পর একটা না-চেনা জায়গায় এসে হঠাৎ কোয়া এমন করে ডেকে উঠল কেন? এতক্ষণ তো শীতে কিঁউ-কিঁউ করছিল। এমন কেন রাগ-রাগ তার ডাক?

কোয়া আবার ডাকল, 'ঘেউ, ঘেউ!' ডাকতে-ডাকতে জগন্নাথের কাঁধের ওপরে ছটফটিয়ে উঠল।

জগন্নাথ জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, কী হল? শিকার দেখেছিস?'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জগন্নাথ কাঁধ থেকে নামিয়ে কোয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু যা ছটফট করছে! যদি মুখ থুবড়ে পড়ে!

তারপরে হঠাৎ তো জগন্নাথ নিজেই থতমত খেয়ে গেছে! দাঁড়িয়ে পড়ল জগন্নাথ! কান পেতে কী যেন শুনছে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকগুলো বেড়াল একসঙ্গে কাঁদলে যেমনশোনায়, তেমন যেন কান্না শুনতে পাচ্ছে জগন্নাথ!

কোয়া আবার চেঁচাল, 'ঘেউ, ঘেউ।'

বেড়ালও কাঁদছে, 'ম্যাঁও-ও মিঁও-ও, মিঁউ-উ!'

জগন্নাথ ভাবল, 'এ আবার কী। এত বেড়াল কাঁদে কোথায়!'

সামনে হাঁটা দিল জগন্নাথ। যত হাঁটছে, কান্না তত বাড়ছে। অথচ এদিক-ওদিক, আশে-পাশে বেড়াল ছেড়ে একটি টিকটিকিও নজরে পড়ছে না। জগন্নাথ ভাবলে, শীতে কাচ্চা-বাচ্ছা ছেড়ে বেড়াল-মা বোধহয় ভেগেছে! দেখদিকিনি, এক কুকুরছানা নিয়েই সে ব্যতিব্যস্ত, আবার বেড়াল! শেষে কি কুকুর-বেড়াল নিয়েই তাকে ঘর করতে হবে! কি হটাৎ চমকে তাকায় জগন্নাথ! মনে হচ্ছে সামনে একটা কোঠাবাড়ি! কুয়াশায় ঢেকেছিল বলে এতক্ষণ দেখতে পায়নি জগন্নাথ। জগন্নাথের ঠিক মনে হল, বেড়ালের কান্না ওখান থেকেই ভেসে আসছে! ওইদিকেই চলল জগন্নাথ। কোয়ার মুখের কাছে হাত রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'চেঁচাস না।'

কোয়া কী বুঝল কে জানে! সত্যিই আর চেঁচাল না।

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল জগন্নাথ। ও দেখল, ওই ওপরে একটা খুপরি। সেখান দিয়ে আবছা-আবছা আলো আসছে। বেড়ালের কান্না যে এই বাড়ির ভেতর থেকেই শোনা যাচ্ছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে, কে যেন বেড়ালগুলোকে মারছে আর ওরা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে!

জগন্নাথ ওই ওপরের খুপরিটার দিকেই চাইল। ইচ্ছে, ওখান দিয়েই উঁকি মারে! কিন্তু কথা হচ্ছে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তো জগন্নাথ নাগাল পাবে না খুপরিটার। ব্যস্ত হয়ে উঠল জগন্নাথ। বাড়ির দরজাটা কোনদিকে দেখতে হয় তো!

দরজা সামনেই। মস্ত উঁচু আর পেল্লাই। লোহার কপাট। বন্ধ। বন্ধ কপাটে ধাক্কা দিল জগন্নাথ। দরজা নড়ে না, খোলেও না। খুব জোরে ঠেলা দিল। লোহার কপাট শক্ত আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোয়াকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, 'তুই এখানে চুপটি করে বস। কোথাও যাসনি!'

কোয়া বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে, চুপটি করে বসে, জগন্নাথের দিকে জুলজুল করে চেয়ে রইল।

জগন্নাথ বেশ করে জামা-প্যান্ট এঁটেসেঁটে লাফ দিল। লাফ দিল ওই উঁচু খুপরিটার দিকে। মতলব, লাফিয়ে কুপরির ওপরে উঠবে। কিন্তু হাত ফসকে গেল। আবার লাফাল, পারল না। কাছে-পিঠে কিছু দেখতেও পাচ্ছে না যে, তার ওপর পা রাখবে! জগন্নাথ আবার লাফ দিল। এবার খুপরির খাঁজটা ধরে ফেলেছে! দেওয়ালের গায়ে পা ঘষতে-ঘষতে জগন্নাথ খুপরির মধ্যে মাথাটা সেঁদিয়ে

https://boierhut.com/fb

দিল। বুকটা একটু ছড়ে-ছিঁড়ে গেল বটে, তবু ঘাবড়াল না। খুপরি দিয়ে উঁকি মেরেই জগন্নাথের চক্ষুস্থির! একি! ঘরের মধ্যে একটা ল্যাংচা মার্কা ছেলে, একটা লাঠি দিয়ে বেদম বেড়াল ঠেঙাচ্ছে ! কেন? তা-ও কি এক-আধটা বেড়াল! গোনাগুনতি সাত-সাতটা। বেড়ালগুলো ঠেঙানি খাচ্ছে, প্রাণের ভয়ে চেঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে, আর ঘরের মধ্যেই চরকি খাচ্ছে। একটা ভুসো-কালি-ভরতি ঝোলা-লণ্ঠনের আবছা আলোয় জগন্নাথ যদিও দেখতে পাচ্ছে ঘরটা বড়ো, তবুও ওদিকটা এত অন্ধকার যে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওই অন্ধকারের মধ্যে কী আছে, কে আছে, কে জানে!

কিন্তু আর দেখতে পাচ্ছে না জগন্নাথ! ঈশ! ছিঃ ছিঃ! বেড়ালগুলোকে বুঝি মেরে ফেলবে! কী জল্লাদ ছেলে রে বাবা!

খুপরির ভেতর থেকেই জগন্নাথ চেঁচিয়ে ধমকে উঠল, 'এই ছেলেটা, বেড়ালগুলোকে মারছিস কেন রে!'

ছেলেটার বয়েই গেছে। জগন্নাথের কথা কানেই নিল না।

ব্যাপারটা তো ভালো ঠেকছে না। থাকতে পারল না জগন্নাথ।

ওর দেহটা খুপরির মধ্যে গলিয়ে দিল। তারপর ওই ওপর থেকে ঘরের মধ্যে মারল লাফ! লাফ মেরেই ছেলেটাকে ধরে ফেলল। জগন্নাথকে দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে সেই ল্যাংচা-মার্কা ছেলেটা।

জগন্নাথ ছেলেটাকে টেনে ধরে বলল, 'খবরদার বলছি মারবি না!'

ছেলেটা জগন্নাথের মুখের দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ছেড়ে দে আমায়।' বলে ছেলেটা জগন্নাথকে এমন এক ধাক্কা মারল, জগন্নাথ চিৎপাত! অমন ল্যাংচা-মার্কা দেখতে হলে কী হবে, ছেলেটার গায়ে কী ক্ষমতা রে বাবা!

জগন্নাথ উঠে পড়েছে। উঠতেই ছেলেটা আচমকা জগন্নাথের মাথায় ধাঁই করে লাঠিটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিল। জগন্নাথের মাথাটা ঝনঝন করে উঠল। কিন্তু জগন্নাথও কি দাঁড়িয়ে মার খাবার পাত্র! নিজেকে সামলে নিয়েই ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছেলেটার হাতের লাঠি হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে গেল জগন্নাথ। কিন্তু তার আগেই ছেলেটা জগন্নাথের পেটে টেনে ঘুঁষি কষিয়ে দিল। জগন্নাথ জাপটে ধরল ছেলেটাকে । বেড়াল ছেড়ে শেষে জগন্নাথ আর সেই ছেলেটার মধ্যে মারামারি লেগে গেল।

বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটার গায়ে জোর বেশি। যতই হোক, জগন্নাথের চেয়ে ও মাথায় বড়ো। তবু বলতে হবে বাহাদুর ছেলে জগন্নাথ। বেড়ালগুলোকে বাঁচাবার জন্যে লড়ে তো যাচ্ছে! বেড়ালগুলো ভয়ে কী কাঁপান কাঁপছে দেখ!

পারল না জগন্নাথ। ছেলেটা ওকে চিত করে ফেলেছে। জগন্নাথের মুখে, পিঠে, হাতে, বুকে যেখানে পাচ্ছে কিল, চড়, ঘুঁষি চালাচ্ছে। কী সববনাশ! মেরে ফেলবে নাকি জগন্নাথকে! ওর কাছে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তো কর্বুরের আশ্চর্য জাদু আছে। এখন তো সে সত্যি-সত্যি বিপদে পড়েছে। দিক না সেই জাদুর ঘুঙুর বাজিয়ে!

বাজাল না জগন্নাথ। ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেল। ওর কি দম আটকে গেছে!

না, ওর ভীষণ লেগেছে। ওর চোখের পাতা দুটি আঘাত সইতে না-পেরে বুজে গেছে। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর। নিস্তেজ হয়ে পড়েই রইল জগন্নাথ।

হঠাৎ যখন চমকে উঠে জগন্নাথ চোখ দুটি আবার চাইল, তখনও বুঝতে পারল না কতক্ষণ সে এমনি করে পড়েছিল। চোখ চাইতেই সে অবাক হয়ে গেছে। একী! সেই ছোট্ট-ছোট্ট বেড়ালগুলো কেমন আদর করে জগন্নাথকে জড়িয়ে আছে! আঃ! নরম তুলোর মতন তুলতুল করছে! জগন্নাথের সারা শরীরে আঘাত লেগেছে! কষ্ট পাচ্ছে! ওরা যেন কষ্ট পেতে দেবে না জগন্নাথকে।

ওরা ভালোবাসবে জগন্নাথকে। ছেলেটার হাত থেকে ওদের বাঁচাবার জন্যেই তো জগন্নাথের এই বিপদ। ওর কপালে রক্ত! সে রক্ত পড়তে দেয়নি ওই ছোট্ট বেড়ালগুলো। ওরা মুছে দিয়েছে। জগন্নাথের কপালের রক্ত ওদের গায়ে মুছে-মুছে ছড়িয়ে পড়েছে!

ধড়ফড় করে উঠে বসল জগন্নাথ। সঙ্গে-সঙ্গে তড়বড় করে এদিক-ওদিক ছুটে পালাল বেড়ালগুলো। দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে কেমন যেন ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল জগন্নাথের দিকে। জগন্নাথও থ হয়ে গেছে। ওর দৃষ্টি থমকে-থমকে ওই বেড়ালগুলোর চোখের কাছে এসে স্থির হয়ে যাচ্ছে। বেড়ালগুলো কাঁদছে নাকি! এতক্ষণ কি ওরা জগন্নাথের বুকের ওপর মাথা রেখে কাঁদছিল!

হ্যাঁ, কাঁদছিল। আর সেই ছেলেটা? সে কোথা গেল?

ওই তো ছেলেটা!

কী করছে ওখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে?

সে-ও কাঁদছে!

জগন্নাথের নজরটা হঠাৎই পড়ল ছেলেটার দিকে! দাঁড়িয়ে ছিল, একটু দূরে। তাকিয়ে ছিল জগন্নাথের মুখের দিকে।

কাঁদছে কেন ছেলেটা?

দাঁড়াবার জন্যে চেষ্টা করছে জগন্নাথ। এখনও ব্যথা করছে। পারছে না। ছেলেটা ছুটে এল। জগন্নাথের হাত দুটি জড়িয়ে ধরেছে। ছেলেটার চোখের জল ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে জগন্নাথের হাতের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। কেমন শিউরে উঠল জগন্নাথ। কী করবে বুঝতে পারছে না। জগন্নাথ ভাবছে, কাঁদছে কেন ওরা! ছেলেটাও কাঁদছে, বেড়ালগুলোও কাঁদছে। কী হয়েছে ওদের?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছেলেটাই কথা বলল, 'আমার নাম মাকু।' কান্নায় ভিজে আছে ওর গলার স্বর। জগন্নাথের চোখের দৃষ্টি ওর মুখের ওপর নরম হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেটা আবার বলল, 'আসলে আমার নাম মানিক। আমায় সবাই মাকু বলে ডাকে। তোর?'

জগন্নাথ ছেলেটার মুখের দিকে চেয়েই রইল। কোনো উত্তর দিল না।

'বলবি না?'

এবার অভিমানে জগন্নাথ মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'তোর খুব লেগেছে?'

জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল।

ছেলেটা বলল, 'দেখ, সত্যি বলছি আমি তোকে মারতে চাইনি। আমি—আমি', বলতে-বলতে সব বলা হল না। হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলল।

ওর কান্না দেখেই বোধহয় জগন্নাথ এতক্ষণে কথা বলল, 'আমি যাব।'

'কোথায়?'

'বাইরে। রাত হয়েছে, শীত বাড়ছে। বাইরে যাবার দরজাটা কোনদিকে?'

ছেলেটা জগন্নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোর মা আছে?'

'আমার কে আছে, না-আছে, সে দেখবার তোর কী দরকার!'

একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিল জগন্নাথ।

'তুই রাগ করেছিস, না?'

'কার ওপর রাগ করব?'

'আমার?'

'না।'

'সত্যি বলছিস? কিন্তু জানিস, আমাদের কথা শুনলে তোর একটুও রাগ হবে না।' বলে ছেলেটা চুপ করে গেল। জগন্নাথ ঘরের যেদিকটা অন্ধকার, সেইদিকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকাল একবার। থমথম করছে সেই অন্ধকারটা। থমথম করছে সারা ঘরটা।

ছেলেটা আবার বলল, 'ওই যে বেড়ালগুলোকে দেখছিস, ওদেরও যেমন মা আছে, আমারও তেমনি মা আছে। কিন্তু জানিস, আমরা হারিয়ে গেছি। আর একটু পরে তোরও সব কিছু হারিয়ে যাবে।' বলে ছেলেটা যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কথাটা কেমন অদ্ভুত ঠেকল জগন্নাথের কানে। জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

'মানে, এখান থেকে তুই আর বেরিয়ে যেতে পারবি না। তুই এখন এখানে বন্দি। একটু পরে তুইও বেড়াল হয়ে যাবি।'

ভীষণ অবাক হয়েগেল জগন্নাথ। মানুষ আবার বেড়াল হবে কী করে!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'সত্যি। ওই যে বেড়ালগুলো দেখছিস, ওরা সব মানুষ। তোর মতো, আমার মতো মানুষ। ওদের ধরে এনেছে। আমাকেও ধরে এনেছে!'

বলবার সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ালগুলো জগন্নাথের মুখের দিকে চেয়ে একসঙ্গে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে জগন্নাথের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। জগন্নাথের বুকটা কেমন যেন ভার হয়ে গেল। বেড়ালগুলোকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল। জিজ্ঞেস করল, 'কে ধরে এনেছে?'

ছেলেটা বলল, 'জানি না।'

'তাকে দেখিসনি?'

'না। ওই অন্ধকারে সে লুকিয়ে থাকে। ওই অন্ধকারটা যেমন অন্ধকার, সেই মূর্তিটাও তেমনি অন্ধকার! অন্ধকারে অন্ধকার হয়ে সে গর্জন করে! তাকে দেখতে পাই না।'

'এখনও সে ওই অন্ধকারে আছে?'

'না, এখন সে নেই। একটু পরে আসবে।'

'তাহলে তুই বেড়ালগুলোকে মারছিলি কেন?'

'আমাকে হুকুম করে গেছে ওই বেড়ালগুলোকে মেরে রাখতে। সে এসে খাবে। তুই বেড়াল হলে তোকেও খাবে। আমাকেও খাবে।' বলতে-বলতে ছেলেটা জগন্নাথের হাত ধরল। বলল, 'আয় আমার সঙ্গে।' জগন্নাথকে টানতে-টানতে ওই অন্ধকারে নিয়ে গেল। অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একটা মস্ত গর্তের সামনে এসে দাঁড়াল ছেলেটা। বলল, 'এই যে গর্তটা দেখছিস, তোকে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে এই গর্তে ফেলে দিয়ে ওই পাথরটা চাপা দিয়ে দেবে। তারপর তোকে যখন তুলবে, তুই তখন একটা বেড়াল হয়ে গেছিস! শুনে তোর ভয় করছে না?'

জগন্নাথ বলল, 'না, ভয় পাই না আমি।'

'তুই তো জানিস তুই আর বাঁচবি না, তবু তোর ভয় করছে না?'

জগন্নাথ তখন বুক ফুলিয়ে বলল, 'তোর নাম যদি মানিক হয়, আমার নাম জগন্নাথ। কোনো বিপদই আমার কাছে বিপদ নয়। কেননা, কোনো ভয়কেই আমি ভয় বলে মনে করি না। আমায় কেউ মারতে পারবে না। যারা ভিতু, তারাই তো মরে!'

'তুই তো এখন ধরের মধ্যে বন্দি।'

'তাতে কী হয়েছে! বেড়ালগুলোতো আরও বিপদে পড়েছে। আমি ওদের বাঁচাব।'

'কেমন করে?'

'সাহস থাকলে সব হয়।'

'আর আমাকে?'

https://boierhut.com/fb

জগন্নাথ বলল, 'দেখ মানিক, তুই আমায় মেরেছিস, তাই বলে আমি প্রতিশোধ নেব, একথা যেন ভাবিস না। মানিক, আমার মাকে আমার মনে পড়ে না। আমি যখন খুব ছোট্ট, আমার মা হারিয়ে গেছে। আজ তোর মা তো আমারই মা। মানিক, তুই আমার ভাই। চ আমার সঙ্গে।' বলে, জগন্নাথ মানিকের হাত ধরে অন্ধকার থেকে আবার সেই ঘরে ফিরে এল।

কী জানি কেন, হঠাৎ দেখি বেড়ালগুলো যেন কত খুশি হয়ে উঠেছে। মানিকের হাত ধরে জগন্নাথ সেইখানে এসে দাঁড়াতেই বেড়ালগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে জগন্নাথকে আদর করতে লাগল। জগন্নাথ ওদের জড়িয়ে ধরল। মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পারবি, আমি যা বলব তাই করতে?'

বেড়ালগুলো একসঙ্গে 'ম্যাঁ-ও, ম্যাঁ-ও' করে চিৎকার করে উঠল।

জগন্নাথ বলল, 'তবে আয়।'

এগিয়ে গেল জগন্নাথ। এগিয়ে গেল ঘরের সেই দরজাটার দিকে। লোহার দরজা। লোহার খিল আঁটা। অনেক উঁচু। ওখানে হাত যাবে না জগন্নাথের। গেলেও একা জগন্নাথ পারবে না ওই খিল খুলতে। জগন্নাথ বলল, 'মানিক, তুই আমার কাঁধে বোস।'

তারপর বেড়ালগুলোকে বলল, 'আমার ঘাড়ে, পিঠে চাপ।'

মানিক কাঁধে বসল। বেড়ালগুলো লাফিয়ে-ছুটে ঘাড়ে-পিঠে উঠে পড়ল। জগন্নাথ বলল, 'এখন তোরা সবাই মিলে খিলটা ঠেলে-ঠেলে খোল।'

তারপর মানিক হাত দিয়ে আর বেড়ালগুলো মাথা লাগিয়ে সেই ইয়া পেল্লাই লোহার খিলটা ঠেলতে-ঠেলতে খুলতে লাগল। কী সাংঘাতিক ভারী! কিন্তু লোহাই হোক আর ভারীই হোক, ওরা আজ কিচ্ছু মানবে না। ওরা হারবে না। ওরা আজ সবাই এক। সবাই মিলে ওরা আজ এই অন্ধকার থেকে আলোয় যাবে। ওরা বাঁচবে!

হঠাৎ একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে! হাজার-হাজার ভীমরুল একসঙ্গে ডেকে-ডেকে উড়ে এলে যেমন শুনতে লাগে, গর্জনটা তেমনি যেন ছুটে-ছুটে উড়ে আসছে।

মানিক চেঁচিয়ে উঠল, 'জগন্নাথ, সে আসছে!'

জগন্নাথও চেঁচিয়ে উত্তর দিল, 'আসতে দে। আমাদের দরজা খুলতেই হবে। জোরে-জোরে, আরও জোরে হাত লাগা।'

মানিক আর বেড়ালগুলো চেঁচিয়ে উঠল, হেঁই-হো, ম্যাঁও-হো!' ওরা যতই জোরে সেই লোহার খিলে ঠেলা মারছে, ভীমরুলের মতো আওয়াজ করে সেই গর্জনটাও ততই যেন দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসছে। জগন্নাথের কানে তালা লেগে গেল! গর্জনটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ভূমিকম্প হলে যেমন ঘর-দোর সব কেঁপে ওঠে, সেই গর্জন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তেই তেমনিই দুরু-দুরু সব কাঁপতে লাগল!

মানিক চেঁচিয়ে উঠল, 'জগন্নাথ!'

জগন্নাথের গলা সেই ভয়ংকর গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ভয় নেই মানিক! আমরা সবাই এক। আমরা জিতব, জিতব, জিতব।'

অমনি ঝন-ঝন-ঝনাৎ! সেই লৌহ কপাটের লোহার খিল ভেঙে মাটিতে ঠিকরে পড়ল। ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু তারপরেই থতমত খেয়ে গেল। কে যেন ওদের ধাক্কা মারল। জগন্নাথের কাঁধ থেকে, পিঠ থেকে এ-ধার ও-ধার ছিটকে পড়ল ওরা সবাই। জগন্নাথকে অন্ধকারে কে যেন ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে মিলিয়ে গেল। মানিক চেঁচিয়ে উঠল, 'জগন্নাথ!'

জগন্নাথ অন্ধকার থেকে উত্তর দিল, 'মানিক, ভয় নেই! আমরা আজ এক হয়েছি। আমরা জিতবই—'

জগন্নাথের কথা শেষ হল না। হয়তো তার আগেই কে যেন ওর মুখটা চেপে ধরল। চেপে ধরে সেই অন্ধকার গর্তটার মধ্যে ফেলে দিয়ে পাথর চাপা দিয়ে দিল।

অন্ধকারটা যত জমাট, গর্জনটা ততই ভয়ংকর। ভয়ংকর গর্জন এবার মানিকের দিকে এগিয়ে আসছে। মানিক ভয় পেল না। মানিক হেঁকে উঠল, 'গর্জন, তোমায় আমরা ভয় পাই না। আমরা এক।'

গর্জনটা এগিয়ে আসছে অন্ধকারের ভেতর থেকে, আর বেড়ালগুলো গুড়িগুড়ি আলতো পায়ের ডিঙি মেরে ডুব দিচ্ছে অন্ধকারের ভেতরে। আজ আর ওদের ভয় নেই। অন্ধকার তো ওদের কোনোদিন অন্ধ করে দিতে পারে না। ওরা আজ জিতবেই! ওদের শত্রু একটাই। আর তা হল—

গর্জনটা হঠাৎ একেবারে ওদের সামনে এসে পড়ল। ওরা দেখে ফেলেছে। দেখল, ভয়ংকর দুটো চোখ। লাল টকটকে। ঠিকরে বেরিয়ে এসে ঝুলছে আর অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। নেকড়ের মুখের মতো মুখটা হিংস্র! জিবটা লকলক করছে। বাদুড়ের মতো দুপাশে ডানা। তার হাত দুটো ডানার সঙ্গে উঠছে নামছে! ঠিক যেন একটা রাক্ষুসে-বাদুড়! এক্ষুনি খুঁচিয়ে শেষ করে দেবে ওই বেড়ালগুলোকে!

একেবারে আচমকা একটা বেড়াল লাফ মারল। লাফ মারল ওর চোখের ওপর! খামচে ধরল। টেনে উপড়ে ফেলল চোখ দুটোকে। রাক্ষুসে-বাদুড়টা যন্ত্রণায় হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে -ঝাঁপিয়ে তুলকালাম শুরু করে দিল। সেই তক্কে আর একটা বেড়াল ওর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর লকলকে জিবটা হ্যাঁচকা-মেরে ছিঁড়ে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে আর সকলে খামচে-ছিঁড়ে, কামড়ে-আঁচড়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল রাক্ষুসে-বাদুড়টাকে। বাদুড় তখন অন্ধকারে অন্ধ হয়ে মাটিতে চিৎপাত! তবু ওরা ছাড়ছে না। লৌহ কপাটের লোহার খিলটা টেনে এনে, ওর মুণ্ডুটার ওপর ধাঁই করে পিটিয়ে দিল। মুণ্ডু গুঁড়িয়ে চ্যাপটা হয়ে গেল। আর কোনো গর্জন নেই, কোনো হুংকার নেই। সেই রাক্ষুসে-বাদুড় মরার আগে শেষবারের মতো ছটফটিয়ে হাত-পা ছুড়ে ঠান্ডা মেরে গেল! শেষ হয়ে গেল তার শয়তানি। বাদুড় মরল।

এবার ছুটল ওরা সেই অন্ধকার গর্তে। অন্ধকার গর্তে সেই রাক্ষুসে-বাদুড় জগন্নাথকে ফেলে দিয়েছে। তাকে উদ্ধার করবে মানিক আর সাত-বেড়াল। তাই তারা গর্তের সামনে এসে একসঙ্গে হাত লাগাল। গর্তের মুখ থেকে সরিয়ে ফেলল সেই মস্ত ভারী পাথরটা। হাত বাড়াল মানিক। মানিকের হাত ধরে উঠে এল জগন্নাথ।

একী! সে তো বেড়াল হয়নি! জগন্নাথ তো জগন্নাথই আছে।

হ্যাঁ, জগন্নাথ যেমন ছিল, তেমনি আছে! কর্বুরের দেওয়া জাদু যে তার কোঁচড়ে বাঁধা। কর্বুর তো বলেছে, তার কোনোদিন বিপদ হবে না!

জগন্নাথ মানিকের হাত ধরে সেই গর্ত থেকে উঠে আসতেই সাতটা বেড়াল আর মানিক ওকে জড়িয়ে ধরল আনন্দে। মানিক বলল, 'জগন্নাথ, আমরা জিতে গেছি।'

জগন্নাথ উত্তর দিল, 'না মানিক, আমরা এখনও জিতিনি! আরও কাজ আছে। আয় আমার সঙ্গে।' বলে সেই রাক্ষুসে-বাদুড়টাকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল অন্ধকার গর্তটার সামনে। ঠেলা মেরে ফেলে দিল সেই মরা বাদুড়টাকে গর্তের মধ্যে। তারপর পাথর চাপা দিয়ে দিল। কাজ শেষ হলে জগন্নাথ বলল, 'এক্ষুনি আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

মানিক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

জগন্নাথ উত্তর দিল, 'বাইরে।'

ওরা সবাই মিলে হাত লাগিয়ে, অন্ধকার ঘরের, মরচে ধরা লোহার কপাট ঠেলতে-ঠেলতে খুলে ফেলল। অন্ধকার থেকে ওরা আলোয় বেরিয়ে এল।

'কোয়া, কোয়া, আ-তু-তু!' জগন্নাথ ডাকল কোয়াকে।

ওহো, ভুলেই গেছি। কোয়া তো এতক্ষণ বাইরের ছিল। জগন্নাথ ডাকতেই কোয়া ছুটে এল। জগন্নাথ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, 'আয়! আমাদের সঙ্গে।' বলে জগন্নাথ সাত-বেড়াল আর মানিককে সঙ্গে নিয়ে, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে চলল। পায়ে-পায়ে কোয়াও চলল। অবশ্য আড়চোখে বেড়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে। কোয়া বলে তাই। অন্য কুকুর হলে এতক্ষণে ঘেউ-ঘেউ করে বেড়ালগুলোর পেছনে তাড়া লাগিয়ে দিত!

আকাশে যদিও এখনও ভোরের ছোঁয়া লাগেনি, তবু রাত কাটছে। আর একটু পরে উজাড় করে আলো উপছে পড়বে ওই আকাশ থেকে মাটিতে।

মানিক জগন্নাথকে জিজ্ঞেস করল, 'এ-পথে কোথায় যাচ্ছিস?' জগন্নাথ উত্তর দিল, 'এবার থামব।'

'কোথায়?'

'সামনে।'

সামনে এসে থামল জগন্নাথ। থামল সাতটা বেড়াল, মানিক আর কোয়া। জগন্নাথ বলল, 'মানিক, যে-পথে আমরা এসেছি, সে-পথ এখানে শেষ হয়ে গেছে। এবার আমাদের বিদায় নেবার সময় এসেছে!'

এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে ওই সাতটা বেড়াল কেমন যেন করুণ চোখে জগন্নাথের সুখের দিকে চাইল। ছলছল করছে ওদের চোখ।

ওরা কাঁদছে।

জগন্নাথ সাত-বেড়ালের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। ওদের কাছে টেনে নিল। আদর করল, তারপর বলল, 'আমি তোদের চিনি না, আমি তোদের জানি না। তবু তোদের দুঃখ, আমারও দুঃখ! তোদের সে-দুঃখ আজ শেষ হবে। আমরা অন্ধকারকে জয় করেছি। এবার দুঃখকে জয় করব। আমরা আবার জিতব।' বলে, জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণে জগন্নাথ কর্বুরের দেওয়া রেশমি-সুতোয় বাঁধা সেই সোনার ঘুঙুরটা কোঁচড় থেকে বার করল। নিজের অনেক বিপদের মধ্যেও জগন্নাথ কোনোদিনই মনে করেনি, এই ঘুঙুর বাজাতে হবে। আজ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে বলেই রেশমি-সুতোয় সে দোলা দিল। ঘুঙুর বেজে উঠল।

সমুদ্রের অনেক ঢেউ একসঙ্গে তোলপাড় করে যেমন গর্জে ওঠে, তেমনি ভীষণ শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল। ভয় পেয়ে গেল মানিক, ভয় পেল সাতটা বেড়াল আর ছোট্ট কোয়া। তারপর ধীরে-ধীরে সেই শব্দ মিলিয়ে গেল। ধীরে-ধীরে সকলের চোখের সামনে, শূন্যে ছড়িয়ে গেল, রং রং আর রং! সেই রং দিয়ে কে যেন আলপনা এঁকে দিল ওই শূন্যে। সেই আলপনা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ময়ূরকণ্ঠী রঙের সেই মূর্তি ভেসে উঠল। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই মূর্তির দিকে। আঃ! কী সুন্দর!

মূর্তি কথা বলল, 'জগন্নাথ, আমি কর্বুর! আমি এসেছি। বল, তুমি কী চাও?'

জগন্নাথ উত্তর দিল, 'কর্বুর, আমি তোমার কথা রেখেছি। আমি বিপদে পড়েছি, তবুও তোমায় ডাকিনি। আজ আমি বিপদ জয় করে তোমায় ডেকেছি। কেন ডেকেছি, সে তো তুমি জানো কর্বুর! তুমি এই বেড়ালদের আবার মানুষ করে দাও!'

কর্বুর উত্তর দিল, 'হ্যাঁ জগন্নাথ, তোমার সাহস দেখে আমি আবার খুশি হয়েছি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।'

বলার সঙ্গে-সঙ্গে শূন্যের সেই রং হঠাৎ ওঠা দমকা হাওয়ায় ঘূর্ণি খেতে-খেতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ছড়িয়ে-ছড়িয়ে সেই সাত-বেড়ালকে ঢেকে ফেলল। গাঢ় রঙের জমাট ধোঁয়ায় আর দেখা যায় না তাদের। বেড়ালগুলো রঙের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন হারিয়ে গেছে!

একটু পরেই আবার ধীরে-ধীরে সরে গেল সেই রঙের ঝিলমিল। ধীরে-ধীরে কর্বুরের রঙিন মূর্তি আবার শূন্যে ভেসে উঠল। ছুটে গেল জগন্নাথ বেড়ালগুলোর দিকে আনন্দে! একী বেড়াল তো আর বেড়াল নেই। তারা যে মানুষ! ছোট্ট-ছোট্ট সাতটি ফুটফুটে ছেলে-মেয়ে, সাদা ধবধবে পোশাক পরে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে গেল জগন্নাথ, অবাক হয়ে গেল মানিক। খুশিতে কোয়া ডেকে উঠল, 'ঘেউ-ঘেউ।'

কেঁদে ফেলল তারা। সেই ফুটফুটে সাতটি ছেলেমেয়ে। কাঁদতে-কাঁদতে জগন্নাথকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'জগন্নাথ, তুমি আমাদের সত্যিকারের বন্ধু।'

জগন্নাথ ওদের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে উত্তর দিল, 'তোমরাও আমার বন্ধু।'

কর্বুর আকাশের ওপর থেকে এবার বলল, 'জগন্নাথ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তোমার আর কি কিছু চাইবার আছে? তুমি আর কী চাও?'

'কর্বুর, আমি বাবার কাছে যাব।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

কর্বুর আকাশে রং ছড়িয়ে ভেসে চলল। জগন্নাথ, মানিক, ওদের সাত বন্ধু আর কোয়া সেই রং দেখে-দেখে পথ হাঁটল।

একটি পাখি ডাকল।

আকাশে ভোর আসছে।

কর্বুর দাঁড়াল। কর্বুর বলল, 'জগন্নাথ এবার দাঁড়াতে হবে।'

ওরা দাঁড়াল।

দুটি পাখি ডাকল।

আকাশে ভোর এসেছে।

কর্বুর জিজ্ঞেস করল, 'জগন্নাথ, তোমার বাবাকে দেখতে পাচ্ছ?'

জগন্নাথ বলল, 'কই না!'

অনেক পাখি ডেকে উঠল।

ভোরের আকাশ রঙিন হল।

কর্বুর বলল, 'সামনে এগিয়ে এস।'

জগন্নাথ এগিয়ে গেল। সূর্য উঠল। সূর্যের রঙের ছটায় চোখ মেলে সামনে চাইতেই স্থির হয়ে গেল জগন্নাথের চোখ দুটি। ওই ওপরে পাথরের বেদিতে ঘোড়ার পিঠে কে বসে আছে! কার মূর্তি ওই পাথরের বেদির ওপর! জগন্নাথের মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল, 'আমার বাবা!'

কর্বুর উত্তর দিল, 'হ্যাঁ জগন্নাথ, তোমার বাবা। আর ওই তাঁর ঘোড়া বাদামি। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তোমার বাবার একটি পা নষ্ট হয়েছে। আর নিরীহ মানুষকে লুঠেরাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। তোমার বাবা বীর। তাই এদেশের মানুষ সেই বীরের মূর্তি গড়ে ওই বেদির ওপর তাঁর আসন করে দিয়েছে। দেখ, তিনি ওই নীল আকাশে মাথা তুলে আছেন। যে বীর, যে দেশকে ভালোবাসে, দেশের মানুষকে আপন করে নেয়, তার মৃত্যু নেই। তোমার বাবাও

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বেঁচে আছেন জগন্নাথ। বেঁচে থাকবেন চিরদিন। কোনো দুঃখ করো না জগন্নাথ। দুঃখ করতে নেই। তুমি এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, তোমার জয় হবে।' বলতে-বলতে কর্বুরের সেই রঙিন মূর্তি সোনালি সূর্যের ছটায় হারিয়ে গেল।

জগন্নাথ ওপর দিকে চাইল, ওর বাবার মুখের দিকে। তারপর উঁচু বেদির একটি-একটি সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপরে ও বাবার পায়ের কাছে পৌঁছে গেল। বাবার পায়ে সে মাথা ঠেকাল। তারপর কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতে দুটি জলভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'বাবা, আমিও তোমার মতো হব।' বলতে-বলতে ডুকরে উঠল।

ধীরে-ধীরে মানিক উঠে এসেছে ওর কাছে। সঙ্গে সাত বন্ধু আর কোয়া। মানিক ওর হাতটি ধরে ডাক দিল, 'জগন্নাথ।'

জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল।

মানিক বলল, 'চ।'

জগন্নাথ জিজ্ঞেস করল, 'কোথা?'

'বাড়িতে।'

'আমার তো বাড়ি নেই।'

'আছে জগন্নাথ। আমার বাড়িই তোর বাড়ি। তুই তো বলেছিস, আমার মা তোর মা। মায়ের কাছে চ।'

জগন্নাথ চোখের জল মুছে ফেলল। কোয়াকে বুকে তুলে নিল। তারপর সাত বন্ধুর সঙ্গে, মানিকের হাত ধরে এগিয়ে চলল।

তখন রোদ উঠে গেছে। শীতের সকালে ফুটন্ত ফুলের পাপড়ির ওপর শিশির ছড়িয়ে আছে। রোদের আলোয় হাজার-হাজার মুক্তা আনন্দে দোল খাচ্ছে। সেই দুলন্ত আলোর ছটাগুলি জগন্নাথের মুখের ওপর ঠিকরে পড়ছে। ওরাও যেন খুশি আজ। কেননা, জগন্নাথ যে মায়ের কাছে যাচ্ছে!

https://boierhut.com/fb

স্বপ্নের জাদুকরী

আঃ কী ভালোই না লাগে এখন, এই সকালটা। আর তো মাত্তর কটা দিন। কদিন পরেই মা-দুগ্গা ঘরে আসবেন। পুজো বসবে। ড্যাম-কুড়-কুড় বাদ্যি বাজবে।

দেখ না, কদিন আগেও তো আকাশ মেঘে-মেঘে ঢেকে ছিল। কদিন ধরে আকাশ ভেঙে বর্ষার সে কী দাপাদাপি! আর এখন? না, এখন মেঘও নেই, ঝমঝমানি বিষ্টিও নেই। যেমন তারা দল বেঁধে এসেছিল, তেমনি দল বেঁধে কোথায় যে পাড়ি দিয়েছে, আকাশের কোন রাজ্যে কে জানে! এখানে এখন তকতকে আকাশের বুক-ভরতি ঝকঝকে নীল আলো। আঃ! মুঠো-মুঠো খুশির মতো ছড়িয়ে পড়েছে, এদিক, ওদিক, চারিদিকে। ওই আলোর মতো খুশি হয়ে দূরে আকাশের দোলনায় দুলতে-দুলতে দুধ-ধবধব মেঘের দল যখন উড়ে যায়, কিংবা ধরো মেঘের সঙ্গে সাদা-ধবধব বকের পাঁতি উড়তে-উড়তে হারিয়ে যায়, তখন স্থির হয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখে হীরালাল। ভারি ভালো লাগে হীরালালের ওই আকাশ আর মেঘ দেখতে। ইচ্ছে করে ওই বকের মতো উড়তে, লুকোচুরি খেলতে, মেঘের সঙ্গে, আলোর সঙ্গে। দেখতে-দেখতে হঠাৎ এমন আনমনা হয়ে যায় হীরালাল। হঠাৎ আনমনা ওর মনের কোণে দিদির কথা ভেসে ওঠে। মন বলে, এই সময় যদি দিদি থাকত!

দিদিকে হীরালালের মনে নেই। হীরালাল যখন খুব ছোট্ট, হাঁটতে গিয়ে ছোট্ট পা দুটি যখন তার টুল-টুল করে টলে পড়ত, কিংবা হাতের পাতা দুটি তার খুশির আনন্দে দুলে-দুলে ঢেউ খেলত, সেই তখন থেকে দিদি নেই। এখন তবে কেমন করে মনে পড়বে হীরালালের দিদির মুখখানি, চোখ দুটি?

মায়ের কাছে দিদির গল্প কত শুনেছে হীরালাল। এই পুজোর সময় দিদি যখন সাজত, তখন নাকি ভারি সুন্দর লাগত দিদিকে। ডাগর-ডাগর চোখে কাজল পরত। পায়ে আলতা দিত। কপালে কাঁচপোকার টিপ সাজিয়ে হীরালালকে কোলে নিয়ে ঠাকুর দেখতে যেত। কিন্তু এখন? এখন হীরালাল একা। মা বলেছে, দিদি নাকি মেঘের দেশে চলে গেছে। তাই এই পুজোর সময়, ওই নীল আকাশের মেঘ দেখতে-দেকতে হীরালাল ভাবে মেঘের দেশ কোন দেশে? সেই দেশে যাবে সে। দিদিকে সে ডেকে আনবে।

হীরালাল তোমার মতো। হয়তো বা তোমার চেয়ে একটু বড়ো। ভারি মিষ্টি চোখ দুটি তার। সারাক্ষণ দোল খাচ্ছে। হঠাৎ যদি কান্না-ছোঁয়া দুঃখ এসে ওর বুকের মধ্যে আলতো-হাওয়ায় কেঁপে ওঠে, তবু ও চোখের পাতা দুটি ভিজতে দেবে না। দুঃখ হলে ও মার কাছে ছুটে যাবে। মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরবে। মা যখন জিজ্ঞেস করবে, 'কী রে, কী হল?' তখন

হীরালাল আঁচল থেকে মুখ সরিয়ে মায়ের চোখ দুটির দিকে চাইবে। চেয়ে-চেয়ে অস্ফুট স্বরে বলবে, 'কিচ্ছু না।'

মাঝে-মাঝে মায়ের জন্যেই থির হয়ে কেঁপে ওঠে হীরালাল। যখন দিদি ছিল, তখন এক-কথা। এখন মা ভারি একা। একা-একাই সারাদিন কত কাজ করবে মা। না করলে চলবেই বা কেমন করে। হীরালালের বড়ো হতে এখনও অনেক দেরি। যতদিন না বড়ো হচ্ছে হীরালাল, ততদিন দুধের ঘটি নিয়ে মাকে বাড়ি-বাড়ি দুধ বেচে আসতেই হবে। কোন সকালে উঠবে মা। সেই গরমের দিনে, তখনও আকাশে ভোরের আলো ফুটবে না, পাখি ডাকবে না। চারদিক নিশ্চুপ। শুধু শোনা যাবে বাড়ির কোল ঘেঁষে ছোট্ট নদীর ছুটে চলার তির-তির শব্দ, তখন মা উঠবে। কিংবা ধরো, এখন, এই শরতে ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় যখন ওই নদীর তীরে-তীরে শুধু কাশের হাওয়ায় নাচনের নূপুর বাজে, তখন মা জাগবে। আবার নয়তো কনকনে শীতের ভোরে তুমি যখন লেপের মধ্যে মুখ লুকিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে ঘুম দাও আর জানতে পার না ঘরের বাইরে গাছের পাতায় একটি-একটি শিশির-ফোঁটা টুপটাপ লাফ দিয়ে খেলা করছে, তখন মায়ের ঘুম ভাঙবে। গোয়ালে যাবে মা। লক্ষ্মীকে খেতে দেবে। লক্ষ্মী ওদের মোষ। কালো কুচকুচ করছে। কেমন নাদুস-নুদুস মোষটা। লক্ষ্মীর একটা বাচ্চাও আছে। ঠিক ওর মায়ের মতো, অমনি কালো, অমনি মোটা। সাংঘাতিক দুষ্টু। তুমি যাও না সামনে, এমন মাথা নেড়ে তেড়ে আসবে যে, পালাতে পথ পাবে না। তবে হীরালালকে দেখলে ভারি আনন্দ ওর। তিড়িং-তিড়িং লাফাবে, ছুটবে আর হীরালালের বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে আদর করবে। তখন কী ভালোই না লাগে হীরালালের।

মা যখন দুধ বেচে ঘরে ফেরে,তখন আকাশ উপচে রোদ উঠে যায়। বই নিয়ে তখনও পড়বে হীরালাল। তারপর মা এসে পড়া ধরলে,তখন ছুটি।মা এত জানে কী করে ? মায়ের মুখে-মুখে কত ছড়া। কত গল্প। এমন কী হীরালালের বই-ভরতি শক্ত-শক্ত বানানগুলো পর্যন্ত মুখস্থ। অবাক হয়ে যায় হীরালাল। হবেই তো! কেননা, হীরালালকে কত কষ্ট করে বানানগুলো শিখতে হয় বল! অবিশ্যি এ-কথা বলি না, পড়তে হীরালালের খারাপ লাগে। ও যতই পড়ে, ততই যেন ওই গাছ আর পাখি, ওই নদী আর মাঠ কিংবা ওই ফুল আর ফড়িং আপন হয়ে মনে-মনে ওর সঙ্গে কথা বলে। জিজ্ঞেস করো না তুমি যা ইচ্ছে। ভাবছ হীরালালকে হারিয়ে দেবে! তবেই হয়েছে! তুমি নিজেই গো-হারান হয়ে বসে পড়বে।

মা এলে, পড়া শেষ করে এক কোঁচড় মুড়ি নেবে হীরালাল। তারপর লক্ষ্মীর পিঠে চেপে ওই নদীর দিকে পাড়ি দেবে। রোজ রোজ। শীতের দিনে তো ওই নদী ঠিক যেন একফালি রুপালি রাংতা। তখন নদীর জল ডিঙিয়ে এ-পার থেকে ও-পার যেতে লক্ষ্মীর কী মজাই না লাগে ! যতই বকো,এক-একদিন লক্ষ্মী জল ছেড়ে নড়বেই না। একদিন হয়েছে কী,হীরালাল লক্ষ্মীর পিঠে বসে,মাঝ-নদীতে জলের উপর কোঁচড় থেকে মুড়ি নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছ আসছে

! টাপুস-টুপুস মুড়ি খাচ্ছে আর নেচে-নেচে পালিয়ে যাচ্ছে ! দেখতে-দেখতে কার না ভালো লাগে! বল, কে না আনমনা হয়ে যায়! ব্যস! যেই না হীরালাল একটু আনমনা হয়েছে, লক্ষ্মী অমনি ঝপাং করে জলের মধ্যে বসে পড়েছে। পড়বি তো পড় হীরালালও চিতপটাং। হীরালালের চোখে জল, মুখে জল। জলে-জলে নাকানি-চোবানি। ওঃ! সে কী দারুণ মজা। তাই বলে ভাবছ, হীরালাল বুঝি লক্ষ্মীকে খুব একচোট পিটুনি দিয়েছে! মোটেই না। উলটে হীরালাল খিলখিল করে হেসে উঠে নদীর জলে সাঁতার কাটতে শুরু করে দিল আর টুপ-টাপ ডুব মেরে লক্ষ্মীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে লাগল। খেলা শেষ হলে লক্ষ্মীর পিঠে চেপে আবার ঘরে ফেরা।



...হীরালাল লক্ষ্মীর পিঠে বসে,মাঝ-নদীতে জলের ওপর কোঁচড় থেকে মুড়ি নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে ।

নদীর গা ঘেঁষে ওই যে বনটা, দেখ কী গভীর! গাছের গায়ে গা হেলিয়ে একটা যেন দানব! অন্ধকারে থেকে-থেকে চোখ মটকাচ্ছে! দানবের মাথায় আলুথালু চুল। তার নখের ডগাগুলো যেন খোঁচা খোঁচা ডালপালা! কেউ সামনে গেলেই তাকে খিমচে দেবার জন্যে আঁকপাঁক করছে। দেহটা তার দূর, কত দূর হয়তো অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে-মড়িয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে!

কী জানি কেন, আজই হঠাৎ হীরালালের চোখ দুটি বনের দিকে তাকিয়ে থমকে যায়! বনের গভীরে ও যায়নি কোনোদিন! এতদিন এই পথে ও লক্ষ্মীর পিঠে চেপে কতবার আনাগোনা করেছে, কিন্তু এমন করে সে তো কোনোদিন বনের দিকে তাকিয়ে দেখেনি! অবাক চোখে দাঁড়িয়ে আজই ও প্রথম ভাবল, কী আছে এই বনের গভীরে! দেখে এলে হয় না!

হঠাৎ এ কী! এমন কেন হল! এক টুকরো কালো মেঘে আকাশের সূর্য কেন ঢেকে গেল! এই তো রোদ-ঝলমল দিন ছিল! কোত্থেকে মেঘ এল! আলোর বুঝি রাগ হয়েছে, তাই মুখ ভার করেছে!

বনের ভেতর যেতে-যেতেও যাওয়া হল না হীরালালের। বলা তো যায় না। শরৎ-মেঘের মন বোঝা ভার! কখন তিনি কোনখানে যে ঝমঝমিয়ে নেমে পড়বেন, কেউ জানে না। না থাক। আজ না, কাল যাওয়া যাবে। ঘরের দিকে মুখ ফেরাল হীরালাল।

'হীরালাল!' হঠাৎ কে যেন ভারি আদর করে ডাকল তাকে! এতো একটি মেয়ের গলার স্বর! এ ডাক তো তার চেনা নয়! দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকাল হীরালাল, এ-পাশে ও-পাশে! না, কাউকে তো সে দেখতে পাচ্ছে না। তবে কি সে ভুল শুনল! হবেও বা! হীরালাল লাফ দিয়ে লক্ষ্মীর পিঠের ওপর বসে পড়ল। তারপর হাঁক দিল, 'হ্যাট-হ্যাট।' লক্ষ্মী হাঁটা দিল।

ক-পা-ই বা গেছে লক্ষ্মী, আবার আচমকা তেমনি করে ডাক দিল মেয়েটি, 'হীরালাল!'

চমকে উঠল হীরালাল। অবাক কাণ্ড! তক্ষুনি একটা দমকা হাওয়া শনশনিয়ে ঝাপটা মেরে বয়ে গেল বনের ডালে-ডালে। মেঘে-মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ! এ কী! ঝড় উঠল যে! ঝড়ের ঝাপটায় ধুলোর ঘূর্ণি ছোটে সাঁই-সাঁই! ছুটতে-ছুটতে হীরালালের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'হীরালাল।'

হীরালালের মনে হল, সেই ডাক ঝড়ের সঙ্গে বনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। নিমেষের মধ্যে লক্ষ্মীর পিঠ থেকে লাফ দিল মাটিতে। তারপর চিৎকার করে বনের দিকে ছুটল, 'কে—!'

হয়তো দুর্যোগ মাথায় নিয়ে হীরালাল বনের মধ্যেই ছুটে যেত! তারপর যে কী হত কেউ জানে না। কিন্তু এমনই সময়ে হঠাৎ মা ডাকল, 'হীরালাল।'

ছোটা হল না। ছুটতে-ছুটতে থামল হীরালাল। কান পেতে আবার শুনল ঝড়ের শব্দে মায়ের ডাক, 'হীরালাল, ঘরে আয়, ঝড় উঠেছে!'

'যাচ্ছি মা।' হীরালাল চেঁচিয়েই উত্তর দিল। মায়ের ডাক শুনে বনের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই ওর মনে হল, বনটা যেন ঝড়ের ঝাপটায় মাথা ঝাঁকিয়ে হীরালালকে ঠাট্টা করছে। ওই তো, হাজার-হাজার গাছের পাতা হীরালালের বিপদ দেখে একসঙ্গে কেমন হাততালি দিচ্ছে দেখ! কিচ্ছু বলার নেই হীরালালের। কাকে বলবে? বনকে, না গাছকে? তাই চটপট লক্ষ্মীর পিঠে বসে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে হীরালাল ঘরে ছুটল!

সত্যিই অবাক কথা। কেননা, হীরালাল সকালে ঘুম থেকে যখন উঠল, তখন তো মেঘ ছিল না! কে বুঝবে তখন, একটু পরে ঝড় উঠবে! তখন, কেমন মিষ্টি হাওয়া শিউলি গাছে দোল খাচ্ছিল আর ঝরা-ফুলে শিউলিতলা ভরে যাচ্ছিল। আর এখন? আকাশের মনের কথা কেউ জানে না, কেউ জানে না। এই বৃষ্টি এল যদি, এই উঠল রোদ। এই ছায়া ভরে গেল, এই ফুটল আলো!

ঝড় থামল বটে, কিন্তু মেঘ কাটল না। আজ আর ঘর থেকে বেরুল না হীরালাল। ভারি ছটফট করছিল তার মনটা। তখন কে তাকে ডাকল? কাউকে তো দেখতে পেল না হীরালাল! ওই বনে যে থাকে, সে তার নাম জানে! যতই ভাবছে, মন তার বার-বার ছুটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এখনি যাই, খুঁজে আসি!

মেঘ কাটেনি বলেই আজ আকাশে তারা ফোটেনি। হীরালাল কতবার ছুটে-ছুটে উঠে এসেছে এই উঠানে। কতবার থেকে-থেকে উঁকি মেরেছে দূর আকাশে! কিন্তু দেখ, তারার আকাশ আজ মুখে-চোখে অন্ধকারের কালি মেঘে চোখ মটকাচ্ছে। হীরালাল যতই দেখছে, বুকটা তার কেমন যেন নিরাশ হয়ে কেঁপে উঠছে। মন ভাবছে, কাল যদি মেঘ না কাটে!

মনের ভাবনা মনে নিয়েই হীরালাল রাতেরবেলা মায়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমোবার আগে শুধু একটিবার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মা, মেঘ কেন করে?'

মা বলেছিল, 'মেঘ না করলে বিষ্টি হবে কেন? বিষ্টি না হলে ফুল ফুটবে কেন? ফুল না ফুটলে পুজো হবে কেমন করে দুগ্গাঠাকুরের?'

মায়ের কথা শুনে খানিক চুপ করে ছিল হীরালাল। তারপর আবার বলেছিল, 'আচ্ছা মা, দিদি না থাকলেও কেন পুজো হয়?'

মায়ের মুখের কথা হীরালালের এই একটি কথায় আর কোনো উত্তর খুঁজে পায়নি। অন্ধকার এই ঘুমের রাতে হীরালাল দেখতে পায়নি মায়ের চোখ দুটি। দেখেনি চোখ দুটি উছলে গেছে জলে-জলে। হঠাৎ এমন নিস্তব্ধ আর নিথর হয়ে গেল চারিদিক। হীরালালের নিজেরই অবাক লাগছে! কী হল, মা কেন কথা কয় না। আর তখনই হঠাৎ মায়ের হাতের নরম আঙুলগুলি হীরালালের কপাল ছুঁয়ে কেঁপে উঠল। হীরালাল মায়ের গলাটি জড়িয়ে ধরল। তখন তার মনে হল, বাইরে ওই ঝিঁঝিগুলো যেন ডাকতে-ডাকতে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। ওরা একটু থামলে পারে না।

থামল। কেন-না, বাইরে টাপুর-টুপুর বিষ্টি নামল। হীরালালের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। মন ভাবল, এ-বিষ্টি যদি আর না থামে! কাল সকালে উঠে, তাহলে কেমন করে বনে যাবে সে! কেমন করে খুঁজবে তাকে যে ওর নাম ধরে ডেকে-ডেকে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল! আহা! কত যেন আদর-মাখা মিষ্টি-সুরের সে-ডাক, 'হীরালাল, হীরালাল!' এখনও হীরালালের কানে-কানে বাজছে সেই সুর। শুনতে-শুনতে ঘুমের আবেশ যেন আপনা থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে হীরালালের চোখ দুটিতে। আধো-আধো ঘুমে-ঘুমে ও ভাবে, দিদিও কি তাকে ওই নামে ডাকত, 'হীরালাল, হীরালাল।'

না। মা বলছে, দিদি ডাকত, 'হীরামন, হীরামন।' ডাকতে-ডাকতে দিদি তাকে কোলে নিয়ে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুট দিত। তারপর ছুটতে-ছুটতে হারিয়ে যেত।

ভাবতে-ভাবতে শেষ হয়ে গেল ভাবনা। ঘুমিয়ে পড়ল হীরালাল।

আজ অনেক সকাল-সকাল উঠেছিল হীরালাল। বিষ্টি থেমেছে। আঃ! আলো, আলো, চারিদিকে আলো। আকাশের নীল পোশাকে আলোর রোশনাই চমক দিয়ে ঠিকরে পড়ছে আকাশ থেকে মাটিতে। খুশিতে দু-হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল হীরালাল। তারপর ছুট দিল হীরালাল। ছুট দিল বনের দিকে। যেন আলোর পিছনে আর-এক আলো!

আজ ভারি শান্ত বনের গাছপালা। বিষ্টির জলে চান করে ঝলমলিয়ে উঠেছে গাছের পাতারা। এ-পাতার জল এখনও ও-পাতায় টুপটাপ লাফ দিয়ে খেলা করছে। যদিও ভিজে মাটি কাদা-কাদা, তবু হীরালাল ছুটতে-ছুটতেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

হঠাৎ দাঁড়াল কেন হীরালাল! দেখ, কী ভয়ংকর থমথম করছে এখানটা, বনের সামনেটা। এত অন্ধকার কেন! পাতার ফাঁকে-ফাঁকে টুকরো আলোর ফুলকিটুকু পর্যন্ত উঁকি মারছে না।

ভয় পেল না হীরালাল। সেই অন্ধকার বনের ভেতরে, এ-গাছ ও-গাছ জড়িয়ে ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে সে এগিয়ে চলল। ডাগর-ডাগর চোখে তার অবাক-অবাক চাউনি। অবাক চোখ দুটি তার ইতি-উতি খুঁজছে কাকে? খুঁজছে তাকে, যে ডেকেছে তার নাম ধরে।

খুঁজতে খুঁজতে আরও একটু ভেতরে যখন চলে গেছে হীরালাল, তখন কী গহন! যে পথ দিয়ে এসেছে, সে-পথও তো আর দেখা যায় না। গাছে-গাছে ঢেকে গেছে। ভারি নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ চারিদিক। গাছে পাখি নেই, কোনো সাড়া নেই। শুধু ভিজে পাতায় হীরালালের পায়ে চলার খসখসানি শব্দ শুনে নির্জন বনটা চমকে উঠছে।

হঠাৎ শিউরে উঠল হীরালাল। ওখানে গাছের ঝোপটা নড়ে যেন! মস্ত এই গাছটার আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়ল। লুকিয়ে লুকিয়ে উঁকি মারল। সত্যিই তো! নড়ছে, কী ওটা!

দেখে ফেলেছে হীরালাল। স্পষ্ট দেখল, একটা হরিণ। উরিববাস! শিং দুটো দেখ, যেন মাথা ফুঁড়ে ডাল গজিয়েছে! হলদে গায়ে ছাপ-বাহারি! মুখ উঁচিয়ে কেমন কচি-কচি পাতা খাচ্ছে! খেতে-খেতে কানও নড়ছে পিড়িং-পিড়িং। ল্যাজও নাচছে, তুড়ুক-তুড়ুক। এই যাঃ। কী হল দেখ!

হরিণটা তো খাচ্ছে, নিশ্চিন্তে আপন মনেই খাচ্ছিল। হীরালাল করেছে কী, হরিণটাকে আরও একটু ভালো করে দেখবে বলে যেই আর একটু উঁকি মেরেছে, ব্যস! হরিণটা দেখে ফেলেছে! চট করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে! হীরালালের চোখের ওপর চোখ রেখে নট-নড়ন নট-কিচ্ছু! হীরালাল তো তাই দেখে ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেছে! কী করবে এখন? তাড়াতাড়ি ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল! আর বলব কী, ঠিক তক্ষুনি, একেবারে বসার সঙ্গে-সঙ্গে, আবার সেই ডাক, 'হীরালাল।'

হীরালালের বুকের ভেতর যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সেই ডাকের সুরে-সুরে নিস্তব্ধ গহন বন দুলে উঠল। ডাক শুনে ঝোপের আড়াল থেকে ঝটপট বেরিয়ে পড়েছে হীরালাল। তাই দেখে

হরিণটাও দিয়েছে ছুট! কী জানি কী মনে হল, হীরালালও ছোটা দিল। ছুটল সে হরিণটার পেছনে-পেছনে। ভাবল নাকি, হরিণটাই তাকে ডেকেছে!

ঝোপ আর জঙ্গল, খানা আর খন্দ লাফিয়ে-লাফিয়ে তিরের মতো পালায় হরিণটা। আর হীরালাল গাছ ডিঙিয়ে, ঝাড় পেরিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করল। আরি ব্যস। কী ছুট! কিন্তু যতই ছোটো, হরিণের সঙ্গে হীরালাল পারবে কেন! একী! ছুটতে-ছুটতে যে হীরালাল বনের আরও গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে! যাক, তবু সে ছুটবে। সে হরিণটাকে ধরবে।

যাঃ! দেখ, ছুটতে-ছুটতে হীরালালের পা পিছলে গেল! ধপাস! পড়েছে হীরালাল। লেগেছে খুব? না, একটুও লাগেনি, বুঝতে-না-বুঝতেই ও বাবা, এ যে সারা বন যেন একসঙ্গে হেসে উঠল! হা-হা, হি-হি, হো-হো!

হাসি শুনে আঁতকে উঠেছে হীরালাল। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে। চোখে-মুখের কাদা সরিয়ে সামনে চাইতেই হীরালালের চক্ষু ছানাবড়া! ও মা! এ তো একটা হরিণ নয়! অসংখ্য হরিণ গাছের ফাঁকে, ঝোপের ধারে শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হীরালাল পিছনে ফিরল, সেখানে হরিণ। সামনে তাকাল, সেদিকে হরিণ। আশে-পাশে যেদিকে চাও, হরিণ আর হরিণ! এখন কী করবে হীরালাল? ওই দেখ, হরিণগুলো এগিয়ে আসছে! গুঁতিয়ে দেবে নাকি হীরালালকে! আর বলতে! পালাও হীরালাল! কিন্তু কোনদিকে পালাবে! কোথায় পথ? ওই তো এসে পড়ল হরিণের দল!

বলতে-বলতেই হীরালাল মেরেছে লাফ! লাফিয়েই ওই ঝাঁকড়া গাছটার একটা ডাল ধরে ফেলেছে। গাছের ওপর তরতর করে উঠে পড়েছে! উঃ! খুব রক্ষে। হরিণগুলো শিং উঁচিয়ে লাগিয়ে দিল লাফালাফি। লাফালে কী হবে! ধরতে হচ্ছে না। হীরালাল এ-যাত্রায় বাঁচল হয়তো!

কিন্তু শোনো, ওই তো সেই মেয়েটি আবার ডাকল, 'হীরালাল'।

হীরালাল থমকে গেল।

সে চিৎকার করে উঠল, 'হীরালাল, তোমার মাথার কাছে সাপ!'

হীরালাল চকিতে ওপরে তাকিয়েছে। সত্যি তো একটা ময়াল! হীরালাল প্রাণের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সাপ।' গাছের ওপর থেকে চক্ষের নিমেষে মারল লাফ। তারপর দে ছুট।

সাপটাও তো ছাড়বার পাত্তর নয়! সড়াত করে গাছ থেকে গড়িয়ে পড়ে লাগাল তাড়া! উরি বাবা! কী বিরাট সাপটা! আর বলতে, তাই না দেখে কোন ফাঁকে যে কোথা দিয়ে হরিণগুলো সটকে পড়ল, কেউ দেখতেই পেল না!

সাপের ভয়ে হীরালাল তো ছুটছে, কিন্তু বনের ঘোঁতঘাঁত তো সে জানে না! সাফ-সাফ সিধে রাস্তা হলে এককথা, হীরালাল পাঁই-পাঁই ছুটে পালাত। কিন্তু এখানে? ছুটতে গেলেই গাছের ধাক্কা। নয়তো কাঁটা-ঝোপে আটকা। কিন্তু আটকা পড়ুক, কি ধাক্কা লাগুক, ওকে ছুটতেই হবে।

তারপর হাঁপিয়ে পড়েছে!

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তারপর পা কেটে রক্ত পড়ছে!

তারপর সাপটা এগিয়ে এসেছে!

এবার ঠিক ধরবে! এই মারল ছোবল!

না, পারল না! কী সববনাশ! ওই দেখ সামনে একটা চিতা বাঘ! সাপটা দেখতে না পেলেও হীরালাল দেখে ফেলেছে! ওই তো, ওই ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে তাক কষছে! যাঃ! এবার হীরালালের নির্ঘাত মরণ! এখন কাকে সামলাবে? বনের দুই যম—চিতাকে না সাপকে?

'হীরালাল, শিগগির গাছে উঠে পড়!' এ কী! আবার যে সে হাঁকল!

একটু যে থতমত খায়নি হীরালাল, তা নয়! তবু নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে ঝটপট সামনের গাছটাতেই উঠে পড়ল! আর সঙ্গে-সঙ্গে 'হালুম' করে ডাক ছেড়ে চিতাটা দিয়েছে এক লাফ! দেরি করে ফেলল! ততক্ষণে শিকার তার গাছের ডালে হীরালালকে ধরতে গিয়ে পড়বি-তো পড় সাপের ঘাড়ে। তারপর যা লেগে যা নারদ-নারদ! বাঘে-সাপে মারামারি। কামড়া-কামড়ি, খামচা-খামচি। বাঘের যত তর্জন-গর্জন, সাপের তত ফোঁসফোঁসানি! ও ওকে আছাড় মারে, তো ও একে কামড়ে ধরে! বনের নির্জনে সে কী তুলকালাম কাণ্ড! কাণ্ড দেখে, শেয়াল হাঁকে, ফেউ ডাকে! ভালুক পালায়, বাঁদর চেঁচায়! আর ভয়ে জুজু হীরালাল, গাছের ডালে বসে-বসে তাই দেখে শিউরে ওঠে।

অনেক পরে সব শেষ। বাঘটার ভয়ংকর হুংকার সাপটার প্রচণ্ড ফোঁসফোঁসানি থেমে নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারিদিক। দুটোই লড়তে-লড়তে মরে গেল।

হীরালাল কিন্তু তক্ষুনি-তক্ষুনি গাছ থেকে নামল না। যদিও বাঘটা লটকে পড়েছে, সাপটাও নড়ছে না, তবু কে বলবে তারা সত্যি-সত্যি মরেছে কি না! তাই আরও অনেকক্ষণ গাছেই বসে রইল হীরালাল।

কই, না তো! অনেকক্ষণ পরেও তো বাঘের নিশ্বাস পড়ছে না। সাপটাও ধোঁকাচ্ছে না! এখন কি তবে নামা যায় গাছ থেকে!

হ্যাঁ, হীরালালের এতক্ষণে সাহস হল। খুব সাবধানে নামল সে! তারপর অবাক চোখে চেয়ে দেখল! চোখ তার ঠিকরে পড়ছে! এমন করে, এত কাছ থেকে বাঘের চেহারা হীরালাল আর কোনোদিন দেখেনি! কী সাংঘাতিক পায়ের থাবা কী ভীষণ খোঁচা-খোঁচা নখ!

হঠাৎ বুকটা ধক করে উঠল হীরালালের! আবার কীসের শব্দ যেন! পাতার ওপর খসখসানি! চটপট লুকিয়ে পড়ল হীরালাল! উঁকি মারল। হ্যাঁ, শব্দটা দূর থেকে এদিকেই এগিয়ে আসছে! সঙ্গে-সঙ্গে এই গাছ থেকে আর এক গাছে এগিয়ে গেল হীরালাল। এবার তার স্পষ্ট নজরে পড়ল, তিনজন সৈনিক! এ কী! এরা এ সময়ে বনের ভেতরে কেন? তাদের হাতে বন্দুক, পিঠে ব্যাগ। হাঁটছে, ক্লান্ত। চলতে-চলতে সতর্ক দৃষ্টি তাদের এদিক-ওদিক ঘুরছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তারা। মরা বাঘটার দিকে নজর পড়ল! অস্ফুট স্বরে একজন বলে উঠল, 'বাঘ!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর একজন আঁতকে উঠল, 'সাপ!'

আর একজনের চোখ দুটো ঠিকরে পড়ল। ভয়ে-ভয়ে বলে উঠল, 'সববনাশ!'

তিনজনে বন্দুক উঁচিয়ে তফাতে দাঁড়াল। দেখছে তারা বেবাক হয়ে। চোখের পাতা পড়ছে না। এখন বুঝতে পেরেছে ওরা, বাঘটা মরেছে, সাপটাও জ্যান্ত নেই। আলতো পায়ে এগিয়ে এল তারা। বন্দুক দিয়ে খোঁচা মারল বাঘের পিঠে, সাপের পেটে। তারপর নিজেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চাপা-গলায় হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে একজন বলে উঠল, 'এক বিপদ থেকে আর এক বিপদ। যাও বা ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এলুম, এখন আবার বাঘ! বনের ভেতর জ্যান্ত বাঘের খপ্পরে না পড়তে হয়!'

আর একজন উত্তর দিল, 'ঠিকই বলেছিস। আমাদের তিনজনের তিনটে বন্দুক। কিন্তু গুলি মাত্র একটা। সামনে বিপদ এলে সামাল দেব কেমন করে?'

আর একজন বলল, 'সুতরাং আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন ডিঙিয়ে পালাতে হবে।'

বলেই সৈনিক তিনজন হাঁটা দিল।

হীরালালের কী মনে হল, ওদের পিছু নিল।

সৈনিক তিনজনের পায়ে শক্ত জুতো। শব্দ যাতে না ওঠে, তাই সামলে-সামলে পা ফেলছে। আর খালি পায়ে তার চেয়ে আরও সাবধানে হীরালাল হাঁটছে এ-গাছ থেকে ও-গাছের আড়ালে। এ ঝোপ থেকে ও ঝোপের অন্ধকারে। অবাক কথা, এখন হীরালালের বাঘের ভয় নেই। না সাপের ভয়। এখন তার মনেও পড়ছে না সেই মেয়েটির কথা! মনে পড়ছে না সেই মিষ্টি ডাক, 'হীরালাল'। তার চোখের দৃষ্টি এখন ওই সৈনিক তিনজনের ওপর। কোথায় যাচ্ছে ওরা? কোথায় পালাচ্ছে?

না, একথা তো হীরালালের জানার কথা নয় যে, ওই তিনজন সৈনিক যুদ্ধের ভয়ে দল ছেড়ে পালাচ্ছে। মরতে ওরা ভয় পায়। ওরা জানে, সৈনিক হয়েও চোরের মতো পালালে তার কী শাস্তি! ধরা পড়লে, রাইফেলের গুলিতে বুকগুলো ঝাঁঝরা হয়ে যাবে!

থামল তারা হঠাৎ। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কী কথা বলাবলি করল, শুনতে পেল না হীরালাল। কিন্তু দেখতে পেল, তিনজনের চোখ একই সঙ্গে ঘুরছে যেন। ঘুরতে-ঘুরতে এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল তাদের চোখ। যেদিকে চাইল তারা, হীরালালও তাকাল সেদিকে। একটা পোড়ো বাড়ি না সামনে? হ্যাঁ তো! কই এতক্ষণ হীরালাল তো বাড়িটা দেখতে পায়নি! দেখবে কেমন করে! জঙ্গলের আড়ালে এমন ঢাকা পড়ে আছে, নজরই যায় না। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সৈনিক তিনজন সেইদিকে। বাড়িটার সামনে একটু দাঁড়াল। উঁকি মারল। না, হয়তো কেউ নেই। একটু দোনোমনো করল হয়তো! কিন্তু সে তো আর হীরালালের নজর গেল না। তারপর তিনজনেই ভাঙা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

https://boierhut.com/fb

হীরালালও হামাগুড়ি দিল। কী আছে বাড়িটার ভেতরে! তাই তো! লোক তিনটে বাড়ির ভেতরে ঢোকে কেন? দেখতে হবে তো! তাই হীরালালও চুপিসারে এগিয়ে গেল সেইদিকে।

সত্যি, পোড়ো-বাড়ির ভেতরটা এত ঘুপচি, চারিদিকে এত ঝোপ-জঙ্গল আর ঝাঁক-ঝাঁক পাতায় ছেয়ে রয়েছে যে, শত চেষ্টা করেও হীরালাল ভেতরে কী হচ্ছে, না হচ্ছে টের পেল না। হীরালালকে আরও কাছে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আরও কাছে যাওয়া মানেই তো বিপদ! তবে বনের ভেতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকলে কাউকে আর দেখতে হচ্ছে না! লুকিয়ে-লুকিয়ে তুমি যা ইচ্ছে যত পার দেখ, ঘুণাক্ষরে কেউ জানতেও পারছে না।

তাই হীরালাল লুকিয়ে-ছাপিয়ে আরও কাছে এগিয়ে চলল। নিমেষের মধ্যে সে বাড়িটার পিছন দিকে চলেও এসেছে। এদিকে দেওয়ালের গায়ে ঢাপ্পুস গর্ত। হয়তো এককালে জানলা ছিল। এখন তার চিহ্নটি পর্যন্ত নেই। হ্যাঁ, ওই গর্তে মাথা গলিয়ে হীরালালকে দেখতে হবে।

কিন্তু কাজটা তো সহজ নয়। তবু হীরালাল থাকতে পারল না। গর্তের ভেতরে সে উঁকি মারল। মেরেই চক্ষুস্থির! আরে! আরে! তারা যে সৈনিকের পোশাক খুলে ফেলেছে! পিঠে-ঝোলানো ব্যাগ থেকে অন্য কাপড় বার করে পরে ফেলেছে! মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে! পায়ে চটি চড়িয়েছে। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, তারা নকল দাড়ি-গোঁফ এঁটে এখন একেবারে অন্য মানুষ। হীরালাল এবার স্পষ্ট দেখতে পেল, এক কোণে বন্দুকের নল দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল তারা। তারপর খুলে-ফেলা পোশাকগুলো আর বন্দুক তিনটে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিল। তারপর নিজেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে-করতে একজন জিজ্ঞেস করল, 'চেনা যাচ্ছে?'

আরও একটু ভালো করে দেখে অন্য দুজন ঘাড় নাড়ল, 'না।' 'তবে চ, এবার বেরিয়ে পড়ি।'

'চ।'

তিনজনে পোড়ো-বাড়ির দরজা ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। দেখতে-দেখতে হীরালাল তো থ। কেন-না, এমন করে কাউকে কোনোদিন সে দাড়ি-গোঁফ পরে অন্য মানুষ সাজতে দেখেনি। তবে কি লোকগুলি সৈনিক নয়, অন্য কিছু! ভেবেই পায় না হীরালাল।

কিন্তু এত যে কাণ্ড হচ্ছে, পায়ে-পায়ে এমন যে বিপদ ঘুরছে অথচ হীরালালের ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল ওই বন্দুক তিনটে নেড়েচেড়ে দেখতে। এমন নয় যে সে বন্দুক কোনোদিন দেখেনি। তবে হাত দিয়ে তো ছোঁয়নি কোনোদিন! তাই ভারি লোভ হচ্ছিল তার! আর তাই আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হীরালাল গা ঢাকা দিয়ে পোড়ো-বাড়ির পিছনে। তারপর যখন, লোক তিনটের সাড়া-শব্দ আর শোনা গেল না, তখন নিঃসাড়ে বেরিয়ে এল হীরালাল ঝোপের ভেতর থেকে। খুব সাবধানে এগিয়ে এল পিছন থেকে সামনে। পোড়ো-বাড়ির অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়াল সে। গা-টা কী রকম ছমছমিয়ে উঠল। কী ভয়ংকর কালো ঘুরঘুট্টি ভেতরটা। এর ভেতরে মানুষ যাবে কেমন করে!

তা হোক। ও তো আর অনেক ভেতরে যাচ্ছে না। ওই তো, ওই সামনেই, ওই কোণে বন্দুক তিনটে পোঁতা আছে। হাত বাড়ালেই তো পাওয়া যায়! ধাঁ করে ছুটে গেল হীরালাল সেই অন্ধকারের দিকে। তারপর পোড়ো-বাড়ির গহ্বরে সে হারিয়ে গেল।

'আঃ—!' চিৎকার করে উঠল হীরালাল আচমকা! হাত বাড়াল। হাত বাড়িয়ে ছুটতে গেল। কিন্তু ওই দেখ, কালো-জমাট অন্ধকারটা নিমেষের মধ্যে ওকে জড়িয়ে ধরল। অন্ধকার, অন্ধকার। চারিদিক অন্ধকার। যেদিকেই তাকায় হীরালাল, সেদিক থেকেই কে যেন মুঠো-মুঠো অন্ধকার ওর চোখে ছুড়ে-ছুড়ে ওকে অন্ধ করে দিচ্ছে। হীরালাল কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সামনে হাঁটে, হোঁচট খায়। হাত বাড়িয়ে থমকে যায়। অন্ধকার দানবটা যেন তার কেলেকিষ্টি মুখখানা ভয়ংকর হাঁ করে হীরালালকে কামড়ে ধরেছে। হীরালালের দম আটকে আসছে। এখানে এখন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। এখানে কি হীরালালের সব শেষ হয়ে যাবে?



হীরালাল বলল, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি না। চারিদিক অন্ধকার।’

চমকে উঠল হীরালাল। হঠাৎ তার কানে ভেসে এল ভাঙা বাড়ির দূর অন্দর থেকে সেই ডাক, 'হী-রা-লা-ল!'

এবার হীরালাল আর থাকতে পারল না। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় তুমি?'

সে বলল, 'এইদিকে।'

হীরালাল বলল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি না। চারদিকে অন্ধকার।'

সে বলল, 'এগিয়ে এস।'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হীরালাল বুঝতে পারে না কোনদিকে এগিয়ে যাবে সে। ভারি রাগ ধরছে তার। কেন এমন করে লুকিয়ে-লুকিয়ে বার-বার ডাকছে সে! না, তাকে হীরালাল খুঁজে বার করবেই। তাকে জিজ্ঞেস করবে, এই লুকোচুরি খেলার মানে কী! তাই অন্ধকারেই থমকে-থমকে পা ফেলল সে, আর কানামাছির মতো হাত ছড়িয়ে এগিয়ে চলল।

কিন্তু এ কী! আর কতদূরে যাবে হীরালাল! যতই এগোয় এ যে শেষ নেই। কত বড়ো বাড়িটা! এ কি বাড়ি না প্রাসাদ! হয়তো তাই।

হুস-স-স। হীরালালের গায়ের ওপর দিয়ে যেন ঝটকা মেরে এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল! থমকে যায় হীরালাল। এই অন্ধকার বন্ধ ঘরে হাওয়া কোত্থেকে আসে! হীরালাল চকিতে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু তারপরেই তার যেন মনে হল, হাওয়ার মতো উড়তে-উড়তে আবছা কালো ছায়ারা তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। হীরালাল ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

তবে কি এই ছায়ারাই তাকে ডাকছিল! এ-কথা মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হীরালালের চোখের পাতা দুটি আপনা থেকেই খুলে গেল। চোখ খুলেই হীরালাল ভয়ে আঁতকে ওঠে! এ কী! এ যে চারিদিক থেকে অন্ধকারের ঢেউ যেন পাক খেতে-খেতে তার দিকে তেড়ে আসছে! এখন কী করবে হীরালাল! ভয়ে পালাতে গেল হীরালাল। ছুট দিল সে! কিন্তু কোথায় ছুটল, কোনদিকে পালাবে কিছুই ঠাওর করতে পারল না যে! অন্ধকার, অন্ধকার! চারিদিকে শুধু অন্ধকারের ঢেউ গড়িয়ে-গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। ছড়িয়ে-ছড়িয়ে কুণ্ডলি পাকাচ্ছে। তারপরে, ওই তো হীরালালের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! কী ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল হীরালাল! তার সেই চিৎকার পোড়ো-বাড়ির দেওয়ালে-ছাতে, ঘরে-উঠোনে প্রতিধ্বনিত হয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু কেউ তার সেই চিৎকারে সাড়া দিল না। কেউ তাকে বাঁচাতে এল না। তখন হীরালাল একাই লড়াই শুরু করে দিল সেই অন্ধকারের সঙ্গে।

কিন্তু কতক্ষণ পারবে হীরালাল একা-একা! ও তো ছোট্ট! অন্ধকারের সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হীরালাল। ওর মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছিল। নিস্তেজ হয়ে চোখের পাতা দুটি যেন বুজে আসছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে হীরালালের। হ্যাঁ, ওই তো! অন্ধকার পোড়ো-বাড়ির টুটা-ফাটা মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল হীরালাল। তারপর আর কিছু জানে না হীরালাল।

৩

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ চমকে চোখ মেলেছিল হীরালাল। আশ্চর্য! তখন এতটুকু অন্ধকার ছিল না। রাশি-রাশি সোনালি রঙিন আলো ওর চোখের তারা দুটির ওপর উছলে পড়েছে। ঝলসে গেল

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হীরালালের চোখ দুটি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কই, সেই পোড়োবাড়ি কোথায় গেল? সে তো দেখতে পাচ্ছে না। এ যে এক সুন্দর রঙে-রঙে রং-ছবি আলোর দেশ। চেয়ে দেখ, চারিদিকে যেন সোনার ঝকমকি গলে-গলে গড়িয়ে পড়ছে। আলোদের টুপটাপ রোশনাই। বাজনার টুং টাং ছন্দ। আঃ। কী মিষ্টি লাগছে হীরালালের। ও কী! আলোর স্রোতে ও কাদের গান শোনা যায়? দেখ, দেখ, কত ফুল! না, না, ফুল না। ফুলের পাপড়ি সাজিয়ে তবে ওরা কারা? আহা! ছোট্ট-ছোট্ট কত মেয়ে। পাখির পিঠে বসে আছে। পাখিরা উড়ছে আর ওরা কেমন গান গাইতে-গাইতে আলোর স্রোতে ভাসছে! সেই আলো দেখতে-দেখতে, সেই গান শুনতে-শুনতে অবাক হয়ে গেল হীরালাল। ভাবল, এমন গান তো সে কোনোদিন শোনেনি। এমন ফুল-পাপড়ি মেয়ের দলকে তো সে কোনোদিন পাখির পিঠে উড়তে দেখেনি!

দেখতে-দেখতে চোখ জুড়িয়ে গেল হীরালালের। তার মনের ভাবনাগুলি মন থেকে কোথায় যেন সরে গেল ধীরে-ধীরে। ভুলে গেল হীরালাল। সব ভুলে গেল। ওই আলোর দোলনায় দোল খেতে-খেতে নিজেকে হারিয়ে ফেলল হীরালাল।

'হীরালাল, কেমন লাগছে?'

বুকের ভেতরটা চমকে উঠল হীরালালের। এ কী! এখানেও সেই মেয়েটি! সে আবার ডাকছে! কিন্তু কই সে?

হীরালালকে কথা বলতে না দেখে, সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বলছ না, কেমন লাগছে?'

হীরালাল উত্তর দিল না।

সে আদর করে বলল, 'তোমার ভালো লাগলে, আমারও ভালো লাগবে, হীরালাল।'

এবার হীরালাল থাকতে পারল না। এবার হীরালালও কথা কইল। জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি? আমার সঙ্গে তখন থেকে তুমি লুকোচুরি খেলছ?'

সে বলল, 'ভালো লাগছে না?'

'না, একটুও না। তুমি আমায় দেখা দিচ্ছ না কেন?'

'এই তো, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে!'

'কই?'

'এই তো।'

হীরালাল চরকি খেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কই? কই? কই?'

হঠাৎ সে খিলখিল করে হেসে উঠল। কী জানি, কী ছিল হাসিতে, কী জাদু, সঙ্গে-সঙ্গে সেই গান থেমে গেল! সেই পাখি উড়ে গেল। সেই আলো নিবে গেল।

হীরালাল আবার হারিয়ে গেল অন্ধকারে। অন্ধকারে দু-হাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আলো জ্বালাও।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। হীরালালের চিৎকারের শব্দটা অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে-খেতে নিথর হয়ে হারিয়ে গেল। হীরালাল এবার ছুটতে গেল অন্ধকারে। ঠোক্কর খেল। অন্ধকারে এলোমেলো পা ফেলতে-ফেলতে হাঁপিয়ে গেল!

এমন সময়ে,

গুড়ুম-ম-ম!

হঠাৎ বন্দুক ছুড়ল কে?

আবার,

গুড়ুম-ম-ম!

লাগেনি। হীরালাল বসে পড়েছে। কিন্তু ব্যাপার কী! সেই তিনজন সৈনিক তাকে দেখতে পেয়েছে নাকি! এই রে! এখন তো তবে হীরালালের আর নিস্তার নেই!

গুড়ুম-ম-ম!

এবার হীরালাল স্পষ্ট দেখতে পেল, বন্দুকের নল থেকে আলোর ফুলকি ছুটতে-ছুটতে দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা মেরে হারিয়ে যাচ্ছে।

তারপরেই গট-মট-খট-খট। একসঙ্গে পায়ে চলার শব্দ।

ওই তারা আসছে। এদিকেই আসছে।

অন্ধকারের গভীরে, আরও গভীরে গা ঢাকা দিল হীরালাল। কিন্তু পারল না। ওদের হাতে আলো। হঠাৎ ঝলসে উঠে অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ল সেই আলোর রোশনাই। ছড়িয়ে পড়ল একেবারে হীরালালের মুখের ওপর। হীরালাল থতমত খেয়ে গেছে। দেখতে পেয়েছে তারা হীরালালকে। একজন চিৎকার করে উঠল, 'উধার কৌন হ্যায়?'

উত্তর না দিয়ে, আগু-পিছু কিচ্ছু না ভেবে হীরালাল আচমকা পিছনদিকে ছুটতে শুরু করে দিল। পাঁই-পাঁই করে ছুটছে সে সেই পোড়ো-বাড়িটার অন্দরে!

তারা আবার হাঁক পাড়ল, 'রোখ যা।'

হীরালাল থামল না।

তখন তারাও ছুটল হীরালালের পিছনে। অন্ধকারে আলো ফেলে, বন্দুক উঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'না দাঁড়ালে গুলি মেরে দেব।'

সে-কথা শুনল না হীরালাল। সে ছুটছে। ছুটছে কিন্তু পালাবার পথ পাচ্ছে না। যতই অন্দরে সে ঢুকে পড়ছে, ততই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। শেষে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না পাশটা, পিছনটা, সামনেটা। এই রে! গর্তে পা পড়ে গেছে হীরালালের। হীরালাল হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়েছে। উঃ ভয়ানক লেগেছে। লাগুক। তবু তাকে উঠতেই হবে। কিন্তু না, পারল না। ওই তারা

https://boierhut.com/fb

ছুটে এসেছে দুড়দাড়িয়ে। হীরালালকে ওরা পাকড়াও করে ফেলল। হীরালাল ভয়ে কুঁচকে গেল। হীরালাল এখন স্পষ্ট দেখতে পেল, এ-লোকগুলো সেই লোক নয়। এরা আর একদল সৈনিক।

এখনও হাঁপাচ্ছে হীরালাল। এই সৈনিকদের একজন হীরালালের ঘাড় ধরে টেনে তুলল। কর্কশ-গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'এই ছেলে, এখানে কী করছিস?'

হীরালাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আবার কড়কে উঠল, 'কথা বলছিস না কেন?'

তবু হীরালাল চুপ করে রইল।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'এদিকে তিনজন সৈনিককে আসতে দেখেছিস?'

হীরালাল মুখ খোলে না।

'কথা বলবি না? এই গুলি চালা!' একজন হুকুম করল।

আঁতকে উঠল হীরালাল। ওর বুকের ওপর বন্দুকের নল! হীরালাল কথা বলল। বলল, 'অন্ধকারে হারিয়ে গেছি।'

'কে তুই?'

'হীরালাল।'

'এই পোড়ো-বাড়ির অন্ধকারে কী করছিস?'

'বললুম তো হারিয়ে গেছি।'

'এখানে আমাদের মতো তিনজন সৈনিককে আসতে দেখেছিস?' হীরালাল আবার চুপ করে গেল।

'তারা যুদ্ধের ভয়ে আমাদের দল ছেড়ে পালাচ্ছে।'

হীরালাল এবারও চুপ।

'তাদের সন্ধান বলতে পারলে তোকে মেডেল দেব,' একজন লোভ দেখাল হীরালালকে।

তবুও হীরালাল কথা বলল না।

তখন একজন ভীষণ চেঁচিয়ে ধমক মারল, 'দেখেছিস কি না বল?'

হীরালাল কিছুই বলল না।

বলল না বলে তো আর সৈনিক শুনবে না। তারা হীরালালকে ছাড়বে কেন? তারা হীরালালকে হ্যাঁচকা মেরে টান দিল। হীরালাল টলতে-টলতে চলতে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।'

হীরালালের কথা তারা শুনল না। তারা ছাড়ল না হীরালালকে। ওরা সৈনিক। ওদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অত সহজ না তো!

সৈনিক-সর্দার হুকুম করল, 'ছেলেটাকে অন্ধকারের বন্ধ-ঘরে আটকে রাখ। না বললে ছাড়ান নেই।'

অন্ধকারে বন্ধ-ঘর কোথায়, তারা খুঁজে পেল না।

তখন সৈনিক-সর্দার বলল, 'তবে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে রেখে দে!'

হীরালালের হাত-পা বাঁধা হল। কিন্তু তবুও হীরালালের মুখ দিয়ে একটিও কথা সরল না। হাত-পা বেঁধে, হীরালালকে অন্ধকারে ফেলে রেখে, তারা যেমন করে এসেছিল তেমনি করে চলে গেল। কিন্তু কোথায় যে চলে গেল হীরালাল দেখতে পেল না।

এবার হীরালাল কী করবে? এখন সত্যিই সে এক ভয়ংকর বিপদের মধ্যে পড়েছে। এখন, এই অন্ধকারে তাকে বাঘ-ভালুকের পেটে না যেতে হয়! বলা যায় না, বাঘ-ভালুক বাসা বাঁধতেও পারে ওইখানে! কি সাপ-খোপ!

অন্ধকারে ভয়ংকর ভয়টা যখন তার বুকের ওপর চেপে বসেছে, তখন হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। উঠে দাঁড়ালও সে। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে! পা টানছে সে। হাঁটবে। বাঁধা পায়ে ঘসটানি লাগছে। ঘসতে-ঘসতে হাঁটল। কিন্তু কোনদিকে যাচ্ছে হীরালাল? জানে না। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে চারিদিক থেকে যেন জমাট অন্ধকারটা নিশ্বাস ফেলছে। সত্যিই তাই! ওই শুনতে পাচ্ছ না, নিশ্বাস ফেলে কে যেন হাঁসফাঁস করছে।

থমকে গেল হীরালাল। কে ও! ও কার চোখ! অন্ধকারে দপদপ করে জ্বলছে। এগিয়ে আসছে সে ধীরে-ধীরে হীরালালের দিকে।

হীরালাল ভয়ে কাঠের মতো স্থির হয়ে গেল। অমনি তার শ্যাওলা-পড়া দাঁতগুলো অন্ধকারে ছরকুট্টে ভেংচি কেটে উঠল। হীরালাল ভয়ে ককিয়ে উঠল, 'বাঁচাও।'

হীরালালের সুরে সুর মিলিয়ে কেমন যেন একটা হাসি, কিংবা একটা আর্তনাদ, অথবা একটা কান্না সেই অন্ধকারে কান-ফাটানো শব্দে ঘুরপাক খেতে লাগল। হীরালাল ভয়ে ছুটে পালাতে গেল। ভুলে গেল তার হাত-পা বাঁধা। ছিটকে পড়ল একেবারে মাটির ওপর। তড়িঘড়ি উঠতে যাবে কী, দেখে তার মুখের সামনে সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো প্যাট-প্যাট করে চেয়ে আছে। দুটো হাত মুঠো পাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। কে ও! ওই হাত দুটো খামচে ধরল হীরালালকে। হীরালাল চেঁচাতে গেল, পারল না। ওর গলার স্বর যেন কে কেড়ে নিল! কাঁপতে লাগল হীরালাল ঠক-ঠক করে। ভয়ে নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল!

https://boierhut.com/fb

অনেকক্ষণ পর, ঠিক কতক্ষণ পর হীরালাল ঠিক মনে করতে পারছে না, হীরালালের কানে-কানে সেই মিষ্টি সুরে সে যেন আবার ডাক দিয়েছিল, 'হীরালাল, ও হীরালাল, উঠে পড়।'

চমকে উঠেছিল হীরালাল। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি হীরালাল। চোখ দুটি চাইতেই অবাক হয়ে গেল সে! এ কী! এ কোথায় এসেছে হীরালাল! কে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে! এ তো সেই বন নয়। এখানে কোথায় সেই বনের পোড়ো-বাড়ি। অন্ধকার পেরিয়ে ও আলোয় এসেছে কেমন করে! এখানে তো মেলা বসেছে। কত লোকজন! কত দোকান-পসার! দাঁড়াল হীরালাল। আবার ভিড়ের মধ্যে পা চালাল। বেবাক হয়ে এদিক-ওদিক চোখ ফেরাল। না, এ মেলা তো সে কোনোদিন দেখেনি! এ মেলাতে সে তো কোনোদিন আসেনি! কে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে! আজব কাণ্ড! সে কি স্বপ্ন দেখছে!

না, স্বপ্ন না। যা দেখছে সব সত্যি! এই মেলা। মেলায় মিষ্টি-খাবার, মুড়কি-মুড়ি, আলুর বড়া, জিবে গজা, রঙিন জামা, জুতো-মোজা, খেলনা-পুতুল, চেঁচামেচি, হই-হল্লা সব সত্যি! ভিড়ের মাঝ দিয়ে হাঁটে হীরালাল। ভিড়ের ফাঁকে-ফাঁকে হাঁটে। কেউ ঠেলা মারে, কেউ পা মাড়ায়। কেউ চেয়ে দেখে, কেউ চোখ টেরায়। হীরালাল দেখছে আর ভাবছে, তাই তো। এই ছিল বন, হয়ে গেল মেলা! কোথায় গেল সেই পোড়ো-বাড়ি।

এখন কী করবে হীরালাল! ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কোনদিকে যাবে!

হাঁটতে-হাঁটতে থমকে দাঁড়াল হীরালাল। কারা যেন ওইদিকে একসঙ্গে হাততালি দিচ্ছে। মেলার ওইদিকে ওটা কীসের ভিড়! এগিয়ে গেল হীরালাল। ভিড়ের মধ্যে উঁকি মারল। আরে! ম্যাজিক হচ্ছে। একটা লোক ম্যাজিক দেখাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। 'লেড়কা-লোক এক দফে তালি লাগাও।'

হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখছে, অনেক ছোটো, অনেক বড়ো, অনেক লোক। তারা যেই হাততালি দিচ্ছে অমনি সঙ্গে-সঙ্গে শূন্য ঝুড়ি থেকে পায়রা বেরুচ্ছে। আবার পায়রা হুস করে উবে যাচ্ছে। ঝুড়ি-চাপা শুকনো মাটিতে গাছ গজাচ্ছে। ছোট্ট গাছে আম ফলছে,সেই আম কেটে-কেটে সবাইকে খেতে দিচ্ছে ম্যাজিকঅলা। সবাই খাচ্ছে আর অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

দেখতে-দেখতে হীরালালও অবাক হয়ে গেল। ভারি মজার কাণ্ড তো!

অনেকক্ষণ খেলা চলল। অনেক খেলার পর অনেক পয়সা। যখন ম্যাজিকঅলার থলি ভরে গেল, তখন খেল খতম। খেল খতম মানেই মজা শেষ। মজা শেষ মানে, ভিড়-ভাট্টা হালকা। লোকজন সব একটি-একটি কাট্টা। তারপর সেই জমজমাট জায়গাটা এক্কেবারে ফাঁকা!

হল কী, সববাই যখন চলে গেল, ম্যাজিকঅলা পুঁটলি বাঁধল। সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে নিল। ঘরে যাবে বলে পা বাড়াল। ঠিক তখুনি হীরালালের দিকে তার নজর পড়ল।

হ্যাঁ, ওই তো হীরালাল একা চুপটি করে বসে আছে, একটু দূরে। এক-মনে দেখছে ম্যাজিকঅলাকে। দেখছে, তার মাথায় টুপি। লম্বা। গায়ে জামা। ইয়া ঢাপ্পুস। জামার এদিকে পকেট,

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওদিকে পকেট। জামার হাতার ভেতর হাতা। লোকটার বুক-ভরতি মেডেল। হীরালালের মনে হল, লোকটার চেয়ে জামাতেই যেন বেশি রহস্য। জামাটাই যেন একটা ম্যাজিক। আহা! ওই ম্যাজিক যদি হীরালালের জানা থাকত!

লোকটার চোখে চোখ পড়তেই হীরালাল থতমত খেয়ে গেছে। কেননা, সে যে হীরালালের মুখের দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে! সত্যি! তার হাসিতেও কেমন যেন ম্যাজিক-ম্যাজিক গন্ধ! হীরালাল চোখ না ফিরিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। লোকটা এগিয়ে এল। হীরালালের সামনে এসে দাঁড়াল। হীরালাল কথাই বলল না। হঠাৎ লোকটাই কথা বলল, 'আরে খোঁকা, খেলা তো শেষ হয়ে গেল, ঘোরে যাবে না?'

হীরালাল ও কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মন্ত্র পড়ে তুমি ম্যাজিক করো?'

লোকটা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, মনতর ভি আছে. কায়দা ভি আছে।'

'তুমি আমায় ম্যাজিকের মন্ত্র শিখিয়ে দেবে?' জিজ্ঞেস করল হীরালাল।

ম্যাজিকঅলা হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'কেনো? মনতর শিখে তোমহি কী করবে?'

'আমি অদৃশ্য হয়ে যাব। অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র জানো তুমি?'

ম্যাজিকঅলা এতক্ষণ হাসছিল। হীরালালের কথা শুনে হঠাৎ যেন মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে গেল। হীরালালের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'অদৃশ্য কোনো হোবে?'

হীরালাল উত্তর দিল, 'কারণ আছে।'

'কী কারণ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাজিকঅলা। হীরালাল ও কথার উত্তর না দিয়ে, বিরক্ত হয়েই বলল, 'তুমি অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র শিখিয়ে দিতে পারবে কি না তাই বল!'

ম্যাজিকঅলা হীরালালের কথার ওপর আর কোনো কথা বলল না। শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে-সময় ম্যাজিকঅলার চোখ দুটো দেখলে বুঝতে বাকি থাকে না যে, তার মতলবটা কী! হীরালালকে দেখে তার ঠিক মনে হয়েছে, হয় ছেলেটা ঘর থেকে পালিয়েছে, না-হয় পথ হারিয়েছে। ছেলেটা বাচ্চা, একবার যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে দলে নিতে পারে, তবে ভালো করে ফয়দা ওঠাবে।

'আমার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে কী দেখছ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল হীরালাল।

ম্যাজিকঅলা সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'না, বলছি, তোমহার নাম কী আছে?'

'হীরালাল।'

'ঘর?'

'ঘর আছে, মা আছে। এখন নেই।'

'তবে তুমহি এখোন কুথা যাচ্ছ?'

https://boierhut.com/fb

'কে একজন মেয়ে আড়াল থেকে বার-বার আমায় ডাক দিচ্ছে। ডাকতে-ডাকতে আমায় ঘোরাচ্ছে। কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। তাকে খুঁজতে-খুঁজতে আমি এখানে চলে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে, সে বোধহয় অদৃশ্য। সে-ও বোধহয় ম্যাজিক জানে। কিন্তু জানো এত মিষ্টি তার গলার স্বর। আমি তার ডাক শুনলে থাকতে পারি না। আমার মনে হচ্ছে, আমিও অদৃশ্য না হলে বোধহয় তাকে দেখতে পাব না। তাই জিজ্ঞেস করছি, তুমিও অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র জানো কি না!'

ম্যাজিকঅলা হীরালালের কথা শুনে হয়তো অবাক হল। হয়তো বা ভয় পেল। কিন্তু তার মুখ দেখে সে-কথা বোঝার উপায় ছিল না। তবে তার মাথায় যে অন্য একটা মতলব দানা বেঁধেছে, সে তার চোখ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তাই সে চট করে বলল, 'অদৃশ্য কোরার মনতর তো হামি জানে হীরালাল। লেকিন অদৃশ্য হোবার আগে তোমহাকে তো ট্রেনিং লিতে হোবে!'

'সেটা কী?' জিজ্ঞেস করল হীরালাল।

'মানে, অদৃশ্য হোবার কায়দা তো তোমহাকে শিখতে হোবে।'

'সে আর এমন কী কথা!'

ম্যাজিকঅলা এবার মুচকি-মুচকি হাসতে-হাসতে বলল, 'কোথা আছে হীরালাল। সাতদিন তোমহাকে ভি হামার সাথে খেলা দেখাতে হোবে।'

'সাতদিন?' ভাবনা হল হীরালালের। জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি যাব না?'

ম্যাজিকঅলা বলল, 'সেই তো কোথা। বাড়ি ভি যাবে, আউর অদৃশ্য ভি হোবে, দোনো তো এক সাথে হোবে না। আগে শোচো ভাই, ঘর যাবে, না ম্যাজিক শিখবে।'

হীরালাল এখন সত্যিই খুব দোটানার মধ্যে পড়ল। কিন্তু দোটানার মধ্যে পড়লেও, এখন অদৃশ্য হবার ইচ্ছেটাই তাকে বেশি টানছে। কারণ, ও ভাবল অদৃশ্য হলেই বুঝি সে তাকে খুঁজে পাবে। সেই মেয়েটিকে, যে তাকে বার-বার ডাকছে অথচ দেখা দিচ্ছে না। তাই আর দোনোমোনো না করে হীরালাল বলল, 'বেশ, আমি তোমার কথায় রাজি।'

হীরালালের কথা শুনে ম্যাজিকঅলার চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে উঠল। তাড়াতাড়ি হীরালালের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'তোবে চোলো।'

'কোথায়?'

'হামার ঘর।'

'কত দূর?'

'যাদা নেহি।'

'চলো তবে।' হীরালাল ম্যাজিকঅলার সঙ্গে হাঁটা দিল।

https://boierhut.com/fb

ঈশ বাবা! ম্যাজিকঅলার ঘরটা একেবারে যা-তা! ছিঃ, ছিঃ! বিচ্ছিরি নোংরা ছিরকুট একটা বিছানা। একপাশে গোটানো। একদিকে হাঁড়ি আর কটা এঁটো বাসন। ম্যাজিকের সাজ-সরঞ্জাম বলতে কিচ্ছু নেই। আর ভেতরটায় একটা গা-ঘিনঘিন বোঁটকা গন্ধ। হীরালাল ঘরে ঢুকেই নাক সিঁটিয়ে বলে উঠল, 'এই তোমার ঘর?'

'হ্যাঁ, হামার ঘর।'

'এখানে সাতদিন আমায় থাকতে হবে?'

'থাকতে হোবে, খেলা ভি শিখতে হোবে।'

হঠাৎ হীরালাল চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এখানে আমি থাকতে পারব না। থুঃ!'

'মানে?'

'মানে, তোমার ঘরটা নোংরা। বিচ্ছিরি গন্ধ। ইঁদুরের গর্ত। এখানে মানুষ থাকতে পারে?' চিৎকার করেই কথাটা বলে হীরালাল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

ম্যাজিকঅলা চক্ষের নিমেষে ছুটে গিয়ে দরজায় খিল তুলে দিল।

'দরজা বন্ধ করছ কেন?' বেশ ব্যস্ত হয়েই হীরালাল জিজ্ঞেস করল।

এবার ম্যাজিকঅলা নিজমূর্তি ধরল। টেরা-চোখে তাকাল হীরালালের দিকে। টেরা-চোখে তাকিয়ে বেঁকা সুরে বলল 'দরোয়াজা হামি খুলবে না।' বলে হো-হো-হো করে হেসে উঠল। সে হাসিতে শয়তানির নিশ্বাস ছড়ানো।

হাসি শুনে বুকের ভেতরটা কেমন যেন চমকে উঠল। তবু সাহসে বুক উঁচিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কেন খুলবে না?'

লোকটা এবার হীরালালের কথার উত্তর না দিয়ে, দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে আগের চেয়েও আরও জোরে হেসে উঠল, হা-হা-হা!

চেঁচিয়ে উঠল হীরালাল, 'দরজা খুলে দাও!' বলে লোকটার জামা ধরে টানাটানি লাগিয়ে দিল।

লোকটা হাসতে-হাসতে হঠাৎ থেমে চোখ পাকিয়ে ধমক মারল, 'এ লেড়কা, হল্লাগুল্লা করো মাত। হল্লা কোরলে জিব ছিঁড়ে লিবো। দরোয়াজা আউর নেহি খুলবে। ঘরকা অন্দর মে তুম বনধ থাকবে।'

এবার সত্যি-সত্যি কান্না পেয়ে গেল হীরালালের। লোকটা যে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ধরে এনেছে, এবার বুঝতে পেরেছে হীরালাল। তক্ষুনি মায়ের কথা মনে পড়ে গেল হীরালালের। এখন কী করে সে মায়ের কাছে যাবে। কান্না পেলেও হীরালাল সামলে নিল। এখন কাঁদলেও এই লোকটার হাত থেকে সে নিস্তার পাবে না। কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। বাঁচতে তাকে নিজেকেই হবে। কিন্তু

কী করে যে বাঁচবে, সে তো জানে না। কারণ ও ছোট্ট। এই ধুমসো লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে ওঠা তো সহজ কথা নয়।

তাই, কী যে করবে হীরালাল ভেবে পাচ্ছিল না। ভাবতে-ভাবতে মনটা যখন তার ভীষণ ছটফট করছিল, তখনই ওই ম্যাজিকঅলা লোকটা একটা কাণ্ড করে বসল। বলা নেই, কওয়া নেই, করল কী, হীরালালের ঘাড়টা খপাত করে খামচে ধরল। হীরালাল তো প্রথমটা ভড়কে যাবেই। তারপর চোখের পাতা পড়তে-না-পড়তেই হীরালাল ভয়ংকর চিৎকার করে সটান লোকটার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছোটোই হোক কী বড়োই হোক আচমকা কেউ যদি কারও ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ধাক্কা মারে, তবে সে যত বড়োই পাট্টা হোক নির্ঘাত চিতপটাং! হলও তাই। ধাক্কা খেয়ে ম্যাজিকঅলা মেরেছে এক ডিগবাজি! ডিগবাজি মেরেই মেঝের ওপর লটকা-লটকি। তাই দেখে হীরালাল ছুট্টে গিয়ে দরজার খিলে মেরেছে ধাক্কা। ধাঁই-ই-ই করে খিল ছিটকে খুলে পড়ল। দরজা খুলেই মার ছুট।

না, পারল না হীরালাল। চৌকাঠ ডিঙিয়ে একটা পা বাইরে ফেলেছে মাত্তর, ব্যস! তার আগেই ম্যাজিকঅলা লোকটা উঠে পড়েছে। কিছু না পেয়ে হীরালালের জামাটাই খপ করে ধরে ফেলেছে। ধরেই মেরেছে এক টান। টাল খেতে-খেতে হীরালাল মারল গিয়ে দেওয়ালে এক ধাক্কা। উঃ! কপালে ভীষণ লেগেছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাজিকঅলার চোখের দিকে তাকিয়েই হীরালাল জুজুবুড়ি! কী সাংঘাতিক দেখতে লাগছে ম্যাজিকঅলাকে! কী বীভৎস তার মুখখানা! চোখ দুটো রাগে টকটক করছে! সারা শরীর তার ঠকঠক করে কাঁপছে। তার ঠোঁটটা বিড়বিড় করে কী যেন আওড়াচ্ছে! হঠাৎ সে তার ডান হাতটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসে ফুঁ মারল। মেরে বিকট একটা চিৎকার করে, হাতের মুঠি খুলে হীরালালের মুখের ওপর ছুড়ে দিল। হীরালালের গায়ের ওপর যেন বাজ পড়ল। হীরালাল 'ও মা' বলে ককিয়ে উঠেই ধপাস করে মাটিতে পড়ে ছটফটাতে লাগল! হাত-পা ছুড়তে লাগল।

ধীরে ধীরে হীরালালের হাত-পা নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। চোখের পাতা দুটিও বুঁজে গেছে।

শুনলে অবাক হবে, অনেকক্ষণ পর হীরালাল যখন উঠে বসল, তখন সে একেবারে অন্য মানুষ! সে দেখছে ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক চারপাশ। এই ঘরটা, ওই ম্যাজিকঅলা লোকটা, সব যেন তার কত চেনা! হীরালালের মুখের দিকে তাকাও, তোমার মনে হবে, হীরালাল আর সে হীরালাল নেই! কে যেন ওকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। ভুলিয়ে দিয়েছে তার মাকে, লক্ষ্মী তার মোষকে। আর মনে পড়ে না তার ছোট্ট তাদের ঘরখানির কথা। কিংবা মাঠের গান, নদীর ঢেউ আর ঢেউয়ের সঙ্গে দুলতে-দুলতে হারিয়ে যাওয়া।

সত্যি-সত্যি হারিয়ে গেল হীরালাল। হবেও-বা, ম্যাজিকঅলার ওই মুঠোর মধ্যে হীরালালকে সব ভোলাবার মন্ত্র ছিল। হয়তো হীরালালকে সম্মোহন করে দিয়েছে লোকটা। তাই হীরালাল সব ভুলেছে!

ম্যাজিকঅলা এতক্ষণ হীরালালের সামনেই ছিল। হীরালাল উঠে বসতেই ম্যাজিকঅলা হাত নেড়ে ইশারা করল। ম্যাজিকঅলার চাউনিটা কেমন শয়তানিতে ভরা দেখ! দেখলেই তোমার বুক দুরু-দুরু করে কেঁপে উঠবে! হঠাৎ লোকটা গলায় এক ভয়ংকর শব্দ করে হীরালালকে জিজ্ঞেস করল, 'এ খোঁকা, বোলো তো তোমার নাম কী আছে?'

কে জানে কেন, হীরালাল কোনো উত্তর দিল না। শুধু বোকার মতো তাকিয়ে রইল।

ম্যাজিকঅলা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম?'

হীরালালের মুখে কথা নেই। থাকবেই বা কেমন করে! হীরালাল নিজেকে যেমন ভুলেছে, নিজের নামটাও তো তেমন ভুলে গেছে।

ম্যাজিকঅলা এবার হীরালালের ওপর চোখ রাখল। কী ভয়ংকর সে চাউনি! তারপর খুব চাপা গলায় বলল, 'তোমহার নাম কাকাতুয়া!'

তবুও হীরালাল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'বোলো, কাকাতুয়া। বোলো!'

এবার হীরালাল ধরা-ধরা গলায় বলল, 'কাকাতুয়া।'

'বহুত আচ্ছা।' লোকটা হীরালালের চিবুকটা ধরে আদর করল। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'আউর হামার নাম? হামার নাম, উস্তাদ। বোলো উস্তাদ।'

হীরালাল তেমনি ধরা-গলায় বলল, 'উস্তাদ।'

'শাবাশ!'

ম্যাজিক দেখাতে-দেখাতে ম্যাজিকঅলা থেকে-থেকে যেমন করে চেঁচিয়ে ওঠে, এবার তেমনি চিৎকার করে লোকটা হীরালালকে নতুন নামে ডাক দিল, 'এ কাকাতুয়া।'

যেমন করে ম্যাজিকঅলা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ঠিক তেমনি চেঁচিয়ে হীরালাল উত্তর দিল, 'উস্তাদ!'

'তোমহি এখন কী দেখাবে।'

'আমি এখন খেলা দেখাব।'

'কোন খেলা দেখাবে?'

'ম্যাজিক খেলা।'

এবার ম্যাজিকঅলা হীরালালের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, 'বহুত খুব।'

https://boierhut.com/fb

তারপর কটা দিন কেটে গেল। ক-দিনে কটা নতুন খেলা শিখে ফেলল হীরালাল। নতুন খেলা শিখতে-শিখতে হীরালালের আর এক নতুন জীবন শুরু হয়ে গেল। এখন সে ম্যাজিকঅলার সাকরেদ। আর আজই প্রথম সাকরেদি করতে গিয়ে হীরালাল আর এক বিপদের হাতছানি দেখতে পেল!

হীরালালকে নিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় খেলা দেখাতে যে ম্যাজিকঅলার দস্তুরমতো ভয় ছিল, সে তো জানা কথা। কেননা, রাস্তা-ঘাটে হীরালালকে কেউ যদি চিনে ফেলে, তা হলে যে কী হবে, সে-কথা কী আর ম্যাজিকঅলাকে বলে দিতে হবে। মারের চোটে বাছাধনের বদন বিগড়ে তো দেবেই, তার ওপর পুলিশ ডাকবে, নাকে দড়ি দিয়ে খাটাবে, লোকে ছ্যা-ছ্যা করবে। ম্যাজিক খেলা লাটে উঠবে। তাই ম্যাজিকঅলা আজ আর তেমন কোনো দূরে, অজানা জায়গায় ম্যাজিক দেখাতে গেল না। কাছেপিঠে একটা ছোট্ট মাঠের ওপর ডুগডুগি বাজিয়ে দিল। বাজিয়ে-বাজিয়ে হাঁকতে লাগল:

'মাদারি কা খেল দেখো,
মাদারি কা খেল।
আজব খোঁকার খেল দেখো,
হরেক মজার খেল।'

রোজ যেমন করে, আজও তেমনি হীরালাল ডুগডুগির তালে-তালে ম্যাজিকের মাল-পত্তর বাঁধাই-করা ঝোলাঝুলি খুলে ফেলল। একদিকে একটা মড়ার মাথা সাজিয়ে রাখল আর একদিকে সাত-সতেরো জিনিস ছড়িয়ে রাখল। দেখতে-দেখতে কত লোক। চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর শুরু হয়ে গেল, খেলার মজা, মজার খেলা! লোকটা ডুগডুগি বাজায়, আর মাঝে-মাঝে হাঁক দেয়, 'কাকাতুয়া!'

হীরালাল সাড়া দেয়, 'উস্তাদ!'

'তুমহার ভুক লেগেছে?'

'হ্যাঁ উস্তাদ!'

'তো কী খাবে?'

'বাদাম খাব।'

'বাদাম?'

'হ্যাঁ, উস্তাদ!

সেই কথা শুনে তখন ম্যাজিকঅলা সামনে যারা খেলা দেখছিল, তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভান করল। বলল, 'দেখেন স্যার, কাকাতুয়া এখোন বাদাম খানে মাংতা। বোলেন তো, আমি এখোন

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাদাম কিধার পাব! আচ্ছা, ঠিক হ্যায়। চেষ্টা তো করতে হোবে,' বলে ম্যাজিকঅলা একটা খালি কৌটো নিয়ে খুলে খুলে সবাইকে দেখাল। চেঁচাল, 'দেখেন বাবুরা, এর ভেতর কুচ্ছ না আছে—দেখিয়ে স্যার, আভি আভি বাদাম এসে যাবে।' বলেই ম্যাজিকঅলা কৌটোর ওপরে ঢাকা দিয়ে কৌটোটা বন্ধ করে দিল। তারপর হাঁক পাড়ল,'লেড়কালোক, একদফে জোরসে তালি লাগাও।'

অমনি চটপট, চটাপট চারদিক থেকে তালি পড়ল। ম্যাজিকঅলা চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী সব মন্তর আওড়ালে, কেউ শুনতে পেল না। তারপর চোখ খুলে, কৌটোটা নেড়ে দিল। চিৎকার করে কৌটোটা খুলে ফেলতেই, ওই দেখ, কৌটো-ভর্তি বাদাম!

'কাকাতুয়া!' কৌটো খুলে আবার সে হীরালালকে ডাক দিলে।

হীরালাল তেমনি করেই সাড়া দেয়, 'উস্তাদ।'

'বাদাম খা লেও!'

'না উস্তাদ, বাবুলোকদের দিয়ে দাও।'

'বহুত আচ্ছা।' বলে, ম্যাজিকঅলা কৌটো থেকে বাদাম বার করে, সেই বাদাম ছেলে-বুড়ো যারা দেখছিল সবাইকে বিলিয়ে দিল।

দেখ, দেখ, ওই তিনটে লোককে যেন চেনা লাগছে! তাই তো, লোকগুলোর যে গাল-ভরতি দাড়ি! কোথায় যেন দেখেছি!

আরে, আরে! এ যে সেই তিনজন সৈনিক। সেই যে, বনের সেই পোড়ো-বাড়িটার ভেতর পালিয়ে এসে, লুকিয়ে-লুকিয়ে নিজেদের পোশাক ফেলে, ছদ্মবেশে সেজে আছে!

হ্যাঁ, তাই তো! তারাও যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখছে। ওই তো! হাত বাড়িয়ে বাদাম নিচ্ছে! কুচমুচ করে চিবুচ্ছে! না, হীরালাল এখন আর তাদের মনে করতে পারবে না। হীরালাল তো এখন আর হীরালাল নেই। এখন তো ও সব ভুলে গেছে! ও তো এখন কাকাতুয়া!

'কাকাতুয়া!' আবার লোকটা ডাক দিল।

'উস্তাদ!'

'এখোন কী খেলা দেখাবে?'

'জ্যোতিষ-খেলা।'

'শাবাশ! ম্যাজিকঅলা হীরালালের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করল। তারপর চেঁচিয়ে চারপাশের লোকদের বলল, 'হাঁ স্যার, এ-খেলাটা বহুত কড়া খেলা। দেখিয়ে বাবু, হামার এই সাকরেদ আভি-আভি আপনাদের জ্যোতিষকা খেলা দেখাবে। আপনাদের ভাগ্যমে কী আছে, আভি-আভি আপনাদের মালুম হয়ে যাবে।'

বলে ম্যাজিকঅলা আবার তেমনি চিৎকার করে উঠল, 'কাকাতুয়া!'

'উস্তাদ।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'ইধার আসো।'

হীরালাল এগিয়ে এল। একেবারে ম্যাজিকঅলার সামনে। 'হামার আঁখ কা উপার নজর রাখো।'

হীরালাল ম্যাজিকঅলার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর যে কী হল, হঠাৎ হীরালাল টলে পড়ল। টলতে-টলতে ম্যাজিকঅলার গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ম্যাজিকঅলা ধরে ফেলল হীরালালকে। ধীরে-ধীরে মাটির ওপর শুইয়ে দিল। তারপর একটা কাপড় দিয়ে হীরালালের মুখখানা চাপা দিয়ে ডেকে উঠল,'এ কা-কা-তু-য়া।'

অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে এলে যেমন শুনতে লাগে, হীরালালের গলা থেকেও সঙ্গে-সঙ্গে তেমনি সাড়া জেগে উঠল, 'উ-স-তা-দ!

'হামি এখন যো বাবুর গায়ে হাত রাখিয়েছি, এ বাবুকা কাম কী আছে?

'কিচ্ছু না।'

'বাবুকা কাম হোবে?'

'দেরি হবে।'

'দেরি কোতো হোবে?'

'সাত মাস।'

ম্যাজিকঅলা এবার আর একজনের কাছে এল। আবার ডাক দিল,

'কা-কা-তু-য়া!

'উ-স-তাদ!'

'এ-বাবুকা ভাগ্য কেমন আছে?'

'খুব খারাপ।'

'খারাপ কেনো?'

'এ-বাবু একজন সৈনিক। এখানে ওঁর দুজন বন্ধুও আছেন। তাঁরাও সৈনিক। একদিন এ-বাবুদের দাড়ি-গোঁফ খসে পড়বে। তারপর বাবুরা চারপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটবে!'

'তাজ্জব বাত!'

হ্যাঁ, সত্যিই তো। ম্যাজিকঅলা এবার ওই তো তিনজন ছদ্মবেশী সৈনিকের কাছেই এসেছে! যদিও তারা চার-পায়ে হাঁটবে শুনে, রাজ্যের লোক হো-হো করে হেসে উঠল, কিন্তু ওই তিনজন সৈনিকের ভয়ে দফা শেষ। তারাও অবিশ্যি সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু হীরালালের মুখে ওই কথা শুনে, তাদের মুখে হাসি ফোটে কী করে! তাদের তো মাথা এখন বাঁই-বাঁই ঘুরছে। ভেবে কিনারাই করতে পারছে না, কী করে বলল এই ছেলেটা, তারা সৈনিক। এ কি সত্যি ম্যাজিক, না অন্য কিছু। তারা ভাবল, এমনও তো হতে পারে ছেলেটা তাদের চেনে! হয়তো আগে দেখেছে! হয়তো তাদের পালিয়ে আসার খবরটা সে জানে! তাদের দাড়ি-গোঁফ, এ যে সব

https://boierhut.com/fb

নকল, হয়তো এটাও তার জানা! নইলে বলল কেমন করে দাড়ি-গোঁফ খসে পড়বে। কিন্তু একটা কথার মানে তারা কিছুতেই বুঝতে পারল না। ওই যে বলল না, চার পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটবে তারা!

লোক তিনটে আর দাঁড়াল না। নিজেদের মধ্যে চোখের ইশারায় কথা হয়ে গেল। খেলা চলছে তখনও। ফাঁক বুঝে তিনজন চুপচাপ কেটে পড়ল।

কেটে পড়ল বটে, কিন্তু কী ভয়ানক দুর্ভাবনা তাদের। ভয়ে তিনজনেই এখন জুজু। তিনজনে একটা নিরিবিলি জায়গায় তিন মুণ্ডু এক করে ভাবতে বসল। একজন বলল, 'এখান থেকে এক্ষুনি পালানো উচিত।'

আর একজন বলল, 'এই ছদ্মবেশটা খুলে ফেলে আর একটা নতুন ছদ্মবেশ পরতে হবে।'

কিন্তু শেষজন বলল, 'না, তাতে আমরা রেহাই পাব না। ওই ম্যাজিক যদি সত্যি হয় তা হলে ছেলেটার কথা মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। আর যদি সত্যিনা-ও হয়, তাহলে বলতে হবে, ছেলেটা আমাদের কথা কোনো-না-কোনোভাবে জেনে ফেলেছে। সুতরাং এখন বাঁচতে হলে আমাদের লক্ষ্য হবে ছেলেটাকে ধরে সরিয়ে ফেলা!'



‘এখন চ আমরা ম্যাজিকঅলার পিছু নি।...’

'ধরব কেমন করে?' একজন জিজ্ঞেস করল।

'গোপনে!'

'আমরা নিজেরাই ধরা পড়ে গেলে?'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'ধরা পড়তে পারি। কিন্তু এ-ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আর ভয় পেলে চলবে না।'

'ওই দেখ, ম্যাজিক ভেঙে গেছে।'

হ্যাঁ সত্যিই ম্যাজিক ভেঙেছে। লোকের ভিড় কাটছে। 'এখন চ আমরা ম্যাজিকঅলার পিছু নি। চ দেখি, কোথায় ছেলেটা থাকে।'

তারপর সেই নিরিবিলি জায়গা থেকে তিনজনে বেরিয়ে এল। নিঃসাড়ে ম্যাজিকঅলা আর হীরালালের পিছু নিল।

না, এখন আর হীরালালকে নিয়ে ম্যাজিকঅলার ভয় নেই। হীরালাল যে পালিয়ে যাবে, এমন কথাও আর ম্যাজিকঅলা ভাবে না। ছেলেটার মগজ সে অনেক আগেই সাফ করে দিয়েছে। এখন হীরালাল জানে, এই তার ঘর। ম্যাজিকঅলা তার আপন জন। আগে হলে কী হত বলতে পারি না, এখন ওই মড়ার খুলিটা দেখলে ওর একটুও ভয় লাগে না। অত কী, রাত্রে যখন শুতে যায় হীরালাল, ওই মড়ার মাথাটা তো ঠিক তার মাথার ওপর, ওই তাকটাতে বসানো থাকে। তার ঘুমুবার সময় ওই খুলিটা হেসে উঠল, অথবা তুড়ুক-তুড়ুক লাফিয়ে উঠলেও হীরালাল শিউরে উঠবে না।

কিন্তু একদিন হীরালাল শিউরে উঠেছিল। একদিন গভীর রাতে তার আচমকা ঘুম ভেঙে গেছল! রাতের আকাশটা জানলায় মুখ ঝুঁকিয়ে উঁকি দিচ্ছে। আকাশ-ভরতি তারাদের ঝিকিমিকি। বাইরে, গাছের অন্ধকারে জোনাকিরা টুপটাপ আলো জ্বেলে, উড়ে-উড়ে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। চারিদিক ভারি নিশ্চুপ, থমথমে। ছোট্ট একটি গাছের পাতা মাটিতে পড়ে খসখসিয়ে উঠলে মনে হয়, কী ভয়ংকর তার শব্দ! এমন সময় হঠাৎ মনে হল, কে যেন আলতো-পায়ে চুপি-চুপি এদিকেই এগিয়ে আসছে। আর বলব কী, ঠিক তক্ষুনি ওর ঘুম-ভাঙা চোখ দুটির দৃষ্টি কেমন যেন আপনা থেকে ওই মড়ার মাথাটার ওপর গিয়ে পড়ল। উঃ! হঠাৎ যেন মনে হয়, কী বীভৎস সেটা! যেন হীরালালকে দেখে সেটা হেসে উঠেছে! মাথাটা চোখের খাবলা-খাবলা গর্ত-দুটো খুলছে আর বন্ধ করছে! ফোকলা মুখটা হাঁ করছে বার-বার! মনে হচ্ছে, কী যেন গেলার জন্যে খাবি খাচ্ছে আর ঢোঁক গিলছে! বলব কী, ঠিক তক্ষুনি একটা পেঁচা ডেকে উঠল ক্যারকেরে গলায়, 'ক্যাঁক-ক-ক, ক্যাঁক-ক।'

ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েছে হীরালাল, ভয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে ওর কানে বেজে উঠল নূপুরের রিনিঝিনি। তারপরেই আবার সে শুনতে পেল সেই মেয়েটির গলা, সেই মিষ্টি ডাক, 'হী-রা-লা-ল!'

ওই ডাক শুনে হীরালালের তক্ষুনি-তক্ষুনি নিজের ভুলে-যাওয়া নামটা মনে পড়ল কি না জানি না। কিন্তু হীরালাল কেমন হতভম্ব হয়ে গেল। চোখের পাতা দুটি থমকে স্থির। বোবার মতো চুপটি করে ঘরের চারপাশটা দেখতে-দেখতে সে নিজের মাথার বালিশটা খামচে ধরল!

আবার সে ডেকে উঠল, 'হী-রা-লা-ল!'

মাথাটা ঝিমঝিম করছে হীরালালের।

https://boierhut.com/fb

'হী-রা-লা-ল!' আবার ডেকেছে।

বাইরে একটা তক্ষক 'তোক খোক, তোক খোক' করে দুবার ডেকে থেমে যেতেই আবছা-আবছা একটা ছবি হীরালালের মনের ভেতর ভেসে উঠছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার। কিছুই মনে করতে পারছে না সে। যেটুকু মনে পড়ছে, সেটুকুও ধরে রাখতে পারছে না। আর থাকতে পারল না হীরালাল। বালিশে মুখ গুঁজড়ে ফুঁপিয়ে উঠল।

অবিশ্যি সে-ডাক সে আর শুনতে পায়নি। শুনতে পায়নি সেই নূপুরের রিনিঝিনি। ওই মড়ার মাথাটাও আর হাসছে না। চোখও মটকাচ্ছে না। তবুও হীরালালের চোখে আর ঘুম এল না। বাকি রাতটুকু জেগে-জেগে সে ছটফট করতে লাগল! আর ভাবল, এ কোথায় সে এসেছে!

সকাল হয়েছিল যখন, তার অনেক আগেই হীরালাল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। ও যখন উঠেছে তখনও ম্যাজিকঅলার অর্ধেক রাত। লোকটা তেড়ে ঘুম দিচ্ছে আর ফোঁসফোঁসিয়ে নাক ডাকাচ্ছে! বিছানা ছেড়ে ওই জানলাটার ধারে একটু দাঁড়াল হীরালাল। এখনও কালো রাতের আবছা ছায়া আকাশের দিকে মুখ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে আর বেশিক্ষণ থাকতে হবে না। একটু পরেই মানে-মানে সরে পড়তে হবে।

আহা! কাল রাতের-বেলা ওই নূপুরের রিনিঝিনি কে বাজাল!

হাওয়ায় দুলে-দুলে কার পায়ের নূপুর এমন করে বাজে! এ কি স্বপ্নের পরি কোনো! না কি আর কেউ!

হীরালাল ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। খুব সাবধানে খিলটা সে খুলে ফেলল। তারপর আলতো-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল। ছুটতে গেল, পারল না। তখন আর এক বিপদ! জানতে পারেনি হীরালাল, সেই তিনটে লোক তাকে ধরবে বলে ভোরের আলো-ছায়ার অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। তাই যেই হীরালাল ছুটতে গেছে, সঙ্গে-সঙ্গে ধরে ফেলেছে। তারপর তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে কোথায় যে ছুটল কেউ জানতেও পারল না।

হ্যাঁ, ছুটল তারা এক পাহাড়ের গুহায়। হয়তো তারা হীরালালকে মেরে এই পাহাড়ের গুহায় ফেলে রেখে যাবে। কেউ টেরও পাবে না। কেননা ছেলেটা জেনে ফেলেছে তারা সৈনিক। কথাটা আরও পাঁচ কান হয়ে ছড়িয়ে পড়লে তাদেরই প্রাণ রাখা দায় হয়ে যাবে!

কিন্তু না, তারা প্রথমেই মারল না হীরালালকে। তাকে ভালো করে দেখল তারা। হীরালালও কী বলবে, কিছু ভেবে না পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তাদের মুখের দিকে। কারণ সে চিনতে পেরেছে এই লোক তিনজনকে। এখন বেশ মনে পড়ছে তার, এরাই তো সেই জঙ্গলে পোশাক পালটে ছদ্মবেশ পরেছে!

এই তিনজনের মধ্যে যে পালের গোদা সে-ই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'এই ছেলেটা, তুই কেমন করে জানলি আমরা সৈনিক?'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হীরালাল চুপ করে রইল।

সে ধমক মারল, 'চুপ করে থাকলে ওই পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দেব।'

হীরালাল মুখটা কাচুমাচু করে বলল, 'দেখুন, আমি তো কাউকে কিছু বলিনি।'

'বলিসনি মানে!' সে আবার ধমক দিল।

হীরালাল জিজ্ঞেস করল, 'কবে বলেছি বলুন তো! আমার তো মনে পড়ছে না।'

'আবার মিথ্যে কথা বলছিস!' সে তেমনি তেড়ে কড়কে উঠল। হীরালালের গলাটা টিপে ধরে বলল, 'বল, নইলে গলা টিপে মেরে ফেলব।'

হীরালাল কথা বলতে পারল না। ওই লোকটার হাতের চাপে ওর দম আটকে আসছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। হীরালাল ছটফটিয়ে উঠল।

হয়তো আর-একটু হলেই ওর সত্যিই দম আটকে যেত। ঠিক সেই সময় আচমকা যেন সেই মেয়েটির গলার স্বর চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান, তোমরা ওকে মারছ কেন?'

থমকে গিয়ে চমকে উঠেছে সেই তিনটে লোক! এই রে! এই সময়ে এই অন্ধকার গুহার হদিস কে পেল! কে জানল, এখানে ছেলেটাকে ওরা ধরে এনেছে! হীরালালকে মারা তো দূরের কথা, এখন তারা পালাতে পারলে বাঁচে! আর তারা সত্যিই হীরালালকে ছেড়ে ভো-কাট্টা!

সেই মেয়েটির গলার স্বর আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাচ্ছে, তিনটে সৈনিক পালাচ্ছে।'

তার গলার স্বরটা স্পষ্ট হচ্ছে যতই, ততই তাদের বুক কাঁপছে। দৌড়, দৌড়, একেবারে গুহার ভেতরে, অনেক ভেতরে তারা দৌড় মারল! কিন্তু যতই ছুটছে তারা, সেই মেয়েটির গলার স্বর ততই তাদের কানের ভেতরে ভয়ংকর শব্দে চিৎকার করে উঠছে!

ছুটতে-ছুটতে তারা হাঁপাচ্ছে। আর বুঝি তাদের বাঁচার রাস্তা নেই। এবার তাদের নির্ঘাত মরণ!

না, হঠাৎ থেমে গেল সেই চিৎকার। ভয়-পাওয়া বুকের কাঁপুনিটা তবু থামতে চায় না তাদের। তবু ছুটছে তারা। তারপর সত্যিই যখন সেই চিৎকার ছুটে-ছুটে আর তেড়ে আসছিল না, তখন তারা দাঁড়াল। অন্ধকার গুহার পাথরের মধ্যে চটপট গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

তারা অনেকক্ষণ লুকিয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পর যখন মনে হয়েছিল, হয়তো আর কেউ নেই এখানে, তখন তারা পাথরের আড়াল থেকে চুপিসারে বেরিয়ে এসেছিল। অসহ্য কষ্ট এখানে! গুহাটা যেমন ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ছমছম করছে, কষ্টে ওদের মুখগুলোও তেমনি শুকিয়ে চুপসে গেছে! ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে ওদের। এই সময় কেউ যদি ওদের একটু জল দেয়! একটু খাবার জল। একটু জলের জন্যে এই নিস্তব্ধ গুহাটা ওদের দম-ফাটা নিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠছে! একজন হাঁপাতে-হাঁপাতেই আর্তনাদ করে উঠল, 'একটু জল, একটু জল।'

আর একজন বলল, 'বাইরে যেতে হবে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু বাইরে যাবে কেমন করে! এই গুহার ভেতর থেকে কোন পথ দিয়ে তারা বাইরে যাবে? সে তাদের জানা নেই! তার ওপর বাইরে গেলে যদি ধরা পড়ে যায়! তাই শেষজন বলল, 'না, বাইরে গেলে আরও বিপদ হতে পারে । আমরা ধরা পড়ে যাব।'

'তবে কি আমরা এখানেই মরব!' রেগে উঠল প্রথমজন।

শেষজন বলল, 'অত ব্যস্ত হলে চলে না। এই গুহার আরও ভেতরে চ। নিশ্চয়ই পথ খুঁজে পাব। আর একটু কষ্ট করলে হয়তো আমরা বাঁচতে পারি!'

'বেশ, তাই সই।'

তিনজন গুহার আরও ভেতরে পাথর টপকে হাঁটা দিল।

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ এ কী হল!

এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারটা যেন একটু-একটু ফ্যাকাশে হয়ে আসছে! মনে হচ্ছে, অন্ধকার কালোটা একটু-একটু বেগুনি-বেগুনি আলো হয়ে উঠছে! সত্যিই তো! তবে কি আর একটু হাঁটলেই বাইরে আলো দেখতে পাবে! তিনজনের মুখেই হাসি ফুটল! আঃ! কী আনন্দ!

না তো! হঠাৎ গুহার সেই বেগুনি আলোর রং সবুজ হয়ে উঠল যে! যেদিকে চাও, শুধু সবুজ আর সবুজ। গুহার ভেতরটা সবুজ। পাথরের গায়ে-গায়ে সবুজ। ওদের পায়ে-পায়ে সবুজ, যেন চলছে, ফিরছে, থমকে-থমকে থেমে পড়ছে!

থেমে পড়ল তিনজনা। সবুজ আলোর ধাঁধায়, ওদের চোখ ঝলসে উঠেছে। হঠাৎ ঝরনার মতো টুংটাং শব্দ করে কত বাজনা বেজে উঠল শোনো! এই গুহার সবুজ আলোয় যেন কাদের পায়ে নেচে উঠল সুরের বুনুঝুনু! দেখ, দেখ সেই সবুজ আলো গুহার দেওয়ালে কত ছবি এঁকে দিয়েছে। সেই ছবিদের কেউ নাচে, কেউ গান গায়, কেউ মৃদঙ্গ বাজায়। অবাক চোখে চেয়ে থাকে তিনজন লোক।

কিন্তু হঠাৎ এ কী দেখল ওরা!

কী দেখল?

এ তো আঁকা ছবি নয়। এ ছবিরা তো জীবন্ত হয়ে ওদের চোখের সামনে দুলছে। ওই তো, ঠান্ডা জলের পাত্র হাতে ওই জীবন্ত ছবিরা যেন ডাকছে ওই তিনটে লোককে! আঃ! ওদের তৃষ্ণা যেন বেড়ে যায়! তিনজনেই হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল।

কিন্তু কই জল! ওই দেওয়ালের ছবির মানুষেরা ওই তিনটে লোককে ছুটে আসতে দেখে যেন লুকিয়ে পড়ল!

না, লুকোয়নি। ওই তো তাদের দেখা যাচ্ছে একটু দূরে! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে!

আবার ছুটে গেল তিনজন সেইদিকে।

এবারও ফুস-মন্তরের মতো তারা হারিয়ে গেল! দেখা দিল আবার আর-একদিকে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তারপর তিনটে লোক এদিক ছোটে, ওদিক ছোটে! আর দেওয়ালের ছবিরা এ-পাশ আসে, ও-পাশ পালায়! শেষে একটু তৃষ্ণার জলের জন্যে ছোটাছুটি আর লুকোচুরি শুরু হয়ে গেল। ছুটতে-ছুটতে প্রাণান্ত তাদের। এবার তারা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আর তাই মাটি থেকে তুলে নিল পাথর। ছুড়ে দিল ওই ছবির মানুষের দিকে! পাহাড়ের গায়ে শব্দ উঠল, ঠং! ঠক! ঠকাস!

কিন্তু এ কী! পাথর ছোড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ছবির মানুষেরা যে উবে গেল! সেই ছবির মানুষের জায়গায় তো কটা ছবির জন্তু দেখা যাচ্ছে! কটা গাধা! কটা ছাগল! কটা শুয়োর!

ওই জন্তুগুলোকেই মারবে বলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই তিনজন মানুষ আবার পাথর ছুড়ল। অমনি চক্ষের নিমেষে সেই গাধা, ছাগল, শুয়োরের দল পাহাড়ের গায়ে আঁকিবুঁকি ছড়িয়ে দৌড় মারল। লোক তিনটেও লাগাল তাড়া।

৭

ছুটছে জন্তুরা।

ছুটছে তিনটে লোক।

হঠাৎ সেই ছুটন্ত জন্তুদের তালে-তালে বেজে উঠল দামামা, ডিড্ডিম-ডিম-ডিম! ডিড্ডিম-ডিম-ডিম!

বাজনা বাজছে। এখনও বাজছে।

জন্তু ছুটছে। এখনও ছুটছে!

হঠাৎ থেমে গেল বাজনা।

যাঃ! চক্ষের পলকে জন্তুগুলো উধাও! সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল, ঝিরি-ঝিরি! ঝিরি-ঝিরি! গুহার পাথরের গা বেয়ে পাহাড়ি ঝরনার জল গড়িয়ে পড়ছে!

ঝিরি-ঝিরি! ঝিরি-ঝিরি!

আঃ! জল! চারিদিকে জল! আর তর সইল না সেই তিনটে লোকের। ছুটে গেল তারা। আঁজলা ভরে জল তুলে নিল। তারপর মুখে দিল। প্রাণ ভরে চুমুক দেয় আর গায়ে ছড়ায়! আঃ! তবু যেন শান্তি নেই। যত পারে খাক!

কিন্তু দেখ, দেখ জল খেতে-খেতে ওরা কেমন যেন পালটে যাচ্ছে! ওদের তো আর মানুষের মতো দেখতে লাগছে না! যেন মনে হচ্ছে, একটা গাধা, একটা ছাগল আর একটা শুয়োর!

হ্যাঁ, ঠিক তাই!

আচ্ছা আজব কাণ্ড তো!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তবে তো হীরালাল ম্যাজিকের খেলা দেখাতে-দেখাতে সেদিন ঠিকই বলেছিল, বাবুরা একদিন চার পায়ে হাঁটবে!

হ্যাঁ, আজবই তো! ওই দেখ-না, নিজেরাই নিজেদের দেখতে-দেখতে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠছে! ছাগল, শুয়োর, গাধার ডাকে গুহার গহ্বর গমগম করে উঠল। প্রাণের ভয়ে তারা ছুট দিল অন্ধকারের ভেতর থেকে গুহার বাইরে!

ঝিরি-ঝিরি!

সেই পাহাড়ের গা গড়িয়ে সেই জলের শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। তিন জন্তু ছুটছে!

জলের শব্দ তবু শোনা যাচ্ছে, ঝিরি-ঝিরি!

গুহার অন্ধকার হালকা হচ্ছে। আলো আসছে। ওরা বাইরের রাস্তা দেখতে পেল। গুহায় যখন ঢুকেছিল, তখন ওরা ছিল তিনজন মানুষ। আর এখন যখন বাইরে এল,

একটা গাধা, লম্বা কান।

একটা ছাগল, শুকনো দাড়ি।

একটা শুয়োর, ছুঁচকো মুখ।

এ ওর দিকে চায়। কান নাড়ে। ঠ্যাং ছোড়ে। ল্যাজ নাচায়। কিন্তু কথা কয় না। ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে!

এখন ঝরনার ঝিরি-ঝিরি শব্দের সুরটা কেমন পালটে গেছে। বাইরে এখন রিনি-ঝিনি রিনি-ঝিনি করে কার যেন পায়ের নূপুর বাজছে।

ওরা বাইরে এসে কান পাতল। এদিক দেখছে, ওদিক দেখছে। তারপর হাঁটা দিল। হাঁটতে-হাঁটতে ছোটা দিল। ছোটা দিল পাহাড়ের ওপরে! গাধা উঠতে গিয়ে ছ বার পড়ে। ছাগল পড়ে ক বার। শুয়োর গড়ায় ন বার। তারপর তিনটে জন্তুই থমকে যায়! চমকে দাঁড়ায়! আরে, সেই ছেলেটা না!

হ্যাঁ, হীরালাল। পাহাড়ের পাথর ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে সে হাঁটছে। হাঁটতে-হাঁটতে কাকে যেন খুঁজছে!

সেই তিনটে জন্তু ঝটপট লুকিয়ে পড়ল। উঁকি মেরে দেখতে লাগল হীরালালকে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হীরালাল কথা বলল, 'আর কতদূরে যেতে হবে? তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

কার সঙ্গে যে কথা বলল ছেলেটা, তিনটে জন্তু বুঝতেই পারল না। কিন্তু তারা শুনতে পেল সেই মেয়েটির গলার স্বর। সে জিজ্ঞেস করল হীরালালকে, 'কেন, কষ্ট হচ্ছে?'

হীরালাল উত্তর দিল, 'না, কষ্ট আমার হচ্ছে না। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলছ কেন? তুমি আমায় ডাকছ, কিন্তু দেখা দিচ্ছ না। তোমার ডাক শুনতে-শুনতে কোথায় চলে এসেছি বল তো! তুমি দেখা দিচ্ছ না কেন?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সে বলল, 'দেখতে পাবে।'

'কবে?'

'একদিন।'

'কোনদিন।'

সে হাসল।

হীরালাল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হাসছ যে!'

তবু সে হেসে উঠল খিলখিল করে। তার হাসির রেশটা ওই পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ভেসে-ভেসে হারিয়ে গেল।

অভিমানে গলা ভার হয়ে গেল হীরালালের। সে বলল, 'খালি-খালি তুমি হাসছ কেন? তুমি যদি দেখা না-ই দেবে, তবে আমায় ওই গুহার ভেতর থেকে কেন বাঁচালে! কেন আমায় ডেকে আনলে! তোমার ডাক শুনে, আমি পথ ভুলে গেছি! হয়তো আমার মা কাঁদছে আমার জন্যে।'

হাসতে-হাসতে থামল সে হীরালালের কথা শুনে। তারপর একটুখানি চুপ করে রইল।

হীরালাল জিজ্ঞেস করল, 'চুপ করলে যে!'

তার গলাও ভার হয়ে গেল। সে বলল, 'হীরালাল, আমিও যে তোমার জন্যে কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার যে ভারি ইচ্ছে করে হীরামন তোমাকে আদর করতে!'

হীরালাল অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'এ কী! তুমি আমার ওই নামটা জানলে কী করে? মা বলেছে, হীরামন বলে দিদি আমায় ডাকত! ডেকে-ডেকে আমায় আদর করত!

হঠাৎ সে আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বলল, 'আমি জানি, সব জানি।'

হীরালাল অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

সে বলল, 'আমি কেউ না। সামনে দেখ, আমি ওইটা।'

হীরালাল ব্যস্ত হয়ে সামনে চাইল। কাউকে দেখতে পেল না। জিজ্ঞেস করল, 'কই? কোনটা?'

'ওই পাথরটা!'

'তুমি পাথর?'

সে তখন বলল, 'বিশ্বাস করতে পারছ না বুঝি? আচ্ছা, এক কাজ কর, তোমার সামনে ওই যে টুকরো পাথরটা দেখতে পাচ্ছ ওই পাথরটা দিয়ে একটা মস্ত গোল আঁকো!'

হীরালাল দোনোমোনো করল।

সে আবার বলল, 'আঁকছ না?'

হীরালাল জিজ্ঞেস করল, 'কী হবে এঁকে?'

'আমায় দেখতে পাবে।'

হীরালাল বলল, 'ধ্যাত! তাই বুঝি আবার হয়!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আঁকলেই বুঝতে পারবে।'

'বেশ, তুমি যখন বলছ, আঁকছি!' বলে হীরালাল পাহাড়ের গায়ে ওই পাথরের টুকরো দিয়ে একটা মস্ত গোল আঁকল।

কিন্তু কই?

আবার সে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'আমি ওই!'

হীরালাল বলল, 'কী মিথ্যে কথা বলো তুমি। এটা তো একটা মস্ত বড়ো শূন্য!'

সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, আমি শূন্য। ওই দেখ, দেখ, তোমার আঁকা গোল শূন্যটা কী হয়ে গেল দেখ!'

বলতে না বলতেই ঠং-ঠং ঠং করে আওয়াজ তুলে পাহাড়ের পাথরে কী যেন গড়িয়ে -গড়িয়ে ঠিকরে পড়ে বেজে উঠল। চকিতে ফিরে তাকাল হীরালাল। এ কী কাণ্ড! সেই শূন্যটা যে একটা সোনার মোহর হয়ে গড়িয়ে পড়ল!

ওই দেখ, সেই তিনটে জন্তুও পাহাড়ের ওপরে উঠে এসেছে। পাথরের আড়াল থেকে সেই তিনটে জন্তুও এটা দেখে ফেলেছে! তারাও যে থ!

হীরালাল অবাক গলায় বলল, 'এ যে সোনা!'

'এই তো আমি। তুমি আরও অনেক শূন্য আঁকো, আরও সোনা হবে। তারপর সেই সোনা দিয়ে তোমার স্বপ্ন গড়ে উঠবে।'

'সত্যি?' খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল হীরালাল।

সে বলল, 'সত্যি?'

তখন হীরালাল আবার একটা গোল আঁকল। ওটাও সোনা হয়ে গেল।

আবার আঁকল।

আবার সোনা।

আবার আঁকল।

সোনা—সোনা—সোনা। হাজার-হাজার সোনার মোহর ছড়িয়ে পড়ল সেই পাহাড়ের আনাচে-কানাচে।

তাই না দেখে, সেই তিনটে জন্তুর তো চক্ষুস্থির। লোভে চোখগুলো তাদের জ্বলে উঠল। কিন্তু করবে কী! যখন মানুষ ছিল, তখন এক কথা! এখন তো ওরা জন্তু!

হীরালাল মোহরের আড়াল থেকে মুখ উঁচিয়ে বলল, 'বাব্বা! এত সোনা, আমি যে চাপা পড়ে যাচ্ছি।'

'না, চাপা কেন পড়বে। ওই দেখ, পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকাও।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হীরালাল চেয়ে দেখল। তারপরেই চমকে উঠল! এ আশ্চর্য কাণ্ড তো! মস্ত পাহাড়ের আকাশ-ছোঁয়া চূড়াটার ঠিক ওপর, স্বপ্নের রং বুলিয়ে, সেই সোনার মোহর সাজিয়ে ছোট্ট একটি প্রাসাদ গড়ে উঠেছে!

জন্তু তিনটে এবারও হাঁ!

হীরালাল মুগ্ধ চোখে সেই প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আঃ! এমন সুন্দর প্রাসাদ! এ কার?'

সে বলল, 'সবটা তোমার। একটুখানি আমার।' হীরালাল জিজ্ঞেস করল, 'এখানে তুমি থাকো?'

সে উত্তর দিল, 'আমার সঙ্গে তুমিও।'

'কিন্তু তোমায় তো এখনও দেখতে পাচ্ছি না!'

সে বলল, 'পাবে, পাবে, দেখতে পাবে। দেখতে পাবে পূর্ণিমায়, যেদিন চাঁদ উঠবে।'

অমনি দেখতে-দেখতে পাহাড়-চূড়ার রঙিন প্রাসাদের সিংদরজা খুলে গেল।

সে বলল, 'ভেতরে এস।'

হীরালাল দরজা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

হীরালাল ভেতরে ঢুকে যেতেই বেরিয়ে এল সেই গাধাটা ছাগলটা আর শুয়োরটা—পাথরের আড়াল থেকে।

আহা! কী চমৎকার প্রাসাদের ভেতরটা! চারিদিকে ফুল। ফুলে ফুলে মৌ। রং-রং ছবি। ছবি-ছবি পাখি। আর এখানে ফোয়ারা, ওখানে রঙিন মাছ। অবাক হয়ে দেখছে হীরালাল। দেখতে-দেখতে সে বাগান পেরিয়ে দালানে উঠতেই, টুং-টাং করে বাজনা বেজে উঠল। কী মিষ্টি তার সুরটা! থমকে দাঁড়িয়েই পড়ল হীরালাল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'দাঁড়ালে যে?'

হীরালাল বলল, 'কী মিষ্টি বাজনা বাজছে!'

সে উত্তর দিল, 'জলতরঙ্গ।'

'কোথা বাজছে?'

'জলের নীচে।'

'কী সুন্দর!'

হীরালাল দালান ছেড়ে ঘরে ঢুকল। এ-ঘরটা ছবির ঘর। দেওয়াল-ভরতি রঙিন ছবি। একটা হাঁস, তো একটা বাঘ। একটা ফড়িং, তো সাতটা ফানুস। একটা নদী, তো পাঁচটা নৌকো। একটা সূর্য, একটা চাঁদ।

সে জিজ্ঞেস করল, 'ভালো লাগল?'

হীরালাল বলল, 'খুব ভালো।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এবার এই ঘরটা খেলার ঘর।
বাঁদর-ছানা ন্যাজ ঝুলিয়ে দুলছে।
মেম-পুতুলটা ঘাগরা পরে নাচছে।
মোটরগাড়ি পিপ্পি-পিপ্পি ছুটছে।
কাঠের ঘোড়া টগবগ টগবগ হাঁটছে।
সে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল?'
হীরালাল বলল, 'কী সুন্দর!'
খেলা-ঘরের পরের ঘর পোশাক-ঘর।
এই পোশাকটা নীল।
ওই পোশাকটা লাল।
ওই জামাটা আকাশি।
ওইটা দেখতে ফ্যাকাশি।
এটার গায়ে ফুলের ছাপ।
ওটার গায়ে লতার দাগ।
সে জিজ্ঞেস করল, 'কোনটা পরবে?'
হীরালাল বলল, 'লালটা পরব।'
এর পরে পাখির ঘর।
ময়নাটা গাইছে।
লালমন চাইছে।
টিয়া ঠোঁট ঠুকছে।
বুলবুলি উড়ছে।
সে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

পাখির-ঘর ছাড়িয়ে, একটি-একটি সিঁড়ি পেরিয়ে, একেবারে ওপরে, ঠিক রূপকথার রাজপুত্রের মতো ঝলমল একটি রঙিন-ঘর।

সে-ঘরে সোনার পালঙ্ক সাজানো। তাতে মখমলের বিছানা পাতা। রেশমি পর্দা হাওয়ায় উড়ে-উড়ে নীল আকাশের মুখটা একবার ঢেকে দিচ্ছে আবার এঁকে দিচ্ছে। এখনই আকাশে তারা ফুটবে। তারপর সোনার পালঙ্কে হীরালাল শুয়ে পড়বে। সে গান গাইবে। আঃ! শোনো, শোনো, কী নরম গলা তার! এ তো গান না। মনে হবে, বুঝি-বা ফুলের পাপড়িতে শিশিরের ফোঁটারা দোল খাচ্ছে।

https://boierhut.com/fb

ঘুমিয়ে পড়ল হীরালাল। আহা! ঘুমাক। একটি হালকা পশমি চাদর দিয়ে সে ঢাকা দিয়ে দিল হীরালালের গা-টি। পাহাড়ের হাওয়ায় ভেসে-ভেসে ফুলের গন্ধ এসে সেই চাদরের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে!

ঘুমিয়ে পড়েছে হীরালাল। কেন এমন একদৃষ্টে হীরালালের মুখের দিকে চেয়ে আছে সে? সে বুঝি হীরালালের মাথায় হাত রেখেছে। চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে কপালে চুমু খাবে। তারপর হয়তো চোখ দুটি ওর ছলছলিয়ে উঠবে। হ্যাঁ, ওই তো কাঁদছে সে! শুনতে পাচ্ছ না, এই শান্ত, নিস্তব্ধ রাত্রে, এই ঘরে তার কান্নার অস্পষ্ট শব্দ!

হ্যাঁ, আজ ও কাঁদবে। অঝোর ধারায় চোখের অদৃশ্য জলে ভেসে যাবে তার গাল দুটি। হীরালালকে এমন করে কাছে পেয়ে তার যত আনন্দ, তত ভয়।

ভয় কেন?

কেননা, যেদিন পূর্ণিমা আসবে, পূর্ণিমায় আকাশে চাঁদ উঠবে, সেদিন যে সে শেষবারের মতো হীরালালকে দেখতে পাবে। সেদিনই তো হীরালাল জেনে ফেলবে, সে কে!

সত্যি, সে কে? কে এই অদৃশ্য মেয়েটি? এমন নিছক একটা পাথরে আঁকা শূন্য মোহর হয়ে যায় কার হাতের ছোঁয়ায়? কোন মায়াবলে এমন এক সোনা-ঝলমল প্রাসাদ গড়ে তোলে সে এই পাহাড়ের চূড়ায়? কেন, কেন, সে হীরালালকে এমন আদর করে? আদর করে কেন সে ডেকে এনে গান শোনায় তাকে? সে কি জানে না, হীরালালের মা হীরালালের জন্যে কত কাঁদছে?

হ্যাঁ, জানে সে। কিন্তু তবু সে হীরালালকে না দেখে পারে না। কতদিন সে আঁতিপাঁতি করে খুঁজছে হীরালালকে। কতদিন সে নদীর তীরে-তীরে ছুটে-ছুটে হীরালালের পিছু নিয়েছে। বনের ছায়া-ঘেরা পথে-পথে একা-একা ঘুরেছে একটিবার ওর মুখখানি দেখার জন্যে। আজ সে কাছে পেয়েছে হীরালালকে। আজ প্রাণ ভরে ওকে আদর করবে। ওর যত সাধ ছিল মনে-মনে, আজ সব উজাড় করে দেবে হীরালালের জন্যে!

এখন সোনায় গড়া স্বপ্ন-প্রাসাদে হীরালাল ভারি নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। নিজঝুম এই পাহাড়-চূড়ায় আজকের রাত নিথর হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল। শুধু জেগে রইল সেই ছাগল, সেই শুয়োর আর গাধাটা।

হ্যাঁ, ওরা জেগে আছে। ওই তো কেমন নিঃসাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে! এখন তারা পাহাড়ের পাথর ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে ওপরে উঠবে। ওই চূড়ায়, ওই প্রাসাদে! কেন, কী মতলব তাদের?

আকাশে তারার ঝিলিমিলি। আর নীচে, প্রাসাদের গায়ে-গায়ে মণিমুক্তার ঝকমকি! দেখতে-দেখতে তিন জন্তুর চোখ ঝলসে গেল! হায় রে, এই প্রাসাদটা যদি তাদের হত! হলই বা তারা জন্তু, এই প্রাসাদে একবার রাজা হয়ে বসতে পারলে মানুষই তাদের সেলাম ঠুকবে! দৌলত যার, শক্তিও তার! সুতরাং এ প্রাসাদ তাদের চাই-ই। এটা পাওয়াই বা এমন কী শক্ত! মালিক তো ওই একটা

পুঁচকে ছেলে! ছেলেটাকে মারতে-মারতে এই পাহাড়ের ওপর থেকে একবার নীচে ওই খাদে ফেলে দিতে পারলেই হল! হুর-র-র-রে! তখন এ প্রাসাদ হবে তাদের!

হ্যাঁ, এই কথা ভাবতে-ভাবতে, অনেক কষ্ট করে, পাহাড়ের পাথর ঘসটাতে-ঘসটাতে তারা সত্যিই প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আ-হা-হা! সোনা, চারিদিকে শুধুই সোনা। থরে-থরে সাজানো। সারে-সারে ঝকমকি জৌলুস। ওরা পারল না আর দাঁড়িয়ে থাকতে। সামনের ঠ্যাং ওপরে তুলে সেই সোনা কেউ আঁকপাঁকিয়ে আঁকড়ে ধরে। কেউ সোনার ওপর জিব দিয়ে চাটে। কেউ গোঁত্তা মেরে মাথা খোঁড়ে!

আরে! আরে! এ কী! গাধার পিঠের ঠেলা লেগে যে সত্যি-সত্যি প্রাসাদের সিংদরজা হাট হয়ে খুলে গেল! তা বেটপকা দরজাটা অমন খুলে গেলে একটু ভড়কে যেতে হয় বইকী! চাইকি, ভয় পেয়ে একটু ঘাবড়েও যেতে হয়!

হ্যাঁ, তা-ঠিক, তিন জন্তু একটু ভড়কাল বটে, তবে ঘাবড়াল না। একটু এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে তিন জন্তু চটজলদি প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আঃ! খুশির মতো এক ঝলক আকাশি নীল আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রাসাদের মাথার ওপর। খুব মিঠে হালকা সুরে বাজনা বাজছে। আর মনে হচ্ছে, ফিনফিনে সাদা তুষারের মতো ঝুরুঝুরু কী যেন ভেসে বেড়াচ্ছে হাওয়ায়-হাওয়ায়।

তিন জন্তু এগিয়ে গেল।

সেই সাদা তুষার যেন ধীরে-ধীরে জমাট বাঁধছে!

তিন জন্তু চেয়ে দেখল।

সেই সাদা তুষার যেন ফ্যাকাশে হয়ে ছাইরং ধরল!

হ্যাঁ, জমাট-বাঁধা তুষারের ছাই-রং হঠাৎ এবার ভুসোর মতো কালো হয়ে গেল! তারপর সেই কালো ভুসো জমাট বাঁধতে-বাঁধতে একটা ইয়া লম্বা দত্যির মতো ছড়িয়ে পড়ল সেই তিন জন্তুর সামনে। সেই কালো কুচকুচে দত্যি হাত বার করল! প্যাট-প্যাট করে চেয়ে দেখল! দাঁত ছরকুট্টে হেসে উঠল! আর অমনি সঙ্গে-সঙ্গে হালকা সুরের বাজনাটা দামামার মতো দমাদ্দম দমাদ্দম করে গর্জে উঠল! তাই না দেখে, তিন জন্তুর আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া! কী করি কী করি ভেবে দে পিঠটান!

অমনি, একেবারে চক্ষের নিমেষে সেই কালো ভুসোর মতো দত্যিটা খপাত করে গাধার কানটা ধরে ফেলল! আর এক হাত বাড়িয়ে ছাগলটার একটা ঠ্যাং খামচে ধরল! শুয়োরের ঘাড়টা পা দিয়ে চেপটে দিল! তারপর দুহাত দিয়ে গাধাটাকে আর ছাগলটাকে কান-ঝোলা আর ঠ্যাং-ঝোলা করে দোলাতে লাগল। শুয়োরটার ঘাড়ে পায়ের নোখ দিয়ে খামচি মেরে চিমটোতে লাগল!

তারপর কী চেল্লাচেল্লি, 'ও বাবা গো, ছেড়ে দাও গো! ও বাবা গো, ঘাট হয়েছে গো! ও বাবা গো, আর কক্ষনো করব না গো!'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এখন আর এ-সব কথা বলে গলা ফাটালে কী হবে! তখন মনে ছিল না! দত্যির শুনতে বয়ে গেছে এ-সব কথা! সে দোলাবে আর খিমচোবে!

দোলাতে-দোলাতে হল কী, খচাং করে গাধাটার কান ছিঁড়ে গেল। কান ছিঁড়ে গাধাটা পড়ল গিয়ে পাঁচিলের ওপারে একেবারে প্রাসাদের বাইরে!

খটাং করে ছাগলটার ঠ্যাং ভেঙে গেল। ছাগলটা ছিটকে পড়ল গাধাটার ঘাড়ের ওপর!

ফটাং করে শুয়োরটার পেট ফেটে গেল। ফাটা পেট হাঁসফাঁস করতে-করতে সে মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ছাগলটার পিঠের ওপর। তারপর কী সাংঘাতিক বাজখাঁই গলায় হা-হা-হা করে হেসে উঠল দত্যিটা! ওমা! দেখ, হাসতে-হাসতে দত্যিটা কেমন ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে! ঝরতে-ঝরতে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে! দেখতে-না-দেখতে ওই তো, উবে গিয়ে হারিয়ে গেল!

আঃ! আবার খুশির মতো এক ঝলক নীল আলো সেই সোনালি প্রাসাদের মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। দামামার সেই গুরুগুরু গর্জনটা আবার যেন সেই তেমনি হালকা মিষ্টি সুরে বেজে উঠেছে। আহা! রূপসি সোনার প্রাসাদটা আবার শান্ত এখন।

যাই বলো তাই বলো, মারের গুঁতোয় বেচারিদের প্রাণ রাখা দায়! কান-কাটা, ঠ্যাং-ভাঙা, পেট-ফাটা তিন জন্তু যন্ত্রণায় ছটফটাচ্ছে। একে বলে দুর্দশার একশেষ! ছিল মানুষ হল জন্তু! কী কুক্ষণেই না তারা পাহাড়ের গুহার মধ্যে পালিয়েছিল! পালিয়েছিল, পালাক। কিন্তু এটা কেমন ভেলকি যে, তেষ্টার জল মুখে দিতেই তারা জন্তু হয়ে গেল! তাও না হয় সই, কিন্তু এখন একটা পুঁচকে ছেলের পাল্লায় পড়ে তাদের যে ঠ্যাং ভাঙল, কান ছিঁড়ল, পেট ফাটল, একে তুমি কী বলবে? না, না, তারা এর বিহিত না করে কিছুতেই ছাড়বে না। কত বড়ো ছেলে একবার দেখে নেবে তারা! দত্যি দিয়ে অপমান। ছিঃ! ছিঃ! অপমানের শোধ যদি না নিতে পারে তো জন্মই বৃথা!

হ্যাঁ, কান-কাটা গাধা কাঁদতে-কাঁদতে পাহাড়ের ওপর থেকে নামতে শুরু করল। ঠ্যাং-ভাঙা ছাগলটা লেংচে-লেংচে পাথরের ওপর থেকে নীচে হাঁটতে শুরু করল। আর পেট-ফাটা শুয়োরটা পেটে হাত চেপে ওদের পিছু নিল।

সকাল হবার আগেই তিন জন্তু পাহাড় ডিঙিয়ে নীচে নামল। নীচে নেমে শুয়োরটাই প্রথম কথা বলল, 'এখন কী করা?'

গাধা বলল, 'লুকিয়ে থাকা।'

ছাগল বলল, 'লুকিয়ে কেন থাকব! আমাদের চিনছে কে! এখন আমাদের সেই ম্যাজিকঅলার কাছে যেতে হবে! তাকে সব খুলে বলতে হবে।'

'তাতে লাভটা কী?'

ছাগল বলল, 'লাভ কী, গেলেই বুঝবি।'

ছাগলের কথা শুনে গাধা বলল, 'ক্ষতি না হলে, আপত্তি করি না।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তিন জন্তু ম্যাজিকঅলার খোঁজে চলল।

৮

ম্যাজিকঅলার বাড়ি কোনদিকে, সে তো আর ওদের অজানা নয়। তাই খুঁজতে হল না। বাড়ির দোরগোড়ায় এসে তিনজনে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর তিনজনেই একসঙ্গে হাঁক পাড়ল :

'ম্যাজিকঅলা, ম্যাজিকঅলা বাড়িতে আছ কী,
তোমার জন্যে জবর খবর সঙ্গে এনেছি!'

ম্যাজিকঅলা ডাক শুনে সাড়া দিল, 'কোন ডাকতা?'

'আমরা ডাকি, আমরা ডাকি ছাগল, শুয়োর, গাধা
দয়া করে একটু যদি বাইরে আসেন দাদা!'

ম্যাজি অলা দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই চক্ষু কপালে! আরে, আরে! সত্যিই তো তার ঘরের দোরে তিনটে জন্তু! 'এ তো ভারি তাজ্জব বাত আছে! গাধা কোথা বোলছে!'

ছাগল বলল, 'দেখুন ম্যাজিকবাবু, আপনি আমাদের দেখে ভুল বুঝবেন না। দেখুন, আমরা সত্যিকারের ছাগল, গাধা, শুয়োর নই। আমরা মানুষ। আপনার সঙ্গে সেই যে ছেলেটা ম্যাজিক দেখাত, সে আমাদের জন্তু করে দিয়েছে।'

ম্যাজিকঅলা চমকে উঠে ধমকে বলল, 'ছেলেটা!'

তিন জন্তু একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'আজ্ঞে হুজুর।'

'কিধার আছে ও ছেলেটা?'

শুয়োর বলল, 'আজ্ঞে আছে তো অনেকদূর! কিন্তু—'

ম্যাজিকঅলা রেগেমেগে বলল, 'কিন্তু-মিন্তু জানতা নেহি, আগে বোলো কিধার হ্যায় ও লেড়কা!'

ছাগল বলল, 'দেখুন বাবু, অত ব্যস্ত হলে সব ভেস্তে যাবে। ব্যাপারটা তো খুবই সাংঘাতিক। রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আপনাকে সব বলি কী করে! একটু আড়ালে না গেলে!'

'বাত তো ঠিকই আছে। তব ঘরমে আও।' ম্যাজিকঅলা ঘরের ভেতর ডেকে নিল। তিন জন্তু ঘরে ঢুকতেই দরজায় হুড়কো এঁটে দিল ম্যাজিকঅলা।

ঘরে ঢুকে ছাগল ইনিয়ে-বিনিয়ে সত্যি-মিথ্যে জড়িয়ে-মড়িয়ে বলল, 'দেখুন, আপনাকে তো আর সব কথা বলতে বাধা নেই। দেখুন, আমরা হলুম গিয়ে ধনকুবেরের তিন পুত্তুর! আমরা নানান দেশ ভ্রমণ করে এখন নিজের দেশে ফিরছিলুম। আমাদের সঙ্গে ছিল অমূল্য সব হিরে-জহরত, সোনাচাঁদি! তা বলব কী, আপনার ওই ছেলেটি আমাদের ভেলকি মেরে, আমাদের জন্তু বানিয়ে,

https://boierhut.com/fb

সর্বস্ব লুঠ করে নিল। শুনলুম নাকি ওই ছেলেটা আপনার কাছেই ভেলকি শিখেছে। শিখুক, সে তো ভালো কথা। কিন্তু তাই বলে আমাদের এই দশা করে ছাড়বে! শুধু তাই নয়, আমাদের সর্বস্ব নিয়ে সে এখন সোনার প্রাসাদ গড়ে দিব্যি আরামে আছে।' বলে ছাগলটা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তাকে দেখে গাধা-শুয়োরও কান্না জুড়ে দিল।

ম্যাজিকঅলা ছাগলের কথা শুনে আরও রেগে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'ও প্রাসাদ কিধার আছে?'

'আজ্ঞে তাও বলব। আপনাকে সঙ্গে করে নিয়েও যাব। কিন্তু দেখুন, আমাদের জন্তু করেও তার সাধ মেটেনি। সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঠ্যাংটাও ভেঙে দিয়েছে।'

গাধা চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'আমার কানটা ছিঁড়ে দিয়েছে।'



...হীরালাল আজ ছোট্ট একটি সাদা রঙের টাট্টু ঘোড়ার সওয়ার...

'আজ্ঞে আপনি দয়া করে আবার মন্ত্র পড়ে, আমাদের মানুষ না করে দিলে আমাদের গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে!' বলতে-বলতে তিন জন্তু এবার খুব জোরে কেঁদে উঠল।

আসলে জন্তুকে যে কেমন করে মানুষ করতে হয়, সে তো আর ম্যাজিকঅলা জানে না। তবু মিথ্যে-মিথ্যে তাকে তো একটা কিছু বলতে হয়! তা না হলে, এরা ছেলেটার খোঁজ সত্যি-সত্যি জানলেও, বলবেই না। তাই ম্যাজিকঅলা ভান করে বলল, 'দেখ ভাই, হামি সব ঠিক করে দেবে। লেকিন ও ছেলেটাকে তো পয়লে পাকড়াতে হোবে। ও হামার ঘর থিকে হাজার আদমি কো

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জানোয়ার বানাবার জাদু চুরি কোরে ভেগেছে। হামাকে আভি-আভি সেখানে লিয়ে চোলো, দের হোনেসে সব গড়বড় হয়ে যাবে।'

ম্যাজিকঅলার কথা শুনে ছাগল কাঁদতে-কাঁদতেই জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক তো, আপনি আবার আমাদের মানুষ করে দেবেন তো?'

ম্যাজিকঅলা ছাগলের দাড়িতে হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, 'ঠিক বলছে, ঠিক বলছে!

গাধা নাকি-সুরে বলল, 'ঠিক তো, আপনি আমার কাটা কানটা জোড়া দিয়ে দেবেন তো?'

ম্যাজিকঅলা গাধার গোটা কানটায় সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, 'দিবে, দিবে, ঠিক দিবে।'

শুয়োরটা ফাটা-সুরে বলল, 'ঠিক তো, আপনি আমার ফাটা পেটটা গোটা করে দেবেন তো?'

ম্যাজিকঅলা শুয়োরের ফাটা পেটে হাত বুলিয়ে বলল, 'দিবে দিবে, সব দিবে।'

'তবে চলুন আমাদের সঙ্গে।'

৯

আহা! সকালবেলা সোনা রোদের আলোয় হীরালাল আজ ছোট্ট একটি সাদা রঙের টাট্টু ঘোড়ার সওয়ার হয়ে কেমন পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ছুটে বেড়াচ্ছে! রেশমি পোশাক পরেছে। মাথায় পালক আঁটা পাগড়ি। পায়ে জরি-বসানো নাগরা। কী মিষ্টি দেখতে লাগছে! আর ওই দেখ, ওর সঙ্গে আরও কত ঘোড়সওয়ার! ওমা! ঠিক যেন পল্টনের দল। হ্যাঁ, পল্টনই তো। হীরালাল খেলবে আর ওই সোনার প্রাসাদের পল্টনরা তাকে দূর থেকে দূরে, আরও দূরে নিয়ে যাবে। যেখানে এই পাহাড়টা শেষ, সেখানে। সেখানে দূর-পাহাড়ের গা বেয়ে কত উঁচু থেকে নীচে রাশি-রাশি জল লাফিয়ে পড়ছে। পড়তে-পড়তে পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে নেচে-নেচে ছুটে যায়! আর নয়তো এই পাহাড়ে ওই যেখানে নীল আকাশে মেঘের সঙ্গে আলোর লুকোচুরি খেলা হচ্ছে, কিংবা নানা-রং পাখা মেলে ওই যেখানে প্রজাপতিরা ফুলের সঙ্গে মিতালি পাতাচ্ছে, সেখানে ছুটে যায় হীরালাল। তারপর ছুটতে-ছুটতে মেঘের ফাঁকে, নয়তো ফুলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। তারপর চেঁচিয়ে ডাকে, 'তোমায় বলে টুকি!'

খিলখিল করে হেসে ওঠে সে। সেই মেয়েটি হাসতে-হাসতে বলে, 'টুকি তো আমি তোমায় দেব। তুমিই তো আমায় দেখতে পাচ্ছ না!'

হীরালাল জিজ্ঞেস করল, 'আমি মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও তুমি দেখতে পাও?'

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হঠাৎ কেন হীরালালের ঘোড়াটা ডেকে উঠল, 'চিঁ-হিঁ-হিঁ!' ঘোড়ার পিঠে পল্টনরা সজাগ হয়ে চোখ ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

তাইতো! ঘোড়া কেন ডাকে! দেখা গেল একটা গোদা চিল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল:

শঙ্খচিলের ঘটি বাটি,
গোদা চিলের দাঁতকপাটি!

চিলটা উড়তে-উড়তে ওইখানে পাক মারছে কেন? আকাশের ওইখানটায়?

ওইখানে, পাথরের আড়ালে ম্যাজিকঅলা আর সেই তিন জন্তু ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখছে হীরালালকে। দেখছে সেই সোনার প্রাসাদ। যতই দেখছে, ততই বেবাক হয়ে যাচ্ছে।

চিলটা উড়তে-উড়তে যখন আকাশ পেরিয়ে চোখের বাইরে চলে গেল, তখন পল্টনরাও হীরালালকে নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর সিংদরজা বনধ!

এইসব এলাহি কাণ্ড দেখে ম্যাজিকঅলার আর কী সাহস হয় হীরালালের কাছে যাওয়ার! একবার যদি দেখে ফেলে পল্টনরা তা হলে আর রক্ষে নেই। গুঁতোর চোটে ঠুঁটো করে ছেড়ে দেবে।

হঠাৎ ছাগলটা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী করবেন ম্যাজিকবাবু? এইখানে বসে থাকবেন?'

ম্যাজিকঅলা তার গলার স্বর আরও নামিয়ে, একেবারে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'বাত বহুত মুশকিল আছে। এ তো তোমি-হামি পারবে না। ও ব্যাটা পল্টন লোগ তরোয়ালসে কাটকে হামাদের পাহাড়কা উপরসে নীচে ফেলে দিবে।'

'তাহলে?'

'লড়াই কোরতে হোবে। চোলো পাহাড়সে নীচে চোলো। রাজাকা পাশ হামলোগ যাবে। রাজাকে সব বলব!'

ছাগল, গাধা, শুয়োর তিনজনে বললে, 'তা ঠিক। সেই ভালো।'

আজ পূর্ণিমা। আজ খই ফুটবে চাঁদের আলোয়। আজ দূর আকাশে সোনায় গড়া একটি নিটোল টিপের মতো চাঁদ উঠবে। আর তারপরেই হীরালাল সব জানতে পারবে। জানতে পারবে কে এই মেয়েটি। কেননা, সে বলেছে, যেদিন পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে, সেদিন সে দেখা দেবে। তাই হীরালাল আজ বারবার আকাশে চেয়েছে আর ভেবেছে, রাত আসতে কত দেরি! তাই ও ছুটে গেছল পাখির ঘরে। ন্যাজঝোলা পাখি বলেছিল, 'রাত আসবে দিন গড়ালে।'

ফুলবাগানের ফুল বলেছিল, 'রাত আসবে রাতের বেলা।'

হ্যাঁ, রাতের বেলা রাত এসেছিল ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্য, চাঁদ তো উঠল না। আজকের রাত এত অন্ধকার কেন? আজ সাদা মেঘের দল ঘুম দেবার জন্যে নেমে আসেনি পাহাড়ের গায়ে-গায়ে! আজ

https://boierhut.com/fb

তারা ছাই-ছাই পোশাক পরে কালো মেঘের সঙ্গে দল বেঁধেছে। আকাশে আজ মেঘ করেছে। তবে কি সত্যিই মেঘের আড়ালে আজ লুকিয়ে থাকবে চাঁদ? দেখা দেবে না?

হীরালালের মুখেও আজ খুশি নেই। ও দূর-আকাশের দিকেই চেয়ে ছিল আর দেখছিল, কখন জ্যোৎস্নার আলো ওই কালো মেঘের মুখ রাঙিয়ে এই প্রাসাদের সোনার ওপর গড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ নূপুর বেজে উঠল! সেই মেয়েটি আসছে বুঝি! হীরালাল জানে, এই নূপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে সে আসে তার কাছে। হ্যাঁ, এসেছে সে। হয়তো সে হীরালালের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে এখন। আজ মুখখানি ভারি শুকিয়ে গেছে হীরালালের। সে জিজ্ঞেস করেছিল হঠাৎ, 'কী ভাবছ, হীরালাল?'

হীরালাল একবুক নিশ্বাস নিয়ে হতাশ সুরে বলেছিল, 'আজ বোধহয় চাঁদ উঠবে না।'

'মন খারাপ লাগছে?'

হীরালাল উত্তর দিয়েছিল, 'আজ পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে তুমি আমায় দেখা দেবে বলেছ। চাঁদ না উঠলে তোমায় যে জানতে পারব না!'

সে চুপ করে ছিল একটুক্ষণ। তারপর সে কথা বলেছিল। হাওয়ায় ঝুরুঝুরু পাতার মতো তার গলাটি কেঁপে উঠেছিল কান্নায় ভিজে। তারপর জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, আমায় নাই-বা দেখতে পেলে? আমি তো তোমার কাছে-কাছেই আছি হীরালাল?'

হীরালাল বলেছিল, 'এ আবার কী থাকা? আমার মা যখন আমার কাছে থাকে, তখন মা তো তোমার মতো হারিয়ে থাকে না! মাকে আমি ছুঁতে পাই। মা আমায় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আমার দিদির গল্প বলে!'

হয়তো সে এবার ডুকরে কেঁদে ফেলত। সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী গল্প হীরালাল?'

'সে অনেক। জানো, দিদি আমায় গান শোনাত!'

'কেন আমিও তো শোনাই।'

'দিদি আমায় কত আদর করত!'

'কেন, আমি বুঝি করি না?'

'পুজোর সময় নতুন পোশাক পরে দিদি আমায় ঠাকুর দেখতে নিয়ে যেত! মা বলেছে, দিদি যখন নতুন পোশাকে সাজত, কী সুন্দর দেখতে লাগত দিদিকে!'

সে চুপ করে গেল।

'চুপ করলে যে!' হীরালাল জিজ্ঞেস করল।

তবু সে কথা বলল না।

হীরালাল আবার জিজ্ঞেস করল, 'কথা বলবে না? আমার দিদির গল্প শুনে তোমার রাগ হয়েছে বুঝি?'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সে কথা বলল না। শুধু তার নূপুর দুটো হঠাৎ মেন ব্যস্ত হয়ে ছটফটিয়ে বেজে উঠল। সে বোধহয় চমকে উঠেছে।

চমকেই তো উঠেছে সে। কেননা, আকাশের কালো মেঘ সরে গেছে। ওই প্রাসাদের স্বপ্নরাজ্যের ছোট্ট ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদের আলো! এবার তাকে কথা রাখতে হবে! দেখা দিতে হবে হীরালালকে!

হীরালাল আনন্দে হাসিতে চিৎকার করে উঠল, 'চাঁদ, চাঁদ।'

গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

এ কী! এত সৈন্য কখন চুপিসারে এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এসেছে! অসংখ্য সৈন্য পাহাড়ের গায়ে থিক-থিক করছে! তাদের হাতে বন্দুক। তারা পাহাড়ের মাথায় টেনে তুলেছে কামান!

গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

সেনারা তিনদিক থেকে প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে! ওই তো ওদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সেই ম্যাজিকঅলাকে। ওই তো সেই তিন জন্তু! সেনারা কামান দেগে এগিয়ে চলেছে, গুড়ুম! গুড়ুম!

হীরালাল শিউরে উঠল, 'কে? কীসের শব্দ?'

সে শান্ত গলায় বলল, 'কিচ্ছু না। তোমার কিচ্ছু ভয় নেই।

তুমি এসো আমার সঙ্গে।' তার পায়ে-চলার নূপুর বেজে উঠল।

হীরালাল সেই নূপুরের শব্দ শুনে তার পিছু নিল।

গুড়ুম! গুড়ুম! কামানের গোলা উড়ে এসে ওই অমন সুন্দর সোনা দিয়ে গড়া প্রাসাদের গায়ে ছিটকে পড়ছে।

সে বলল, 'হীরালাল, তাড়াতাড়ি এসো।'

তার নূপুরের শব্দ শুনে মনে হল, সে ছুটছে।

হীরালালও ছুটল।

মনে হল মেয়েটি প্রাসাদের পিছনের দ্বার দিয়ে বাইরে চলে এল।

হীরালালও সেই পথে তার পিছু নিল।

সৈন্যরা স্রোতের মতো ধেয়ে আসছে প্রাসাদের দিকে। সোনার প্রাসাদের মাথার ওপর জ্যোৎস্নার আলো উছলে পড়েছে। সৈন্যরা প্রাসাদের সিংদরজা ভেঙে ফেলল। সোনার ঝলমলানি ঠিকরে-ঠিকরে চমকে উঠছে। সেনাদের চোখ ঝলসে যায়! তারা দেখতেই পেল না, তাদের চোখের সামনে দিয়েই একটি ছোট্ট ছেলে ছুটে যাচ্ছে। দেখতে পেল শুধু গাধাটা। সে একাই চিৎকার করে উঠল 'পালাচ্ছে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এত হট্টগোলে কে শুনছে তার কথা! অবিশ্যি শুনতে পেয়েছিল ম্যাজিকঅলা। শুনেও সে চেঁচিয়ে উঠল, 'যানে দেও। অন্দর মে সোনে আছে।' বলে সে রাজার সৈন্যদের সঙ্গে হুড়মুড় করে প্রাসাদে ঢুকে পড়ল।

যুদ্ধ করতে এল সৈন্যরা। যুদ্ধ করে তারা ছেলেটাকে বন্দি করবে। কিন্তু এখন নিজেরাই যুদ্ধ ভুলে সোনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যত পার এখন সোনা নাও। দু হাত ভরে তুলে নাও। তারা ভাঙতে শুরু করে দিল প্রাসাদের সোনার পাঁচিল। টুকরো-টুকরো হয়ে সোনা ছিটকে পড়ছে চারিদিকে। অসংখ্য সৈনিক সেই সোনার টুকরোর ওপর লাফিয়ে পড়ে চিৎকার করছে আর লুটে নিচ্ছে। তাদের সাধ মিটছে না। তারা চায়। আরও চায়। আরও ভাঙো। আরও কামান দাগো। গুড়ুম! গুড়ুম! প্রাসাদটা ভেঙে চুরমার করে দাও। ধড়-ধড়-ধড়-ধড়াস! দুম-দাম!

হঠাৎ কী ভয়ানক কানফাটা শব্দ শোনা গেল! তারপর আর্তনাদ করে উঠল কারা, 'বাঁচাও, বাঁচাও!'

এ কী সর্বনাশ! প্রাসাদটা যে ভেঙে চুর-চুর হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল! প্রাসাদের ধবংসস্তূপের তলায় ওই তো সেনার দল চাপা পড়ে আর্তনাদ করছে। ওই তো চিৎকার করছে ম্যাজিকঅলা আর তিন জন্তু। না, এখন কেউ নেই এখানে ওদের বাঁচাবার। কেউ শুনতে পাবে না ওদের কান্না। ওই প্রাসাদের সোনার চাপে একটু পরেই ওদের বুকের ধুকধুকি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। তখন আর এই সোনা লুঠ করার জন্যে ওরা চিৎকার করে লাফাবে না। দু-হাত বাড়িয়ে ছুটবেও না।

১০

দেখ, দেখ! হঠাৎ কেমন চাঁদের আলো ঢেউ খেলছে! দেখ, ঢেউয়ের ওপর দুলতে-দুলতে কে যেন তার সাদা পোশাকখানি উড়িয়ে দিয়ে ছুটে যায়। মেঘবরন চুলের রাশি তার মুখখানি ঢেকে দেয়, আবার সরিয়ে নেয়! এই তাকে দেখা যায়, আবার আলোর ঢেউয়ে হারিয়ে যায়! তাকে হীরালাল দেখতে পেয়েছে। হীরালাল কিছু বলার আগেই সে হাত বাড়াল। বলল, 'হীরালাল, তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরো।'

হীরালাল তার হাত ধরল। হীরালালের হাত ধরে পাহাড়ের পাথর ডিঙিয়ে হাওয়ার মতো ছুটে গেল সে! অনেকদূর চলে এসেছে তারা। পাহাড়ের ওপরে, আরও ওপরে।

ছুটতে-ছুটতে সে জিজ্ঞেস করল, 'হীরালাল, আমায় দেখতে পাচ্ছ?'

হীরালাল বলল, 'তোমায় ছুঁতে পারছি।'

'আমায় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আরও ছুটতে হবে, পারবে?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হীরালাল জিজ্ঞেস করল, 'কত দূর?'

'ওই পাহাড়ের ওপারে!'

'ওখানে কী আছে?'

সে বলল, 'ওখানে ছোট্ট নদী আছে। নদীর বুকে নৌকো আছে। কাশফুলের ঢেউ আছে। শিউলি ফুলের গন্ধ আছে। ছোট্ট মাটির ঘর আছে। মা আছে আর লক্ষ্মী আছে।'

'আর তুমি?'

এবার তার গলার স্বর কেঁপে উঠল। ছুটতে-ছুটতে কাঁপা স্বর হাওয়ায় ভেসে হীরালালের কানে এল, 'আমি তো নেই, আমি হারিয়ে গেছি!'

হীরালাল হেসে ফেলল। বলল, 'তুমি কী মিথ্যে বলো! কই তুমি হারিয়ে গেছ? এই তো, আমি তোমায় ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ছুটছি। আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি!'

জ্যোৎস্নায় আঁকা ওর আঁচলখানি হাওয়ায় উড়ে এসে হীরালালের কপালখানি ছুঁয়ে গেল! হীরালালের চোখের তারা হঠাৎ আলোয় চমকে উঠল। অবাক হয়ে হীরালাল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে?'

সে বলল, 'আমি পূর্ণিমা।'

'ওমা! আমার দিদির নামও তো ছিল পূর্ণিমা। মা বলেছে, দিদি আমার মেঘের দেশে চলে গেছে। জানো, যেদিন থেকে দিদি চলে গেছে, সেদিন থেকে হীরামন নামটাও আমার হারিয়ে গেছে। আর ও-নামে কেউ ডাকে না আমায়।'

সে ছুটছে। ছুটতে-ছুটতে সে ডেকে উঠল, 'হী-রা-ম-ন।'

আঃ! কী মিষ্টি সে ডাক। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে সেই ডাকে যেন গানের সুর ছড়িয়ে গেল! সেই সুরে সুর মিলিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় একটি পাখি ডেকে উঠল, 'হী-রা-ম-ন!'

ছুটতে-ছুটতে আনন্দে শিউরে উঠল হীরালাল।

সে আবার ডাকল, 'হী-রা-ম-ন!'

চাঁদের আলোর সঙ্গে লুটোপুটি খেতে-খেতে বাতাসেরা হেসে উঠল, 'হী-রা-ম-ন!'

হীরালাল খুশিতে আরও জোরে তার হাতখানি চেপে ধরল।

সে ছুটে যায়। হীরালালের খুশি দেখে সে আবার ডাক দিল, 'হী-রা-ম-ন!'

আর থাকতে পারল না হীরালাল। কী তার মনে হল, সেই সুরে সুর মিলিয়ে হীরালালও ডেকে ফেলল, 'দি-দি'। তবে কি হীরালাল জেনে ফেলেছে এখন, যার হাত ধরে সে ছুটে যায়, সে-ই তার দিদি! হবেও বা।

আনন্দে-খুশিতে হীরালাল এখন দিদির হাত ধরে ছুটবে। ছুটতে-ছুটতে হাসবে। না-হয় জ্যোৎস্নার আলোর মতো হাওয়ায় ঢেউ তুলে নেচে উঠবে।

https://boierhut.com/fb

কিন্তু হঠাৎ এ কী হল! হীরালাল হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল যেন। হ্যাঁ, ওই তো হীরালালের পা পিছলে গেল পাথরের ওপর। দিদির হাত ফসকে সে যে ওই অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছে! কী সাংঘাতিক! ও হয়তো খুশিতে ছুটতে-ছুটতে দেখতে পায়নি, যেখানে সেই মস্ত উঁচু পাথরে লাফিয়ে-লাফিয়ে রাশি-রাশি জল নীচে গড়িয়ে পড়ছে, সেখানে পিছল। পড়তে-পড়তে ভয়ে চিৎকার করে উঠল হীরালাল, 'দি-দি-ই-ই-ই!'

কই দিদি! যেদিকে চাও শূন্য। দিদি নেই, কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু এক ঝলক দমকা হাওয়া তোলপাড় করে একটি ছোট্ট মেয়ের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'হী-রা-ম-ন-ন-ন।'

কাঁদতে-কাঁদতে সেই হাওয়া পাথরে-পাথরে মাথা কুটতে লাগল। সেই হাওয়া গাছে-গাছে ঝড় তুলল। সেই হাওয়া আকুল হয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

পাহাড়ের ওপর থেকে ওই রাশি-রাশি জল কেমন পাথরে-পাথরে লাফ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। গড়িয়ে-গড়িয়ে নীচে কেমন একটি ছোট্ট নদীর মতো ঝুমঝুম করে ঝুমঝুমি বাজিয়ে বয়ে যাচ্ছে! ওই দেখ-না পূর্ণিমার চাঁদটি নদীর জলে ছায়া মেলে দোল খাচ্ছে!

হীরালাল পাহাড়ের ওপর থেকে ওই নদীর বুকে পড়ল বোধহয়! সে পড়ল, কিন্তু আশ্চর্য, সে তো অতল তলে তলিয়ে গেল না। জলের ছায়ায় ওই পূর্ণিমার চাঁদটি যেন কোল পেতে ওকে কাছে টেনে নিয়েছে। না, চাঁদ ওকে ডুবতে দেবে না। হীরালাল নদীর জলে ভেসে যায়। চাঁদও ভাসতে-ভাসতে জলের দোলায় দোল খায়।

দুলতে-দুলতে ঘুমিয়ে পড়ল হীরালাল। তারপর কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ দেখতে পেল না।

খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল হীরালালের। চোখ চেয়ে অবাক হয়ে গেল হীরালাল। আরে! কী সুন্দর ছোট্ট একটি নৌকোতে শুয়ে আছে সে! ধড়ফড় করে উঠে পড়ল হীরালাল। ও মা! এ যে তাদেরই সেই ছোট্ট নদী। তাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। ওই তো দূরে বন! এই তো তাদের ঘরে যাওয়ার রাস্তা!

নৌকো থেকে নদীর ঘাটে নেমে পড়ল হীরালাল। নদীর জলে নিজের মুখখানি একবার দেখে নিল। আকাশে চাইল। নীল আকাশে সোনালি সূর্য সকালের খুশি ছড়িয়ে দিয়েছে। হাঁটা দিল হীরালাল।

আর একটু হাঁটলেই তাদের ছোট্ট ঘরখানি। ছোট্ট ঘরে মা কাঁদছে হীরালালের জন্যে। ঘরে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে, মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিল সে। তারপর বলল, 'কেঁদো না মা। আমি তোমার হীরালাল। এই তো তোমার কাছে ফিরে এসেছি।' বলতে-বলতে সে-ও কেঁদে ফেলল। হঠাৎ কোত্থেকে লক্ষ্মীর বাচ্চাটা ছুটে এসে ওর পিঠে মুখ ঠেকিয়ে ওকে আদর করল। সে হয়তো বলল, 'কেঁদো না হীরালাল। আমার সঙ্গে খেলবে এস।'

হীরালাল বুঝবে কি তার কথা? না সে কাঁদবে, এখনও?

হ্যাঁ, হীরালাল কাঁদবে আর চমকে-চমকে ভাববে, ওই যেন তার পায়ের নূপুর বেজে উঠছে! ওই যেন সে হাত দুলিয়ে ডাকছে তাকে! বুঝি তার গলার স্বরে সোনা ঝরছে, হী-রা-ম-ন! হী-রা-ম-ন!

এ-ডাক তুমিও শুনতে পাবে। শুনতে পাবে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-নিঝুম রাতে যদি একমনে কান পেতে শোনো। শুনবে, এখনও সে কাঁদছে। ফোঁটা-ফোঁটা কান্নায় যেন বেজে-বেজে উঠছে, হী-রা-ম-ন! হী-রা-ম-ন!

সমানানুপাতি

সমানানুপাতী

https://boierhut.com/fb

কে জানত যে খাঁচার দরজাটা খুললেই পাখিটা অমন আচমকা উড়ে পালাবে/ আজ যে পাখিটা তক্কে-তক্কে ছিল, সে-কথা ঘুণাক্ষরেও টোরা জনাতে পারেনি/পাখি পেটে-পেটে কী বুদ্ধি ফেঁদে রেখেছে, তা মানুষে জানবে কেমন করে/ পালাবি, পালা, কে বারণ করছে/ তাই বলে টোরার হাতের ফাঁক দিয়ে/ কে বলেছিল ওই ছোট্ট মেয়েটাকে অমন বিপদে ফেলতে/

অবশ্য টোরার কোনো দোষ ছিল না। সকাল থেকে নতুন মায়ের হুকুম শুনেতে শুনতে যেন আর শরীর বইছে না। ভারি ক্লান্ত। আজ সে ভারি আনমনা। কোন সকালে সে বাদশাকে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। তারপর ঘর পরিষ্কার করেছে। বাসন মেজেছে। দোকান ছুটেছে। বাদশার জামা কেচেছে। কাজের কি আর শেষ আছে। এত কাজ ওই একফোঁটা মেয়ে যে মুখ বুজে করতে পারছে সেইটাই বাহাদুরি। কাল বাবা বাদশার জন্যে একটা রঙিন ছবির বই কিনে দিয়েছে। কী সুন্দর বইটা। কত ছবি। একটা ছবি অবশ্য বাদশা ওকে দেখিয়েছে। এক পেটমোটা ভোম্বল সর্দার তরোয়াল নিয়ে লড়াই করতে গিয়ে দুম-ফট/ পা পিছলে আলুর দম/ ছবিটা দেখে কী হাসিই না পাচ্ছিল টোরার। কিন্তু সব ছবি তো আর দেখা হয়নি। হয়তো পাতায়-পাতায় আরও কত মজার মজার ছবি আছে। কখন থেকে ভাবছে বইটা দেখবে, এখনও পর্যন্ত ফুরসুত পেল না। টোরার ভারি ইচ্ছে, অনেক পড়বে সে। অনেক পড়তে-পড়তে ও ছোট্ট ভাই বাদশাকে দেখাবে রাতের অন্ধকারে নীল আকাশের কোন পারে সপ্তঋষি তারার আলো জ্বেলে ধ্যান করছেন। নয়তো কোন পথটি পেরিয়ে-পেরিয়ে চাঁদের দেশে মানুষ যাচ্ছে। কিংবা শীতের ভোরে কোন পাখিটি অনেক পাহাড় অনেক বন পাড়ি দিয়ে এই বনেতে বাসা বেঁধে গান গাইছে/

সে না হয় হল। বই না হয় না-ই দেখা হল। কিন্তু পাখিটি যে উড়ে পালাল, তার কী হবে/ রোজ সকালে টোরা পাখিকে চান করাবে। খাঁচাটা পরিষ্কার করবে। একবাটি ছাতু দেবে, খাবার জল দেবে। তারপর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আদর করে বলবে, 'পাখি, পাখি, বলো তো বাদশা-দাদা ঘরে এসো, আমার কাছে একটু বসো।'' কিন্তু পাখি ছাতু খাবে আর টোরার দিকে চেয়ে-চেয়ে ল্যাজ নাড়বে/ কথা বলবে না/ কথা বলে না বলে টোরা ধমক দেয়, পাখি অমনি খাঁচার ভেতর ঝটপটিয়ে কপচায়/ কিন্তু আজ/ পাখি ফুড়ুত/ অবশ্যি টোরা যে চেষ্টা করেনি, তা নয়/ ধড়ফড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেছল পাখিটাকে/ কিন্তু ফোক্কা/ পাখি পগারপার/ উলটে টোরার হাতে ঠ্যালা খেয়ে খাঁচাটা গোঁত মেরেছে। ছাতুর বাটি ছিটকে ছড়িয়ে নৈরেকার/

নতুন-মা তো আর কালা নয়/ শব্দ শুনেই চেঁচিয়ে উঠেছে, 'কী হল রে টোরা?'

নতুন-মায়ের মুখখানা চোখে ভেসে উঠতেই ভীষণ ভয়ে কেঁপে উঠল টোরার বুকখানা/

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে নতুন মা, 'কী ফেললি, কী?'

টোরার মুখে রা নেই। খাঁচাটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে কাঁপছে সে/

টোরার মুখে রা না-থাক, নতুন মায়ের চোখে তো আর ঠুলি বাঁধা নেই। ছিটকে-পড়া খাঁচাটার হাঁ-করা দরজটা দেখলে কাণ্ডটা যে কী হয়েছে, সে তো আর জানতে বাকি থাকে না। চিৎকার করে আঁতকে উঠেছে নতুন-মা, 'পাখি কোথা গেল?'

আমতা-আমতা করে কাঁপা-গলায় উত্তর দিলে টোরা, "উড়ে গেল।"

তারপর যে কী হবে, সেসব টোরার জানা। নতুন-মা চিল-চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। টোরাকে বককে-বকতে পাঁচশোবার বলবে, 'আহ্লাদী মেয়ে, আমার হাড়মাস কালি করে দিলে। কাজ তো কত করছ, শুধু অকম্ম/ এবার তোকে দূর করে দেব। দেখি এবার তোকে কে রক্ষে করে/'

টোরা আর একটি কথাও বলবে না। নিজের ঘরে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকবে। তারপর বাবা যখন আসবে, টোরাকে ডাকবে। লুকিয়ে-লুকিয়ে আদর করবে। তখন টোরার ভয় ভাঙবে।

কিন্তু আজ তো তা হল না। আজ তো নতুন-মা ওকে শুধু গাল পেড়ে ক্ষান্ত হল না। হঠাৎ টোরার গালে চড় মারল। নরম তুলতুলে গালটা ওর লাল হয়ে গেল। ওর কানটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে সত্যিই বার করে দিল। বার করে দিল ঘর থেকে রাস্তায়। অভিমানে মুখটা ফুলে উঠেছে টোরার/ নিমেষে সে যেন বে-বাক হয়ে গেল/ সত্যিই কি নতুন-মা আজ তাকে দূর করে দিল/

টোরাকে কেউ মারে না। কোনোদিনও না। আজই প্রথম ও মার খেল। মার খেল নতুন-মায়ের হাতে। কেন? ও তো কোনো দোষ করেনি। ও তো ছোট্ট। পাখিটা তো ও আর ইচ্ছে করে আকাশে উড়িয়ে দেয়নি। পাখিটা যে পেটে-পেটে অমন মতলব এঁটে বসেছিল, খাঁচা খুললেই পালাবে, সে আর টোরা জানবে কেমন করে/ তাই বলে টোরাকে এমন করে মারবে/ঘর থেকে বার করে দেবে নতুন-মা/ সবাই দেখছে টোরাকে। ভাবছে, না জানি কী অন্যায় করেছে টোরা/ কী লজ্জা/

না, সবাই জানে টোরা কোনো অন্যায় করেনি। সবাই জানে নতুন-মা টোরাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। রাতদিন হেনস্তা করবে। সৎ-মেয়ে তো/ দু-বেলা নাকে দড়ি দিয়ে খাটাবে। ওর কি এখন খাটবার বয়েস/ আহা/ খাটতে-খাটতে মেয়ের কী দশা হয়েছে এখন/ ওর মা যখন বেঁচে ছিল, তখন কী যত্নেই না ছিল টোরা/ দেখতেও ছিল তেমনি। যেমন গায়ের রং, মুখখানাও তেমনি মিষ্টি। ভারি ভালোবাসতে ইচ্ছে করে/

টোরাকে ভালোবাসে সবাই। সবাই জানে, লক্ষ্মী মেয়ে টোরা। ভারি নরম। নরম তার মনটি, মনের ভেতরটি/

ঘরের দরজা বন্ধ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এখন কী করবে টোরা ভেবে পাচ্ছে না। লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে টোরা। ভয় হচ্ছে, সত্যিই যদি নতুন-মা ওকে আর ঘরে ঢুকতে না দেয়/

https://boierhut.com/fb

তবে যাবে কোথা সে? জানে না টোরা, কোথায় তার আপনজন আছে। কে তাকে আদর করবে বাবার মতো। ভালোবাসবে ছোট্ট ভাই বাদশার মতো।

খুব ভালোমানুষ টোরার বাবা। নতুন-মা টোরাকে বকলে বাবার মনের ভেতরটা ভীষণ কষ্টে গুমরে ওঠে। বাবা তবু মাকে কিছু বলবে না। বাবা তো জানে কিছু বললেই নতুন-মা চেঁচিয়ে-মেচিয়ে পাড়া মাত করবে। কী দরকার। একটা কথা বললে খ্যাঁক-খাঁক করে যে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়, তার সঙ্গে লেগে কী লাভ/ মেয়েকে বকলে দুঃখে বুকটা ভরে যায় বাবার/ আর তাই সেই ভার নামাতে সে মেয়েকেই বুকে জড়িয়ে আদর করে।

সত্যি, বাবার জন্যে টোরাও ভীষণ খারাপ লাগে। আগে বাবা কত গল্প বলত, মুখখানা সব সময় হাসি-খুশি। আর এখন? ভারি চুপচাপ বাবা/ খুব মেঘ করলে আকাশটা যেমন অন্ধকার হয়ে যায়, বাবার মুখখানাও তেমনি অন্ধকার/ টোরা সব বোঝে। কিন্তু কী করবে ওই এক-ফোঁটা ছোট্ট মেয়ে/ মাঝে-মাঝে ভাবে, বাবার হাত ধরে চলে যাবে কোথাও। অনেক দূরে। না, পারে না। সে-কথা ভাবলেই ওর ভাইটির কথা মনে পড়ে যায়। বাদশা এত ভালোবাসে তাকে। ভাবতেই পারে না টোরা তার ভাইকে ছেড়ে সে অনেক দূরে চলে যাবে। বাদশা তার সৎ-ভাই। কিন্তু টোরার কোনোদিনই তো সে-কথা মনে হয় না। বাদশাও জানে টোরা তার দিদি। দিদির আবার পর-আপন আছে নাকি/ দিদির সঙ্গে বাদশা ইস্কুলে যায়। ইস্কুলে যাবার আগে দিদি ওকে জামা-প্যান্ট পরিয়ে দেবে। বই-খাতা গুছিয়ে দেবে। জুতোয় ফিতে বেঁধে দেবে। ইস্কুল তো খুব দূরে নয়। তবু দিদির হাত ধরে ইস্কুলে যেতে বাদশার খুব ভালো লাগে। ওইটুকু রাস্তা যেন কত মজার/ দিদির সঙ্গে কথা, শুধু কথা। গল্প আর গল্প। যেন শেষ নেই তার। এ-মজা যেন শেষ হবে না কোনোদিনও। বাদশা দিদির সঙ্গে না খেলে ওর যেন খিদে মেটে না। একসঙ্গে খেলবে, ঘুমুবে, নয়তো রাত্তিবেলা মোমবাতির আলো জ্বেলে দু-জনে গুনগুন করে ছড়া পড়বে, কিংবা গান গাইবে। তারপর যখন মোমের আলো জ্বলতে জ্বলতে নিভে আসবে, আগুনের ছোঁয়ায়-ছোঁয়ায় মোমের ফোঁটা গলতে-গলতে ফুরিয়ে যাবে, তখন হাই উঠবে বাদশার। দিদি বলবে, 'বাদশা, এবার ঘুমো।'

বাদশা উত্তর দেবে, 'তুই ভাবছিস আমার ঘুম পাচ্ছে?'

দিদি বলবে, "অনেক রাত হল।"

বাদশা দিদির দিকে চাইবে অন্ধকারে। তারপর বলবে, 'রাত কই রে। এখনও রেলগাড়িটা গেল না।'

রেলগাড়িটা রোজ যায়। রোজ যায় এমনি সময় এই রাতে, ওই দূরের অন্ধকার ছুঁয়ে-ছুয়ে। কু/ জেগে থাকলেই বাদশা ছুটে যাবে জানলার ধারে। জানলার গরাদে গাল দুটি ঠেকিয়ে দেখবে। দেখবে, রেলকাম ঝমাঝম করতে-করতে রাতের গাড়ি ছুটছে। অন্ধকারে গাড়ির সঙ্গে আলোর ঝিকিমিকি রোশনাইটাও যখন ছুটতে থাকে, তখন বাদশারও মন ছুটে চলে। মন চলে যায় অ-নে-

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ক অনেক দূরে। হয়তো কোনো পাহাড়ের দুর্গম চূড়ায়, নয়তো গাছগাছালি ভরা কোনো গহন বনের গভীরে। কিংবা ঢেউভাঙা উচ্ছল কোনো সমুদ্রের তীরে-তীরে।

অবশ্যি কোনোটাই দেখেনি বাদশা। দেখেনি পাহাড়, জানে না সমুদ্র কেমনতর। কে জানে, গহন বনের গভীরে সূর্যের আলো যায় কি না-যায়। ও শুনেছে, পাহাড়ের চূড়া আকাশের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। পাহাড়ের চূড়ায় তুষারের মুকুট সূর্যের আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠলে চোখ ঝলসে যায়। সে নাকি ভারি ভালো লাগে দেখতে। ও দিদিকে বলে, 'দিদি, বড়ো হলে রেলগাড়ি চেপে আমরা দুজনা অনেক দূরে চলে যাব। পাহাড় ডিঙিয়ে, বন পেরিয়ে সমুদ্দুরে পাড়ি দেব। যাবি না তুই?'

টোরা হাসে।

হাসতে দেখলেই বাদশা দিদিকে জড়িয়ে ধরবে। দিদির হাসিটা এত ভালো লাগে বাদশার।

হাসতে-হাসতেই দিদি বলবে, 'আমি গেলে মাকে দেখবে কে?'

বাদশা বলে, 'দিদি, তুই ভারি বোকা/ মা-র কাছে তো রাতদিন বকা খাচ্ছিস, তবু মা-র জন্যে তোর এত ভাবনা/'

টোরা চাপা সুরে ধমক দেবে বাদশাকে। বলবে, 'ছিঃ, ও কথা বলতে আছে/ দোষ করলে মা বকবে না?'

'তুই দোষ না করলেও তো মা তোকে বকে। আমি যেন জানি না।'

'চুপ/' টোরা ভয় পায়। তাড়াতাড়ি বাদশার মুখখানা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে। বলে, 'মা জানতে পারলে আস্ত রাখবে না'

'টোরা।'

কে ডাকল এমন আদর করে/ এতক্ষণ সে তো রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। মা তাকে বার করে দিয়েছে। ডাক শুনে চমকে গেছল টোরা। পেছন ফিরে দেখে বাবা।

'কী হয়েছে মা?' বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

টোরা কিছু বলতে পারল না।

'মা বকেছে?' বাবা আবার জিজ্ঞেস করল।

ঘরের ভেতর থেকে মা চেঁচিয়ে উঠল, 'না, মেয়েকে পুজো করবে। ধিঙ্গি মেয়ে আমার পাখিটাকে উড়িয়ে দিলে। রথ দেখতে গিয়ে আমি শখ করে কিনে এনেছিলুম। আমার ময়না। সবে কেষ্ট-কেষ্ট বলতে শিখেছে। তা আমার সাধ-আহ্লাদ করবার জো নেই/ মেয়েছেলের অত নাচন-কোঁদনের কী আছে। কাজের নামে অষ্টরম্ভা। শুধু লোকসান করছে/'

বাবার বুঝতে বাকি রইল না কী হয়েছে। টোরার হাত ধরে বললে, 'চ মা।'

বাবার হাত ধরে ঘরে ঢুকল টোরা।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বাবা মাকে বলল, 'পাখি গেছে আবার হবে। কিন্তু তাই বলে বাচ্চা মেয়েকে অমন করে ঘর থেকে বার করে দিতে আছে/'

'বাচ্চা' শুনে ঘরের গিন্নি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বলল, 'বলি, বাচ্চাটা তুমি দেখলে কোথায়? তোমার আহ্লাদী মেয়ে তোমার কাছেই বাচ্চা থাক। আমার দরকার নেই অমন মেয়ের। তুমি থাকো মেয়েকে নিয়ে। আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব।' চিৎকার করে পাড়া মাত করলে নতুন-মা।

চিৎকার শুনলে যেন বুক শুকিয়ে যায় বাবার। আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। কথা বলে লাভ কী। যে বোঝে না, তার সঙ্গে কথা বললে কথা বাড়বেই শুধু। থামবে না।

টোরার চোখ দুটি ছলছল করছে। নিজের ঘরে গিয়ে জানলায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল টোরা। যখন অনেক ব্যথায় ওর মন ভরে যায়, তখন এই জানলাটি যেন আপনজনের মতো ওকে ভালোবেসে আদর করে। আর তখন টোরার চোখের জল গাল বেয়ে উপচে যায়। ভাগ্যিস, এখন বাদশা ইস্কুলে গেছে/ নইলে বাদশা দেখে ফেলে যদি জিজ্ঞেস করত, 'দিদি তুই কাঁদছিস কেন?' তখন কিছুই যে উত্তর দিতে পারত না টোরা/ দু-হাতের মুঠি দিয়ে চোখের পাতা আড়াল করলেও কি তখন সে কান্না লুকোতে পারত?

টোরাকে কেউ কাঁদতে দেখেনি। কোনোদিনও না। অনেক দুঃখে যখন ওর বুকে ভার হয়ে যায়, তখনও ঠোঁট দুটিতে মিষ্টি হাসির আলতো-ছোঁয়া লেগে থাকবে। হাসলেই কেমন টোল খেয়ে গাল দুটি ভেঙে যায়/ তখন এত ভালো লাগে মেয়েটাকে। অবিশ্যি এখন তো বড়ো হয়েছে। যখন আরও ছোট্ট ছিল, ছোট্ট হাত দুটি এলোমেলো নাড়তে-নাড়তে ছুটত, ওই সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে নাচত কিংবা হাসত, মনে হত, যেন একটি রঙিন পাখি উড়ছে অথবা গান গাইছে। আচ্ছা বলো, এখন কি ওর কাজ করার বয়েস? এখন তো ও খেলবে, গল্প শুনবে, নয়তো গান শুনবে। নদীর ওপার থেকে যে-গান ভেসে আসে সোনালি রাতে আলোর পাল তুলে। বাদশার মতো টোরারও তো ইচ্ছে যায় ইস্কুলে যেতে, বই পড়তে। কিন্তু সে তো আর হল না।

আজ রাত এসেছিল চুপিচুপি। ওই আকাশ উপচে পড়া রাতের তারারা কেমন যেন টোরার অজান্তে আকাশের বুক জুড়ে জেগে উঠেছে। আজ সারাদিন দিদির সঙ্গে কথা হয়নি বাদশার। আজ ও ইস্কুল থেকে ফিরেছে বাবার সঙ্গে। বাদশা সব শুনেছে। শুনেছে পাখিটা উড়ে গেছে। মা দিদিকে মেরেছে। কান ধরে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে। কী জানি কেন, দিদির দিকে চেয়ে ওর ভারি দুঃখ হচ্ছিল। ও ভেবে পায় না, কেন যে মা দিদিকে দেখতে পারে না। অথচ দিদি মা বলতে অজ্ঞান। দিদি মাকে এত ভালোবাসে, অথচ মা যেন দিদির ওপর তিরিক্ষি হয়েই আছে। রাগ ধরে মায়ের ওপর। আচ্ছা, সববার মা-ইতো মেয়েকে আদর করে, যত্ন করে। আর বাদশার মা দিন রাত উঠতে-বসতে দিদিকে কেন বকাবকি করে? দিদি তো লক্ষ্মী, দিদি তো কারো সঙ্গে লাগে না। মুখ বুজে তো মায়ের হুকুমই শুনছে সারা দিন।

https://boierhut.com/fb

ভাবতে-ভাবতে কেমন অবাক হয়ে যায় বাদশা। ওর ভাবনার সঙ্গে ঘরের অন্ধকারটা মোমের আলোয় যেন কেবলই কেঁপে উঠছে। আজ রাতে বাদশা দিদিকে বলতে পারল না, 'দিদি, একটা গল্প বল।' বলতে পারল না, 'দিদি একটা গান শোনা।'

আলো নিভে আসছে। বাদশা চুপচাপ শুয়ে ছিল বিছানায়। টোরা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জানলায় রাতের অন্ধকারে চোখ মেলে। টোরা হয়তো ভাবছিল, পাখিটার কথা। কিংবা দেখছিল, অসংখ্য জোনাকির আলোর উড়ন্ত বিন্দুগুলি। ওর জ্বলে উঠে হারিয়ে যায়। হারিয়ে গিয়ে আবার জ্বলে ওঠে। এ যেন অন্ধকারের সঙ্গে আলোর লুকোচুরি খেলা/

হঠাৎ বাদশাই প্রথম কথা বলল, 'দিদি, শুবি না?'

দিদি উত্তর দিলে, 'ঘুম পাচ্ছে না।

বাদশা আবার বলল, 'সত্যিই তো, অমন করে মারলে কখনও মানুষের চোখে ঘুম আসে?'

টোরা চেয়ে দেখল বাদশার দিকে একবারটি। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুই ঘুমুবি না?'

কোনো উত্তর দিল না টোরা। আবার নিস্তব্ধ, আবার নিঃঝুম চারদিক। থমথম করছে ঘরের ভেতরটা, বাইরের আকাশটা। হঠাৎ গাছের বাসায় হয়তো ঘুমের ঘোরে একটি পাখি ডানা ঝাপটাল। চমকে উঠল টোরা। যেন ভয়ে বুকটাও থমকে গেল তার।

'দেখ দিদি, পাখিটা উড়ে গেছে ভালোই হয়েছে।' হঠাৎ যেন দিদিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে বাদশা। 'একটা নিরীহ জীবকে ধরে এনে খাঁচায় রাখার কী দরকার/ বল, আমায় যদি কেউ খাঁচায় বন্দি করে রাখে?'

এবারও কোনো উত্তর দিল না টোরা। ওর মন বারবার শুধু ভাবছে একটি কথা। একটি পাখির কথা। সত্যি এমন অকৃতজ্ঞ পাখিটা/ কেন, টোরা কি তাকে ভালোবাসেনি? না, যত্ন-আত্তি করেনি? রোজ নিজের হাতে সে খাবার দিয়েছে। খাঁচার ভেতর হাত গলিয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে কত আদর করেছে। আর পাখিটা কিনা তাকেই ফ্যাসাদে ফেলে, তারই হাতের ফাঁক দিয়ে উড়ে পালাল। যাক, যাক/ টোরার খারাপ হোক, যত পারে হোক/ তাতে তোর কী/ তোর মনের বাসনা তো পূর্ণ হয়েছে, তুই তো মুক্তি পেয়েছিস, তা হলেই হল। এখন টোরাকে কেউ মারুক কি ঘর থেকে বার করে দিক, তাতে তোর তো আর কিছু এসে যাচ্ছে না। মা-দুগ্গা তোকে রক্ষা করেছেন, এই দেখেই টোরার চক্ষু সার্থক/ ভাবতে-ভাবতে টোরার চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

মোমবাতিটা নিভে গেছে। কখন যে বাদশা ঘুমিয়ে পড়েছে, খেয়াল করেনি টোরা। চোখের জল মুছতে-মুছতে বাদশার পাশে সেও শুয়ে পড়ল। মনটা খুব খারাপ-খারাপ লাগলেও দিনটা তবু কেটে যায় এক রকম। কিন্তু রাত যখন ঘনিয়ে আসে, যখন সব নিশ্চুপ হয়ে যায়, সাড়া শব্দ শোনা যায় না, তখন যেন দুঃখের ভাবনাগুলো পেয়ে বসে মানুষকে। অন্ধকার রাতটা যেন ভাবনার পালতোলা

নৌকো নিয়ে ভেসে যায়। থামতে বলো, কিছুতেই শুনবে না। নৌকো দুলবে। আর দুলতে-দুলতে বয়ে যাবে।

দুলছিল টোরার মনও। দুলতে-দুলতেই টোরার চোখের পাতা দুটি ঘুমের ছোঁয়ায় বুজে গেল। ওর ক্লান্ত মুখখানি ঘুমের আবেশে কেমন শান্ত হয়ে গেছে। এখন আর টোরার কিচ্ছু মনে পড়বে না। মনে পড়বে না, নিজের মায়ের মুখখানি। মা তো কবে তাকে একা ফেলে চলে গেছে। মা নেই বলেই এত অপমান তাকে সইতে হয়। ওরও তোমন বলে, আর সবার মায়ের মতো ওরও মা ওকে আদর করুক। ইচ্ছে করে নতুন মায়ের মতো ওর কপালেও কেউ লাল চুমকির টিপ পরিয়ে দিক। রাঙা টুকটুকে পা দুটিতে লাল টকটকে আলতা দিয়ে সাজিয়ে দিক। কে দেবে? ওর ওই ছোট্ট ভাইটি? ধ্যাৎ/

বাদশা কবে যে বড়ো হবে কে জানে/ টোরা ভাবে, বাদশা বড়ো হলে অনেক লেখাপড়া শিখবে। অনেক নাম-যশ হবে। লোকের মুখে মুখে বাদশার নাম শুনতে-শুনতে টোরার বুকখানা গর্বে ভরে উঠবে। কিন্তু সে তো এখনও অনেক দেরি। বাদশা যা ছোটো/ বাদশা যদি টোরার চেয়ে বড়ো হত, তাহলে বেশ হত। তখন যা মজা হত না, টোরা তখন খালি ডাকাডাকি করত, 'বাদশা-দাদা।'

'বাদশা-দাদা।' সত্যিই হঠাৎ কে ডাকল না?

'বাদশা-দাদা।'

হ্যাঁ তো, আবার ডাকল/ এত রাত্তিরে কে ডাকছে বাদশাকে? কিন্তু সাড়া দেবে কে? অঘোরে ঘুমোচ্ছে বাদশা। ঘুমিয়ে পড়েছে টোরা। ওই ডাক কি এই ঘুমের ঘোরে ওরা শুনতে পাবে?

শুনতে পেল। ডাক না। রাত-পহরের রেলটা কু বাজিয়ে ঝিকঝিক করতে করতে ছুটে চলেছে। সেই শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বাদশার। চমকে উঠেছে। ঘুম জড়ানো চোখে বিছানায় শুয়ে-শুয়েই ও চেয়ে দেখল জানলাটার দিকে। কান পেতে রইল, যতক্ষণ শোনা যায়, কু-কু ঝিক-ঝিক। ওই শব্দ শুনলেই বাদশার যেন মনে হয়, রেলগাড়িটা বাজনা বাজিয়ে নাচতে-নাচতে লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তারপর রাতের অন্ধকারে সেই বাজনার রেশটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, আরও দূরে। যেতে-যেতে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল সেই বাজনা। পাশ ফিরল বাদশা। মুখে তুলে দেখল, দিদি ঘুমোচ্ছে। এখন অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দিনেরবেলা ও স্পষ্ট দেখছে, কেঁদে-কেঁদে দিদির চোখ দুটি ফুলে গেছে। মা যে কেন এমন নির্দয় হয়, ভেবে পায় না বাদশা। আহা/ অমন করে মারতে আছে? আচ্ছা, না হয় মেরেছে, তারপর তো একটু আদর করবে? তা নয়, দিদির দিকে একবার চেয়েও দেখল না। এ কী রাগ বাবা? রাগের কি শেষ নেই/ না কি রাগ শেষ হয় না?

'বাদশা-দাদা।'

চমকে উঠলে বাদশা। এবার শুনতে পেয়েছে সে। কে ডাকল? বাদশার বুকটা চমকে ধড়ফড়িয়ে উঠল।

'বাদশা-দাদা।'

আবার ডেকেছে। বাদশা তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

'বাদশা-দাদা।'

আরে, এ কী/ তাদের সেই উড়ে-যাওয়া পাখিটা ডাকছে নাকি/ এত রাত্তিরে পাখি এল কোত্থেকে?

বাদশা চুপি-চুপি ডাকল, 'দিদি, এই দিদি।'

টোরার ঘুম ভেঙে গেল, 'কী রে?'

বাদশা চাপা-গলায় বলল, 'পাখি/'

টোরা উঠে পড়ল, 'কই?'

বাদশা উত্তর দিলে, 'কী জানি। আমার নাম ধরে ডাকল।'

বলতে না বলতেই আবার ডেকেছে, 'বাদশা-দাদা।'

হ্যাঁ, তাই তো। সত্যিই তো তাদের পাখির গলা/ ঠিক তেমনি অস্পষ্ট, ভাঙা-ভাঙা ডাক/ টোরার বুকটা কেঁপে উঠল। বাদশার কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ডাকছে বল তো?'

বাদশা দিদির চেয়েও আরও আস্তে বলল, 'মনে হচ্ছে জানলার ধারে ওই জামগাছটায়। যাবি? চ, ধরে আনি।'

ধরতে পারলে তো খুব ভালো। কিন্তু উড়ন্ত পাখিকে ধরবে কেমন করে টোরা জানে না। তাই ছোট্ট ভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে ধরবি?'

বাদশা উত্তর দিলে, 'চ না, বাইরে গিয়ে দেখি।'

'যাবি কেমন করে?' ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল টোরা।

'দরজা খুলে।'

'মা জানতে পারলে?'

'পারলেই বা। আমরা তো চুরি করতে যাচ্ছি না। মায়ের জন্যেই তো পাখি ধরতে যাচ্ছি।' সাফ উত্তর দিলে বাদশা।

সায় দিতে ভয় করল না টোরার। কেননা, পাখিটা ধরে আনতে পারলে, নতুন-মা যে খুব খুশি হবে, এটা টোরা ঠিক জানে। কিন্তু এও জানে টোরা, এই রাতের অন্ধকারে পাখিটাকে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। তাই টোরা অনেকটা সন্দেহ-ভরা মনেই জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু বাদশা, অন্ধকার যে/'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অন্ধকারকে ভয় পায় না বাদশা। তাই দিদিকে সাহস দিয়ে বলল, 'অন্ধকার তো কী হয়েছে/ তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন? হাত বাড়িয়ে ডাকলেই দেখবি, পাখি লক্ষ্মীটির মতো হাতের ওপর নেমে আসবে। আমি বলছি, ওর ঠিক মন কেমন করছে। মন কেমন করছে বলেই তো আমাদের জানলার ধারে কেঁদে বেড়াচ্ছে।'

বাদশার কথা শুনে টোরারও মনটা অভিমানে ঝাপসা হয়ে গেল। হবেই তো। বলো, পাখিটার জন্যে টোরা কি কম করে/ আর তুই এমন স্বার্থপর, কিছু না-বলে না-কয়ে টোরাকে এমন একটা বিপদে ফেললি? তোর তো বোঝা উচিত ছিল, তুই পালালে নতুন-মা টোরাকে আস্ত রাখবে না। কাউকে যে দুঃখ দিতে নেই এ-কথাটা বুঝবি কবে? অন্যকে দুঃখ দিলে নিজেকেও যে দুঃখ পেতে হয়, এখন হাড়ে-হাড়ে বোঝ/ যাকগে যাক, যখন সুমতি হয়েছে, যখন আবার ঘরে ঢোকার জন্যে অন্ধকারেই ডাকাডাকি শুরু করেছে, তখন আর কিছু না-বলাই ভালো। তাই টোরা বাদশাকে বললে, 'চ তাহলে।'

পাখিটা আবার ডেকেছে, 'বাদশা-দাদা।'

ঘরের দরজাটা খুলবে বলে খিলটায় হাত দিল টোরা।

বাদশা বললে, 'দেখিস, মা না উঠে পড়ে। তাহলে সব মজা মাটি/ পাখিটা ধরে চুপচাপ খাঁচায় রেখে দেব। তারপর কাল মা যখন দেখবে, তাক লেগে যাবে। দেখি তখন মা তোকে কেমন না আদর করে/'

টোরার মুখখানা আনন্দে উছলে উঠল। টোরা নিঃশব্দে খিলটা খুলে ফেলল। তারপর বাদশা আর টোরা আলতো পায়ে নিঃসাড়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লে।

'বাদশা-দাদা।' ওদের বাইরে দেখেই পাখিটা যেন দ্বিগুণ খুশিতে ডেকে উঠল। জামগাছের নীচে এসে টোরা চাপা গলায় পাখিটাকে ডাকল, 'আয়, আয়।'

এবার পাখি হঠাৎ ডেকে উঠল, 'টোরা-দিদি।'

অবাক কাণ্ড/ পাখিটা তো এর আগে কোনোদিনই টোরার নাম ধরে ডাকেনি। আজ হঠাৎ ডাকল কেমন করে/

টোরা আবার ডাকল, 'আয় টু টু পাখি আয়/'

পাখি আবার ডাকল, 'টোরা-দিদি।'

কিন্তু আশ্চর্য/ কোথায় যে লুকিয়ে আছে দুষ্টুটা গাছের ফাঁকে, ওদের একদম নজর যাচ্ছে না। ওপরে তাকালেই ওরা দেখছে, পাতার ঝিলিমিলির আড়াল থেকে আকাশটা উঁকি মারছে। আকাশ ভরতি আলোর তারাগুলো যেন এক-একটা অবাক গল্পের ছবি।

"ফুড়ুত/"

https://boierhut.com/fb

টোরা আর বাদশা স্পষ্ট দেখল জামগাছ থেকে পাখিটা উড়ে গেল। ইশ/ এত কাণ্ড করে শেষে এই/ টোরার মুখখানা হতাশায় চুপসে গেল/ কিন্তু বাদশা দমবার পাত্র নয়। বাদশা বললে, "পালাবে কোথায়/ আয় দেখি/'

পাখি এবার অন্ধকারে উড়তে-উড়তে, ঘুরতে-ঘুরতে দুষ্টুমি করে ডাকল, 'বাদশা-দাদা, টোরা-দিদি।'

বাদশা ছুটল পাখির পেছনে/ ডাক দিল, 'আয় পাখি, পাখি আয়।'

টোরা ডাকল, 'পাখি, পাখি আয়, আয়।'

পাখি উড়ছে, বাদশাও ছুটছে।

পাখিও ডাকছে টোরাও ডাকছে।

আঁধার রাতে অমন করে যে একা-একা ছুটতে নেই, এ-কথা বুঝতে পারেনি টোরা। বোঝেনি বাদশা। বোঝা যায়ও না। কেননা, টোরা জানে পাখিটার জন্যে নতুন-মা ভারি কষ্ট পেয়েছে। আবার যদি ফিরে আসে পাখি, খুব খুশি হবে নতুন মা। নতুন-মাকে খুশি দেখলেই টোরাও খুশি/ অবিশ্যি বাদশা ভাবছে অন্য কথা/ ভাবছে, একবার পাখিটাকে ধরতে পারলে হয়। মাকে যা কথা শোনাবে না বাদশা/ ছিঃ ছিঃ দিদিকে শুধুমাত্র মারাটা কি ঠিক হয়েছে/ দিদির দোষটা কী শুনি?



বাদশা তাই না দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠলো, ‘দিদি/’

সত্যিই পাখিটার লোভে টোরা আর বাদশা কেমন যেন ভুলে গেল সব কিছু। ভুলে গেল, যে-পাখি উড়ন্ত তার পেছনে ধাওয়া করলে তাকে ধরা যায় না। তাই ছুটতে-ছুটতে এমন জেদ বেড়ে গেল যে, খেয়ালই করল না কোথায় চলেছে তারা।

এ কী/ হঠাৎ পাখিটা যেন ওদের সঙ্গে চোর-চোর খেলা শুরু করে দিলে/ হাওয়ায় ভাসছে পাখি। ভাসতে-ভাসতে হঠাৎ-হঠাৎ নেমে আসছে একেবারে ওদরে হাতের নাগালে। যেই বাদশা আর টোরা ধরতে যাচ্ছে, পাখি ভড়কি দিয়ে ফুড়ুত করে উড়ে পালাচ্ছে। আশ্চর্য কথা/ বলে, পাখি নাকি রাত-দুপুরে চোখে দেখে না। কিন্তু এখন ওই উড়ন্ত পাখির কসরতের কাণ্ডকারখানা দেখলে কে বলবে এ-কথা/ উলটে অন্ধকারে টোরা আর বাদশারই চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। ধাঁধা যতই লাগছে, ওদের গোঁ ততই বাড়ছে। যেমন করে হোক পাখি তারা ধরবেই ধরবে/

হাঁপিয়ে গেছে বাদশা। টোরাও হাঁপাচ্ছে। টোরা বাদশাকে চেঁচিয়ে বললে, 'বাদশা, তুই আর ছুটিস না। দাঁড়া। আমি দেখছি।'

বাদশা উত্তর দিলে, 'তুই একা পারবি না।'

তাই বাদশাও পাখিটাকে ধরবে বলে হাত পাকাচ্ছে, লাফ মারছে, ভড়কিও খাচ্ছে। উড়ন্ত পাখি ধরা কি আর বাদশার কম্ম। না, বাদশার কম্ম নয়। কিন্তু দিদির মুখ তাকে রাখতেই হবে। দিদির জন্যে কোনো কাজই তার কাছে অসাধ্য নয়/

পাখিটা উড়তে-উড়তে এবার একদম আচমকা মেরেছে এক ঝটকা। মেরেছে একেবারে টোরার হাতের মধ্যে। হয়তো পাখিটা ভেবেছিল টোরার হাতে ঠুকরে দিয়ে পালাবে। টোরা তো থতমতো খেয়ে গেছে/ কিন্তু ঘাবড়াল না। চোখ-কান বুজে হাতের মুঠি পাকিয়ে ছোঁ মারতেই বাছাধন পাখি হাতের মধ্যে সড়াত/ ধরা পড়েছে/ আর কোনো কথা আছে/ টোরা একেবারে প্রাণপণে চেপে ধরলে পাখিটাকে/ পাখি চিল্লিয়ে ডেকে উঠল, 'ক্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ/' তারপরেই থেমে গেল।

বাদশা তাই না দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠল, 'দিদি/'

কিন্তু দিদি? দিদির তো মুখখানি খুশিতে উছলে পড়ল না। হাতের পাখি হাতে নিয়ে টোরা কেমন যেন থমকে গেল। পাখিটা চিৎকার করেই অমন ঠান্ডা হয়ে গেল কেন/ টোরা তাড়াতাড়ি হাতের মুঠিটা খুলে ফেলতেই পাখিটা হাত ফসকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যাঃ টোরার হাতের চাপে পাখিটা মরে গেছে/

কিন্তু পাখিটা মরেছে কি মরেনি, এ-কথাটা বুঝতে না বুঝতেই, হঠাৎ আর এক কাণ্ড/ মরা পাখিটা টোরার হাত থেকে যেই মাটিতে পড়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল আকাশে। থরথর করে মাটি কেঁপে যেন সব কিছু ভেঙে ভেঙে চুরমার করে ফেলছে। গাছের পাতায়-পাতায় এতক্ষণ যে-হাওয়া ঝুরুঝুরু বয়ে চলেছিল, সেই হাওয়া হঠাৎ ঝড়ের বেগে লাফিয়ে-লাফিয়ে মাতামাতি লাগিয়ে দিল। সঙ্গে কী ধুলো/ টোরা আর বাদশার চোখেমুখে সেই ধুলো ঝাপটা

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মেরে ঝড়ের সঙ্গে লুটোপুটি খাচ্ছে/ প্রচণ্ড সেই ঝঞ্ঝার মধ্যে বাদশা চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'দিদি/'

টোরাও অন্ধকারে দু-হাত বাড়িয়ে ডাক দিল, 'বাদশা।' কে কাকে খুঁজে পাবে এই দুর্যোগে/ টোরা আর বাদশা ঝড়ের ধাক্কায় এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। অন্ধকারে অন্ধের মতো হাবুডুবু খেতে লাগল। কখনো বিদ্যুৎ, কখনো বজ্রপাত, প্রচণ্ড ঝড় আর মুঠোমুঠো ধুলো, সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর বিপদে পড়ে গেল টোরা আর বাদশা। চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাদশা, 'দিদি, আমার কাছে আয়/'

দিদি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলে, 'বাদশা, তুই কোথা?'

বাদশা উত্তর দিলে, 'আমি এখানে।'

কিন্তু কোনদিকে যাবে টোরা? কোথায় আছে বাদশা? চোখ তো চাইতেই পারছে না। চোখ চাইলেই ঝাঁক-ঝাঁক ধুলো উড়ে এসে চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ছে। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না। তবু ডাক দিল টোরা, 'বাদশা, আমি এখানে আছি, আমার কাছে আয়/ আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না/'

বাদশা উত্তর দিলে, 'আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুই কোনদিকে?'

'এই দিকে/'

এই ভয়ংকর দুর্যোগে এইদিকে একঝাঁক পাখি ঝড়ের সঙ্গে ঘূর্ণি খেতে-খেতে টোরার মাথার ওপর পাক খাচ্ছে/ কী সাংঘাতিক বিকট দেখতে সেই পাখিগুলোকে। বীভৎস কুচ্ছিত কালো মিশমিশে তাদের গায়ের রং/ বলতে পার, যেন এক-একটা দানব। ঝড়ের আকাশ কালো করে তেড়ে আসছে টোরার দিকে। কালো রাতে তাদের হিংস্র চোখগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ঠোঁট যেন ধারালো ছুরির মতো তীক্ষ্ণ/ হঠাৎ মস্ত মস্ত ডানাগুলো আগুনজ্বালা হাপরের মতো ঝটপটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টোরার ঘাড়ের ওপর। তারপর ডানা জাপটিয়ে টোরাকে থাবড়াতে লাগল। নোখ দিয়ে খামচাতে লাগল। ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে লাগল। টোরা যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ককিয়ে উঠল, 'বাদশা/'

ঝাঁকে ঝাঁকে দানব পাখি টোরাকে খামচে-ছিঁড়ে নাস্তানুবুদ করে ছাড়লে। টোরা ঝড়ের সঙ্গে ঘুরপাক খেতে-খেতে পাখির হাত থেকে বাঁচার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু কে শুনবে সেই চিৎকার? ঝড়ের দামামা আর পাখিদের কর্কশ চেঁচানি ছাপিয়ে সে-চিৎকার কার কানে যাবে?

পারেনি টোরা। পারেনি পাখির সঙ্গে লড়াই করে ওই দানব পাখির হাত থেকে বাঁচতে। টোরার যেন দম আটকে আসছে। ছুটতে-ছুটতে, লাফাতে-লাফাতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল টোরা। তারপর আর কিছু জানবার কথা নয় ওর। ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল মাটির ওপর।

https://boierhut.com/fb

ঝড় থেমে গেছল। হয়তো অনেক আগেই। কত আগে টের পায়নি টোরা। কেননা, যখন ও চোখ চাইল, দেখল কেমন সব থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। না আছে ঝড়ের দাপাদাপি, পাখিদের কিচিমিচি। কিন্তু চারদিকে এত কুয়াশা কেন? যেদিকে চায় সে, শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না টোরা। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল টোরা। উঠতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কী ব্যথা সার দেহ জুড়ে। কেটে গেছে, ছড়ে-ছিঁড়ে গেছে হাত-পা/

কিন্তু এ কোথায় সে? কোথায় এসে পড়েছে টোরা? জায়গাটা যেন ভয়ংকর চুপসি মেরে থমকে আছে। ভীষণ অস্বস্তিতে দম আটকে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়ল টোরা। সেই কুয়াশার জালের মধ্যে কানামাছির মতো হাতড়াতে লাগল। পথ কোনদিকে? কোনদিকে যাবে সে?

হঠাৎ যেন চমক দিয়ে ওর মনের ভেতরটা শিউরে উঠল/ বাদশা/ তাই তো, বাদশা কোথা গেল/ ঘন কুয়াশায় চারদিকটা এমন ছেয়ে আছে যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে বাদশা?

টোরা নরম-গলায় চুপিসারে ডাকল, 'বাদশা।'

বাদশার সাড়া পেল না।

আবার ডাকল, 'বাদশা।'

তবুও সাড়া নেই।

কেন সাড়া নেই/ বুক শুকিয়ে গেল টোরার। কী হবে এখন? এই কুয়াশার মধ্যে বাদশাকে সে কোথায় খুঁজবে? এবার মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'বা-দ-শা—'

এবারও ভোঁ-ভাঁ/ শুধু তার ডাকের সুরটা প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সেই কুয়াশার মধ্যে। কেঁদে টোরা ফেলল হাউ-হাউ করে।

তার সেই কান্না শুনে হঠাৎ যেন কারা হেসে উঠল, 'হো-হো-হো/'

হাসির শব্দে কান্নাটা আচমকা থমকে বুকের মধ্যে আটকে গেছে টোরার। ভয় পেয়ে গেল টোরা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল/ অমনি সঙ্গে-সঙ্গে বাতাস বইতে শুরু করল। যেন কার জাদুর ছোঁয়ায় সেই গাঢ় কুয়াশাটা ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে টোরা। দেখছে, কুয়াশা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল রাজবাড়ির দরবারের মতো একটা বিরাট ঘর। বহুদিনের পুরোনো। ভাঙা, জীর্ণ। যেদিকে চাও, বড়ো বড়ো থাম। ফেটে গেছে, ইঁট ঝুলছে। উঁচু উঁচু দেওয়াল। খসে পড়েছে চুনবালি। মাথার ওপর খাড়া মস্ত এক গম্বুজ। মনে হচ্ছে এই বুঝি হুড়মুড় করে ঘাড়ে পড়ে/ গম্বুজের নীচে একলা দাঁড়িয়ে টোরা। হঠাৎ বিকট শব্দ করে গম্বুজের ডালাটা যেন খুলে গেল/ হ্যাঁ/ সেই খোলা ডালার ভেতর থেকে ওর চোখের সামনে

ভাসতে-ভাসতে বেরিয়ে এল এক বিকট মূর্তি/ কালো অন্ধকারের মতো সে ভয়ংকর/ বীভৎস তার মুখের হাঁ-টা। হাঁ-এর ভেতর জিবটা তার লকলক করছে। যেন গিলতে আসছে টোরাকে। চোখ দুটো ভাঁটার মতো। হাত-পায়ের নোখগুলো লম্বা আর খোঁচা-খোঁচা/ তার মাথায় ঝাঁকড়া খসখসে একরাশ চুল। পিঠে ছড়িয়ে আছে উড়ন্ত পাখির ডানা। সেটা ঝটপট করে ঝাপটা মারছে, হাওয়ার ঢেউ উঠছে সারা ঘরে/ এ যেন এক উড়ন্ত দানব/

আতঙ্কে চেয়ে দেখল টোরা। 'কে/'

'গর-র-র' করে গর্জে উঠল দাবনটা। তার গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠল দরবারটা। মনে হল, তার মুখ দিয়ে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এসে টোরার মুখের সামনে ঝলসে উঠল।

টোরা ভয়ে পিছিয়ে গেল/ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাই তোমার?'

তখন সেই দানব তার বিরাট মাথাটা নাড়তে-নাড়তে প্রচণ্ড হুংকার ছেড়ে বললে, "হাতের মুঠিতে চেপে পাখি মেরেছিস তুই/'

টোরা তেমনি ভয়ে জড়সড়ো হয়ে বললে, 'না, আমি ইচ্ছে করে মারিনি। আমি হাত দিয়ে ধরতেই পাখিটা মরে গেল।'

"আমিও যদি আমার পায়ের নোখ দিয়ে তোর গলাটা চেপটে ধরে মেরে ফেলি/ কিংবা খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে তোর মাথাটা ফুটো করে দিই। তখন তোর কেমন লাগে/'

'ওটা আমার মায়ের পাখি। দুষ্টুমি করে আমার হাত ফসকে পালিয়েছিল। পাখিটার জন্যে মায়ের মন কেমন করছে বলেই আমি ধরতে গেছলুম।'

'মায়ের জন্যে তোর তো ভারি দরদ।' ধমকে দিলে দানবটা।

'মায়ের কষ্ট দেখলে আমি থাকতে পারি না।' উত্তর দিল টোরা।

দানবটা ভীষণ লাফিয়ে উঠল। সাংঘাতিক তর্জন-গর্জন শুরু করে দিলে। তারপর রক্ত-বর্ণ চোখ দুটো বার করে বললে, 'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি পাখিটাকে জীবন্ত দেখতে চাই। তুই যদি পাখির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে না পারিস, তোর ভাইকে ফিরে পাবি না।'

টোরা শিউরে উঠল/ তাহলে এই দানবটা বাদশাকে লুকিয়ে রেখেছে/ টোরা বুঝে উঠতে পারছে না, এখন সে কী করবে/ যে-পাখি মরে গেছে, তার প্রাণ সে কী করে ফিরিয়ে দেবে/ তাই টোরা এবার কাকুতি-মিনতি করে বললে, 'পাখির প্রাণ আমি দেব কী করে? প্রাণ তো ভগবানের। কিন্তু তুমি আমার ভাইকে ফিরিয়ে না দিলে মায়ের কাছে আমি মুখ দেখাব কেমন করে?'

এবার প্রচণ্ড চটে গেল দানবটা। বললে, 'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। বল, তুই পাখির প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবি কি না।'

টোরা বললে, 'আমি যা পারি না, তা পারব কেমন করে বলি?'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'বেশ/ তবে তোর মাকে ভুলতে হবে।'

টোরা চিৎকার করে উঠল, 'না, মাকে আমি ভুলতে পারি না, পারব না। মা আমার ভালোবাসার।'

'মাকে না ভুললে, ভাইকেও ফিরে পাবি না।'

তেমনি আকুল হয়ে টোরা উত্তর দিলে, 'ভাইকে ফিরিয়ে দাও, ভাই আমার আদরের।'

'আবার ভাই-ভাই করলে আমি তোকে বেঁধে রাখব।'

'আমাকে বাঁধ, আমি মেনে নেব। তাহলে তুমি আমার ভাইকে ছেড়ে দেবেতো?'

দানবটা হুংকার ছাড়লে, 'ফের ওকথা বললে তোর মুখখানা আমি আগুনে ঝলসে দেব।'

খুব শান্ত-গলায় টোরা উত্তর দিলে, 'বেশ তো, তোমার যদি তাই ইচ্ছা যায়, ঝলসে দিয়ো আমার মুখখানা। কিন্তু ভাইকে আমার ছেড়ে দিতে হবে।'

দানব আরও রেগে গেল। বললে, 'তোর ভাইকেও আমি পুড়িয়ে মারব।'

টোরার শান্ত গলাটা ভীষণ শব্দে ফেটে পড়ল। চিৎকার করে উঠল টোরা, 'না, যে বলে এমন কথা, সে যেন বোবা হয়ে যায়।'

'তোর এতদূর আস্পর্ধা, আমাকে তুই শাপান্ত করছিস/ তুই পাখি মেরেছিস। তুই খুনি।' বলে সেই কালো দানবটা হঠাৎ এক মুঠো ধুলো নিয়ে টোরার মুখে ছুঁড়ে মারল। মেরেই হো হো করে হাসতে-হাসতে নৃত্য শুরু করে দিলে।

টোরার চোখ দুটি ভীষণ জ্বলে উঠেছে। টোরা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কাতরে উঠল, 'আ—আ।'

দানবটা বললে, 'এই তোর শাস্তি। তোর এই মুখে আমি জাদু মেরেছি। এখন তোর ওই মুখ যে দেখবে, সে জন্তু হয়ে যাবে/ তোর মা হবে, তোর ভাই হবে, তোর বাবা হবে/ এমন কী, অজানা অচেনা যে দেখবে সে-ই হবে/ তারপর সেই জন্তু তোকে ছিঁড়ে খাবে/'

চিৎকার করে উঠল টোরা, 'না' টোরার তীক্ষ্ণ গলার স্বর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে ওই বিশাল দরবারের গম্বুজে গমগম করে উঠল। এমন সময় হঠাৎ যেন আকুল স্বরে বাদশা ডেকে উঠল, 'দিদি/'

প্রথমটা বুঝতে পারেনি টোরা। তারপর আবার যখন ডেকেছে, সে-ডাক চিনতে ভুল হয়নি টোরার। ও চেঁচিয়ে সাড়া দিলে, 'বাদশা/'

দানব বিচ্ছিরি মুখ খিঁচিয়ে হেসে উঠে বললে, 'ওই দ্যাখ, ওই তোর ভাই আসছে/ এবার তোর মুখ দেখবে। তারপর তোর ভাই হবে জন্তু/ হা হা হা/'

ভয়ে কুঁচকে গেল টোরা। প্রথমটা বাদশার ডাক শুনে, খুশিতে ওর চোখের পাতা দুটি নেচে উঠেছিল। কিন্তু তারপর? দিদি বলে বাদশা সেই দরবার-ঘরে ছুটে আসতেই, টোরা, দু-হাত দিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে ফেললে। এ-মুখে জাদু মেরেছে দানব পাখি/ এ-মুখ দেখলে তার ভাই জন্তু

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হয়ে যাবে যে/ না, তার ভাইকে সে জন্তু হতে দেবে না। কিছুতেই না। মুখ চেপেই টোরা ছুট দিল। বাদশাকে পিছনে ফেলে পালাল।

বাদশা টোরাকে ছুটতে দেখে চেঁচিয়ে ডাকলে, 'দিদি, আমি।'

টোরা তখন ছুটতে-ছুটতে দরবার-ঘরের বাইরে চলে গেছে। বাদশা দিদির কাছে যাবার আগেই, দরবারের দরজা ডিঙিয়ে দিদি আকাশের নীচে পৌঁছে গেছে। দিদিকে ডাকতে-ডাকতে বাদশাও ছুটল। আর দানবটা ঠ্যাং ছুঁড়ে, ডানা ঝাপটিয়ে খুশিতে সিটি মারলে, টি-টি/ সিটি দিতে দিতে দরবারের ধুলো-বালির ওপর নাচন-কোঁদন শুরু করে দিলে। ধুলোয়-ধুলোয় ভরে গেল দরবার-ঘর। সেই ধুলোর সঙ্গে ঝটাপটি করতে করতে কোথায় যে ফুস করে লুকিয়ে পড়ল সেই দানব, আর দেখাই গেল না।

'দি—দি।' যত জোর ছিল গলায়, বাদশা চেঁচিয়ে উঠল।

তবু টোরা দাঁড়াল না। দাঁড়াবেও না। ভাইয়ের জন্যে তার মন ভেঙে খানখান হয়ে গেলেও ভাইয়ের দিকে ও একবার ফিরেও দেখবে না। ও মুখ ঘুরিয়ে ছুটবে। বাদশা যেন ওর মুখখানা দেখে না ফেলে।

বাদশাও ছুটল দিদির পিছু। প্রাণপ্রণে ছুটেও সে পৌঁছতে পারল না দিদির নাগালে। টোরা ছুটতে ছুটতে এগিয়ে যায়, বাদশা দেখতে-দেখতে হারিয়ে যায়। বাদশা কেঁদে ফেলে, 'দিদি, দাঁড়া দিদি।'

দিদি দাঁড়াবে না।

কাঁদতে-কাঁদতে আবার ডাকে বাদশা, 'দিদি, দিদি, ফিরে চা।'

দিদি ফিরেও চাইবে না।

তখন বাদসার সেই কান্না যেন আকুল হয়ে বেজে ওঠে। বেজে ওঠে গাছের পাতায়, ফুলের রঙে, আকাশের নীলে। সে যেন এক কান্না-ভরা সুরের ঢেউ। সে-সুর বাজতে-বাজতে হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়।

তবু থামল না টোরা। তবু শুনল না সেই কান্নার সুর/ সে ছুটল।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ কী দেখে এমন আঁতকে ওঠে টোরা? ওর যেন ধাঁধা লেগে গেল চোখে/ ও যেন দেখে সেই সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওর পিছু-পিছু ছুটে আসছে, রাস্তার দু-পাশের ছোটো-বড়ো ঘর-বাড়ি, মস্ত-মস্ত গাছ-গাছালি/ লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছে ওরা, কিংবা, ছুটতে-ছুটতে হাসছে ওরা/

টোরা থমকে গেল/ ও তো কোনোদিন শোনেনি, গাছ ছোটে, ঘর হাঁটে/ এ আবার কেমনতর কাণ্ড/

ভাবতে-না-ভাবতেই আর-এক ধাঁধা। টোরা দেখে গাছগুলো আর গাছ নেই। গাছগুলো সব মানুষ হয়ে গেছে/ মানুষগুলো টোরার পেছনে ছুটে আসছে/

https://boierhut.com/fb

তারা ছুটছে, তাদের ঢলঢলে প্যান্ট পায়ের কাছে ল্যাকপ্যাক, ল্যাকপ্যাক করছে। তারা বুঝি ধরবে টোরাকে/ হ্যাঁ, ওই তো তারা হাত বাড়িয়েছে/ ওই তো, লম্বা, লম্বা হাত বাড়িয়ে পেছন থেকে টোরার ঘাড়টা খপাত করে ধরে ফেললে/ টোরা আর ছুটতে পারল না। টোরাকে ওরা ঘাড়ে তুলে নিলে/ ঘাড়ে নিয়ে, বিকট চেঁচিয়ে গান গাইতে লাগল, আর ধে-কেটে-ধিন নাচতে লাগল/

টোরার প্রাণ যায়/ সে-রকম নাচ টোরা জন্মে দেখেনি/ কখনো তারা হাত-পাগুলো প্রচণ্ড কাঁপাতে-কাঁপাতে বসে পড়ছে, আবার দাঁড়াচ্ছে। পা ছুঁড়ছে, হাত বেঁকাচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল টোরার চোখের সামনে। হঠাৎ টোরা দেখল কী, মানুষগুলোর মুখ আর মানুষের মতো নেই। এক-একটা হিংসুটে জন্তুর মতো তাদের মুখের চেহারা। গায়ে তাদের লম্বা-লম্বা লোম। হাতের থাবায় খাড়া-খাড়া নোখ/

আঁতকে উঠে চিৎকার করে টোরা বললে, 'আমায় ছেড়ে দাও/'

ছাড়ল না তারা। উলটে তাদের ধারালো নোখ দিয়ে যেন টোরাকে ছিঁড়ে কুটোকুটি করে ফেলতে চাইল।

টোরা জানে, এবার তার বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। দানবের অভিশাপ সত্যি-সত্যি ফলে গেল। এই মানুষগুলো ওর মুখ দেখে জন্তু হয়ে গেছে/ ওর মুখ দেখলে যদি মানুষে জন্তু হয়ে যায়, বেঁচে লাভই-বা কী/ আর তাই মিছিমিছি বাঁচবার জন্য টোরার কাঁদতেও মন চাইল না। এই জন্তুগুলোর কথা ছেড়েই দাও/ যে-মাকে সে এত ভালোবাসে, সেই মা-ই যখন তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না, তখন আর পরকে কী বলবে/

'দি—দি/' ওই বাদশা ছুটে আসছে।

চমকে উঠেছে টোরা। কী হবে? এই অপয়া মুখ সে কেমন করে দেখাবে বাদশাকে? ও কেমন করে চেয়ে দেখবে বাদশার মুখের দিকে?

ওই জন্তু-মুখো মানুষগুলো বাদশার ডাক শুনেই নাচতে-নাচতে থমকে দাঁড়াল। ওরা টোরাকে ঘাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। টোরাকে ছেড়ে ওরা বাদশার দিকে ছুটে গেল। যেন-এক-একটা জীবন্ত শয়তান।

টোরা নিশ্চিত জানত, এই জন্তুগুলোর হাত থেকে তার ভাই আর রেহাই পাবে না। তা হলে এখন তোমরাই বলো, কী করবে টোরা? এখন কেমন করে বাঁচাবে তার ভাই বাদশাকে?

টোরা থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে ফেলল, 'বাদশা, এদিকে আসিস না।'

বাদশা নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি। ওই তো বাদশা এদিকেই আসছে/ টোরা চক্ষের নিমেষে লুকিয়ে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে/

বাদশা এখন জন্তুগুলোর মুখোমুখি/ দাঁড়িয়ে পড়ল ভয়ে/ কী বীভৎস দেখতে জন্তুগুলোকে। এমন অদ্ভুত জীব বাদশা দেখেইনি কোনোদিন। সামনা-সামনি দেখা তো দূরের কথা, ওর অমন যে নানান ছবির বই আছে, তাতেও দেখেনি। আর দাঁড়ায় বাদশা/ মার ছুট/

কিন্তু পালাতে পারল না বাদশা। জন্তুগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। জন্তুগুলো মারল লাফ। লাফিয়ে পড়ল বাদশার ঘাড়ে। ওকে ধরে ফেলেছে। তারপর ওকে নিয়ে লোফালুফি শুরু করে দিলে। ওঃ/ বাদশার নড়াটা বুঝি ছেঁড়ে/ প্রাণ বুঝি যায়-যায়/

লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছে টোরা। ওর বুকের ভেতরটা গুমরোচ্ছে। এখন কেমন করে সে বাঁচাবে তার ছোট্ট ভাইটিকে?

বাদশা যখন আর পারছিল না, হাঁপাচ্ছিল বে-দম হয়ে, আর ওর চোখে-মুখে বিন্দু-বিন্দু ক্লান্তির ছোঁয়া ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে পড়ছিল, তখন আর চুপ থাকতে পারেনি টোরা। টোরা যেন মুখ ফসকে আপনা থেকেই ডেকে উঠেছিল 'বাদশা/'

ইশ/ এখন কী হবে/ বাদশা যদি শুনে ফেলে থাকে।

না, খুব রক্ষে/ বাদশা শোনেনি। শুনেছে ওই জন্তুগুলো।

ওরা দেখতে পেয়েছে, ভয়ে টোরা ওই ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে পালাচ্ছে। হ্যাঁ, টোরা ছুটেছে/ আগু-পিছু কিচ্ছু না ভেবে একেবারে তিরবেগে ছুটেছে। একবার পিছনে ফিরেও তাকাল না। দেখল না, তার পালানো দেখে, জন্তুগুলো হাসতে-হাসতে ডিগবাজি মারছে আর তুড়তুড়ি কাটছে/ ওর পেছনে ছুটছে না, তাড়াও মারছে না।

এক নিশ্বাসে অনেকটা পথ চলে এসেছে টোরা। অনেক ঝোপ ডিঙিয়েছে সে, অনেকটা বন। এতক্ষণ যে চিৎকার ওর কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছিল, সে চিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। নিস্তব্ধ, নিঃঝুম চারদিক। তাই আর ছুটল না সে। থামল। ওই গাছের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ওর যেন ইচ্ছে হচ্ছিল একটু বসে-বসে কাঁদে। কিংবা ওই খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, সে কী পাপ করেছে যে তার কপাল এত মন্দ। এ অলক্ষুনে মুখ নিয়ে সে কোথা যাবে? এই অলক্ষুনে মুখ নিয়ে সে কেমন করে ভাইকে নিয়ে মায়ের কাছে ফিরবে?

যখন কেউ থাকে না নিজের কাছে, যখন মনে হয় ওই আকাশই আপনজন, তখন ভারি ভালো লাগে টোরার। যখন কথা বলার কেউ চাকে না, তখন যেন আকাশই কথা বলে টোরার সঙ্গে। ওই রহস্যঘেরা আকাশ ওকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। আকাশের তারারা চোখ টিপে ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলে/

আঃ। কী মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে/ এ তো ফুল না/ ফুলের মধু না/ কোথা থেকে ভেসে আসছে এই সুগন্ধ বাতাস? এত ভালো লাগছে টোরার। কেমন যেন আনমনা হয়ে সেই গন্ধের পথ চিনে-চিনে এগিয়ে চলল টোরা। সামনে পাহাড়। মস্ত উঁচু পাহাড়ের গায়ে-গায়ে নানা গাছ-গাছালি।

গাছ-গাছালির সবুজ পাতায় মিষ্টি হাতের ছোঁয়া বুলিয়ে আদর করছে ঝুরুঝুরু বাতাস। টোরা পাহাড়ের কাছাকাছি যতই এগোচ্ছে, সে-গন্ধ ততই কাছে আসছে। টোরা পাহাড়ের পায়ের কাছে, পাথরের গায়ে-গায়ে পা ফেলে খুঁজতে লাগল। ও ভাবল, এখানে নিশ্চয়ই কেউ আছে। হয়তো এমন কেউ, যে ওকে ভালোবাসবে। ওর দুঃখ বুঝবে।

সামনে একটা মস্ত গুহা। অন্ধকার। সেই মিষ্টি সুবাস এই গুহার ভেতর থেকেই আসছে যেন/ কে আছে গুহার ভেতরে?

ভয়ানক নিস্তব্ধ। ওর নিশ্বাসের শব্দটুকু ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ওর নরম পায়ের ছন্দটুকু পাথরের গায়ে-গায়ে যে শব্দ তুলছে, তা টোরার নিজের কানেই নিতান্ত অস্পষ্ট বেজে যাচ্ছে। টোরা গুহার ভেতরে এগিয়ে গেল।

সামনে আলো। অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল টোরা/ প্রদীপ জ্বলছে। কেবল একটি প্রদীপ। অন্ধকারে একটি শিখা। প্রদীপের আলোয় স্পষ্ট দেখল টোরা এক দেবতার মূর্তি। এই অন্ধকার গুহার ভেতরে এ মূর্তির পায়ের কাছে কে জ্বেলেছে প্রদীপের শিখা/ কে দিয়েছে আলোর ছোঁয়া/

কেঁদে ফেলল টোরা। ওর চোখের পাতা বেয়ে কান্নার ফোঁটাগুলি মুক্তোর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। হয়তো আনন্দে। এই অজানা জায়গায় ও একা। একাকী একটি ছোট্ট মেয়ে। ও জানে না, কী করবে এখন/ ও জানে না, কেমন করে তার ভাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। জানে না, কেমন করে ভাইকে মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে। এই দেবতা কি টোরাকে দয়া করবে না? দেবতা কি শুধুই পাথর/

আকুল হয়ে দেবতার পায়ের কাছে প্রণাম করল টোরা। মনে মনে বললে, 'ঠাকুর, বলো তুমি, ভাইকে কেমন করে ফিরে পাব? বলো ঠাকুর, আমার মায়ের কাছে কেমন করে যেতে পারব? তুমি তো ঠাকুর। তোমার তো অজানা কিছুই নেই। তুমি তো জানো ঠাকুর, আমার এ অলক্ষুনে মুখ যে দেখবে, সে-ই জন্তু হয়ে যাবে/ আমি কী করব? আমি কী করব ঠাকুর?' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল টোরা/

এ কী/ হঠাৎ প্রদীপটা পিলসুজের ওপর থেকে পড়ে গেল কেন/এই দ্যাখো, প্রদীপ যে মাটিতে পড়ে নিভে গেল/ বুঝতে পারেনি টোরা, অসাবধানে তার আঁচলের ছোঁয়া লেগেছে প্রদীপের গায়ে। তাই পড়ে গেল/ কী হবে/

সঙ্গে সঙ্গে উঃ/কী জমাট অন্ধকার/ কিচ্ছু দেখা যায় না/ ওই সুন্দর দেবতার মূর্তিটি পর্যন্ত অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আর টোরা? টোরা কোথায় গেল? অন্ধকারে সে কোথায় হারিয়ে গেল?

দ্যাখো, দ্যাখো, টোরা হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেছে। অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকার হয়ে মিশে আছে যে/ একী/ ওই প্রদীপ নিভে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে টোরাও যে অদৃশ্য হয়ে গেল/ টোরা নিজে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দেখতে পাচ্ছে, সে আছে। কিন্তু তুমি দেখছ, সে নেই। দেখা যাচ্ছে না, তার সেই ফুটফুটে মুখটি। সেই ডাগর-ডাগর চোখ দুটি। লাল টুকটুক ঠোঁট দুটি কিংবা আলতা-ছোঁয়া পা দুটি/ কী হল তার? আবার তার কি অভিশাপ লাগল?

টোরা কাঁদছে/ তুমি শুনছ টোরা কাঁদছে, কিন্তু দেখছ না তার কান্নার জল। তুমি শুনছ টোরার পায়ের শব্দ, কিন্তু বুঝছ না কোথায় সে চলছে/ তার হাতের চুড়ি বেজে যায় ঠুং-ঠুং, কিন্তু দেখছ না কোথায় সে বেজে পড়ছে/ ডুকরে-ডুকরে কেঁদে ওঠে টোরা, 'এ আমার কী হল?'

এই অন্ধকার গুহায়, অজানা দেবতার ঘরে অদৃশ্য টোরা কাঁদছে/

হঠাৎ কে যেন কথা বলল, 'কেঁ কাঁদে রে, কে কাঁদে?'

টোরার অদৃশ্য মূর্তি অদৃশ্য চোখে এদিক ওদিক চাইল।

সে-ই আবার বলল, 'কী তোর নাম?'

'আমি টোরা।'

'কী করে প্রদীপ নিভল?'

'আমার আঁচল লেগে প্রদীপ নিভে গেল।'

তখন সেই না-দেখা মানুষ গম্ভীর গলায় বললে, 'যারা অসাবধানী তারাই বারবার ভুল করে।'

টোরা মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারল না।

আবার সে বললে, 'তুই অসাবধানী। তোর অসাবধনতার জন্যে খাঁচার থেকে তোদের পাখিটা উড়ে পালাল। তোরই অসাবধানতার জন্যে সেই পাখি তোরই হাতের চাপে মারা গেল। আর এখন তোরই অসাবধনতার জন্যে দেবতার প্রদীপ নিভল। আর সেই পাপে তুই-ও অদৃশ্য হয়ে গেলি/ তুই সবাইকে দেখতে পাবি, কিন্তু তোকে আর কেউ দেখতে পাবে না। তারপর একদিন তোর অদৃশ্য শরীরটা নিয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে নীল আকাশে মিশে যাবি। সেদিন তুই আর কাঁদতেও পারবি না।'

'না—।' চিৎকার করে কেঁদে উঠল টোরা, 'আমাকে তুমি বাঁচাও। আমি না থাকলে, কে আমার মাকে দেখবে/ কে তার ঘরকন্নার কাজ করে দেবে। কে আমার বাবাকে যত্ন করবে। ভাইকে গল্প বলে ঘুম পাড়াবে।'

'তোর মা তো তোকে দেখতে পারে না। তবু মায়ের জন্যে তোর এত ভাবনা কেন?'

'কে বললে মা আমায় দেখতে পারে না। মা আমার ভালোর জন্যেই তো আমাকে বকে। কার মা তার মেয়েকে বকে না? আবার ভালোও বাসে না?'

'তোর মা তো পর। ও তো বাদশার মা।'

'মা কখনো পর হয়? বাদশা তো আমার ভাই।'

https://boierhut.com/fb

সেই কণ্ঠস্বর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আর টোরার অদৃশ্য চোখ দুটি ইতিউতি ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজে বেড়াল। কিন্তু তাকে দেখতে পেলে না। না পেয়ে, টোরাই আবার বললে, 'চুপ করলে কেন? তুমি আমায় বলে দাও কেমন করে আমি ফিরে পাব আমার সব কিছু/'

হয়তো সেই না-দেখা মানুষের মন টোরার কথা শুনে খুশি হয়েছিল। হয়তো মনে হয়েছিল অনেক দুঃখেও যে অন্যের মাকে আপন করে নেয়, সে লক্ষ্মী মেয়ে। তা দুঃখ ঘোচাতেই হবে। তাই সেই না-দেখা মানুষের কণ্ঠস্বর আবার শুনতে পেলে টোরা। সে বললে, 'তুই যদি আবার সব কিছু ফিরে পেতে চাস, তবে যে তোকে এই প্রদীপ আবার জ্বালতে হবে/

টোরা বললে, 'আমি জ্বালব।'

'কিন্তু এ যে বড় শক্ত কাজ। তুই যে ছোটো। তুই তো পারবি না।'

টোরা ব্যাকুল হয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমি পারব। আমি রোজ সন্ধ্যায় আমার ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বেলে দিই।'

তখন সেই কণ্ঠস্বর বললে, 'তবে শোন। এই গুহার ওপরে যে পাহাড়, সেই পাহাড়ের চূড়ায় তোকে যেতে হবে। সেই পাহাড়ের চূড়ায় খোলা আকাশের নীচে জ্বলছে আর এক প্রদীপ। এই নিভন্ত প্রদীপের শিখাটি সেই জ্বলন্ত প্রদীপের শিখায় জ্বালাতে হবে। যদি পারিস, তুই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবি।'

টোরার কণ্ঠস্বর আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, 'পারব, পারব, পারব।'

আবার সেই না-দেখা মানুষ বললে, 'বেশ তবে তুলে নে ওই প্রদীপ।'

টোরা অন্ধকারে তার অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে হাতড়ে-হাতড়ে মাটি থেকে সেই প্রদীপটা তুলে নিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এ যে সোনার প্রদ্বীপ/

সে তখন বললে, 'শুধু প্রদীপ নিলেই তো হবে না।'

'টোরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তবে?'

'জ্বলবে কেমন করে?'

'কেন জ্বলবে না?'

'প্রদীপের শিখা তো শুকিয়ে গেছে। ওকে ভিজিয়ে নিতে হবে/'

'কেমন করে? কী দিয়ে ভেজাব?'

'ভেজাতে হবে একটি ফুলের কান্নার জলে/'

অবাক হল টোরা। 'ফুল কাঁদে?'

'হ্যাঁ, ফুল কাঁদে। যেমন তুই কাঁদিস। একটি ফুলের এক ফোঁটা চোখের জলে এর শিখাটি ভিজিয়ে নিলে, তবেই প্রদীপ জ্বলবে।'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

টোরা হতাশ হয়ে চেয়ে রইল সেই কালো অন্ধকারের দিকে। কালো অন্ধকারে ও আলোর দেবতাকে দেখতে পাচ্ছে না একটুও। ও বুঝতে পারছে না এ কার কণ্ঠস্বর, দেবতার না অন্য কারও। তবু অন্ধকারেই অন্ধের মতো হাত জোড় করে বললে, 'ঠাকুর, তুমি যখন এত দয়াই করলে, তখন বলে দাও কোথায় কাঁদছে সেই ফুল? কোথায় গেলে তার দেখা পাব?'

তখন সেই কণ্ঠস্বর আবার বললে, 'যেখানে জলও আছে, স্থলও আছে। হাসিও আছে, খুশিও আছে। পাখিও আছে, ফুলও আছে। শুধু সেখানে নেই টোরা। সেখানেই তোকে যেতে হবে।'

টোরা উঠে দাঁড়াল। প্রদীপটা হাতে নিলে। সে অদৃশ্য, কিন্তু প্রদীপ তো নয়/ তাকে না-দেখা গেলেও এই প্রদীপ তো সবাই দেখতে পাবে, সোনার প্রদীপ দেখলে, কেউ নিয়ে নেয় যদি। ভয় হল। কিন্তু ভয় পেলে তার চলবে না। তাকে বেরিয়ে আসতে হবে গুহার অন্ধকার থেকে বাইরে। তারপর ও হাঁটবে। ওর পায়ের ছন্দে-ছন্দে প্রদীপও দুলে-দুলে এগিয়ে যাবে। মনে হবে, একটি আশ্চর্য সোনার পাখি শূন্যে একা-একা ভেসে যাচ্ছে।

টোরা গুহার অন্ধকার হাতড়ে-হাতড়ে আকাশের আলোয় বেরিয়ে এল। তারপর একটু দাঁড়াল। ভাবল, কোনদিকে যাবে সে/ কোনদিকে জল আছে, স্থল আছে? হাসি আছে, খুশি আছে? পাখি আছে, ফুল আছে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেমন যেন অবাক লাগল টোরার। ওর মনে হল, এসব তো সবখানেই আছে/ তা ঠিক। তাহলে? সে কোনখানে যাবে? কেমন করে যাবে?

৩

'টোরা, টোরা, টোরা/' কে যেন ফিসফিসিয়ে টোরার নাম ধরে কানে কানে ডেকে গেল। ও তো কাউকে দেখতে পেল না। শুধু ওর চারপাশে হাওয়া বয়ে চলেছে ঝুর-ঝুর করে/ আঃ/ কী মিষ্টি। তবে কি হাওয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কেউ ডাকল তাকে?

টোরা মিষ্টি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি, ডাকছ আমায়?'

'টোরা, টোরা, আমিও তোমার মতো অদৃশ্য। আমার সঙ্গে যাবে তুমি?'

'কোথায়?'

'যেখানে ফুল কাঁদে? কাঁদতে-কাঁদতে ফুলের চোখে জল গড়ায়?'

'তুমি সেখানে আমায় নিয়ে যাবে?' আনন্দে টোরার মন নেচে উঠল। উৎসাহে উচ্ছল হয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কে? তোমায় দেখছি না তো?'

সে বললে, 'আমি হাওয়ার দোলনা।'

অমনি টোরার পা দুটি দুলে উঠেছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হাওয়া বলল, 'অবিশ্যি ভয় কিছু নেই। কেননা, আমি তোমায় আমার দোলনায় নিয়ে যাব/'

টোরার চোখ দুটি ভয়ে কুঁচকে গেল। বললে, 'যদি পড়ে যাই/'

'যারা ভয় পায়, তারা পড়ে। পড়তে-পড়তে মরে। কিন্তু তুমি আর পড়বে কী/ তুমি তো অদৃশ্য/'

দুঃখে টোরার গলাটা ভার হয়ে গেল। টোরা উত্তর দিলে, 'ও হ্যাঁ, আমি তো অদৃশ্য। বেশ তুমি নিয়ে চলো, আমি ভয় পাব না/'

অমনি ঝুরঝুরে হাওয়া ফুরফুর করে বয়ে চলল। সেই হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে টোরা ভেসে যায়, হারিয়ে যায়, হারিয়ে যায় ওই আকাশে।

হাওয়া জিজ্ঞেস করলে, 'টোরা ভয় পাচ্ছ?'

টোরা বলল, 'ভালো লাগছে/'

পাহাড়টা পেরিয়ে-পেরিয়ে নদী এল। ওই নীল আকাশের ওপার থেকে চোখ মেলে দেখতে-দেখতে টোরার মনে হল, নদী যেন সবুজ বনের কপালে রূপালি আলোর টায়রা/ ঝিকমিক করছে/

টোরা হাওয়ার দোলনায় ভাসতে-ভাসতে জল দেখল, স্থল দেখল। হাসি দেখল, খুশি দেখল। পাখি দেখল, ফুল দেখল।

দেখল আর অবাক হয়ে গেল। মাটিতে হেঁটে হেঁটে দেখা একরকম। আর আকাশে উড়ে-উড়ে দেখা আরেক রকম। আকাশ থেকে দেখলে মনে হয়, পৃথিবটা যেন একটা খেলাঘর/ কেমন এইটুকু-টুকু হয়ে গেছে সব/

তারপর?

তারপর হাওয়া বলল, 'টোরা, নামতে হবে।'

টোরা জিজ্ঞেস করলে, 'এইখানে?'

হাওয়া বলল, 'এই বনে।'

'এই বনে ফুলের কান্না পাব?'

'কান্নার জল পাবে।'

'তবে নামি।' সায় দিল টোরা।

টোরার কথা শেষ হতে না হতেই, হাওয়া হুস-হুস করে টোরাকে নিয়ে সেই বনের গভীরে নেমে এল।

টোরা বনের ঘাসে পা ফেলে হাওয়াকে বলল, 'ভীষণ গহন বন।'

হাওয়া বলল, 'বন যদি না গহন হয়, মজা কিসের?"

টোরা জিজ্ঞেস করলে, 'বাঘ আছে?'

'বাঘ আছে, বাঘের মাসিও আছে।'

'এখানেই কান্না খুঁজতে হবে?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হাওয়া উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু খুঁজতে-খুঁজতে গভীর বনে হারিয়ে গেলে?'

'হারিয়ে গেলেই খুঁজে পাবে।' বলে হাওয়া হা-হা-হা করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে ঝড়ের বেগে ঘুরপাক খেতে লাগল। ঘুরতে-ঘুরতে গাছের পাতায়, গাছের ডালে হুটোপাটি লাগিয়ে দিলে। তারপর যে হঠাৎ কোথায় লুকিয়ে পড়ল, টোরা আর দেখতে পেল না।

টোরা চেঁচিয়ে ডাকলে, 'কোথা লুকালে?'

কে উত্তর দেবে? হাওয়া তখন হাওয়া হয়ে গেছে। আর ঠিক তক্ষুনি টোরার যেন শীত-শীত পাচ্ছে। মনে হল উত্তুরে হাওয়া ঝির ঝির করে বয়ে-বয়ে বনের পাতা ঝরাচ্ছে। গাছের শুকনো পাতাগুলো ঝরতে-ঝরতে যখনই ওর পায়ের ওপর উড়ে আসছে, তখন ওর মনে হচ্ছে এখন সে ভারি একলা। হাওয়াটা যে তাকে এমন একটা না-চেনা, না-জানা জায়গায় একলা ফেলে পালাবে, এটা তো সে ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি/ বলো, এখন এই গা-ছমছম বনে একা-একা সে কী করব? কোথায় খুঁজবে ফুলের কান্না?

একদল পাখি পাইন গাছের পাতায়-পাতায় খেলা করছে আর খুব গান গাইছে। এক-একটা পাখি গাইতে-গাইতে কেমন শিস দেয়/ কেউ-কেউ নাচে আবার। হাসে আবার। যাই বলো, টোরা কোনোদিন পাখিকে হাসতে দেখেনি/ ওরা তো আর টোরাকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই ভয়ও পাচ্ছে না। খুব হাসছে, খুব গাইছে, ধিনিক-ধিনিক নাচছে।

দেখছে টোরা। যতই দেখছে, ভালো লাগছে। আর মনে-মনে ভাবছে, এই বন ভরতি সব পাখি যদি মায়ের জন্যে নিয়ে যেতে পারি/ না, না, এখন ওসব কথায় না যাওয়াই ভালো। এখন কান্নার কথা। ফুলের কান্না/

হঠাৎ টোরার মনে হল, আচ্ছা পাখিরা তো সারা-রাজ্যি উড়ে বেড়াচ্ছে, ওরা তো জানতে পারে কান্না-ঝরা ফুলের কথা/ আচ্ছা, একবার পাখিদের যদিও ডাকে, যদি জিজ্ঞেস করে?

তাই হ্যাঁ, দেখাই যাকে না। এই ভেবে ভারি মিষ্টি সুরে পাখিদেরই ডাকল টোরা .

গহন বনের রঙিন পাখি,
বল না আমায় বল
কোথায় আমি খুঁজে পাব
ফুলের চোখের জল?

ওমা/ এ কী হল/ টোরার গলার স্বর শুনে যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেল পাখির দল/ ভাবল হয়তো, কীরে বাবা/ মানুষের দেখা নেই কোথাও, অথচ মানুষের গলা শোনা যায় কোত্থেকে/ পাখিরা আর থাকে ওখানে? গান থামিয়ে, নাচ থামিয়ে ভো-কাট্টা/ এ-গাছে, ও-গাছে যত পাখি ছিল, সব গাছ ছেড়ে, গাছের ডাল ছেড়ে একেবারে টোরার দৃষ্টির বাইরে হাওয়া/

https://boierhut.com/fb

টোরা সেইদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ভাবতে লাগল 'তাই তো, পাখিরা পালাল কেন?'

এমন সময় এক ঝলক হাওয়া গাছের পাতার ওপর দিয়ে ভেসে গেল। আর ঠিক তক্ষুনি মনে হল, যেন পাতাদের গায়ে কে সুড়সুড়ি দিয়ে দিয়েছে/ এ-পাতা ও-পাতার গায়ে লুটোপুটি খেয়ে খিলখিল করে হেসে কুটোকুটি/ টোরা ভাবল, গাছের পাতাও হাসে/ যখন হাসে, তখন নিশ্চয়ই টোরার কথাও বুঝতে পারবে/ তাই টোরা এবার গাছের পাতাদের ডাকলে .

গহন বনের সুবজ পাতা,
বল না আমায় বল,
কোথায় আমি খুঁজে পাব
ফুলের চোখের জল?

চোখের পলকে তখন এক কাণ্ড। টোরার মুখের কথা তখনও শেষ হয়নি/ দেখে কী, সেই বন ভরতি গাছ, গাছ ভরতি সবুজ পাতা নিমেষের মধ্যে সব ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ল। ঝরে পড়ে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সারা বনে ছোটাছুটি, হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল। সে এক তাজ্জব ব্যাপার/ গাছ আছে পাতা নেই। ডাল পালা খাঁ-খাঁ/ কঙ্কালসার/ মনে হচ্ছে যেন, কোমরভাঙা একশো দুশো বছরের হাড়-জিরজিরে এক-একটা বুড়ি, কিংবা বুড়ো, লিকলিকে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ল্যাকপ্যাক করছে।

পাতা ঝরল বলে, সেই গহন বন আর গহন রইল না। সারা বন আলোয় আলো হয়ে গেল/ সেই কাণ্ড দেখে বনের যত জীব সবাই তো থ বনে গেছে। যে যেদিকে পারল, দে চম্পট/ আর টোরা? কোনদিকে যাবে, কাকে ডাকবে, কিছুই ভেবে না পেয়ে শুকনো গাছের, শুকনো পাতার দিকে হাঁদার মতো চেয়ে রইল/ পথ যে কোথায়, ঠাওরই করতে পারছে না টোরা। সে যেন সত্যিই অলক্ষুনে/ না হলে এমন হবে কেন? এমন যে পখ-পাখালি, গাছ-গাছালিতে ভরা সুন্দর বন, তার দৃষ্টি লেগে সে-বনও ঝরে গেল/ এখন আর কিচ্ছু ভাবতে পারছে না টোরা। এখানে ফুলের চোখে জল পাওয়া তো দূরের কথা। এখন যেন এ-বনের মরুর দশা। যেদিকেই চাও খাঁ- খাঁ করছে/

ভারি দুঃখ লাগছে টোরার। সেই সোনার প্রদীপটি হাতে নিয়ে এখন সে এখানে একা/ ডাকলেও কেউ সাড়া দেবে না। সাড়া দিলেও কেউ টোরাকে দেখতে পাবে না।

কেঁদে ফেলল টোরা/ শূন্য এই বনে ওর কান্না কেউ শুনতে পাচ্ছে না। কেউ জানছে না, কে কাঁদে, কেন কাঁদে। টোরা যেমন হাওয়ার সঙ্গে হাওয়ার মতো অদৃশ্য, টোরার কান্নাও তেমনি হাওয়ার সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে ভেসে ভেসে ফিরে যাচ্ছে। ফিরে যায়, অনেক কাছে আবার অনেক দূরে। ধীরে-ধীরে পা ফেলে টোরা। ধীরে ধীরে সেই কান্নার সুর যেন একটি মিষ্টি গানের ঢেউয়ের মতো উছলে পড়ে/ অনেক ব্যথা, অনেক সুরের মুক্তা হয়ে হাহাকার করে ছড়িয়ে পড়ছিল/ এ কি কান্না? না, কান্নার গান? কে বলবে, টোরা কাঁদছিল, না কান্নার ছলে গাইছিল এই শূন্য বনে একা?

এই শূন্য বনে একটু আগে কত না প্রজাপতি রঙিন পাখনা ছড়িয়ে নেচে বেড়িয়েছে। কত না মৌমাছি ফুলের কানে গুন-গুনিয়ে গান শুনিয়েছে। গাছের ডালে বহুরূপী কত রূপের বাহার দেখিয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। হয়তো ছাপ-ছাপ চিতাবাঘ ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে বসে শিকার খুঁজেছে। কিংবা লয়া-লয়া সাপ লতায়-পাতায় জড়িয়ে-মড়িয়ে অঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে। কিন্তু এখন? সব শূন্য। এখন এই শূন্য বনে টোরার এ-কান্না কে শুনবে, শুধু ওই শূন্য আকাশ ছাড়া?

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁত করে চমকে উঠল টোরার। কেন? কাকে দেখলে টোরা? কে যায় তার চোখের সামনে দিয়ে? এ কী/ এ যে বাদশা/

বাদশা? হ্যাঁ, সত্যিই তো/ কিন্তু ওর এমন দশা কেন? কী হয়েছে তার? কেন গাধার মতো গাড়ি টানছে? কার গাড়ি টানছে? ও কে বসে আছে গাড়ির ওপর/

গাড়িটার দুটো চাকা। মাথা ঢাকা। ঠিক যেন এক্কাগাড়ি। গাড়ির সওয়ার একটা বুড়ি/ দ্যাখো, কেমন ঠ্যাং ছড়িয়ে আরাম করে বসে আছে বুড়িটা/ লজ্জা নেই তো/ একটা ছোট্ট ছেলে গাধার মতো গাড়ি টানছে আর বুড়ি কিনা তার পিঠে চাবুক মেরে হ্যাট-হ্যাট করছে/ এ কী রে/ বাদশাকে কি সত্যিই গাধা পেয়েছে/ ওইটুকু ছেলে বাদশা পারবে কেন ওই একটা ইয়া পেল্লাই গাড়ি টানতে/ পারছে না বলেই হোঁচট খাচ্ছে। হোঁচট খেলেই, বুড়িটা চাবুক হাঁকড়াচ্ছে/ আর বাদশা 'বাবা গো' বলে কেঁদে উঠছে/



হোঁচট খেলেই,বুড়িটা চাবুক হাঁকড়াচ্ছে/

যে টোরা এতক্ষণ কাঁদছিল, বাদশাকে দেখে তার চোখের জল চোখেই শুকিয়ে গেল। কী করবে এখন টোরা? কাকে ডাকবে? বাদশা তার এত কাছে থেকেও কত দূরে/ এ দুর্দশা থেকে সে কেমন করে বাঁচাবে বাদশাকে? কী দোষ করেছে বাদশা যে একটা বুড়ি নিষ্ঠুরের মতো তার কাঁধে গাড়ি জুতে আরাম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর হাওয়া খাচ্ছে/ এ কেমন করে হয়? জন্তু-মার্কা মানুষগুলোর হাত থেকে তবে কি এখন বাদশা এই বুড়িটার হাতে পড়েছে।

থাকতে পারল না টোরা। এখন তো আর বাদশার সামনে যেতে টোরার ভয় নেই। টোরা জানে এখন আর বাদশা তার মুখখানা দেখতে পাচ্ছে না, যে দেখলেই জন্তু হয়ে যাবে/

'আ—/' আর্তনাদ করে উঠল বাদশা। ওর পিঠে বুড়িটা আবার চাবুক মেরেছে। কেননা, ও যে পারছে না। পারছে না গাড়ি টানতে/

টোরা দাঁড়াল না। প্রদীপটা হাতে নিয়েই ছুটে গেল। ছুটে গেল গাড়িটার পেছনে। আহা/ ভাইয়ের কষ্ট সে যে আর দেখতে পারছে না। টোরা পেছন থেকেই তার অদৃশ্য হাত দিয়ে ঠেলা দিল গাড়িটায়। গাড়ির গায়ে টোরার হাতের ধাক্কা লাগতেই গাড়ি হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে গেল। বাদশার ছুটতে আর কষ্ট নেই। বাদশা ছুটল আর বুড়িটা দাঁত ছরকুট্টে হেসে উঠল।

বাদশা নিজেই অবাক হয়ে গেল/ বেড়ে মজা তো/ এতক্ষণ যে-গাড়িটা টানতে তার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল, সেই গাড়ি হঠাৎ এত হালকা হয়ে গেল কী করে? কেউ ঠেলছে নাকি পেছন থেকে? কই, না/ সামনে-পিছে ডাইনে-বাঁয়ে, কই, কেউ নেই তো/

আরও জোরে ঠেলল টোরা। আরও জোরে ছুটল বাদশা। ওর পিঠে চাবুক মেরে বুড়িটা আর হ্যাট-হ্যাট করে তেড়ে উঠল না। উলটে সেই দাঁত-খিঁচুনি বুড়ি, নাক-খিঁচুনি দিয়ে গাড়ির ওপর সটান দাঁড়িয়ে উঠে নৃত্য শুরু করে দিল/ ব্যস/ এবার উলটো বিপত্তি/ বাদশা পারবে কেন টাল সামলাতে? বাদশা তো বাদশা/ অমন একশোটা বাদশা এলেও কি অমন বিচ্ছিরি বুড়িকে সামাল দিতে পারে? বাদশার হাত ফসকে গাড়ি দুমফট/ আর বুড়িও পা হড়কে চিত-ফট/ বুদ্ধি দ্যাখো বুড়ির/ ওই একটা দুধের ছেলের ঘাড়ে গাড়ি জুতে তুই গাড়ির ওপর নাচানাচি করছিস কোন আক্কেলে/ তোর দয়া-মায়া নেই, না বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসে আছিস? ছিঃ, ছিঃ/

তুমি তো বলছ, ছিঃ, ছিঃ/ এদিকে ডিগবাজি খেয়ে বুড়ির যে কোমর গেল/ বুড়ির এমন লাগা লেগেছে না/ মাটিতে চিৎপাত তো হলই তার সঙ্গে চিৎকার শুরু করে দিলে বুড়ি, 'উরি বাবা রে/'

বাদশা একদম থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কী যে করবে, কিছু ঠাওরই করতে পারল না। কিন্তু বুড়ি, সে তো আর ছেড়ে দেবার পাত্তর নয়/ মাটি খামচে লেংচে-লেংচে উঠে দাঁড়ালে। রক্তচক্ষু ড্যাবডেবিয়ে, খপাত করে বাদশার কানটা ধরে ফেলল। তারপর এমন টান দিলে, এই দ্যাখো, বাদশার কান বুঝি ছিঁড়ে যায়/ সঙ্গে সঙ্গে চিল্লিয়ে উঠেছে, 'পাজি, হতচ্ছাড়া/ তোর এত বড়ো বুকের পাটা/ তুই আমায় ফেলে দিয়ে মারতে চাস/ তোর আমি মুণ্ডুপাত করব।' বলেই এমন

প্যাঁ—অ্যাঁ করে কেঁদে উঠল যে, দেখেশুনে বাদশা ভ্যাবাচাকা। যাচ্ছলে/ এত বড়ো বুড়িটা নাকি সুরে কেমন কাঁদছে দ্যাখো/ কাঁদবে না? কোমরে কি কম লাগাটা লেগেছে/ কেঁদে একেবারে পাড়া মাথায় করে চেঁচাতে লাগল, 'ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ গো, এই শয়তান ছেলেটা আমার কোমর ভেঙে দিল গো/'

অবিশ্যি এখানে আর আসবে কে? কেউ তো আর কাছেপিঠে নেই/ যতই চেঁচাও, ফক্কা/ শেষে বুড়িটা রেগে-মেগে বেমক্কা এক চড় কষিয়ে দিলে বাদশার গালে। তারপর কানটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে শুরু করে দিলে/

থাকতে পারল না টোরা। বুড়িটার তো আস্পর্ধা কম নয়। তার ভায়ের গায়ে হাত তোলা/ ছুটে গেল টোরা একেবারে বুড়ির পেছনে। পেছন থেকে বুড়ির নুটি বাঁধা ঝুঁটিটা হ্যাঁচকা মেরে নুড়োনুড়ি করে দিলে। বুড়ি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে, পেছন ফিরে দেখে ভোঁ-ভাঁ/ কেউ তো নেই/ বুড়ি একেবারে হাঁ/ কে তার ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল/

টোরা তো নেড়ে দিয়েই লুকিয়ে পড়েছে/ সামনে থাকলেই বা কী/ ওকে তো আর দেখতে পেত না। কিন্তু মুশকিল ওই যে, হাতে তার প্রদীপ/ সেটা তো দেখে ফেলতে পারে/

বুড়ি পেছনে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভয় পেল, না রেগে গেল, তা জানি না। উলটে বাদশার দিকেই তেড়ে গিয়ে বাদশাকেই গালপাড়া শুরু করে দিলে/ বাদশা বেচারি কী যে হল, কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বুড়ির গাল খেতে লাগল।

টোরা চুপি-চুপি আবার এসেছে বুড়ির পেছনে। এবার বুড়ির কোমরে দিয়েছে এক রামচিমটি/ বুড়ি চিমটি খেয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে গলা ফাটাল, 'বাবা গো, মা গো/' বুড়ি যতই চিল্লাচ্ছে, টোরা ততই খামছে ধরছে/

টোরার এই রামচিমটি বুড়ি কতক্ষণ সহ্য করবে? শেষমেশ ঠ্যাং ছুঁড়ে লাফালাফি শুরু করে দিলে/ থাক পড়ে তোর ঠেলাগাড়ি/ বাদশাকে ঝপাং করে জাপটে ধরে মার ছুট/ বাবা রে বাবা/ এই ল্যাকপ্যাকে-মার্কা বুড়িটার কী শক্তি দেখো। ভেবেছিলাম, বুঝি ফুঁ দিলে ফুস হয়ে যাবে/ ও হরি/ এখন দেখছি সে-গুড়ে বালি/ বাদশাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়ুচ্ছে দ্যাখো, যেন শ্যাওড়াগাছের ডাইনি।

বুড়িটা ছুটতে ছুটতে একটা আঁধার-আঁধার জায়গায় এসে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে। পেছন ফিরে দেখলে/ না, জন-মনুষ্যি নেই/ আঁধার জায়গায় মস্ত ঝোপের আড়ালে একটা ঘুপচি-মতো ঘর। বুড়ি চুপি-চুপি ঘরের চাবি খুলে, বাদশার ঘাড়টা ধরে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিলে। তারপর আর একবার ভালো করে বাইরের আঁদাড়-পাঁদাড়টা লক্ষ করে নিজেও ঘরে ঢুকে গেল। ভেতর থকে ঘরের হুড়কো এঁটে দিলে/ এদিকে টোরাও হাজির/ সে-ও যে তার পেছনে-পেছনে ছুটে এসেছে, বুড়ি সে-কথা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি/

টোরা ছুটে এল ঠিকই, কিন্তু ঘরে আর ঢুকতে পারল না/ ও ছুটে আসার আগেই দোর বন্ধ/ অবিশ্যি হুট করে ঘরে ঢোকাও তো যাবে না। ওর হাতে প্রদীপ/ প্রদীপ নিয়েই তো যত মুশকিল/ বুড়িটা একবার যদি দেখে ফেলে তা ব্যাস/ তখন কি-আর ছেড়ে কথা বলবে?

হাঁ বুড়ি সত্যিই ছেড়ে কথা বলেনি। বলেনি বাদশাকে। ঘরের মধ্যে তখন তুলকালাম শুরু হয়ে গেছে। কী চিৎকার আর দাঁতখিঁচুনি/ বাদশাকে ধরে এমন মার দিলে যে, বাদশা ককিয়ে উঠল/ বাইরে থেকে টোরার তো আর শুনতে কিছু বাকি থাকছে না। ছটফটিয়ে উঠল টোরার মন। এখন সে কী করবে? কেমন করে তার ভাইকে সে রক্ষা করবে?

ছুটে গেল টোরা দরজাটার কাছে। কান পাতলে/ তারপর ওর ছোট্ট হাতে যত শক্তি ছিল সব শক্তি দিয়ে দরজায় ঠেলা দিলে। দরজা কেঁপে উঠল, খট-খট-খট।

নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিল বুড়িটা। নইলে চেঁচাতে-চেঁচাতে হঠাৎ অমন থামবে কেন? একদম চুপচাপ/ বুড়ির গলায় আর টুঁ শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে না টোরা/ কীরে বাবা/ বুড়ি ভড়কে গেল নাকি/

আবার দরজায় ঠেলা দিলে টোরা।

বুড়ি গলায় খেঁকরি মেরে ক্যারকেরিয়ে সাড়া দিলে, 'দরজায় ঠেলা মারে কে র্যা?'

টোরা সাড়া না দিয়ে আবার ঠেলা দিলে।

বুড়ি দরজার হুড়কো খুললে।

শুনতে পেয়েছিল টোরা হুড়কো খোলার শব্দটা। তাই আবার চটপট লুকিয়ে পড়েছে/

দরজা খুলে, একটুখানি ফাঁক করে উঁকি মারলে বুড়ি। বাইরে তো কেউ নেই। কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। দরজা আর-একটু ফাঁক করে গলা বাড়াল/ কই, জন-মানুষের তো চিহ্ন নেই/ তাহলে বোধ হয় বাতাসে ঠেলা মেরেছে। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্যে বাইরে পা বাড়িয়ে রা কাড়লে, 'দরজা ঠেললি কে? কাকে চাই?'

এখনও কোনো সাড়া নেই/

বুড়ি এবার দরজা ডিঙিয়ে একেবারে বাইরে বেরিয়ে এসেছে/ দ্যাখো, দ্যাখো, বুড়ির চোখ দুটো দ্যাখো/ কী সাংঘাতিক দেখতে/ দেখলেই মনে হয়, কুচুটেপনায় ভরতি একেবারে/ আড়চোখে টেরিয়ে-টেরিয়ে ইদিক-ওদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ, বলব কী, টোরার হাতের সোনার প্রদীপটার দিকে তার নজর পড়ে গেছে/ এই রে/ এ কী করল টোরা। আবার অসাবধানীর মতো কাজ করে বসল/

বুড়ি প্রথমটা বুঝতেই পারেনি/ বুঝতে পারেনি ওটা কী/ তারপর কাছে আসতেই সোনা যখন ঝকমক করে চোখের সামনে ঠিকরে উঠল, তখন কি আর বুড়িকে বলে দিতে হবে এটা কী/ বুড়ির

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তো চক্ষু চড়কগাছ/ আরি ব্যাস? এ যে একটা সোনার প্রদীপ, হাওয়ায় ভাসছে/ এ-কেমনতর আজবকাণ্ড/ বুড়ি তখন করল কী, হাত বাড়াল/ এই সেরেছে/ ধরে ফেলল নাকী/

হুঃ/ অতই সোজা/

টোরার অবিশ্যি প্রথমটা বাদশার কান্না শুনে ভারি মন খারাপ লাগছিল/ কিন্তু বুড়ি প্রদীপটা ধরবার জন্যে হাত বাড়াতেই আর দেখতে হয়। টোরা চটপট হাতটা সরিয়ে নিলে/ বুড়ির হাতে ফোক্কা/

বুড়ি তো থ/ ভাবলে, এ কীরে, এপিকিস উড়াতে উড়তে ভাগে দেখি/

এবার বুড়ি গুটি-গুটি পা ফেলে এগিয়ে গেল। একেবারে প্রদীপটার সামনে। তারপর আঙুল দুটো শক্ত করলে। যেমন করে ফড়িং ধরে, তেমনি নিঃসাড়ে আঙুল পাকিয়ে যেই ধরতে গেছে, অমনি ফুড়ুত/

আর থাকতে পারল না। এবার বুড়ির চোখ দুটো লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল। চোখের তারায় সোনার ছায়া/ বুড়ি এখন মরিয়া/ কাপড়ের আঁচলটা কোমরে বেশ করে জড়ালে। মাথার চুলে নুটি বেঁধে শক্ত করে প্যাঁচ কষল। তারপর ধাঁই ধপাধপ শুরু করে দিলে।

প্রদীপ এদিক যায়।

বুড়িও এদিক ছোটে।

প্রদীপ ওপরে ওঠে।

বুড়িও লেংচি মেরে হাত তোলে।

প্রদীপ মাটিতে গড়ায়।

বুড়িও গড়াগড়ি খায়।

শেষে ঘেমে-নেয়ে, কেশে-হেঁচে বুড়ি একশা/ বুড়ির বুকের ধুকধুকি এই বুঝি ঠান্ডা মেরে যায়/

না, তা হল না। উলটে, টোরার হাত থেকেই যে প্রদীপটা ফসকে গেল/ ফসকে যেতেই মাটিতে পড়েছে। আর দেখতে/ বুড়ি একেবারে প্রদীপটার ওপর হুমড়ি খেয়ে কাঁপিয়ে পড়ল। মারলে ছোঁ/ ব্যাস/ ওই দ্যাখো, প্রদীপ সটান বুড়ির হাতের মুঠোর মধ্যে।

ইস/ এ কী হল/ প্রদীপটাও টোরার হাত ফসকে গেল/ সত্যিই/ এখন তুমিও না-বলে পারবে কি, মেয়েটা অসাবধানী, মেয়েটা বোকা?

না, মোটেই না/ এখন টোরাকে যে বলবে বোকা, আমি বলব সে-ই বোকা/ আমি যদি বলি, প্রদীপটা টোরা ইচ্ছে করে বুড়িকে দিয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না/

ইচ্ছে করেই তো/ এই দ্যাখো না এবার মজাটা/ প্রদীপটা যেই না হাতে পাওয়া, অমনি সেই সুঁটকি বুড়ির তখন সে কী ধেইধেই নাচুনি/ নাচুক বুড়ি। যত পারে নাচুক। সেই তক্কে টোরা যে তার ঘরে ঢুকে পড়েছে/ সাধ করে কি-আর প্রদীপটা হাতছাড়া করেছে টোরা/

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নাচ শেষ করে হাঁপাতে-হাঁপাতে বুড়ি যখন ঘরে ঢুকল, তখন টোরা বাদশার সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। টোরাকে যেমন বুড়িও দেখতে পাচ্ছে না, তেমনই বাদশাও দেখতে পাচ্ছে না, দিদি তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

বুড়ি ঘরে ঢুকেই আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়ে কাঠের সিন্দুক খুলে প্রদীপটা ঝটপট লুকিয়ে ফেললে। আর মনে-মনে ভাবলে, অ্যাদ্দিনে বোধ হয় কপাল খুলল/

বাদশা আর কাঁদছে না। বুড়িকে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাদশা। বুড়ি একবাটি তেল আনলে। তারপর বাদশার কাছে এসে ওর গালে ঠাস করে চড় মারল মেরে বলল, 'দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে ন্যাকামি হচ্ছে/ এই নে, এই তেল দিয়ে আমার কোমর মালিশ কর/ হতচ্ছাড়া ছেলে আমায় এমন ফেলে দিয়েছে যে, কোমরের যন্ত্রণায় আমি মরতে বসেছি/' বলে আবার বাদশার গালে একটা ঠোনা মেরে মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ল। বাদশা তেল দিয়ে বুড়ির কোমর মালিশ করতে বসল। এ-কম্ম কি বাদশা পারে? না, করেছে কোনোদিন? সে-কথা বললে কে শুনছে? না পারলেও উপায় নেই। করতেই হবে/

বাদশা পারছে না। ওর তো আর গায়ে তেমন শক্তি নেই যে খুব জোরে দলাই-মলাই করবে/ বাদশা যতই পারছে না, বুড়ি ততই খ্যান-খ্যান করে খেঁকিয়ে উঠছে।

টোরা এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল। তারপর চুপিসারে বুড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল/ হয়তো কিছু ভাবল। ওর মাথায় তখন কী বুদ্ধি খেলছে, ও ছাড়া আর কেউ জানে না। আর তাই বুড়ি যখন আবার বাদশাকে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠল, টোরা করল কী, দু-হাত দিয়ে বুড়ির কোমরটা তেড়েমেড়ে টিপতে লাগল। বাদশা জানতেও পারল না, পাশে তার দিদি। তার সঙ্গে দিদিও বুজির কোমরে তেল মালিশ করছে।

কী খুশি বুড়িটা/ আরামে বুঁদ হয়ে বললে, 'এই তো ভাল ছেলের কাজ/ লক্ষ্য করে আমার সেবা-যত্ন কর, খেতে দেব, পরতে দেব। তবে হ্যাঁ, বেয়াড়াপনা করলেই কিন্তু মুণ্ডুপাত করব।'

টোরা শুনছে বুড়ি কথা।

বুড়ি আবার নিজের মনেই বিড়বিড় করতে শুরু করলে, 'এমন উদ্ভুট্টি কাণ্ড কখনো দেখিনি/ আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কিন্তু পিলসুজের পিদিম যে এমন ভড়কি মেরে আকাশে ওড়ে, এই পেথম দেখলুম/ উঃ/ একটা আস্ত সোনার পিদিম/ এখন আমি কী করব, বেচব না রাখব? না, বেচব না, রাখব/ পয়মন্ত প্রদীপ যখন ধরা দিয়েছে, তখন কে জানে, ভাগ্যে আমার আরও কী আছে/'

বুড়ি এবার আয়েশ তরতাজা হয়ে বললে, 'বাঃ, ছেলেটা তো বেশ দলাই-মলাই করতে পারে/'

https://boierhut.com/fb

টোরা মনে-মনে 'বললে দাঁড়াও, তোমার আয়েশ করাচ্ছি/' বলেই টোরা হঠাৎ বুড়ির কোমরে এমন কাতুকুতু দিয়ে দিলে যে, বুড়ি একেবারে হাসতে-হাসতে যায় আর কী/ বুড়ি খিলখিলিয়ে হেসতে হাসতে চিৎকার করে উঠল, 'এই ছাড়, ছাড়।'

টোরা ছেড়ে দিল। বুড়ির হাসি থামল। দেখেশুনে বাদশা তো একদম হাঁদা/ বাদশা ভাবল, তাই তো, হলটা কী/ বুড়ি এমন পাগলের মতো হাসে কেন?

কাতুকুতুর রেশ জুড়াতে তো আর সময় লাগল না/ এবার দ্যাখো, বুড়ির মুখের ছিরি/ রেগে কাঁই/ রাগটা দপ করে জ্বলে উঠতেই বুড়ি খপ করে বাদশার চুলের মুঠি ধরল। তেড়েমেড়ে বলে উঠল, 'একরত্তি ছেলে গালা টিপলে দুধ বেরোয়, আমার সঙ্গে ফুককুড়ি/ আমায় তুই কাতুকুতু দিস/ আমি তোর ঠাট্টার যুগ্যি/' বলে চুলের মুঠি ধরে এমন নাড়ানাড়ি করে দিলে যে, বাদশার প্রাণ বুঝি গেল-গেল/ তারপর বুড়ি বাদশার চুল ছেড়ে খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'কুয়ো থেকে জল তোল, আমি চান করব।'

বাদশা এতক্ষণে কথা বললে, 'পাতকুয়োর জল অনেক নীচে।'

'নীচে থাকবে না তো কি তোমার মাথার ওপর থাকবে?' বুড়ি তেমনি তিরিক্ষি হয়েই বললে।

'অত নিচু থেকে জল তুলতে আমি পারব না।'

আর দেখতে/ বুড়ি গলার সুর পঞ্চমে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার মুখের ওপর চাটাং-চাটাং কথা/ হাড়বজ্জাত ছেলে/ পারব না/ তোল জল/'

বাদশা তখন কী করে, অগত্যা কুয়োর কাছে এসে, দড়ি বাঁধা বালতিটা সড়াত করে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলে। বালতি জলের মধ্যে গোঁত্তা খেয়ে ভরতি হয়ে গেল। ভরতি তো হল, কিন্তু আর টেনে তুলতে পারে না বাদশা/

কিন্তু বাদশা তো জানে না, তার দিদি তার পাশেই দাঁড়িয়ে/ বাদশা বালতি-বাঁধা দড়িটা টানতে-টানতে যখন হিমশিম, তখন হঠাৎ বাদশার মনে হল, দড়ি টানতে এখন তো বেশ হালকা লাগছে/ বালতি যেন আপনা থেকে উঠে আসছে। কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো তার/ অবাক হয়ে গেল বাদশা/

অবাক হবার তো কিছু নেই/ বাদশার দিদিও যে টেনে তুলছে বাদশার সঙ্গে দড়িতে হাত দিয়ে, এ তো আর সে জানতে পারছে না। বাদশা কেমন জল তুলে, বালতি নিয়ে সটান বুড়ির সামনে এসে দাঁড়াল/ বুড়ি ততক্ষণে কুয়োতলায় হাজির। মাথায় তেল চাপড়াতে-চাপড়াতে বললে, 'ঢাল।'

হুশ/ বাদশা বুড়ির মাথায় জল ঢেলে দিল।

বার-বার তিনবার। তিন বালতি জল ঢেলে, যখন চার বালতি ঢালবে, তখন টোরার মাথায় একটা দুষ্টু মতলব জুড়ে বসল। টোরা করল কী, কুয়োর জলে বালতিটা ডুবিয়ে, একেবারে যখন খুব গভীরে নেমে গেল বালতিটা, তখন টেনে তুলল। কুয়োর খুব গভীরে তো পেঁকো-জল/ সেই পেঁকো-জলের জলটুকু ফেলে, পাঁক ভরতি বালতিটা ওপরে তুলে আনল। অবিশ্যি কষ্ট হল খুব/ টেনে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তুলেই হুশ/ একেবারে বুড়ির মাথায়/ ঈশ/ এ যে সেই দোলখেলার ছাররা-র্যাররা/ বুড়ির মাথায় পাঁক, মুখে পাঁক/ বুড়ির সববশরীরে পাঁকে পাঁকে পাঁকাক্কার/ ম্যাগো মা/ কী যাচ্ছেতাই গন্ধ/

বুড়ি তো গন্ধের চোটে নাকে আঙুল টিপে এই বমি করে তো সেই বমি করে। বুড়ি ওয়াক থু ওয়াক থু করতে-করতে পাড়া মাত করে চেঁচিয়ে উঠল, 'হতচ্ছাড়া ছেলে/ আমার গায়ে তুই পাঁক ঢাললি/ আয়, তোকে কুয়োয় পুঁতি।' বলে বুড়ি যেই বাদশাকে ধরতে যাবে, অমনি টোরা করেছে কী, পেছন থেকে বুড়ির ঠ্যাং ধরে দিয়েছে টেনে/ বুড়ি সড়াত/ একেই তো পাতকো-তলায় শ্যওলা। তার ওপর কুয়োর পাঁক/ আর দেখতে/ বুড়ি ডিগবাজি খেয়ে সেই জলে-পাঁকে জ্যান্ত সাপের মতো কিলবিল করে হাত পা ছোড়াছুড়ি লাগিয়ে দিলে/ ভয়ে বাদশা কেঁদে উঠল, 'আমি করিনি।'

কিন্তু কে শুনছে সে-কথা/ বলি, বুড়িটা কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছে/ দেখতে পাচ্ছে না বাদশা তার সামনে দাঁড়িয়ে/

সে আর কে দেখে/ বুড়ি কোঁকাতে-কোঁকাতে কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে বাদশার ঘাড়ে-পিঠে দে দমাদ্দম। বাদশা কেঁদে উঠল। বুড়ি খ্যানখ্যানে গলায় তেড়ে উঠল, পাজি ছেলে, শয়তানি করার জায়গা পাসনি/ আয় তোকে যমের ঘরে দিয়ে আসি।' বলে বাদশার কানটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল। টানতে-টানতে একটা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে ঘরে ঠেলেমেলে ঢুকিয়ে দিয়ে, ঘরের দোরে শেকল তুলে দিল। বললে, 'থাক এইখানে। পড়ে-পড়ে যত পারিস কাঁদ। যমে এসে নিয়ে গেলে তবে ঘরের দোর খুলব।' বলে বুড়ি গজগজানি আর গাল-পাড়ানির সে কী ছি-চি কাণ্ড/

৪

অন্ধকার ঘরে, এক কোণে বাদশা লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে আর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে গজরাচ্ছে, 'অ্যাঁ-অ্যাঁ। আমায় শুধু-মুধু মারতে এসেছে। নিজে পা পিছলে পড়ে গেল, আবার কথা বলছে/ গায়ের জোর দেখাবার জায়গা পায়নি। দিদি যদি থাকত, তোমার জোর দেখান ঘুচিয়ে দিত।'

তা সে-কথা তো আর বুড়ি শুনতে পাচ্ছে না। রেগে ফোঁস-ফোঁসিয়ে বুড়ি তড়িঘড়ি ক-বালতি জল ঢেলে, গায়ে ল্যাপটানো পাঁক ধুয়ে ফেললে। তারপর চিঁড়ে-মুড়কির ফলার চটকে গপগপ করে গিলতে বসল। গেলা-টেলা হলে, আবার দেরাজের চাবি খুললে। চুপি-চুপি প্রদীপটা বার করে, পাঁশুটে চোখ ড্যাবডেবিয়ে দেখতে লাগল। কী লোভ দ্যাখো বুড়ির চোখ দুটোতে/ দেখতে-দেখতে নিজের মনেই বলল, 'বলি তোর তো ডানা নেই, ঠ্যাং নেই। তা কেমন করে ফুরফুরিয়ে উড়ছিলি বাছা? দেখিস আবার যেন উড়ে পালাস না/ বলে প্রদীপটাকে আদর করার সে কী বহর ছিরি/ আদর করে নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে চুমু খেলে, 'সোনা আমার, মানিক আমার।'

https://boierhut.com/fb

আহা/ দ্যাখো কেমন রোশনাই ঝকঝকাচ্ছে প্রদীপের গা বেয়ে/ মুছে-টুছে, আবার দেরাজের মধ্যে যত্ন করে রেখে দিয়ে দেরাজের চাবি এঁটে রাখলে। তারপর নিজের কাপড়ের খুঁটে সেই চাবির তাড়া বেশ করে বেঁধে, চ্যাটাই বিছিয়ে, একটা তেল চিটচিটে বালিস মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। আঃ/ তখন পাতকো-তলায় পড়ে গিয়ে কোমরে যা লেগেছে না/ ব্যথাটা এখনও টনটনাচ্ছে। বুড়ো হাড় তো/ বুড়ি টনটনে ব্যথা নিয়ে একবার এপাশ একবার ও-পাশ করতে করতে ভাবতে লাগল সোনার প্রদীপটার কথা। তাই তো, এখন সে সোনার প্রদীপটা নিয়ে কী করবে/ বাজারে বেচে আসবে, না প্রদীপ ভেঙে একটা বিছে হার গড়াবে/ হুঃ. খেপেছ/ এ প্রদীপ কখনো ভাঙে, না বেচে/ এ বাবা কপালের ধন। কপাল না ফিরলে এমন ধারা ঘটনা ঘটে কখনো/ এ সব ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছে। তারপরই বুড়ি চোখ দুটো কপালে তুলে বললে, 'আহা ঠাকুর, তুমি বাঁচালেই আমি বাঁচি।' বলে, কেঠো-কেঠো হাত দুটো ঠকাস করে কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুরকে নমস্কার করল।

হঠাৎ বুড়ির মনে হল, আচ্ছা আমি প্রদীপটা নিয়ে তো পাঁচজনকে ভেলকি দেখাতে পারি। আরে বাবা, এ কী শুধু প্রদীপ/ এ যেন সেই ডানাকাটা উড়ুক্কু পাখি। হাওয়ায় ছেড়ে দাও, ফুরফুর করে উড়তে শুরু করে দেবে। ওঃ/ সে যা হয় না/ যে দেখবে তারই চক্ষু চড়কগাছ/ ধরো, হাটের লোক দেখল। তারপর মনে করো না মাঠের লোক দেখল। শহরগঞ্জের লোক দেখল। তারপর মনে করো, আমার খুব নাম-ডাক হল। পয়সা-কড়ি হল। ধরো, এই ভাঙা বাড়িটা মস্ত বাড়ি হয়ে গেল। অনেক ঝি-চাকর হল। হাতি-ঘোড়া হল। আরিববাস/ তখন আমায় দেখে কে/ মখমলের গদির ওপর ঠ্যাং ছড়িয়ে গড়াগড়ি খাব আর হাই তুলব। তখন যদি রাজার ব্যাটা এসেও আমার পায়ে ধরে সাধাসাধি করে, বলে, 'ঠাকমা, ঠাকমা, প্রদীপটা একবার দেখাও' ভেবেছ আমি গলে যাব? উঁহু/ সেটি হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, রাজা যদি নিজে এসে কান্নাকাটি করে, তখন না হয় দেখা যাবে/ কিন্তু তখন কি আমি ছেড়ে কথা বলব/ কেন ছাড়তে যাব/ বলো, আমার ক্ষেমতা রাজার চেয়ে কম কীসে? রাজা, রাজবাড়িতে রাজা/ আর আমি? আমার আছে সোনার পিদিম। ডানা নেই, ঠ্যাং নেই, অথচ হাওয়ায় উড়ছে/ এমন ধন রাজার আছে/ আর দেখতে চাইলেই কি আমি রাজাকে দেখাচ্ছি/ আগে রফা হোক। রাজা যদি বলে অর্ধেক রাজত্ব দেব? ফুস, ওতে, টলব আমি? তারপর যদি বলে, অর্ধেক রাজকোশ দেব? নিতে বয়ে গেছে আমার/ একটুও নড়ছি না। যদি বলে, হাতি দেব, ঘোড়া দেব, ময়ূরপঙ্খি নাও দেব? আমি সঙ্গে-সঙ্গে হেসে উঠব। তখন যদি রাজা রেগেমেগে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলে ওঠে, তবে তোমার কী চাই? তখন আমি বলতে ছাড়ব, আমার গোটা রাজত্ব চাই। তারপর রাজত্বটা আমার হাতে তুলে দিলে, আমি ফিকফিক করে হাসব আর বলব, সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছে/ তখন কি আর কোমরের এই ব্যথা মালিশ করার জন্যে লোক খুঁজতে হবে? তখন তো খোদ রাজবাড়ির রানিই আমার খাসমহলের দাসী। দাসী যখন পায়ের কাছে নত হয়ে বলবে, মাসি, মাসি, তোমার জন্যে দাওয়াই এনেছি কাসির। তখন আমি গম্ভীর গলায় বলব, কোথাকার দাসী রে তুই?

কে বললে আমার কাসি/ তখন দাসী নিশ্চয়ই ঠকঠক করে কাঁপবে ভয়ে। কাঁপতে কাঁপতে তখন দাসী আবার জিজ্ঞেসা করবে, মাতা, মাতা, তোমার ধরেছে বোধ হয় মাথা? তখন আমি ধমকে উঠে বলব, তুই একটা যা-তা। দেখতে পাচ্ছিস না, আমার কোমরে ব্যথা? মালিশ কর। তখন আমি মখমল বিছানো সোনার পালঙ্কে মটকা মেরে পড়ে থাকব, আর দাসী আমার সেবা করবে/ ওঃ/ সে কী আরাম/ বলে যেই না বুড়ি আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে তড়াং করে উঠে বসতে গেছে, ব্যস/ বুড়ির কোমরে লেগেছে হ্যাঁচকা/ উঁহু-হু-হু/ বুড়ি যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে উঠল। তারপর চাটাইয়ের ওপর কাতরাতে-কাতরাতে আবার বাদশাকে গাল পাড়তে লাগল।

কিন্তু বাদশা? ভাগ্য মন্দ না হলে ও কখনো এই বুড়ির পাল্লায় পড়ে/ সেই ঢলঢলে প্যান্ট -পরা জন্তুমুখো মানুষগুলোর খপ্পর থেকে বাঁচতে গিয়েই তো আজ এই বিপদ। দোষের মধ্যে কী, না জন্তুগুলোর তাড়া খেয়ে বাদশা ভয়েময়ে বুড়ির ঘরে ঢুকে লুকিয়ে পড়েছিল। তাই বলে বুড়িটা তাকে একেবারে চোর ঠাওরাবে/ অবিশ্যি এ-কথা সত্যি, বাদশা বুড়িকে জিজ্ঞেস করে তার ঘরে ঢোকেনি। ঠিক আছে, মানলুম বাদশার দোষ। কিন্তু তাকে চোর ঠাওরাবার আগে, জিজ্ঞেস তো করবি, কী হয়েছে তার। ভালো রে ভালো, সে সব জিজ্ঞেস করা নেই, উলটে কোন আক্কেলে বুড়ি বাদশার ঘাড়ে জোয়াল চড়িয়ে গাড়ি টানায়/ তা বলি, লাজ-লজ্জা বলে তো একটা কথা আছে। না কি বুদ্ধি-সুদ্ধিও লোপাট হয়ে গেছে বুড়ির মগজ থেকে। একেই বলে মরণদশা/

বলবেই তো/ তিন কুলে তো বুড়ির কেউ নেই। থাকার মধ্যে এই ভাঙা-ফুটো বাড়িটা আর ছ্যারছ্যারে গাড়িটা। তাও বা কী। এতদিন তো গাড়িটা মুখ থুবড়ে পড়েই ছিল। বুড়ির কাঁখে যে-দিন বাতের ব্যথা ধরল, সেদিন থেকেই চিন্তা। সেদিন থেকেই উনি খোয়াব দেখছেন। আর দেখতে-দেখতে ভাবছেন, আহা রে, একটা যদি ঘোড়া থাকত, তবে গাড়িতে জুতি। গাড়ি চেপে হাওয়া খাই, আরাম করি। মাটিতে পা ফেললে কাঁখে লাগে। ঠ্যাংয়ে-ঠ্যাংয়ে ঠোক্কর লেগে ভারি রাজে/ তা ঘোড়া ছেড়ে একটা ভেড়াও কি বুড়ির ঘরের ধারে কাছে আসে/ জন্মাবার সময় মা বোধ হয় মুখে মধু দিতে ভুলে গেছল। নইলে মশায়, অমন মুখ হয়/ কাছে-পিঠে কাউকে দেখেছে কি, ব্যস/ আর রক্ষে নেই। মুখে যেন তুবড়ি ফুটছে। তাও যদি জানতুম বুড়ির ঘর ভরতি টাকাকড়ি, গয়না-গাটি ঝনঝন করছে/ তবেই হয়েছে। সে-কথাটি ভুলে যাও। টাকা থাকলেও কি বুড়িকে দেখে তুমি বুঝতে পারবে/ কেননা, তিনি পরেন ছেঁড়া কাপড়। তিনি খান চিঁড়ে-মুড়কি। আর তিনি শোবেন ছেঁড়া চাটাইয়ে। এক নম্বরের কঞ্জুস। আমায় বলতে হবে কেন, সে তো তোমরা নিজেরাই দেখলে। নিজে গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলল, কিন্তু কই, বাদশাকে একটু দিল/ বয়ে গেছে। নিজের নিয়েই বুড়ি মত্ত। নিজের হলেই ইচ্ছে। নিজে খাব, নিজে পরব, নিজে গাড়ি চড়ব। অন্যে মরলে বুড়ির কী/

আর এদিকে বাদশা যে কী করে রক্ষে পেয়েছে সেই জন্তুমুখো মানুষগুলোর হাত থেকে, তা সে নিজেই জানে। ও তো ভেবেই পায় না, অত করে ডাকতেও দিদি কেন একবারও ফিরে তাকাল

না। কী বলে দিদি তাকে এই বজ্জাত লোকগুলোর হাতে ফেলে পালাল/ কী কুচ্ছিত তাদের মুখগুলো/ হিংসুটে চোখগুলো যেন লোভে জ্বলছে/

কিন্তু দিদির যে কোনো দোষ নেই, বাদশা যে তার মুখ দেখলে জন্তু হয়ে যাবে, সে তো আর বাদশা জানে না। না পালিয়ে কী করবে দিদি?

ওই জন্তুমুখো মানুষগুলোর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে বাদশাও কী কম চেষ্টা করেছে/ কেননা, ওরা বাদশার চেয়ে অনেক বড়ো। লম্বা-লম্বা পা ফেলে বাদশাকে ধরা এমন কী শক্ত কাজ/ ভাগ্যিস জায়গাটা ঝোপে-ঝাড়ে ভরতি ছিল। বাদশা ওদের তাড়া খেয়ে এক ফাঁকে ঝুপ করে ওই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল, তারা দেখতেও পেলে না। তন্নতন্ন করে খুঁজে সেই জন্তুমুখো মানুষগুলো একেবারে হদ্দ হয়ে গেল। তারপর সন্ধে যখন হয়ে গেল, তখন অন্ধকারে শিকার ভো-কাট্টা/ বাঁচবার জন্যে, একেবারে বুড়ির ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে লুকিয়ে পড়েছিল বাদশা। কিন্তু ধরা পড়তে তো আর সময় লাগেনি। বয়েস হলে কী হবে/ সেই অন্ধকার রাত্তিরেও বুড়ির চোখ জ্বলছে। বুড়ি বাদশাকে দেখে ফেলেছে/ তেড়ে উঠল, 'কে রে, ওখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে?'

বাদশা প্রথমটা থতমত খেয়ে চমকে উঠেছিল। তারপর বুড়িকে দেখে ওর যেন ধড়ে প্রাণ এল। বলল, 'আমাকে চোরে তাড়া করেছে/'

বুড়ি কোথায় ওই ছোট্ট ছেলেটার কথায় বিশ্বাস করে ওকে আশ্রয় দেবে, তা নয়, উলটে বলে কী, 'তোকে চোরে তাড়া করেছে, না তুই নিজে চোর?' বলে বুড়ি ক্যাঁক করে বাদশার ঘাড়টা খাবলে ধরলে।

বাদশা কাকুতি-মিনতি করে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি চোর না, চোর না, আমি বাদশা/'

বুড়ি উত্তর দিল, 'ঠিক কথা। যারা চোর, তারাই বাদশা। চ, তোকে পুলিশে দেব।'

বাদশা বললে, 'বিশ্বাস করো, আমি চোর নই।'

চোরকে কে বিশ্বাস করে? তাই বুড়ি বাদশার ঘাড়টা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জিজ্ঞেস করলে, 'বল, কী চুরি করেছিস? দেখি তোর পকেট/'

বাদশা পকেট দেখাল। ট্যাঁক দেখাল। হাত দেখাল। কিচ্ছু পেল না বুড়ি। তাহলে আর চটবে না? তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বুড়ি বলল, 'বল, কোথায় রেখেছিস চোরাই মাল/'

'চুরি করিনি।' উত্তর দিলে বাদশা।

'চ তবে/'

'কোথায়?'

'পুলিশে/'

বাদশা এবার ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। বুড়িকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'না, আমায় পুলিশে দিয়ো না। পুলিশ বড়ো মারে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলতেই বুড়িটা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বললে,

আহা মরি, ডালের বড়ি
শুক্ত দিয়ে খাই,
চোরের ব্যাটা ভয় পেয়েছে
হেসেই মরে যাই/

ছড়া-পড়া বুড়ির ফোকলা দাঁতের দিকে বাদশা হাঁ করে তাকিয়ে রইল ঠায় একদৃষ্টে। হঠাৎ যেন বাদশার মনে হল, বুড়ির চোখের ভেতর একটা কুমতলব কিলবিল করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছি ঠিক তাই। বুড়ি বাদশার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল, 'পুলিশে যদি না যেতে চাস, তো আমার সেবা কর। ঘর-কান্নার কাজ করতে পারিস?'

বাদশা জিজ্ঞেস করলে, 'কী কাজ?'

'বাসন মাজতে পারিস?'

বাদশা উত্তর দিলে, 'কোনোদিন মাজিনি।'

'বাটনা বাটতে?'

'কোনোদিন বাটিনি।'

'ফল কুটতে?'

'কোনোদিন কুটিনি।'

'জল তুলতে?'

'কোনোদিন তুলিনি।'

'গাড়ি চালাতে?'

গাড়ির নাম শুনেই বাদশার চনমন করে উঠল। ঠিক কথা/ তখন বুড়ির ঘরের দোর-গোড়ায় একটা এক্কা-গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে বাদশা। ভাবল, সেই এক্কা-গাড়িতে ঘোড়া জুতে ওকে হয়তো হ্যাট-হ্যাট করে চালাতে হবে। আর কিছু না হোক, পুলিশের ঘর করার চেয়ে সে অনেক ভালো। তাই আর দোনোমনো না করে সে ঝট করে বলে বসল, 'হ্যাঁ, পারি।'

বললে তো পারি। কিন্তু বুঝতে তো পারেনি, ঘোড়া না আর কিছু। বুড়ি ঘোড়ার বদলে তার ঘাড়েই গাড়ি জুতে, তাকে দিয়েই গাড়ি ঠেলাবে। কী নিষ্ঠুর বুড়ি দ্যাখো/

রাত এল। এতক্ষণ টোরার যে কী কষ্টে সময় কেটেছে, তা ভগবানই জানে/ এতক্ষণ টোরা বোবার মতো চুপচাপ সব দেখেছে। দেখেছে, বুড়িটা নিষ্ঠুরের মতো মারতে-মারতে তার ভাইকে ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে শিকল তুলে বন্দি করে রেখেছে/ দেখেছে, বুড়িটা একলসেঁড়ের মতো নিজে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলেছে, কিন্তু ভাইকে একফোঁটা জলও দেয়নি। দেখেশুনে কী কষ্ট যে হয়েছে টোরার, তা সে-ই জানে। কিন্তু টোরা আর কী করবে/ ওর আর কতটুকু ক্ষমতা বলো/ ও যেন

এই রাতটুকুর জন্যেই সময় গুনছিল। ভেবেছিল, এই রাতের অন্ধকারে ওর আদরের ভাইটির কাছে সে যাবে। সে তার চোখের জল মুছিয়ে দেবে। কিন্তু তার আগে তো প্রদীপটা আবার ফিরে পেতে হবে/ মুশকিল, সেটা যে দেরাজে চাবি এঁটে লুকিয়ে রেখেছে বুড়ি/ তা হলে?

সারাক্ষণ বুড়ি চাবিটা আঁচলেই বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু রাত্তিরে শোবার সময় বুড়ি সেই চাবি আঁচল থেকে খুলে বালিশের তলায়, মাথার নীচে লুকিয়ে রাখল। সেটা স্পষ্ট দেখেছিল টোরা। দেখলে কী হবে/ এখন সেটা পাবে কী করে টোরা?

টোরা জানে, যদিও বুড়ি তাকে দেখতে পাচ্ছে না, তবু হুট করে কিছু না করাই ভালো। বুড়ি যদি একবার টের পেয়ে যায়, তাহলে সব মতলব ভেস্তে যাবে। বরং ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপর যা করবার করবে টোরা।

অবিশ্যি ঘুম পাড়াবার জন্যে, বুড়িকে তো আর ঘুম-পাড়ানি গান শোনাতে হবে না। বিছানায় শুয়ে পড়ে একবার এপাশ, আর একবার ওপাশ করেই তিনি নিদ্রা গেলেন। বাবা/ নাক ডাকানির বহর দ্যাখো/ যেন বর্ষার জলে কোলা ব্যাঙ গাল ফুলিয়ে ভ্যাঙাচ্ছে/

এই তাল। টোরা চুপচাপ তার অদৃশ্য হাতটা বুড়ির বালিশের তলায় সেঁদিয়ে দিলে। বালিশটা নড়ে গেছে/ এই রে/ টোরা চটপট হাতটা সরিয়ে নিলে বালিশের তলা থেকে। না, তেমন কিছু ভয় পাবার মতো কাণ্ড ঘটল না। বুড়ি শুধু এপাশ থেকে ওপাশে ফিরে শুল। একটু পরে বুড়ি আবার ঘুমে অচৈতন্য/ এবার আর ব্যাঙের ভ্যাঙচানি নয়। বুড়ির নাকে ভিমরুলের ভ্যানভ্যানানি/

আবার হাত বাড়াল টোরা। আবার হাত সেঁদিয়ে দিল বালিশের নীচে। এবার খুব সামলে। বালিশ যেন না নড়ে/ তা বললে কে শুনছে। বালিশ নড়বেই। নড়ুক। তবু রক্ষে, এবার বুড়ির নাকডাকানি থামেনি/ একেবারে মড়ার মতো নেতিয়ে পড়েছে বুড়ি। সেই তক্কে নিঃসাড়ে চাবিটা বালিশের নীচ থেকে বার করে আনল টোরা। কিছু বুঝতেই পারল না বুড়ি।

দেরাজ খুলে ফেলল টোরা। সামনেই প্রদীপ। হাত বাড়াতেই প্রদীপ ওর হাতের মুঠোয়।

প্রদীপ পেয়েই টোরা তাড়াতাড়ি আবার বন্ধ করে দিলে দেরাজটা। যদি বুড়ির আচমকা ঘুম ভেঙে যায়/ বলা তো যায় না/ বন্ধ করেই চাবির গোছাটা বুড়ির পাশেই রেখে দিল। কারণ বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে বুড়ির ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে আর সাহস নেই টোরার। প্রদীপ নিয়ে টোরা ছুটল ভাইয়ের কাছে।

ঘরে বন্দি তার ভাই। দরজায় শিকল তোলা। এত উঁচু, হাত যাবে না টোরার। হাত যে যাবে না, টোরা সে আগেই জানে। তাই কেমন করে ঘরের শিকল খুলবে, সে বুদ্ধি আগেই ঠাউরে রেখেছিল টোরা। টোরা কুয়ো-তলায় ছুটল। বুড়ির চান করার বালতিটা খুঁজে বার করলে। নিয়ে এল সেটা ওই বন্ধ ঘরের সামনে। উপুড় করে তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত বাড়াল। টোরার হাতের নাগালে দরজার শিকল। শিকল খুলে ফেললে। ঘরে ঢুকে গেল টোরা।

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভাই তার ঘরের মেঝের ওপর পড়ে আছে। ঘুমোচ্ছে। নিশ্চুপ, নিঃসাড়। আহা/ কী চেহারা হয়েছে বাদশার। মুখখানা শুকিয়ে যেন এইটুকু হয়ে গেছে।

টোরা থাকতে পারল না। এত অনাদর তো তার ভাইকে কেউ কোনোদিন করে না। এত কষ্ট বাদশা কখনো সইতে পারে/ তাই সে আলতো হাতের ছোঁয়া দিয়ে ভায়ের কপালের চুলগুলি সরিয়ে দিল। একটি চুমু খেল ওর কপালে। তারপর কান্নার জল ছলছলিয়ে উপছে গেল টোরার দু-চোখে।

তারপর আপন মনে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'বাদশা, তুই আর আমায় দেখতে পাবি না রে। অসাবধানে ঠাকুরের প্রদীপ নিভিয়ে ফেলে আমি যে অদৃশ্য হয়ে গেছি। আমায় আর কেউ-ই দেখতে পাবে না। আমি যতদিন না ফুলের কান্না খুঁজে পাব, যতদিন না সেই কান্নার জল দিয়ে প্রদীপ জ্বালতে পারব, ততদিন যে আমি অসহায়/ আমার যে সব হারিয়ে গেছে বাদশা। কে জানে, আমি কোথায় সে-ফুল পাব, যে কাঁদে/'

হঠাৎ এত হাওয়া আসে কেন ঘরের দরজা ঠেলে? ঝড় উঠল নাকি বাইরে?

না তো। হাওয়া শুধুই বয়ে যায়। যেতে-যেতে যেন কথা কয়/

চমকে উঠল টোরা। সত্যিই তো। হাওয়া যেন টোরার কানে ফিসফিসিয়ে বলে যায়, 'ওই তো ফুল কাঁদছে, ওই তো ফুল কাঁদছে/'

টোরা আপন মনেই জিজ্ঞেস করে, 'কই তো ফুল কাঁদছে?'

হাওয়া হু-হু শব্দে বইতে-বইতে বললে, 'চোখ থাকলেই দেখতে পাবে, দেখতে পাবে, দেখতে পাবে।'

টোরা তখন দু-চোখ মেলে ঘরের অন্ধকারে ফুল খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে টোরা। ওর চোখের তারা দুটি স্থির হয়ে চেয়ে রইল বাদশার চোখের দিকে।

অমনি হাওয়া খিলখিল, খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক দেখেছ, ঠিক দেখেছ। ওই তো ফুল, কান্না ফুলের/'

ঠিক তক্ষুনি টোরার যেন মনে হল, বাদশার কান্নার জল, অন্ধকারে ঝলমল করে একটি একটি মুক্তার মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

টোরা বললে, 'ও তো আমার ভাই, বাদশা/'

হাওয়া উত্তর দিলেঃ

যার মনে পাপ নেই,
দ্বেষ নেই, দোষ নেই,
রাগ নেই, রোষ নেই,
তার নাম রং/

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যার রঙে আলো আছে,
হাসি আর খুশি আছে,
সুর-ভরা বাঁশি আছে,
তার নাম ফুল।

'সত্যি।' বুকের আনন্দ চেপে রাখতে পারল না টোরা হাওয়ার কথা শুনে।

হাওয়া বললে, 'সত্যি, সত্যি, সত্যি/' বলতে-বলতে হাওয়া দোর ডিঙিয়ে, ঘর ছাড়িয়ে নাচতে লাগল।

আর টোরা? খুশিতে হাত বাড়িয়ে বাদশার চোখের জল সোনার প্রদীপে ভরে নিল। ভরে নিয়ে বাদশার চোখ দুটি মুছে দিল। তারপর শেষবারের মতো ওর মুখটি দেখতে-দেখতে আনমনা হয়ে যায় টোরা। নরম গলায় ডেকে ওঠে 'বাদশা।'

ঘুমন্ত বাদশা চমকে উঠেছে। চোখের ঘুম তার ছুটে গেল। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল। কে ডাকল তাকে? এ যেন তার দিদির গলা/ বাদশাও ডাক দিল, 'দিদি।'

বাদশার ডাকে কে সাড়া দেবে/ ততক্ষণে দিদি ঘর ছেড়ে বাইরে। সে যখন ফুলের চোখের জল পেয়েছে, তখন এই অন্ধকার রাত্তিরেই তাকে যেতে হবে ওই পাহাড়ের চূড়ায়। মন্দিরে। এ প্রদীপ তাকে জ্বালাতেই হবে। নইলে সে যে কিছুই ফিরে পাবে না।

'দিদি/' ব্যাকুল হয়ে ঘর থেকে ডাকতে-ডাকতে বেরিয়ে এলে বাদশা। কিন্তু দিদির দেখাও পেল না। দিদি সাড়াও দিল না।

আবার চেঁচাল বাদশা, 'দিদি, আমি এখানে।'

ডাকতে-ডাকতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে বাদশা।

এদিকে বাদশার চেঁচামেচিতে বুড়ির ঘুম গোল্লায় গেল। আঁকপাকিয়ে উঠে পড়ল। তরতরিয়ে তেড়ে এল। আর যেই না বুড়িকে দেখা, বাদশাও মার ছুট/

বুড়ি তো আর বাদশার মতো ছুটতে পারে না/ তাই ধরতেও পারে না। তার ওপর কোমরে কনকনানি টনটনাচ্ছে। তাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'চোর, চোর, ধর, ধর/'

বাদশা তখন কোথায় চলে গেছে। কত দূরে। আর ধরতে হচ্ছে না। বাদশা হাওয়ার চেয়ে আগে ছুটেছে।

তখন বুড়ি আর কী করবে, ঘরের চৌকাঠে ঠ্যাং ছড়িয়ে চিল্লা-চিল্লি করতে-করতে মাথা খুঁড়তে লাগল।

ছুটছে বাদশা। ডাকছে দিদিকে, খুঁজছে দিদিকে, 'দিদি, দিদি, কই তুই?' সেই ডাক অন্ধকারকে খানখান করে ফিরে-ফিরে ঘুরছে।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হঠাৎ এ কী/ সেই অন্ধকারটা যেন আরও অন্ধকার হয়ে গেল/ হ্যাঁ সেই আরও অন্ধকারে, আবার সেই কালো-ডানার দানো-পাখিদের ভয়-জাগানো পতপতানি আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসছে। ওরা দেখতে পেয়েছে বাদশাকে। ওরা বাদশাকে ধরবে।

বাদশা সেই পতপতানি শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আকাশের দিকে চাইল। কিন্তু এবার ভয় পেল না বাদশা। সেই ভয়ঙ্কর পাখিগুলোর দিকে হাত উঁচিয়ে সে বললে, 'ওরে দানব, ভয় দেখাবি কাকে? আমাকে? আমাকে যে ভয় দেখায়, সে এখনও জন্মায়নি।'

পাখিগুলো নেমে আসছে।

না, আজ আর কিছুতেই ধরা দেবে না বাদশা। বাদশা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাদের দিকে।

এবার পাখিগুলো বাদশাকে ছোঁ মারবে।

বাদশাও ঘুষি পাকালে।

পাখিগুলো ছোঁ মারল।

বাদশা লড়াই শুরু করে দিলে। অসংখ্য পাখি আর বাদশা একা/

বাদশা লড়ছে। ওরা মস্ত-মস্ত ডানার খোঁচা দিয়ে ঝাপটা মারছে বাদশাকে। বাদশা রুখছে সে মার।

ওরা খোঁচা-খোঁচা ঠ্যাং দিয়ে খামছে দিচ্ছে বাদশাকে।

বাদশা ওদের ঠ্যাংয়ের আঙুলগুলো মচকে দিচ্ছে।

ওরা লম্বা-লম্বা ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে দিচ্ছে বাদশার মাথা, বাদশার হাত, বাদশার পিঠ। তখন দারুণ লড়াই শুরু হয়ে গেল।

যে ডানা মারে, তার ডানা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দেয় বাদশা। যে খামচে দেয়, তার ঠ্যাং ভেঙে দেয় বাদশা। যে ঠোক্কর মারে, তার ঠোঁট উপড়ে ফেলে বাদশা। কেউ মরল, কেউ ছটফটিয়ে কাতরাতে লাগল। নয়তো মারের চোটে বৃন্দাবনে পালাল। কিন্তু ওই দানবের দল তো ছোটো নয়, একটা যায় তো দশটা আসে। আসুক/ বাদশার সঙ্গে আজ কেউ পারবে না। বাদশা সবাইকে আজ খতম করে ছাড়বে। দে মার, দে মার/ কী বাহাদুর ছেলে, দ্যাখো/

সত্যি/ শেষকালে পালা-পালা। দানব-পাখিগুলো বাদশার মারের চোটে যে যেদিকে পারল রণে ভঙ্গ দিয়ে একদম ভাগলবা/

বাদশা জিতে গেছে/ বাদশার গা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। পড়ুক। জয়ের আনন্দে ওর বুকটা ফুলে উঠেছে। কিন্তু দিদি? দিদি কোথা? দিদি নইলে তার এই বীর ভাইকে কে আদর করবে? গায়ের রক্ত মুছে দেবে?

বাদশা আবার ডাকল, 'দিদি।'

https://boierhut.com/fb

তখন দিদি অনেক দূরে। দিদি অনেক দূরে ওই পাহাড়ের পাথর ডিঙিয়ে সেই চূড়ায় যাবে। সেখানে প্রদীপের আলো জ্বলছে। তার হাতের এই প্রদীপটি টোরা জ্বালবেই সেই প্রদীপের আলোতে।

কিন্তু টোরা যে জানে না, আর এক ভয়ঙ্কর বিপদ তার সামনে ওঁত পেতে দাঁড়িয়ে আছে/ কে জানত দানো-পাখিদের সেই যে সর্দার, সে তার পিছু নিয়েছে। ওই তো সে টোরার মাথার ওপর উড়ে-উড়ে এগিয়ে আসছে ওর হাতের প্রদীপটির দিকে লক্ষ রেখে। দেখতে পায়নি টোরা। দেখা সম্ভবও না। কেননা, রাতের কালোর সঙ্গে, দানোর ডানার কালো মিশে একাকার হয়ে আছে।

কত উঁচু পাহাড়টা/ ওর ছোট্ট-ছোট্ট পা দুটি পাথরের গায়ে-গায়ে লাফ দিয়ে কত কষ্টে এগিয়ে আনমনে চলেছে। কত সাবধানে, সোনার প্রদীপে কান্নার জলটি সে সামলে রেখেছে। যেন চলতে গিয়ে ছলকে পড়ে না যায়/ যেন তার পা দুটি হোঁচট খেয়ে ছিটকে না পড়ে। চোখ তার সেই দিকেই সজাগ। না, অসাবধানী সে আর হবে না। কিছুতেই না।

অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে টোরা। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ওই দূরে পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোটো মন্দির। মন্দিরের ভেতর সেই প্রদীপের আলো জ্বলছে। ছোট্ট একটি প্রদীপ, কিন্তু তার আলোর ঝিলিমিলি উছলে ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের গায়ে। টোরার দৃষ্টি এখন ওই আলোর দিকে। ওই আলোয়, প্রদীপের শিখাটি ও জ্বেলে নিলেই অদৃশ্য টোরা ফিরে পাবে নিজেকে। নিজেকে ফিরে না পেলে ভাইকে সে কেমন করে ফিরে পাবে/

আঃ/ কী শান্ত নিশ্চুপ চারিদিক। নিশ্চুপ আর ভারি স্থির ওই নীল আকাশের চাউনিটাও। ওই আকাশ যেন পাহাড়কে ডাকছে চোখ টিপে। আর পাহাড় মুখ বাড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে আকাশকে। একাকী জ্বলতে-জ্বলতে পাহাড়ের এই প্রদীপটি তা-ই দেখে দুলছে, নাচছে। নাকি হাসছে?

দাঁড়াল টোরা। তার অদৃশ্য চোখ দুটি স্থির হয়ে। দেখে। ধীরে-ধীরে এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল টোরা। হাতের সোনার প্রদীপটা পাহাড়ের সেই জ্বলন্ত প্রদীপের শিখায় ছোঁয়াল। দ্যাখো-দ্যাখো ওই তো/ প্রদীপ জ্বলে উঠেছে/

দকী আশ্চর্য, প্রদীপ জ্বালার সঙ্গে-সঙ্গে টোরার শরীরটাও তো আবার ফুটে উঠেছে/ ওই তো আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে/ ওই দেখা যাচ্ছে, মুখটি/ ওই তার চোখ দুটি/ প্রদীপটি হাতে নিয়ে ওই তো টোরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে/

আনন্দে বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে নেচে উঠল টোরার। সে নিজেকে দেখতে পেয়েছে। এ কেমন করে হয়/ একি জাদু? না দেবতার বর/

এত আনন্দেও এবার কিন্তু টোরা একটুও অসাবধানী হল না। জ্বলন্ত প্রদীপের শিখাটি সে বুক দিয়ে আড়াল করে রাখল। না, এ-প্রদীপ সে আর নিভতে দেবে না। কিছুতেই না। এ প্রদীপ যে-দেবতার, তার পায়ের কাছে সে আবার রেখে আসবে।

শেষবারের মতো দেবতাকে প্রণাম করে বেরিয়ে এল টোরা মন্দিরের দরজা পেরিয়ে। বাইরে, এই পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় ধীরে ধীরে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ার দোলায় প্রদীপের শিখাটির মতো টোরার মনটিও দুলছে। এবার ওকে ফিরতে হবে। ফিরতে হবে, এই পাহাড়ের পায়ের কাছে, সেই গুহার মন্দিরে। পা বাড়াল। কিন্তু টোরা দেখতে পেল না। সামনে তার কে দাঁড়িয়ে/ কিসের বিপদ/

থতমত খেয়ে আচমকা চিৎকার করে উঠেছিল টোরা/ দেখতে পেয়েছে টোরা। একটা ভয়ঙ্কর জীব। থুপসি মেরে উপুড় হয়ে পড়ে সে তার দিকে চেয়ে আছে। টোরা স্পষ্ট দেখছে, তার আটটা ঠ্যাং। সাপের মতো কিলবিল করছে। তার বুকের একটা গর্তের ভেতর থেকে কালো মেঘের মতো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সেই ধোঁয়া টোরার মুখে-চোখে লেগে কেমন যেন সব ঝাপসা করে দিচ্ছে। তারপর সেই আটটা ঠ্যাং নড়ে উঠল। নড়তে-নড়তে টোরার দিকে এগিয়ে এল। হয়তো এক্ষুনি সে তার ওই আটটা ঠ্যাং দিয়ে টোরাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরবে/ তাহলে টোরা কী করবে তখন?

টোরা ভীষণ ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমায় মেরো না।'

সেই আট-ঠ্যাঙে তখন আটটা ঠ্যাং নাচিয়ে নাচিয়ে হেসে উঠল, হা-হা-হা। তার হাসির শব্দে পাহাড়ের পাথরগুলো টলতে টলতে ছিটকে পড়ল। মেঘ ডেকে উঠল গুড়গুড় করে/

টোরা প্রদীপটা হাতের আড়ালে লুকিয়ে বলল, 'আমার এ-প্রদীপ তুমি নিভিয়ে দিয়ো না/'

এবার সেই আট-ঠ্যাঙে কথা বলল, 'তুই কার হুকুমে মন্দিরে ঢুকেছিস? এই মন্দির আমার/ তার গলার শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, কে যেন ঢাক পেটাচ্ছে তার গলার ভেতর।

টোরা বললে, 'মন্দির তো দেবতার। সেখানে তো সবাই যেতে পারে।'

এবার সে গর্জন করে উঠল। বলল, "আমি মন্দিরের দেবতাকে রক্ষা করি। যারা মন্দিরে চুরি করতে ঢোকে, তাদের আমি পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে ফেলে দিই।'

'আমি তো কিছু চুরি করিনি।' উত্তর দিলে টোরা।

'তুই আলো চুরি করেছিস। প্রদীপের আলো।'

'আলো কি চুরি করা যায়? তা তো আমি জানতুম না।' টোরা কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, 'আমি আর কখনো করব না। এবারটি আমায় ছেড়ে দাও।'

'না।' সেই আট-ঠ্যাঙে এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। টোরা শেষবারের মতো কেঁদে উঠল, 'আমায় ছেড়ে দাও, আমায় দয়া করো।'

এতক্ষণ আর কে তাকিয়ে ওই আকাশের দিকে। ওই দ্যাখো সেই দানো-পাখিটা টোরার মাথার ওপর পাক খাচ্ছে। তার কালো ছায়াটা হঠাৎ টোরার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। পড়ার সহেগ সঙ্গে ছোঁ মারল পাখিটা। সে টোরার হাত থেকে প্রদীপটা ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু পারল না। দেখে ফেলেছে পাহাড়ের এই আট-ঠ্যাঙে জন্তুটা আকাশের ওই কালো-ডানার দানোটাকে। ছোঁ মারার

সঙ্গে সঙ্গে সে-ও তার আটটা ঠ্যাং দিয়ে ধরে ফেলেছে দানোটার কালো ডানা। আর দানোটা অমনি তার মস্ত ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঝাড়লে এক বোম্বাই ঠোক্কর আট ঠ্যাঙের গর্দানে। তারপর যা লেগে যা ঝটাপটি। আট-ঠ্যাঙের গায়ে যত ক্ষমতা, দানোর গায়েও তত শক্তি। আট-ঠ্যাঙে তার ঠ্যাং দিয়ে জড়িয়ে ধরে দানোটাকে যতই চটকাচ্ছে, দানো-পাখিটাও ততই ঠুকরে-ঠুকরে রক্তারক্তি করে ছাড়ছে। কী ভীষণ লড়াই। আর কী প্রচণ্ড আর্তনাদ পাহাড়ের মাথার ওপর। যেন একশোটা ঢাকের শব্দ কান ফাটিয়ে একসঙ্গে বেজে উঠছে। তাদের ধস্তাধস্তিতে পাহাড়, কাঁপছে।

টোরা তো দেখেশুনে থ। এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল টোরা। তারপর যখন ভয়ানক তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল, তখন ভাবল, এই সুযোগ। টোরা ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে তরতর করে নামতে শুরু করে দিলে।

কিন্তু এই যাঃ/ দানব-পাখিটা দেখে ফেলেছে/ তার সেই মস্ত-মস্ত ডানা দুটোর বেদম এক ঝটকায় আট-ঠ্যাঙেকে কুপোকাত করে সে ছুটল টোরার দিকে। টোরাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরলে। ততক্ষণে আট-ঠ্যাঙেও সেখানে হাজির। সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল দানো-পাখির ঘাড়ে। তারপর পাহাড়ের ওপর টোরাকে নিয়ে টানামানি করতে করতে শুগু হল সে আবার আর এক লড়াই। পাহাড়ের ওপর থেকে তিনজনেই, এই পড়ে, কি সেই পড়ে/ আর ওই রকম সাংঘাতিক টানামানি করলে টোরাই বা কেমন করে সামলাবে তার হাতের প্রদীপ/ বেমক্কা হল কী, প্রদীপের আগুনে দানো-পাখির ডানায় লেগে গেছে ছেঁকা/ সঙ্গে সঙ্গে ডানাটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে। দানোটা পুড়তে-পুড়তে বিকট চিৎকার করে উঠল। চিৎকার করে টোরাকে মারল এক ধাক্কা। টোরা টাল সামলাতে পারল না। পিছলে পড়ল সে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে, পাহাড়ের খাদে। খাদ থেকে সে আরও অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে খেতে-পড়তে আরও গভীরে ডুবে গেল টোরা।

৫

কিন্তু আশ্চর্য/ পা ফসকে আছাড় খেয়ে পড়ল না টোরা। কোনো আঘাত তো তার লাগল না/ কে যেন ধীরে ধীরে ওকে নামিয়ে নিয়ে এল এই অন্ধকার গহ্বরে/ না, আঘাত তার লাগবে না। তার হাতে যে দেবতার জ্বলন্ত প্রদীপ। এত বিপদেও সে তার হাতের প্রদীপটি শক্ত হাতে ধরে রেখেছে। সে নিভতে দেয়নি তার শিখাটি। আঃ/ এই গভীর অন্ধকারে এ-প্রদীপটি যেন টোরার বন্ধু। ওকে পথ দেখাবে/

তবু ভীষণ ভয় লাগছে টোরার। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কেউ নেই, কিছু নেই। এ-কোথায় পড়ল সে। এখান থেকে ও কেমন করে উদ্ধার পাবে/ পৃথিবীর নীচটা কী ভয়ানক অন্ধকার/

না, সে হয়তা আর পারবে না, পারবে না বাঁচতে। এই জমাট অন্ধকার গহ্বরে সে বুঝি তিলে-তিলে শুকিয়ে মরবে/ ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল টোরার। ওর মনে হচ্ছে, এখনই খুব চিৎকার করে কেঁদে ওঠে/ কিন্তু পারল না। মনের ভেতরটা ছটফট করে উঠলেও ওর গলা কথা বলতে পারছে না। অথবা মনে হয়, ও যেন কথা বলতে ভুলে গেছে/ সত্যিই, কথা বলতে ভুলে যাওয়ারই কথা। এখানে আকাশ নেই, আকাশের আলো নেই। গাছ নেই, পাখি নেই। শুধু অন্ধকার। টোরার যেন দম আটকে আসছে। আর মনে হচ্ছে, ওর হাতের প্রদীপ-শিখায় ওর নিজেরই ছায়াটা যেন একটা ভয়ঙ্কর মূর্তি হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কটমট করে।

হঠাৎ কেমন যেন শিউরে উঠল টোরা/ অমন চমকে কার দিকে চাইল সে/

টোরা দেখতে পেল, অন্ধকারে কালো-কালো ছায়ার মতো কারা যেন এদিক-ওদিক থেকে ছুটে পালাচ্ছে/ মনে হল, গহ্বরের আশে-পাশে, এবড়ো-খেবড়ো গর্তগুলোর মধ্যে তারা ঢুকে পড়ল। টোরার চোখে ধাঁধা লেগে গেছে/ তুমি দেখলে কী করতে জানি না। কিন্তু টোরা ভয় পেল না। বরঞ্চ মনে ভরসা পেল। হয়তো ভাবল, এই নিথর অন্ধকারে ও শুধু একা নয়। এখানেও প্রাণ আছে। কে বলতে পারে, এ বিপদ থেকে ওই প্রাণ টোরাকে রক্ষা করবে না/

'শি-স-স-স।' ঝড় উঠলে যেমন শিস বেজে ওঠে, ঠিক তেমনি ভীষণ শব্দ শুনতে পেল টোরা হঠাৎ। তারপর কী ভয়ঙ্কর জোরে সেই শিসের সঙ্গে সত্যি-সত্যি ঝড় উঠল সেই অন্ধকার গহ্বরে। এলোমেলো ধাক্কা দিয়ে সেই ঝড় ছুটে আসছে টোরার দিকে। এই বুঝি তার হাতের প্রদীপ নিভে যায়/ এইরে, কী করবে টোরা/ না-বলে, না-কয়ে এমন ঝড় ওঠে কোত্থেকে, এই গহ্বরে। ঝড়ের ধাক্কায় নিজেই টাল সামলাতে পারছে না, প্রদীপ সামলাবে কেমন করে/ এ কী বিপদ আবার/ মনে হচ্ছে, এক্ষুনি সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। কিংবা হুস করে শুকনো পাতার মতো শূন্যে উড়ে যাবে/ টোরার আর কোনো নিস্তার নেই। রাক্ষুসী ঝড় হাঁ বাড়িয়ে তেড়ে-মোড়ে ছুটে আসছে। তাকে গিলে খাবে/ টোরা পালাতেও পারছে না। যেদিকে ও পা বাড়ায়, সেদিকেই ঝড়। ও যদি সমান যায়, ঝড়ও আসে সমানে থেকে। ও যদি পিছন হাঁটে, ঝড়ও হাঁটে পিছন দিকে। নাস্তানাবুদ হয়ে গেল টোরা। টোরা আর দাঁড়াতে পারল ন। বসে পড়ল। তারপর দু-হাতের মুঠি দিয়ে আড়াল করলে প্রদীপের শিখাটি। কিন্তু কে শুনছে, কার কথা/ হুস-স-স, হুস--স-স। ঝড় বইবে, ঝড় বইছে।

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে ওঠে ওর চোখের পাতা দুটি/ আঁতকে ওর বুকের ভেতরটা যেন থমকে যায়/ টোরা সেই প্রদীপের আলোছায়ার অন্ধকারে দেখে কী, অগুনতি ভাঁটার মতো লাল টকটকে চোখ তার দিকে প্যাটপ্যাট করে চেয়ে আছে। কী ভয়-জাগানো তাদের চোহারা/ তারা যেন না-মানুষ, না-জন্তু। টোরা প্রদীপের আলোয়, স্পষ্ট দেখল তাদের মাথাগুলো হাঁড়ির মতো হেঁড়ে। ঝুলের মতো ছন্নছাড়া চুলের ছিরি/ ঠ্যাঙগুলো সব ধনুকের মতো বেঁকাবেঁকা। হাতগুলো নাটা-নাটা, খাটো-খাটো/ নীচের ঠোঁট, নীচের দিকে ঝুলে আছে। নাল গড়াচ্ছে। আর ডাববা-ডাববা নাকের গর্তগুলো

হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁসফাঁস করছে। তাদের মুখ দিয়েই তো ঝড় ছুটছে/ বাবা/ তারা দিচ্ছে ফুঁ, উঠছে ঝড়। এবার টোরা ঠিক দেখতে পেয়েছে। তারা ফুঁয়ের ঝড় বইয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে ফেলতে চাইছে। সর্বনাশ তো তাহলে/



কী-ভয় জাগানো তাদের চেহারা/তারা যেন না-মানুষ,না-জন্তু।

না, সর্বনাশ না। আশ্চর্য ব্যাপার/ তারা যতই ফুঁ দিচ্ছে, প্রদীপ নেভা দূরে থাক, ততই তার আলোর রোশনাই বাড়ছে। প্রদীপ যেন আলোয় আলো করে দিচ্ছে সেই অন্ধকার।

নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে টোরা, এ কেমন করে হয়। ঝড় উঠলে, গাছ পড়ে, ঘর ভাঙে, তুফান ওঠে, গাঙ ছোটে, জাহাজ ডোবে, হাতি মরে। অথচ তার হাতে তো একটা সামান্য প্রদীপ। সে তো নিভছে না। উলটে আরও যে সে ঝলমল করে ওঠে/

সত্যিই/ প্রদীপ আর নিভবে না। টোরা তো জানে না, ওই পাহাড়-চূড়ার মন্দিরে যে প্রদীপ জ্বলছে, সেই জ্বলন্ত প্রদীপের স্পর্শে আর-একটি প্রদীপ জ্বলে উঠলে সে আর কোনোদিন নেভে না। আর তাই শত চেষ্টা করেও সেই না-মানুষ, না-জন্তুরা তাদের ঝড়ের মতো ফুঁয়ের তেজে নেভাতেই পারছে না প্রদীপের আলো।

আচ্ছা, থাকলেই বা আলো। অন্ধকারে আলো জ্বললে ভালোই তো/ ওদের মতলবটা কী বলো তো? টোরার হাতের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে ওকে কি মারবে? নাকি, অন্ধকারে যারা থাকে, তাদের অন্ধকারটাই আলো আর আলোটা অন্ধকার/ হবেও বা।

সেই হাঁড়ির মতো হেঁড়ে-হেঁড়ে মাথাগুলো এবার হেলে-হেলে টোরার দিকে এগিয়ে আসছে। টোরাও ভয়ে চোখ ঘুরিয়ে দেখছে তাদের। তারপর তারা যখন খুব কাছে চলে এসেছে, লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'না, তোমরা আমার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ো না।'

নিমেষের মধ্যে ফুঁয়ের ঝড় থেমে গেল। থামতেই সব ভোঁ ভাঁ/ কোথায় গেল সেই মুখগুলো? লাল-টকটক চোখগুলো? টোরা দেখতে পাচ্ছে না তো/ কোথায় মিলিয়ে গেল?

ধড়ফড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল টোরা। এখন প্রদীপের আলো জ্বলজ্বল করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। টোরার চোখে ভয়-জড়ানো অবাক চাউনি। তার চোখ খুঁজছে। আলতো-আলতো পা ফেলে হাঁটছে। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ নেই। এগিয়ে যায় টোরা। উঃ বাবা/ গহ্বরের গায়ে-গায়ে এবড়ো-খেবড়ো গর্তগুলো যেন রাক্ষসের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। এই গর্তগুলোর মধ্যে লুকিয়ে পড়েনি তো/ কে জানে/ দেখি/ উঁকি মারলে টোরা। আর ঠিক তক্ষুনি তার যেন মনে হল, ভয়ঙ্কর এই গর্তগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে ভয়-জড়ানো রহস্য তাকে চোখ টিপে ডাকছে। কেঁপে উঠল টোরার বুকখানা। কিন্তু এখন ভয় পেলে তো চলবে না তার। এই বিপদে টোরাকে সাহসে বুক বাঁধতে হবে। এই ভয়ঙ্কর না-মানুষ না-জন্তুগুলো যদি তাকে মারতে চায়, মারুক। তবু এ-প্রদীপ টোরা প্রাণ থাকতে নিভতে দেবে না।

হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলে টোরা। সে একটা গর্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল কেন চট করে? ওই তো/ তারা যেন ওকে দেখে এই গর্তের সুড়ঙ্গ দিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় দিচ্ছে।

টোরা গর্তের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। সামনে খাদ। কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। বিশ্রী খানা-খন্দ। লাফ মারল টোরা। হ্যাঁ, এখন টোরা দেখবে ওরা কারা। তাই লাফাতে-লাফাতে গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেল/ টোরা একবার ভাবলও না, ঢুকছে তো, কিন্তু অন্ধকার থেকে বাইরে সে বেরুবে কেমন করে/

'আঃ—/' ঠিক যা ভেবেছি তাই/ বেসামাল হয়ে টোরার পা পিছলে গেছে। ঈশ, মেয়েটা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েছে। যা লাগান লেগেছে না/ প্রদীপটা গেল নাকি? না, সেটি তার হাতছাড়া হয়নি। উঠতে গেল টোরা।

'গ্যাঁও, গ্যাঁও/' হঠাৎ অমন বিশ্রী সুরে দারুণ জোরে গোঙাচ্ছে কারা? গোঙাচ্ছে, না টোরাকে ভেঙাচ্ছে/

টোরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছে।

ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রণায় ভীষণ আর্তনাদ করে উঠল, 'উঃ/' খুব লেগেছে ওর কপালে।

এ কী/ হঠাৎ ওর কপালে ঢেলা ছুড়ে মারল কে। টোরা ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে চাঁই চাঁই ঢেলা চারিদিক থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে আসছে। ওর গায়ে লাগছে, মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে। টোরা

প্রাণপণে সামাল দিচ্ছে। কিন্তু পারবে কেন/ সামলাতে না পেরে টোরা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমায় মেরো না।'

টোরার মিষ্টি গলার প্রতিধ্বনি কাঁপতে-কাঁপতে গহ্বরের অন্ধকারের মধ্যে কার কানে পৌঁছয় কে জানে/ সাত্যিই, নিমেষের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল সেই ঢেলা ছোড়া। আবার নিঝুম চারিদিক। সারা গায়ে আঘাত লেগেছে টোরার। কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এ নিঝুম অন্ধকারে ও কাকে ডাকবে। ওর যে বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে।

'আলোটা নিভিয়ে ফেল/' হঠাৎ গম্ভীর গলায় হুংকার ছেড়ে কে ডেকে উঠল/ টোরার চোখ দুটি চনমন করে এদিক ওদিক তাকাল। সঙ্গে-সঙ্গে আরও অনেক গলা চেঁচিয়ে উঠল, 'আলোটা নিভিয়ে ফেল।'

'নিভিয়ে ফেল/'

'নিভিয়ে ফেল/'

'নিভিয়ে ফেল/'

চেঁচানিতে টোরার কান ঝালাপালা হয়ে যায়। সইতে পারছে না টোরা সে-চিৎকার। টোরা তারস্বরে ডেকে উঠল, 'থামো/'

আশ্চর্য/ আবার সব নিশ্চুপ/ গলার সেই অদ্ভুত আর ভীষণ শব্দগুলো থেমে যেতেই, ভয় মেশানো সেই কালো অন্ধকারে প্রদীপের আলো কেমন যেন থমথম করছে। টোরা এগোতে পারছে না। পিছনে কিছু দেখতেও পাচ্ছে না। ওর হাত-পাগুলো থরথর করে কেঁপে-কেঁপে চমকে উঠছে । তারপর ওর অজান্তেই চোখের পাতা বেয়ে জল গড়ায়। টোরা বোধহয় কাঁদছে। কাঁদছে কার জন্যে? কাঁদছে বাদশার জন্যে? না, মা আর বাবার জন্যে? আজ সবার জন্যে কাঁদবে টোরা। এখন যেন সবার কথা আপনা থেকে ওর মনে এসে বাসা বাঁধছে। টোরা জানে, আর কাউকে সে দেখতে পাবে না। কোনোদিনও না।

'গ্যাঁও-গ্যাঁও-গ্যাঁও/ '

হঠাৎ আবার কর্কশ-গলার হুংকার শোনা যায়/ কে ও? আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলজ্বলে চোখ জ্বেলে টোরার দিকে চেয়ে আছে?

'কে?' টোরার গলায় ভয়-মেশানো স্বর।

সেই কর্কশ-গলার হুংকার বললে, 'আলোটা নিভিয়ে ফেল, নইলে তোকে মেরে ফেলব/'

টোরা সেই আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কেন নিভিয়ে ফেলতে বলছ, আলোর কী দোষ?'

'আমাদের চোখ জ্বলে যাচ্ছে, আমরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছি। আলো আমাদের শত্রু।

'তোমরা কারা?'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

"আমরা এই অন্ধকারে থাকি। পৃথিবীতে থাকতে-থাকতে আমাদের দিন শেষ হয়ে গেলে, এই মাটির নীচে আমরা চলে আসি। সবাই বলে এর নাম মৃত্যু-পুরী। আমরা বলি অন্ধকার। দেখছি, তুই তো মরিসনি/ তুই এখানে এলি কেমন করে? তুই কেন আলো এনেছিস? এক্ষুনি নিভিয়ে ফেল। আমরা সহ্য করতে পারছি না।" সে বললে।

টোরা উত্তর দিলে, 'এ দেবতার আলো। এ আলোয় কেউ অন্ধ হয় না।'

এবার যেন সেই কর্কশ-স্বর গর্জন করে উঠল, 'ফের কথা বলছিস/'

টোরা বলল, 'দেবতার আলো নেভাতে নেই।'

টোরার কথা শুনে সে রেগে জ্বলে উঠেছে। সে লাফ মারল টোরার সামনে। টোরা এবার স্পষ্ট দেখতে পেল, একটা বিকট চেহারার, কিম্ভূতকিমাকার সেই না-মানুষ না-জন্তুটাকে। টোরার সামনে দাঁড়িয়ে সাংঘাতিক জোরে সে ফুঁ দিল প্রদীপের শিখায়/ নিভছে না প্রদীপ। আলো আরও ঝলমলিয়ে উঠছে/

যখন সে প্রাণপণে ফুঁ দিয়েও নেভাতে পারল না প্রদীপের আলো, তখন ধাঁই করে ধাক্কা মেরেছে টোরার প্রদীপে। আর দেখতে আছে/ প্রদীপের শিখা ঝলকে উঠে ওই না-মানুষ না-ভান্তুটার মুখের ওপর ছিটকে পড়ল। আগুনের জ্বালায় প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করে, দশ হাত দূরে সে সরে দাঁড়াল।

টোরা তাই দেখে নিজেই কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। কিন্তু আর দেরি নয়। এখানে আর দাঁড়ানো উচিত নয়। কিম্ভূত জীবটার হাত থেকে বাঁচতে হলে ওকে পালাতে হবে। কিন্তু কোথায় পালাবে? টোরা পিছন ফিরল।

সর্বনাশ/ পিছনে এই দ্যাখো একটা কত বড়ো সাপ/ ফোঁস-ফোঁস করে এগিয়ে আসছে। সাপটাও কি মরা? সেও কি এই মৃত্যু-পুরীর বাসিন্দা/ তা যদি হয়, মরে গেলে তো সব শান্ত হয়ে যায়/ এমন নিষ্ঠুর কেন ওরা? সাপটার জলজ্যান্ত ফণাটার দিকে তাকিয়ে টোরা হতাশ হয়ে ভাবলে, এইবার তার শেষ। শেষকালে বোধহয় সাপই তাকে খাবে/

একপাশে দাঁড়িয়ে টোরা থরথর করে কাঁপছে। সাপ সড়সড় করে টোরার দিকে এগিয়ে আসছে। টোরা ভয়ে পাথর হয়ে গেল। সাপ টোরার সামনে ফণা তুলে খাঁড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। টোরার মুখের কাছে মুখ এনে ফোঁস-ফোঁস করে বললে, 'কথা কানে নিচ্ছিস না কেন/ আলোটা নিভিয়ে ফেল/' সাপটা যেন ধমক মারছে।

টোরা তাড়াতাড়ি প্রদীপটা তার পিছনে আড়াল করে লুকিয়ে রেখে, ভয়ে-ভয়ে বললে, 'না—।'

শেষ হয়নি টোরার মুখের কথা। তার আগেই সাপটা লাফিয়ে উঠে টোরাকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে টোরাকে। টোরার দম আটকে আসছে। মনে হচ্ছে, বাঁধনের চাপে ওর হাড়গোড় গুঁড়িয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে এক্ষুনি। ও আর পারছে না। ও চেঁচিয়ে কাউকে ডাকবে, সে-শক্তিও আর নেই তার। এই বুঝি তার শেষ/

https://boierhut.com/fb

না, শেষ কেন হবে/ ও তো কোনো অন্যায় করেনি। আর তা ছাড়া দেবতা তার সঙ্গে আছেন। তার হাতে দেবতার প্রদীপ জ্বলছে। ওর কে ক্ষতি করবে/ তাই টোরার ওই ছোট্ট প্রাণটুকু প্রচণ্ড ক্ষমতায় ঝলকে উঠল। জ্বলন্ত প্রদীপের শিখাটি সে ঠেকিয়ে দিল, সাপের মুখে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তার মুখখানা। যন্ত্রণায় দিকবিদিকজ্ঞান হারিয়ে টোরাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেই সাপটা গহ্বরের গর্তে। টোরা প্রাণপণে আগলে ধরল প্রদীপটা দু-হাত দিয়ে/ প্রদীপ রক্ষা পেল, কিন্তু টোরা সামলাতে পারল না তার মাথাটি। গহ্বরের পাথরে ধাক্কা খেয়ে টোরা নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেল।

তুমি হয়তো ভেবেছিলে, এই অন্ধকারের অন্ধকূপে টোরার চোখ দুটি চিরদিনের মতো নিভে গেছে। ওর হয়তো আর কোনো দিন ঘুম ভাঙবে না।

কিন্তু না। ওই দ্যাখো, নিস্তেজ ওর হাতের আঙুলিগুলি ধীরে ধীরে কেমন কাঁপছে আবার। ক্লান্ত চোখ দুটি কেমন অনেক কষ্টে জেগে উঠেছে। চোখের পাতা দুটি মেলে ধরার চেষ্টা করছে টোরা। ওই তো টোরা চাইল।

কিন্তু এ কী/ এত আলো এল কোত্থেকে? যে অন্ধকার গহ্বর এতক্ষণ কালো অন্ধকারে ঢাকা ছিল হঠাৎ তার এ কী রূপ/ আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। উঠে বসল টোরা। কই তার প্রদীপ? এই তো/ দ্যাখো, দ্যাখো, প্রদীপের শিখাটি আলোয় আলো ছড়িয়ে, এই গহ্বরের অন্ধকারকে চোখ মটকে যেন ঠাট্টা করছে। এত কষ্টেও খুশিতে উছলে পড়ল টোরার মন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল টোরা। ওর মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করছে। পা দুটি টলে-টলে পড়ে যাচ্ছে। তবু দাঁড়িয়ে উঠে প্রদীপটি হাতে তুলে নিল। হঠাৎ একটি ঝুনঝুনি বেজে উঠল, 'ঝুন-ঝুন, ঝুন-ঝুন।'

ভারি মিষ্টি তো ওই শব্দটি। কে আবার পায়ে মল বাজিয়ে নাচছে এখানে?

আঃ/ কী ভালো লাগছে/ আনন্দে প্রাণভরে নিশ্বাস নিল টোরা। না, এখন সাপও নেই, সেই কিম্ভূতকিমাকার না-মানুষ না-জন্তুও নেই।

কিন্তু কে বাজাচ্ছে? আশে-পাশে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছে না টোরা।

তাহলে তো দেখতে হয়।

একটি-একটি পা ফেলে, এক-পা এক-পা এগিয়ে যায় টোরা। এগিয়ে যাচ্ছে প্রদীপটি হাতে নিয়ে। ফিরে-ফিরে এদিক ওদিক মিটিমিটি চাইছে আর গহ্বরের আরও গভীরে নেমে যাচ্ছে।

চলতে-চলতে হঠাৎ থমকে যায় টোরা। দাঁড়িয়ে পড়ে। আরে/ আরে/ একটি পাখি কেমন ঝুনঝুনি বাজিয়ে দোলনায় দুলছে/ ও/ টোরা তাহলে এতক্ষণ দোলনায় বাঁধা এই ঝুনঝুনির শব্দটাই শুনতে পাচ্ছিল। হ্যাঁ। এখন পাখিটা, দোলনাটা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে টোরা। পাখিটা কি তার দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসছে? বুঝতে পারে না টোরা।

'টোরাদিদি।' হঠাৎ দোলনা থামিয়ে পাখিটা ডাকল।

চমক ভাঙল টোরার। তাইতো, পাখিটা তার নাম জানল কেমন করে/

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আমাকে চিনতে পারছ?' পাখি জিজ্ঞেস করলে।

টোরার মুখে কথা ফুটল না।

'আমি ময়না।'

ময়না/ টোরার বুকটা ছমছম করে ওঠে। গায়ে কাঁটা দেয়।

'মাকে খুশি করার জন্যে তোমায় কত কষ্ট করতে হল বলো তো?' পাখি বললে।

টোরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল পাখির দিকে। চেয়েচেয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, একি সত্যি/ তাদের ময়না তার সঙ্গে কথা বলছে/

'মায়ের জন্যে এই পাতালের গহ্বরে তুমি বন্দি হয়ে আছ। তোমার ভয় করছে না?' পাখি জিজ্ঞেস করলে।

এবার টোরা কথা বললে। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'আমি বন্দি?'

পাখি বলল, 'হ্যাঁ, তুমি বন্দি। যেমন আমায় বন্দি করে রেখেছিলে তোমাদের খাঁচায়।'

'আমরা তো তোমাকে বন্দি করিনি। আমরা তো তোমাকে ভালোবেসেছি। আদর করেছি। বন্দিকে কেউ আদর করে, ভালোবাসে?' টোরা উত্তর দিলে।

পাখি বললে, "আচ্ছা ধরো, তুমি যদি আর কোনোদিন এ গহ্বর থেকে বেরিয়ে যেতে না পার? আর কোনোদিন মাকে দেখতে না পাও? দেখতে না পাও তোমার ওই ছোট্ট ভাই বাদশাকে বা তোমার বাবাকে? যদি তুমি কোনোদিন মাকে আর তোমাদের বাড়ির জানলায় মুখ বাড়িয়ে কু ঝিক ঝিক রেলের শব্দ শুনতে না পাও? কিংবা ওই শব্দ শুনতে শুনতে তুমি গান গাইলে, তোমার গলায় গলা মিলিয়ে তোমার সঙ্গে বাদশা গান না গায়? তোমার সঙ্গে বাদশা খেলে না করে? রাতেরবেলা মোমের আলো জ্বেলে তোমার কাছে গল্প না শোনে? তার বদলে চিরদিন তুমি যদি এখানে বন্দি থাকো, আর আমরা সবাই তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, তোমাকে আদর করে, গান শোনাই, তোমার ভালো লাগবে?

'কেন একথা বলছ?' কেমন ভয়-জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলে টোরা।

'কেন বলছি জানো? আমি মানি তোমরা আমাকে খুব ভালোবাসতে। তোমার নরম মিষ্টি হাতের আঙুল আমার মাথায় ঠেকিয়ে তুমি রোজ আমায় কত আদর করতে। তুমি কত যত্ন করে আমায় খাবার দিতে। কিন্তু তুমি কি দেখেছিলে কোনোদিন আমার চোখ দুটি? দেখেছিলে আমার চোখে জল? তুমি তো কোনোদিন দেখনি আমি মায়ের জন্যে কাঁদি কিনা। তোমার মতো আমারও ভাই আছে টোরাদিদি। তোমার মতো আমিও তাদের গান শোনাতুম। তাদের সঙ্গে কত খেলা করেছি। ভোরের আকাশে সূর্যের ঝিকিমিকি আলোয় ডানা মেলে কতদিন আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে উড়ে বেরিয়েছি। ওই খোলা আকাশই যে আমাদের বাড়ি।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাখির কথা শুনতে-শুনতে টোরার চোখের পাতা দুটি ছলছল করে উঠল। টুপ করে এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়ল।

পাখি বলল, 'কাঁদছ টোরাদিদি?'

টোরা বলল, 'তোমাদের যে এত দুঃখ, সে তো আমি জানতুম না।'

'টোরাদিদি, নিজে দুঃখ না-পেলে, অন্যের দুঃখ বুঝবে কেমন করে?' পাখি উত্তর দিলে।

টোরা কাঁদতে-কাঁদতেই বললে, 'পাখি, আমি যখন তোমায় দুঃখ দিয়েছি, তখন তুমি আমায় শাস্তি দাও/'

পাখি বলল, 'না টোরাদিদি, তোমার কোনো দোষ নেই। তুমি যা করেছ সে তো তোমার মাকে সুখী করার জন্যে। তুমি এই যে এত কষ্ট করলে, সেও তো তোমার মায়ের জন্যে। মাকে সুখী করার জন্যে যে এত কষ্ট সহ্য করে, সে কখনো শাস্তি পায়? সে সবার ভালোবাসা পায়।'

'তাহলে তুমি আমায় ভালোবাস?' জিজ্ঞেস করল টোরা।

'হ্যাঁ টোরাদিদি, আমি তোমায় ভালোবাসি? ভালবাসি বলেই তোমাকে আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দেব।'

টোরার মুখখানা খুশিতে উছলে গেল। বললে, 'পাখি, তুমি যে এত ভালো, আমি তা বুঝতে পারিনি।'

পাখি বললে, 'টোরাদিদি, তোমার হাতে প্রদীপ। তাই তোমাকে যাবার আগে একটি কাজ করতে হবে, পারবে?

টোরা জিজ্ঞেস করলে, 'কী কাজ, পাখি?'

'ওই দ্যাখো, তোমার মাথার ওপর একটি লণ্ঠন দুলছে।'

চকিতে চোখ তুলল টোরা। জিজ্ঞেস করল, 'আমায় কী করতে বলছ?'

'তোমার ওই প্রদীপের আলো দিয়ে ওই লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে দাও। অন্ধকারে থাকতে আমার বড্ড কষ্ট হয়।'

'কেন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না? আমি কথা দিচ্ছি পাখি, তোমাকে আর আমি বন্দি করব না।'

পাখি উত্তর দিল, 'না টোরাদিদি, আমি তো এখান থেকে আর যেতে পারব না। আমি তো মরে গেছি। এখন আমি এই অন্ধকার গহ্বরেই থাকব। এই অন্ধকার গহ্বরই এখন আমার স্বর্গ/ এখান থেকে আর আমি কোথাও যাব না। তুমি আলোটা জ্বেলে দাও। ওই আলোই হবে আমার বন্ধু।'

পাখির কথা শুনে টোরার বুকটা কেমন ভার হয়ে গেল। হ্যাঁ, সত্যিই তো/ ওরই তো হাতের মুঠির চাপে পাখি প্রাণ হারিয়েছে/ আড়ষ্ট চোখে পাখির মুখের দিকে চাইল টোরা/ চোখ সরিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে তাকাল। ওই ঝুলন্ত লণ্ঠনটার দিকে। না অনেক উঁচু না। সামনে ওই পাথরের

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চাঁইটার ওপর দাঁড়ালেই ওর হাত যাবে। ওখানে দাঁড়িয়ে টোরা হাত বাড়িয়ে, তার হাতের প্রদীপের আলো দিয়ে লণ্ঠনের আলো জ্বালাতে পারবে।

টোরাকে অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাখি জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ? জ্বালবে না?'

টোরা উত্তর দিল, 'হাঁ, জ্বালব।'

টোরা হাত বাড়ল। ওর প্রদীপের শিখাটি দুলতে-দুলতে লণ্ঠনের শিখাটি ছুঁয়ে গেল। লণ্ঠন জ্বলে উঠল। ভেসে গেল সেই গহ্বর আলোর বন্যায়। যেখানে যত আলো ছিল সব যেন ছড়িয়ে পড়েছে সেই অন্ধকার গহ্বরে। স্বর্গের রঙিন ছবির মতো সেই গহ্বর ঝলমলিয়ে উঠল। পাখির মনের অনেক, অনেক সুখ ওর দু'চোখের পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে। পাখি আনন্দে বলে উঠল, 'আঃ/'

হঠাৎ টোরা দেখে কী, গহ্বরে সেই রঙিন স্বর্গে ঝাঁকে-ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ে আসছে। ফুল ফুটেছে। মৌমাছি নাচছে। ফুলে ফুলে গান গাইছে। টোরা অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে, 'এরা কোথায় ছিল? এরা কারা?'

'এতদিন অন্ধকারে এরা অন্ধ হয়ে ছিল। এরা আমার বন্ধু। আমার আনন্দ।' পাখি খুশিতে উছলে উঠে বলল।

টোরা বললে, 'আমিও এদের সঙ্গে আনন্দ করব।'

পাখি উত্তর দিলে, 'না টোরাদিদি, না। তোমার আনন্দ তোমার বাড়িতে। তোমার আনন্দ তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার ভাই। তোমার আনন্দ এই গহ্বরের অন্ধকারে নয়, ওই নীল আকাশের নীচে। সে-আনন্দ তোমায় ডাকছে।'

পাখির কথা শুনে টোরার দু-চোখ আবার জলে ভরে গেল।

পাখি বলল, 'এখানে কাঁদতে নেই টোরাদিদি।'

টোরা তাড়াতাড়ি তার চোখ দুটিতে আঁচল চাপা দিলে। বলল, 'না পাখি, আমি কাঁদছি না। তোমায় দেখছি।'

পাখি বলল, 'টোরাদিদি, এবার তোমার যাওয়ার পালা/ ওই দ্যাখো তোমার পথ।'

'কই?'

'ওই যে পাথরের দরজা খুলে গেছে।'

টোরা অবাক হয়ে চাইল। হ্যাঁ, সত্যিই তো/ জিজ্ঞেস করল, 'ওখান দিয়ে আমায় যেতে হবে?'

'ওখান দিয়ে তোমায় ওপরে উঠতে হবে। এই পাথরে পাথরে পা ফেলে।'

'তবে আমি যাই পাখি।'

পাখি আবার সেই দোলনায় দুলতে দুলতে, দোলনার ঝুনঝুনিটা বাজাতে-বাজাতে বললে, 'টোরাদিদি, তুমি সুন্দর।'

টোরা দুহাত বাড়িয়ে পাখিকে বললে, 'তুমি আরও সুন্দর।'

https://boierhut.com/fb

পাখি আনন্দে টুটুর-টুটুর করে ডেকে উঠল। অমনি সুন্দর সেই আলো-ঝলমল গহ্বরের স্বর্গে অনেক, অনেক আনন্দ একসঙ্গে গান গেয়ে উঠল। আর সেই গান শুনতে শুনতে টোরা গহ্বরের দরজা ডিঙিয়ে পা ফেললে, একটি একটি পাথরের ওপর। একা-একা সে এগিয়ে চলল। গহ্বর থেকে আকাশের দিকে। তার সঙ্গী শুধু তার হাতের এই প্রদীপ। আর সঙ্গী তার এই প্রদীপের আলোয় নিজের ছায়া।

তারপর হঠাৎ মুখ ফেরাল টোরা তার পিছনে। দেখে, এ তো শুধু তার ছায়া নয়। ওর পিছনে-পিছনে ওরা কারা আসছে দল বেঁধে/ সেই কিম্ভূতকিমাকার না-মানুষ না-জন্তুগুলো না? ওরাই তো ওকে ঢেলা মেরেছিল/ ওরা কি আবার তাকে মারবে?

না। টোরা যে-পথ দিয়ে যাবে, সে-পথে ওরাও যাবে। টোরা যদি পথে বিপদে পড়ে, ওরা সে-বিপদ দূর করবে। তারপর টোরা যখন এই পাথরের পাহাড় পেরিয়ে ওপরে উঠে যাবে তখন ওরা বলবে হয়তো, 'আমরা জানতুম না, তুমি এত লক্ষ্মী। তাই তোমার গায়ে আমার হাত দিয়েছি। তোমায় মেরেছি। তুমি আমাদের ক্ষমা করো।' তারপর পাথরের ওপর গড়াতে-গড়াতে ওরা আবার গহ্বরে নেমে আসবে। তখন কেউ জানতেও পারবে না, প্রাণহীন সেই পাখির সঙ্গে আরও কত প্রাণহীন জীবন গহ্বরের স্বর্গে, আলোর নীচে বসে-বসে টোরা নামে একটি মেয়ের জন্যে কাঁদছে। কেননা, সে যে তাদের জন্যে অন্ধকারে আলো জ্বেলে গেছে /

টোরা পৌঁছে গেল। পৌঁছে গেল পাতালের অন্ধকার থেকে পাহাড়ের পায়ের কাছে। আকাশের দিকে চাইল টোরা। আঃ/ শেষ রাতের আকাশ ভারি শান্ত। কে যেন খুব সাবধানে শান্ত আকাশের গা থেকে তারার চুমকি গাঁধা ওড়নাখানি ধীরে ধীরে সরিয়ে নিচ্ছে। একটু পরেই ভোরের মুখখানি দেখতে পাবে টোরা।

ঘন্টা বেজে উঠল। কোথায়? ভারি গম্ভীর সেই ঘন্টার ধ্বনি। সেই গম্ভীর সুর হাওয়ায় যেন কেঁপে কেঁপে নাচতে-নাচতে, দূরে আরও দূরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। শিউরে উঠল টোরা। হয়তো আনন্দে কিংবা ভাবনায়/ তাড়াতাড়ি পা ফেলল টোরা। ওকে যে এখুনি পৌঁছুতে হবে দেবতার কাছে। যতক্ষণ না এ-প্রদীপ তাঁর সামনে রাখতে পারছে টোরা, ততক্ষণ ওর নিস্তার নেই। ঠাকুর বলেছেন, তারপরেই টোরা সব ফিরে পাবে।

এসে গেছে টোরা। দেবতার সেই গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। ওহো/ ঘন্টা যে গুহার ভেতর থেকেই ভেসে আসছে/ তা হলে এ তো দেবতার ঘন্টা/

হ্যাঁ, দেবতার ঘন্টা। এই ঘন্টা যেন ডাক দিচ্ছে টোরাকে। বলছে, 'এসো। এখানে তোমার জন্যে আনন্দ লুকোনো আছে/'

ধীরে ধীরে ঢুকে গেল টোরা গুহার মন্দিরে। তারপর দেবতার সামনে এসে দাঁড়ায় টোরা। ওই সেই দেবতা। দেবতার মুখের দিকে তাকিয়ে টোরার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল দু'চোখ দিয়ে।

টোরা সোনার প্রদীপটা দেবতার পায়ের কাছে রাখলে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বললে, 'ঠাকুর, আমি তোমার কথা রেখেছি। ফুলের চোখের জল দিয়ে তোমার সোনার প্রদীপ আবার জ্বেলে এনেছি। এবার তুমি আমার ভাইকে ফিরিয়ে দাও।' বলে টোরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ঠাকুরের পায়ে প্রণাম করল। আর ঠিক তক্ষুনি ঘন্টার বাজনা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

টোরা বুঝতে না-বুঝতেই কে যেন ওর গায়ে হাত দিল/ গায়ে হাত দিয়ে ডাকল, 'দিদি/'

চমকে উঠল টোরা। এ কী/ এ যে বাদশার গলা।

হ্যাঁ, বাদশাই আবার ডাকল, 'দিদি/'

দিদি চকিতে মাথা তুললে। তার চোখ দুটি অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইল বাদশার মুখের দিকে।

'দিদি, আমি।'

'বাদশা/' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল টোরা। এমন চিৎকার সে যেন জীবনে আর কোনোদিন করেনি। জড়িয়ে ধরল বাদশাকে। তারপর কেঁদে ফেলল, হাউ-হাউ করে।

বাদশা দিদির চোখের জল মুছতে-মুছতে বললে, 'কাঁদিস না দিদি। আমি জানতুম তুই এখানে আসবি। ঠাকুর আমায় বললেন যে। বললেন, ঘন্টা বাজাতে। ঘন্টা বাজালেই তুই শুনতে পাবি। তাইতো, আমি সারারাত ঘন্টা বাজিয়েছি।

'সারারাত/' টোরা বাদশার চিবুকটি ধরে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলে।

'তাতে কী হয়েছে। ঘন্টা বাজাতে আমার বেশ লাগছিল/'

দিদি জিজ্ঞেস করল, 'তুই এখানে কেমন করে এলি বাদশা?'

'তোকে খুঁজতে-খুঁজতে।'

''আহা/ কত কষ্ট হল তোর/

'না রে/ আমার একটুও কষ্ট হয়নি। দ্যাখ, না, আমি কি তোর মতো কাঁদছি? কষ্ট হলে তো মানুষ কাঁদে।'

টোরা বাদশার কপাল থেকে এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে দিল ভারি যত্নে। তারপর ভাই-বোন শেষবারের মতো ঠাকুরের পায়ে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়াল। সোনার প্রদীপের আলোয় ওরা এবার স্পষ্ট দেখতে পেলে ঠাকুরের মুখখানি। ঠাকুরের চোখ দুটিতে হাসি ফুটেছে।

দিদির হাত ধরল বাদশা। ধীরে ধীরে গুহার মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। বাইরে, আকাশে রাত কেটে আলো এসেছে।

বাদশা দিদির চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'বাড়ি যাবি না?'

দিদি বললে, 'চ'।

'কোনদিকে?'

https://boierhut.com/fb

'ওই তো, ওই দিকে।' আঙুল দেখাল টোরা, 'ওই যেদিক দিয়ে রেলগাড়ি যায়, ওই পথ ধরে হাঁটব।'

যেদিকে দিদি আঙুল দেখাল, সেইদিকে বাদশা চোখ তুলে দেখলে। তাই তো/ ওই দ্যাখো, পাহাড়ের গা বেয়ে-বেয়ে রেল লাইনটা কেমন এঁকেবেঁকে চলে গেছে/ ছুটে গেল বাদশা সেই দিকে। লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে হেঁকে উঠল, 'কু-কু, ঝিক-ঝিক।' তারপর চেঁচিয়ে দিদিকে ডাক দিয়ে বলল, 'দিদি, আজ আমি নিজেই রেলগাড়ি হয়েছি। তোকে বাড়ি নিয়ে যাব। ছুটে আয়, নইলে গাড়ি ইসটিশান ছেড়ে যাবে।'

বাদশার কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল টোরা। তারপর সত্যিই ছুটে গেল। বাদশার হাত ধরলে। গাড়ি ছুটল কু-কু, ঝিক-ঝিক।

ভোরের সোনার আলোর মতো, যেন দুটি সোনার টুকরো গড়িয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। দুটি ভাই-বোন, টোরা আর বাদশা।

https://boierhut.com/fb

আমি ইসতাসি।

ইসতাসি আমার নাম। এমন নাম তো তোমরা কোনোদিন শোনোনি! সুতরাং ভাবতে পারো, ছেলেটার এ কী অদ্ভুত নাম রে বাবা! অবিশ্যি আমার নামটা তোমার কানে অদ্ভুত ঠেকলেও, আমাকে দেখলে যে তোমার খুব খারাপ লাগবে, তা বলতে পারি না। কেননা, আমার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা এই যে লাল-নীল ডোরা-কাটা প্যান্টটা দেখছ, গায়ে রঙিন ফুল-হাতা, ফুল-কাটা জামাটা দেখছ, তার ওপর এই যে দেখছ, জরির-কাজ-করা জ্যাকেটটা, বলো, এ দেখে আমাকে তোমার ভালো লাগছে না? তবুও তো টুপিটা মাথায় দিইনি। অবিশ্যি আমি দেখতেই-বা কম কী! বলতে পারো, আমার তো এখন বয়স তেমন হয়নি। সবে দশ পেরিয়ে এগারোয় পড়েছি। সুতরাং অমন রংচঙে সাজ-পোশাক পরলে এই বয়সে বাঁদরকেও দেখতে ভালো লাগে!

ছিঃ! ছিঃ! তা বলে আমায় বাঁদর বোলো না! আমি ইসতাসি। আমি এক যাযাবরের ছেলে।

আমি জানি না, যাযাবর বললে তোমরা আমায় ঠিক চিনতে পারবে কি না! শুধু জেনো আমাদের কোনো ঠিক নেই, ঠিকানা নেই। তোমাদের মতো আমাদের না আছে মস্ত-মস্ত বাড়ি, না আছে দামি-দামি আসবাব। পথেই আমাদের ঘর। এই পথে-পথেই আমরা দল-বেঁধে ঘুরে বেড়াই। যাই এক দেশ থেকে আর-এক দেশে। ক-দিনের জন্যে মাঠে-ঘাটে তাঁবু ফেলি। তারপর সময় হলেই আবার আর-এক দেশে পাড়ি দিই। বেশ লাগে। আমরা শুধু দেখে বেড়াই। নতুন-নতুন দেশে কত নতুন মানুষ, কত নতুন মুখ। কত নতুন কথা।

প্রথমেই বলে রাখি, আমার মা-বাবা কেউ নেই। কী করে যে আমি আমার মাকে, বাবাকে হারিয়েছি, সে-কথা বলতে গেলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে! তাদের কথা ভাবতে-ভাবতে আমি মাঝে-মাঝে নিজেকেও কেমন হারিয়ে ফেলি! এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তাদের। মায়ের মুখখানি এখনও আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে ওঠে। আঃ! কী সুন্দর দেখতে ছিল আমার মাকে! কী মিষ্টি গান গাইত আমার মা। আমার বেশ মনে পড়ে, মা পরত রঙিন ঘাঘরা। মায়ের পায়ে ছিল রুপোর মল। গলায় মোহর-আঁটা মালা। আর কানে ছিল এত্তো বড়ো দুটো চাঁদির রিং। সেজেগুজে মা যখন সন্ধ্যারাতে চাঁদের আলোয় গান গাইত, কী ভালোই না লাগত। আর আমার বাবা? একটা ঢিলেঢালা প্যান্ট পরে, রঙিন ডোরা-কাটা জামা গায়ে দিয়ে, মাথায় টুপি এঁটে মায়ের গানের সঙ্গে ব্যানডুররিয়া বাজাত। জ্যোৎস্নারাতে দলের সবাই যখন কাজের শেষে আমাদের তাঁবু-ঘেরা সবুজমাঠে জমায়েত হয়ে আনন্দ করত, সেই আনন্দে মাকেও গান গাইতে হত। আমি হলপ করে বলতে পারি, সে-গান শুনলে আমার মতো তোমরাও অবাক হয়ে যেতে।

ব্যানডুররিয়া বাজনাটা তোমরা কেউ দেখেছ কি না জানি না। এটা একটা তারের বাজনা। অনেকটা ম্যান্ডোলিনের মতো দেখতে। তবে, ম্যান্ডোলিনের পেটটা নাশপাতির মতো গোল। এটার পেট চ্যাপা। গলায় ঝুলিয়ে আঙুল ছুঁয়ে এর তারে সুর তুললে আমি হলপ করে বলতে পারি, তোমার পা-দুটি আপনা-আপনি নেচে উঠবে।

আমার বাবা যেমন ব্যানডুররিয়া বাজাতে পারত, তেমনি জানত মজার জাগলিং-এর খেলা। একসঙ্গে কুড়িটা বড়ো-বড়ো কাঠের বল আকাশে ছুড়ে এমন চরকি খাওয়াত যে, দেখলে তুমি হাঁ হয়ে যেতে! বাবার হাতের কায়দায় শূন্যে ঘুরতে-ঘুরতে ওই কাঠের বলগুলোকে কখনো মনে হত একটা মস্ত মালা। কখনো মনে হত একটা এত্তো বড়ো লাট্টু বাঁই-বাঁই করে ঘুরছে। আবার কখনো মনে হত যেন আকাশ-মুখো একটা রকেট হুস-হুস করে উড়ে যাচ্ছে। শুধু কাঠের বল কেন! লোহার চাকতি, না-হয় তারের রিং, এমনকী কাঠের ছোট্ট-ছোট্ট রংচঙে টুল নিয়েও বেমালুম শূন্যে ছুড়ে নানান খেলা দেখাতে পারত আমার বাবা।

একটু-আধটু ম্যাজিকও জানত বাবা। তবে আনাতিদাদার মতো অমন নয়। আনাতিদাদা ম্যাজিক দেখাতে-দেখাতে 'ফুস' বলেই চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত। উঃ! সে কী তাজ্জব ব্যাপার! তুমি এখানে খোঁজো, আর যেখানেই খোঁজো, খুঁজে আর পেতে হচ্ছে না। আমি তো প্রথম দিন খেলাটা দেখে একেবারে থ। এই খেলাটা দেখালে অনেক পয়সাও পেত আনাতিদাদা।

সে তো বটেই! পয়সা তো পেতেই হবে। নইলে চলবে কেমন করে! আমরা তো যাযাবর। আমাদের এমনি করেই দিন চলে। এমনি নাচ দেখিয়ে, গান শুনিয়ে, খেলা দেখিয়ে, আর নয়তো ঘরে-হাটে সাত-সতেরো জিনিস বিক্রি করে।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, আনাতিদাদা কে? আনাতিদাদা আমাদের দলের সর্দার। আমাকে খুব, খুউব ভালোবাসত। ভারি শক্ত-সমর্থ মানুষ ছিল আনাতিদাদা। এত্তোখানি চওড়া বুক। বুকভরতি সাহস। হাতের আঙুলগুলো এমনি পুরুষ্টু! একখানি ঘুসি মারলে আর দেখতে হবে না! প্রাণ নিয়ে টানাটানি। অবিশ্যি কম-বেশি আমাদের সকলেই সাহসী। হতেই হয়। কেননা, যাদের পথে-পথেই শুধু হাঁটতে হয়, জানে না, আজকের হাঁটা-পথ কালকে কোথায় গিয়ে থামবে, তাদের জীবনে পদে-পদে বিপদ যে! এই সাহস আর শক্তি দিয়েই তো সে-বিপদ রুখতে হয়!

এই ছোট্ট বয়েসেই, বাবার হাতে ওই ব্যানডুররিয়াটা বাজাতে দেখলেই, আমারও হাত নিশপিশ করত। মনে হত, আমিও যদি বাবার মতো ব্যানডুররিয়া বাজাতে পারতুম। ছেলেমানুষি বুদ্ধি তো! তবু, বাবাকে ফাঁকি দিয়ে, মাঝে-মাঝেই ওই ব্যানডুররিয়ার তারগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে টুং-টুং টান দিতে ছাড়িনি। বাজনা হত না। কিন্তু হাতের টানে বেসুরো যে-শব্দগুলো বাজনা হয়ে কানে বাজত, তাতেই ভারি মজা লাগত আমার। আর মজা লাগত বলে, সুযোগ পেলেই তার ধরে টান দিতুম। একদিন এমনি করে টান দিতে গিয়ে বেমক্কা একটা তার টং করে ছিঁড়ে ছিটকে গেল।

বুঝতেই পারছ, তখন আমার কী অবস্থা! বাবার বকুনির ভয়ে আমি একেবারে জুজু! আমার যদি ছেঁড়া তার জোড়া দেওয়ার সাধ্যি থাকত, তাহলে তো কোনো কথাই ছিল না। বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কাজটি সেরে চুপচাপ বসে থাকতুম। বাজাতে-বাজাতে বাবাকেও দেখেছি কখনো-সখনো তার ছিঁড়ে ফেলতে। আবার দেখেছি, কত সহজেই তার জোড়া দিয়ে বাজনায় নতুন করে সুর জুড়েছে বাবা। সে যেন বাবার কাছে কিছুই নয়।



অবাক হয়েই আনাতিদাদা আমাকে জিজ্ঞেস করলো করল, ‘কী হয়েছে,ইসতাসি ?’

তোমাদের আগেই বলেছি, আনাতিদাদার কথা। সুতরাং এখন বাবার বকুনির হাত থেকে আমায় বাঁচতে হলে, আনাতিদাদার হাতে নিজেকে ধরা দিতে হয়। তাই আমি ছুটলুম আনাতিদাদার তাঁবুতে। আমরা যে-মাঠে এখন তাঁবু ফেলেছি, ঠিক তার সামনেই আনাতিদাদার তাঁবু। একছুটে তাঁবুতে ঢুকতেই দেখি, আনাতিদাদা তামুক খাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে, হঠাৎ তার তাঁবুতে আমাকে ঢুকতে দেখে আনাতিদাদার চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় চিৎকার করেই আমার নাম ধরে ডাক দিল, 'ইসতাসি!' ডাক দিয়েই একবুক হাসি ছড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করল। আমাকে দেখে কী যে খুশি, সে তোমাকে কী বলব! আমার কিন্তু হাসি পেল না। আমার মুখখানা শুকনো দেখে, তার অবাক হওয়ারই তো কথা! হাসতে-হাসতে থমকে গিয়ে কেমন সন্দেহের চোখে চাইল আমার দিকে। আমি ছুটে গেলুম আনাতিদাদার কাছে। আনাতিদাদা আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তার বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে হাঁপাতে লাগলুম।

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অবাক হয়েই আনাতিদাদা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, ইসতাসি?'

আমি ফুঁপিয়ে উঠলুম। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বললুম, 'বাজনা!'

আনাতিদাদা আমার এমন উত্তর শুনে আরও অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, 'বাজনা? কীসের বাজনা? কার বাজনা?'

'বাবার। ব্যানডুররিয়া।'

'কী হয়েছে?' আনাতিদাদার গলায় আরও অবাকের সুর।

'বাজাতে গিয়ে তার ছিঁড়ে ফেলেছি!'

আর কোনো কথা নয়। সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে হো-হো করে হেসে উঠেছে আনাতিদাদা। আমি আনাতিদাদাকে হাসতে দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। আনাতিদাদার বুকের ভেতর থেকে মুখটা সরিয়ে এনে তার চোখের সামনে তুলে ধরলুম। আনাতিদাদা আমার মুখখানা দেখে আরও জোরে হেসে উঠেছে। হাসতে-হাসতে বলল, 'আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ! এর জন্যে ইসতাসি ভয় পায়।'

আমি নিজের ভয়টাকে তবুও নিজের মধ্যে লুকোতে পারলুম না? আমার চোখদুটো ভয়ে কাঠ হয়েই,আনাতিদাদার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আনাতিদাদা আমার মাথায় একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি, ব্যানডুররিয়াটা বাজাতে ইচ্ছে যায় বুঝি?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ বাবার মতন।'

'আমি শিখিয়ে দেব।'

এতক্ষণ আমার যে-মুখখানা ভয়ে কালো হয়ে ছিল, হঠাৎ সে-মুখে আলো ঝলসে উঠল। আনাতিদাদার এ-কথাটা আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। তাই তার হাত দুটো ধরে প্রায় লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলুম, 'সত্যি?'

আনাতিদাদা বলল, 'নিশ্চয়ই!'

'আমি পারব?'

'আলবাত!'

আনন্দে আমি আরও লাফিয়ে উঠলুম, মাটি থেকে আকাশে।

কিন্তু তারপর হঠাৎ-ই আবার ব্যানডুররিয়ার তার ছেঁড়ার কথাটা মনে পড়তেই আনন্দটা কেমন যেন চুপসে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'বাবার ব্যানডুররিয়াটার কী হবে?'

আনাতিদাদা বলল, 'ওটার জন্যে ভাবনা নেই। ওটা বাবাই ঠিক করে নেবে। আমি বলে দেব। কিন্তু এক শর্তে! আমি যে তোমাকে ব্যানডুররিয়া বাজাতে শেখাব, এ-কথাটা এখন কাউকে বলতে পারবে না।'

'কেন?'

'একদিন হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দেব।'

https://boierhut.com/fb

কথাটা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। হ্যাঁ, সত্যিই তো! হঠাৎ একদিন আমি যদি ব্যানডুররিয়া শুনিয়ে বাবাকে অবাক করে দিতে পারি, বলো, সেদিন কী দারুণ মজা হবে!

আনাতিদাদাও যে ব্যানডুররিয়া বাজাতে পারে, এ-কথাটা তোমাদের বলতে একদম ভুলে গেছি। অবিশ্যি ম্যাজিক-খেলা দেখাতে আনাতিদাদার যতটা উৎসাহ দেখতে পাবে, ব্যানডুররিয়ার বেলায় তা নয়। একেবারেই বাজায় না যে তা নয়। তবে কালেভদ্রে। তাই বলে যেন মনে কোরো না, তেমন বাজাতে পারে না! বাববা! দারুণ ওস্তাদ! কী ম্যাজিক, কী ব্যানডুররিয়ায়।

আমার বেশ মনে আছে, একদিন সন্ধেবেলায়, মাঠের জমায়েতে বাবার সঙ্গে ব্যানডুররিয়ার এমন লড়াই শুরু করে দিল যে, তাই শুনে তো সবাই একেবারে থ! এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়! কেউ ছাড়বার পাত্তর নয়! যখন বাজনা শেষ হল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম! কে হারল, আর কে যে জিতল কেউ-ই বলতে পারল না। সেই রাতটা আমার আরও স্পষ্ট মনে আছে এই জন্যে যে, দুজনের কাউকেই আমি হারতে দিতে রাজি ছিলুম না। কেউ একজন হারলেই আমি সাংঘাতিক দুঃখ পেতুম। কারণ, দুজনেই যে আমাকে ভীষণ ভালোবাসে।

যাক বাবা! ব্যানডুররিয়ার তার-ছেঁড়ার ব্যাপারটা নিয়ে বাবা আমায় কিচ্ছু বলেনি। বাবা যখন শুনল, উলটে বলল কী, 'ছিঁড়ুক, ছিঁড়ুক। বাজাতে গেলে তো ছিঁড়বেই। এমনি ছিঁড়তে-ছিঁড়তে একদিন ইসতাসি ওস্তাদ হয়ে উঠবে। হবে একজন পাকা ব্যানডুররিয়া-বাজিয়ে!' এ-কথা শুনে, সেদিন যে আমার কী আনন্দ হয়েছিল, সে কী বলব তোমাদের!

২

হ্যাঁ, এখন আমি সত্যিই ব্যানডুররিয়া-বাজিয়ে হয়ে উঠেছি। তবে, এখনও ঠিক পাকা হইনি। আনাতিদাদা গোপনে-গোপনে তালিম দিয়ে, মোটামুটি অনেকটা বাজাতে শিখিয়ে দিয়েছে। প্রথম-প্রথম এত গোলমেলে লাগত! তেমনি অসুবিধা। হবেই তো। আমি যে ছোট্ট। বাজনাটাকে বাগে আনতেই কদিন কেটে গেল। তারপর ধীরে ধীরে যখন সড়গড় হয়ে গেল, তখন সা-রে-গা-মা ছাড়িয়ে গানের বাজনাও বাজাতে শিখে গেলুম। আর সত্যিই, এমন লুকিয়ে-ছাপিয়ে শিখলুম যে, কেউ ঘুণাক্ষরে জানতেও পারল না। এমনকী, বাবা, মা কেউ না। আমি বলতে পারি, আনাতিদাদা সত্যিই এক আশ্চর্য মানুষ! নইলে, আমার মতো এক আনাড়িকে এত সহজে এমন সুন্দর ব্যানডুররিয়া বাজাতে শিখিয়ে দিতে পারে! নিজের কথা ভেবে, আমার নিজেরই কেমন অবাক লাগে!

কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য কথা, আমার এই ব্যানডুররিয়া শেখা নিয়ে আনাতিদাদার মনের ভেতর যে-মতলবটা লুকিয়ে ছিল, সেইটা। সে-মতলবটা কিন্তু কাকপক্ষীও টের পেল না। এমনকী, আমিও না। তোমাদের তো আগেই বলেছি , যাযাবর বলে এক জায়গায় বেশি দিন থাকি না। এক দেশ থেকে আর-এক দেশ এরই মধ্যে কতবার হয়ে গেল। আর এই দেশে-দেশে ঘুরে-ঘুরে আমারও গোপনে-গোপনে বাজনা-শেখা চলল। আনাতিদাদা আদা-জল খেয়ে এমন করে আমায় নিয়ে পড়েছে যেন ওস্তাদ না-করে কিছুতেই ছাড়বে না।

এমনি করে আমার বাজনা শেখা চলছে। আনাতিদাদা এরই মধ্যে ম্যাজিক-খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে আনছে। মায়ের গান, বাবার মজার-মজার হাতের খেলা—সবই চলছে ঠিক-ঠিক। যে-দেশেই যাই সে-দেশের সবার চোখেই আমরা যেন আশ্চর্য মানুষ। যারা এক জায়গায় থাকতে জানে না, কোনো দেশে পাকাপোক্ত ঘর বেঁধে বাস করে না, আজকের পথ কালকে কোথায় থামবে—সে নিয়ে ভাবনা করে না, তাদের তো আশ্চর্য লাগবেই!

তবু একটা কথা এই ফাঁকে না বলে পারছি না। কী জানি কেন, কেউ আমাদের বিশ্বাসও করে না। হয়তো আমাদের দেশ নেই বলে, দেশে-দেশে ঘর-বেঁধে পাকাপাকি বাস করি না বলে, সবাই কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখে আমাদের। কেউ বলে, আমরা লুঠেরা! কেউ বলে, তস্কর! আমাদের পেটে-পেটে শয়তানি বুদ্ধি! আমরা মানুষ ঠকাই! এক দেশের গোপন খবর অন্য দেশকে জানিয়ে দিই! আমরা গুপ্তচর! এই ভেবেই বুঝি তারা আমাদের হেনস্তাও করতে ছাড়ে না। আমরা যখন খেলা দেখাই, তারা তখন আমাদের ইট-পাটকেল ছুড়ে মারে! পেছনে ফেউ ডাকে! ঠাট্টা করে! সুযোগ পেলে জিনিস-পত্তর কেড়ে নিতেও ছাড়ে না! তবু বলি, এই নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। এই নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। অন্যের দেশে গিয়ে, অন্যের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করা তো আমাদের সাজে না! সেটা তো ঠিক রাস্তা নয়। কেউ যদি বলে, হটো এ-দেশ থেকে, এখানে তোমরা একমুহূর্তও থাকতে পারবে না, তখন কি আর গা-জোয়ারি চলে! তখন লোটা-কম্বল গুটিয়ে নিয়ে চলো আবার আর-এক রাজ্যে।

সে তবু ভালো। তোমার পোষাচ্ছে না, তুমি বললে, দেশ ছাড়ো! আমরাও মানে-মানে সরে পড়লুম। কিন্তু কোনো দেশ যদি মুখে টুঁ শব্দটি না করে পেছন থেকে ছুরি মারে, তখন তাকে কী বলবে? আর এমনিই এক ঘটনা ঘটে গেল কোনো-এক দেশে, সে-দেশের রাজ-সরকারের গোপন আদেশে। সেই কথাই এখন আমি বলব।

আমি এখন ব্যানডুররিয়া বেশ ভালো বাজাতে পারি। আমি এখন আরও একটু বড়ো হয়েছি বলে প্রথম-প্রথম যে-অসুবিধা ছিল, এখন আর তা একদম নেই। মা গান গাইলে, আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে সেই গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে ব্যানডুররিয়ায় তুলে নিতে পারি। আমার ভাবতে মজা লাগে, আমার এই বিদ্যের বহরটা একমাত্র আনাতিদাদা ছাড়া আর কেউ জানে না। আর তাই একদিন

সবাইকে হঠাৎ অবাক করে দেবার জন্যে যে-মতলবটা মনে-মনে এঁটে রেখেছিল আনাতিদাদা, সেটা আমিও একেবারে শেষমেশ জেনেছিলুম। মতলবটা আনাতিদাদার মুখে প্রথম শুনেই আমার যে কী মজা লাগল, সে তোমাদের কী বলব! ভাবতে-ভাবতে আনন্দে গা আমার শিউরে উঠছিল! ঘটনাটা যখন সত্যি-সত্যি ঘটবে তখন যে কী হবে, আমি ভাবতেই পারছি না।

এই মজার মতলবটা আনাতিদাদা মনে-মনে আঁটলেও, সে-দেশের রাজ-সরকার গোপনে-গোপনে যে-মতলবটা এঁটে রেখেছে, সে-খবরটা আনাতিদাদা একদম জানতেই পারেনি। তাই দলের সর্দার হিসেবে, সহজ মনেই ঘোষণা করল, আমাদের তাঁবু-গাড়া সামনের মাঠটায় সেদিন রাত্রে এক জলসা বসবে। কিন্তু জলসায় যে কী হবে, কে গাইবে, কে নাচবে, কে বাজাবে সে-কথা কিচ্ছু বলল না।

আজকের রাতটা বেশ নরম। হালকা-নীল চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়েছে আমাদের সবুজ মাঠটার ওপর। আলোয়-আলোয় থিকথিক করছে চত্বরটা। চত্বরের মধ্যিখানে একটা মস্ত বড়ো ধুনুচি রাখা হয়েছে। সেই ধুনুচির আগুনের বুক থেকে গুগগুল ছড়ানো গাঢ় ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। সেই ধুনিচিটাকে ঘিরে আমাদের দলের সবাই গোল হয়ে বসেছে। আমি ছাড়া। আমি তখন ব্যানডুররিয়াটা গলায় ঝুলিয়ে লুকিয়ে আছি আনাতিদাদার তাঁবুতে। মা ওই দলের মধ্যে বসে-বসে দু-একবার আমার খোঁজে মাথা উঁচিয়ে এদিক-ওদিক চাইল বটে,কিন্তু আমায় দেখতে না পেয়ে খুব যে একটা ব্যস্ত হল, তা অবশ্য মনে হল না। মা ভাবল, নিশ্চয়ই এখানে-ওখানে কোথাও আছি আমি। আমায় কী করতে হবে সেটা আনাতিদাদা চুপি-চুপি আগেভাগেই পাখিপড়ার মতো শিখিয়ে রেখেছে। সুতরাং সেই কথাটা যতই ভাবছি, ততই আমার বুকের ভেতরটা খুশিতে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে। কিন্তু আমরা তখনও কেউ-ই জানতে পারিনি, এ-আনন্দ কিছুক্ষণের। একটা ভয়ংকর ঘটনা ওত পেতে আছে। একটু পরেই বুঝি-বা সে থাবা মারবে।

থাক সে-কথা। এখন যা হচ্ছে, তাই বলি।

আনাতিদাদা সর্দার, সে-কথা তো তোমাদের আগেই বলেছি। নিশ্চয়ই মনে আছে। সুতরাং আনাতিদাদা ওই জলসার আসরে উঠে দাঁড়াল। তারপর হেঁকে-হেঁকে ঘোষণা করল, 'এ-দেশ ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে আমাদের। কাল ভোরের আলোয় আমাদের আবার যাত্রা শুরু হবে। এখানে আজ আমাদের শেষরাত। শেষরাতে আজ তোমাদের সকলকে চমকে দেবার মতো একটি উপহার আমি দেব। তার আগে রুশমি-বোন আমাদের গান শোনাবে।'

তোমাদের বলে রাখি, রুশমি আমার মায়ের নাম। আনাতিদাদা আমার মাকে রুশমি-বোন বলেই ডাকে। সুতরাং সর্দার আনাতিদাদার হুকুমে আমার মা গান শুরু করল। সে-গানের প্রথম দুটি লাইন আমার এত ভালো লাগে:

সুন্দর পৃথিবী আহা! তুমি সুন্দর,

তোমার বুকের নীড়ে আমাদের ঘর!

এই গানটা মায়ের গলায় যখন সুরে-সুরে ভরে যায়, আমি হলপ করে বলতে পারি, শুনলে তুমি একেবার হতবাক হয়ে যাবে। তার ওপর এই সুরে সুর মিলিয়ে বাবার হাতের ব্যানডুররিয়া যদি বেজে ওঠে, তাহলে সে যে কী আশ্চর্য ব্যাপার হয়, সে যে না শুনেছে, তাকে আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু আজ বাবার বাজনা বেজে উঠল না। আনাতিদাদার তাঁবুর ভেতরে এতক্ষণ আমি গলায় ব্যানডুররিয়া ঝুলিয়ে চুপটি করে বসে ছিলুম এই মুহূর্তটির জন্যে। আনাতিদাদার কথামতো, মায়ের গলায় গান শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার হাতের ব্যানডুররিয়া সেই গানের সুরে সুর মিলিয়ে বেজে উঠল। আমি বাজনা বাজাতে-বাজাতে ধীর পায়ে তাঁবুর ভেতর থেকে জলসার চত্বরে এগিয়ে এলুম। বিদ্যুৎ চমকে উঠলে আকাশে যেমন হঠাৎ আলোর ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তেমনি যেন নিমেষে সবার চোখ ঝলসে গেল আমার দিকে তাকিয়ে। তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না, তাদের আদরের ইসতাসি তার মায়ের গাওয়া গানের সঙ্গে ব্যানডুররিয়া বাজাচ্ছে নিজের হাতে! আমার মা গাইতে-গাইতে থমকে যায়। বাবা চমকে তাকায়। আনাতিদাদার মুখে মুচকি-মুচকি হাসি। থমকে গিয়ে মা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল ক্ষণেকের জন্যে। হারিয়ে গেল গানও তার কণ্ঠ থেকে। আমি থামলুম না। বাজিয়েই চললুম। একটুখানি থেমে নিমেষের মধ্যেই মা যেন গান ফিরে পেল আবার। মা গেয়ে উঠল দ্বিগুণ উৎসাহে। আমি মায়ের আরও কাছে এগিয়ে গেলুম। একেবারে মুখোমুখি। তোমায় বলব কী, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে চত্বর জুড়ে আমাদের দলের যত মানুষ জমায়েত হয়েছিল, সবাই একসঙ্গে মায়ের গলায় গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠল : 'সুন্দর পৃথিবী আহা! তুমি সুন্দর!' অমন যে আনাতিদাদা, যাকে কোনোদিন আমি গান গাইতে শুনিনি, সেই আনাতিদাদার গলাতেও সুর! নিমেষের মধ্যে সেই জ্যোৎস্নারাতের সবুজ চত্বরটা যেন অপরূপ এক সুরের রূপকথার মতো ঝলমলিয়ে উঠল। তুমি শুনলে বোধহয় আরও অবাক হবে, কারো-কারো পা-দুটিও যেন অস্থির হয়ে উঠল। নেচে উঠল তারা। গলায়-গলায় গান, পায়ে-পায়ে ছন্দ। সে যে কী আশ্চর্য দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না।

হয়তো এ আনন্দ চলেছিল কিছুক্ষণ। তুমি যতক্ষণ ভাবছ, হয়তো তার চেয়েও কম সময়। আনন্দের জোয়ার যখন ঢেউ তুলে ফুলে-ফুলে উঠছিল, ঠিক তখনই সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটে গেল। অদৃশ্য কোন আড়াল থেকে আমাদের এই আনন্দবিভোর মানুষগুলোর ওপর কারা যেন আচম্বিতে গুলি ছুড়ল, গুড়ুম-গুড়ুম! অতগুলো আনন্দ-উচ্ছল মানুষ পলকে হতচকিত। কিছু বুঝতে না-বুঝতেই আবার বুক-কাঁপানো আওয়াজ, দুম-দুম! এবার বন্দুকের গুলি নয়, বোমার বিস্ফোরণ! দেখতে-দেখতে সমস্ত চত্বরটা বারুদের গন্ধে আর নিকষ-কালো অন্ধকার ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। বিপদে সন্ত্রস্ত মানুষগুলো আর্তনাদ করে উঠল, 'বাঁচাও, বাঁচাও!' গানে-গানে ভরপুর সেই সবুজ চত্বর কান্না আর চিৎকারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল! কার গায়ে আঘাত লাগল, কেউ দেখল না। কে

বাঁচল, কে মরল কেউ জানল না। নিজে বাঁচার জন্যে যে যেদিকে পারল, সেই দমবন্ধ ধোঁয়ার ভেতর ঘুরপাক খেতে-খেতে ছুটতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে আমি দেখতে পেলুম, একদল পুলিশ হম্বিতম্বি করতে-করতে এদিকেই ধেয়ে আসছে। আমি কী করব, ভেবেই পাচ্ছি না। আমি তখনও বুঝতে পারিনি, আমার মা আমারই সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে-পড়ে মাটির ওপর ছটফট করছে। মায়ের বুকে গুলি লেগেছে! দেখতে পেলুম না বাবাকেও। তার যে কী হল, তাও জানি না। আমি দেখতে পেলুম পুলিশের হাতে বন্দুকের নলগুলো এদিক-ওদিক ছটফট করতে-করতে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। আমার বুকের মধ্যে সাহসের আগুনটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। আমি ভাবলুম, ওরা যদি গুলি ছোড়ার আগে আমার আর একটু কাছে আসে, তবে ওই যে ধুনিচির আগুনটা এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে, ওই আগুন ছুড়ে ওদের অন্ধ করে দেব। পুলিশের দল আমার আরও কাছাকাছি এসে পড়েছে। আর দেরি নয়। আমিও তড়িৎগতিতে ধুনুচিটার দিকে এগিয়ে যাব বলে পা বাড়ালুম। ঠিক এমন সময়ে কে যেন তারস্বরে চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'ইসতাসি, ইসতাসি!'

আমি থতমত খেয়ে থমকে গেলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম, পুলিশের দল আরও কাছে এগিয়ে এসেছে! আমি গলা শুনে বুঝতে পেরেছি, কে আমায় ডাকছে। এ ডাক আনাতিদাদার। তাকে খুঁজে পাবার জন্যে সেই অন্ধকার ধোঁয়ার মধ্যে আমার চোখ দুটো ছটফট করে উঠল। তাকে দেখতে না-পেয়ে আমিও চিৎকার করে ডেকে উঠলুম, 'আনাতিদাদা!'

অমনি সঙ্গে-সঙ্গে আবার বন্দুক গর্জে উঠল, গুড়ুম-গুড়ুম!

দেখলুম, আর দেরি করা ঠিক নয়। ওরা আমার বুকে আঘাত হানার আগে আমাকেই প্রতিশোধ নিতে হবে। তাই চোখের পলকে ছুট দিয়ে ওই মস্ত ধুনুচিটা এক হাতে তুলে নিলুম। ছুড়ে দিলুম ওদের গায়ে। ওদের গুলি আর ছোড়া হল না। আগুনের ফুলকি ছিটকে-ছড়িয়ে ওদের চোখে-মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিল। দেখতে পেলুম, সেই আগুন ওদের মাথার টুপিতে জ্বলছে, পোশাক পুড়ছে। সারা দেহে আগুনের ঝলকানি। আমি ভাবলুম, এই সুযোগ! এবার আমায় পালাতে হবে! আমার হাতে তখনও সেই ব্যানডুররিয়াটা। এখন তার কোনো শব্দ নেই। একটু আগে এই ব্যানডুররিয়ার সুর থেকে যে আনন্দ উছলে উঠছিল, এখন সেই আনন্দ মরণ-কান্নার আর্তনাদে আছড়ে পড়ছে চারিদিকে। আমি ছুট দিলুম পালাবার জন্যে। ঠিক এই সময়ে ঝট করে কে যেন আমার জামার কলারটা খামচে ধরে টান দিল। আমি ঝটপট ঘুরে দেখার আগেই চিৎকার করে ডাক দিলুম, 'আনাতিদাদা, আমাকে বাঁচাও।'

আমার চিৎকার শুনে, আমার জামাসুদ্ধ গলাটা পাকিয়ে একটা লোক কাঁপা গলায় ধমকে উঠল, 'চোপরাও!'

আমি পিছন ফিরে দেখি,পুলিশের একজন হোমরা-চোমরা আমাকে মারবার জন্যে তার রিভলভারটা আমার দিকে তাক করে ধরে আছে। আমি এক্ষুনি নির্ঘাত মরব, এই কথাটা ভাবতে কতটুকুই বা সময় পেয়েছি, ঠিক সেই সময়ে আবার একটা রিভলভারের শব্দ, সাঁ-ই-ই! আমি আতঙ্কে শিউরে উঠে পিছু ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলুম, আমায় যে-পুলিশটা ধরেছিল, তার পিঠেই কে গুলি ছুড়েছে! লোকটা আমায় ছেড়ে মাটির ওপর আর্তনাদ করে নেতিয়ে পড়ল। পড়ামাত্র আনাতিদাদা পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইসতাসি—'

ডাক শুনে মুখ ঘোরতেই দেখি, আনাতিদাদা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভীষণ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। তারই হাতে রিভলভার। ওই রিভলভারের গুলিতেই পুলিশের লোকটা ঘায়েল হয়েছে। আনাতিদাদার ডাক শুনে আমিও চিৎকার করে সাড়া দিলুম, 'আনাতিদাদা!'

আনাতিদাদা আমায় আর কোনো কথা বলতে দিল না। মুহূর্তে রিভলভারটা নিজের পকেটে পুরে ফেলে আমাকে জাপটে ধরল। তারপর চকিতে আমাকে নিয়ে একটা তাঁবুর আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়ল। এমন চটজলদি সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল যে, আমি নিজেই হতচকিত হয়ে গেলুম। সেই হোমরা-চোমরা পুলিশটার পিঠে গুলি লাগার সঙ্গে-সঙ্গে আমি শুনতে পেলুম, পুলিশের এক বিরাট বাহিনী তর্জন-গর্জন করতে-করতে সেই চত্বরটা তোলপাড় করছে। আমি তখনও শুনছি গুলির আওয়াজ। অবিশ্যি ততক্ষণে চত্বরটাও প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। যে বাঁচল, সে পালাল। যে পারল না, হয় সে গুলির আঘাতে কাতরাচ্ছে, না-হয় মরেছে। আমি আনাতিদাদাকে জড়িয়ে ধরে চুপিসারে জিজ্ঞেস করলুম, 'মা? বাবা?'

আনাতিদাদা আমার মুখটা চেপে ধরল, 'না কথা নয়। আড়াল থেকে নিঃশব্দে উঁকি মারলে আনাতিদাদা। আমিও উঁকি দিলুম। পুলিশের দল আনাতিদাদাকে ধরার জন্যে আহত বাঘের মতো গর্জে-গর্জে খুঁজে বেড়াচ্ছে এধার-ওধার। আনাতিদাদা জানে, এমন অবস্থায় এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। তাই আমার হাত ধরে তক্কে-তক্কে এই তাঁবুর আড়াল থেকে, ঠিক পাশেই একটা ঝোপ ছিল, সেখানে লুকিয়ে পড়ল। এই ঝোপের আড়াল থেকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাঁবুর ভেতরে পুলিশ ঢুকে-ঢুকে খোঁজাখুঁজি করছে। শুনতে পাচ্ছি, তাঁবু ছেঁড়ার শব্দ। ওরা এক তাঁবু থেকে আর এক তাঁবুতে দুড়দাড়িয়ে ঢুকে পড়ে। সব তছনছ করে বেরিয়ে আসে। চিৎকার করে। আর সামনে যা পায় পায়ের বুট দিয়ে ছুড়ে-ছুড়ে লাথি মারে!

ঠিক এই মুহূর্তে আমাকে নিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল আনাতিদাদা। তারপর সেখান থেকে নিঃসাড়ে একটা মস্ত বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে গা-ঢাকা দিল। আমি প্রায় নিশ্বাস চেপে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। কী ভীষণ উৎকণ্ঠা। তারপর একফাঁকে সেই পাঁচিলের আড়াল থেকে ঢুকে পড়লুম একটা ঘুপচিমতো গলির ভেতরে। সেখান থেকে মার ছুট!

ছুটতে ছুটতে আমার বুকের ভেতরটা চমকে উঠল। চিৎকার করে আনাতিদাদাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আমার মা কোথায় গেল? আমার বাবা?'

আনাতিদাদা ছুটতে ছুটতেই বললে, 'এখন কোনো কথা নয়! তোকে বাঁচতে হবে!'

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন এ-কথা বলছ?'

'পুলিশ তাদের গুলি মেরেছে।'

আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। আমি ছুটতে ছুটতে থমকে গেলুম। আমার বুকের ভেতরটা যেন থেমে গেছে। আমি কাঁদতে পারলুম না। কাঁপতে লাগলুম। আনাতিদাদা ব্যস্ত হয়ে আবার আমার হাত ধরে টান দিল। না, আমি যাব না। তখন আমার শরীর উত্তেজনায় গুমরে উঠছে। মন বলছে, যারা আমার মা আর বাবাকে গুলি মেরেছে, তাদের আমি দেখে নেব।

আনাতিদাদা আবার বলল, 'ইসতাসি, তোকে বাঁচতে হবে! এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা দেখে ফেলবে!'

'কটা মাত্র গুলি আছে।'

'একজনকেও তো মারতে পারব।'

'একজনকে মারলে কী লাভ! প্রতিশোধ নিতে হলে আমাদের তৈরি হতে হবে।' বলে আনাতিদাদা আমার হাতটা তার হাতের মুঠি দিয়ে শক্ত করে ধরল। আশ্বাসে ভরপুর সেই হাতে হাত দিতেই আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। ডুকরে কেঁদে ফেললুম। আনাতিদাদা আমার মুখখানা তার চোখের কাছে সরিয়ে এনে বলল, 'ভয় নেই, আমি আছি। চ, আমার সঙ্গে।'

আমি কথা বলতে পারলুম না। এক হাতে আমার ব্যানডুররিয়া আর এক হাতে আনাতিদাদার শক্ত মুঠি শক্ত করে ধরে আমি ছুটলুম।

৩

অনেকক্ষণ ছুটতে-ছুটতে আর যখন পারছিলুম না, আনাতিদাদা তখন নিজেই বলল, 'এবার একটু থামতে পারা যায়।'

আমরা দুজনেই হাঁপাচ্ছি । হাঁপাতে-হাঁপাতেই পিছু ফিরে এদিক-ওদিক দেখছি। না, কেউ টের পায়নি মনে হয়। আমরা বোধ হয় পুলিশের চোখ এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছি।

আমার এখন কথা বলার মতো মনের অবস্থা নয়। আমি যেন প্রায় বোবা। মা আর বাবার মুখ দুটি যতই মনে পড়ছে, আমি যেন নিজেকে ততই কেমন অসহায় মনে করছি। আনাতিদাদার সেই কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, পুলিশ তাদের গুলি মেরেছে। এ-কথা শুনলে কোন

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছেলের না মনের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে! এই পৃথিবীতে যার মা নেই, বাবা নেই তার আর কী আছে। আমি তাই ভারি একা, এখন, এই মুহূর্তে।

আমাকে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনাতিদাদাই কথা বলল। আমি বুঝতে পারছি, আনাতিদাদা এতক্ষণ ছুটে এসে তার দূরন্ত নিশ্বাসটাকে এখনও বাগে আনতে পারেনি। কষ্ট হচ্ছে। তবু সেই কষ্ট অগ্রাহ্য করে আমাকে ডাকল, 'ইসতাসি।'

হঠাৎ সেই ডাক শুনে চমকে উঠলুম।

'এটা স্টেশন।'

আমি হাত দিয়ে আমার চোখ মুছে নিলুম।

'আমাদের এইখানে খানিকক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে,' আনাতিদাদা বলল, 'এক্ষুনি ট্রেন আসবে।'

এতক্ষণ আমি ভালো করে দেখিনি এই জায়গাটা। ভালো করে দেখার কথাটা আমার মনেই আসেনি। আমার মনে শুধু একটা কথাই বার বার ধাক্কা দিয়ে বলে যাচ্ছে, প্রতিশোধ নিতে হবে, প্রতিশোধ!

সুতরাং আনাতিদাদা যখনই বলল, এখানে লুকিয়ে থাকতে হবে, তখনই আমি ঘুরে-ফিরে দেখবার চেষ্টা করলুম কেমন জায়গা এটা। হ্যাঁ, এটা রেলের স্টেশনই বটে। অনেক রাত হয়েছে বলে লোকজন কম। অবিশ্যি প্ল্যাটফর্মে আলো ঝলমল করছে। আমরা দুজনে লুকিয়ে-ছাপিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর জড়াজড়ি করে বসে রইলুম। এই যে ছুটে আসা, এই যে আলো-ঝলমল স্টেশন, বা পুলিশের ভয়, অথবা বন্দুকের আওয়াজ, সঙ্গে অতগুলো মানুষের আর্তনাদ, এসবের কোনোটাই এখন আমার কাছে কিছু নয়। এখন শুধু বার বার আমার মা আর বাবার কথাই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, মায়ের গান, বাবার ব্যানডুররিয়া বাজাতে-বাজাতে খুশিতে দুলে ওঠা, তার জাগলিং-এর খেলা দেখাবার কসরত, কিংবা তাদের গল্প বলা, তাদের মুখের শব্দগুলি আর প্রাণ-খোলা হাসি। মা হাসলে আমি তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতুম। কেননা, হাসতে-হাসতে মায়ের মুখখানি এমন অদ্ভুত আর সুন্দর হয়ে ঝলসে উঠত যে, তুমি তা না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না। আমার তখন সত্যিই মনে হত, ভাগ্যিস, আমার মা আমার না হয়ে অন্য কারো হয়ে যায়নি!

হঠাৎ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঝোলানো ঘন্টাটা বেজে উঠল। এদিক-ওদিক দূরে-দূরে অনেকগুলো লাল আলো লাইনের ওপর মাথা উঁচিয়ে পিটপিট করে জ্বলে জানান দিচ্ছে, এদিকের লাইন বন্ধ। যেদিকের লাইনে গাড়ি আসছে, দেখি, সেদিকে সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। উঠে দাঁড়াল আনাতিদাদা। আমার হাতের দিকে তাকিয়ে অনেকটা চাপা গলায় বলল, 'দে।' বলে আমার হাত থেকে ব্যানডুররিয়াটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে এবার বলল, 'চ।'

https://boierhut.com/fb

আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আনাতিদাদার হাত ধরে এগিয়ে গেলুম প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি। দেখতে পেলুম, দূরে আলোর একটা বিন্দু ছুটতে-ছুটতে ধেয়ে আসছে। দেখছি যতই সেই বিন্দু এগিয়ে আসছে, ততই বাড়তে-বাড়তে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সামনে, লাইনের ওপর। সেইসঙ্গে ট্রেনের ক্ষীণ শব্দটাও ধীরে-ধীরে যেন সেই আলোর সঙ্গে তীব্র হচ্ছে। ঝিক-ঝিক-ঝিক-ঝিক।

স্টেশনে ট্রেন এসে থামল। আনাতিদাদার হাত ধরে গাড়িতে উঠতে গিয়েই আমার বুকটা ধড়ফড় করে চমকে উঠল। দেখে ভেসে গেল কান্নায়। অনুতাপে ভন্তমন বলে উঠল, আমি মা আর বাবাকে চিরদিনের মতো এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছি। আমার পা-যেন চলতে চায় না। আনাতিদাদা আমার হাতে টান দিল। আমার চমক ভাঙল। আমি ট্রেনে উঠে পড়লুম। গাড়ি ছেড়ে দিল।

আমরা দুজনে চুপচাপ বসে পড়লুম এক-কোণে। আনাতিদাদা ব্যানডুররিয়াটা আবার আমার হাতে এগিয়ে দিল। আমি সেটা গলায় ঝুলিয়ে নিলুম। আমাদের সঙ্গে আর তো কিছু নেই। এই ব্যানডুররিয়াটা, আর বোধ হয় আনাতিদাদার পকেটে সেই রিভলভারটা। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই। কেননা, আমি দেখেছি, রিভলভারটা আনাতিদাদা পকেটেই পুরেছে। এক যদি তালেগোলে পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে অন্য কথা। তবে এটা ঠিক, হুড়োহুড়িতে আনাতিদাদার জামা-প্যান্ট-জ্যাকেট সবই কেমন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। আনাতিদাদার মুখখানাও এতক্ষণে ট্রেনের আলোয় ভালো করে দেখতে পেলুম। বুঝতেই পারলুম, দুঃসহ ভাবনায় অথবা গভীর দুঃখে সেই মুখখানা চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। আমাকে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখেই বোধ হয়, আনাতিদাদা আমার দিকে ফিরে তাকাল। হঠাৎ আমার চোখে চোখ পড়তেই দেখি, যেন তার চোখে ফোঁটা-ফোঁটা জল চিকচিক করে উঠেছে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। চকিতে নিজের মুখখানা জানলার ফাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠলুম। আমার পিঠে হাত রাখল আনাতিদাদা। হাত দিয়ে পিঠটা আস্তে চাপ দিতেই, আমার কান্নার শব্দটাকে আমি কোনোরকমে সামলে নিলুম। আমি বুঝতে পেরেছি, এভাবে কেঁদে-ওঠাটা আমার ঠিক হয়নি। পাশের লোক কান্না শুনতে পেলে সন্দেহ তো করতেই পারে!

আমি লুকোবার চেষ্টা করলেও আমার ঠিক পাশের লোকটি আমার কান্না শুনতে পেয়েছিল! সে আচমকা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'কী খোকা, মন কেমন করছে?' তখন আমি আচমকা থমকে উঠে তার দিকে ফিরে তাকিয়েছি।

আনাতিদাদা তো দারুণ চালাক। পাছে আমি কী বলতে কী বলে ফেলি, তাই আমায় উত্তর দেবার সময় না দিয়েই নিজে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মা-বাবাকে ছেড়ে যাচ্ছে তো!'

'কোথায় যাচ্ছে?'

'আমার কাছে। আমি কাকা।'

'ও।'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

লোকটা চুপ করে গেলেই ভালো ছিল। তা না, লোকটা আমাকেই আবার বলল, 'কাকার সঙ্গে যাচ্ছ, কাঁদতে আছে!'

আমার আর তখন কান্না! কখন থেমে গেছে! বোধ হয় লোকটার ভয়ে! কারণ, ভাবছি, যদি লোকটা অন্য কিছু জিজ্ঞেস করে! জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছি, তখন কী উত্তর দেব?

অবশ্য সেসব কথা সে জিজ্ঞেস করল না। কিন্তু যে-কথা জিজ্ঞেস করল, তাতে অতি বড়ো সাহসী মানুষেরও বুকের রক্ত জল হয়ে যায়! আমি না-হয় ছোটো ছেলে! কিন্তু আনাতিদাদার মতো শক্তসমর্থ লোকও যখন তার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল, তখন তুমি কী বলবে বলো?

লোকটা প্রথমে চুপ করেই ছিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'দেখলুম, তোমরা এই স্টেশন থেকেই উঠলে?'

আনাতিদাদা মুখে কথা না-বলে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

'আমিও এখান থেকেই উঠলুম।' লোকটাও বলল।

আমার বুকের ভেতরটা দুরদুর করে কেঁপে উঠেছে। আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওদিকের কোনো খবর জানো নাকি?'

'কোন দিকের?'

'সে কী! জানো না? এমন একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল!'

'আমরা তো কিছুই জানি না!' যেন আকাশ থেকে পড়ল আনাতিদাদা।

লোকটা হাত নেড়ে বলল, 'তাজ্জব ব্যাপার। তোমরা কি শহরে বাস করো না? জানো না, একদল যাযাবরকে আজ পুলিশ ভীষণ ঠেঙিয়েছে! গুলি করে কটাকে খতম করেও দিয়েছে।'

'তাই নাকি।'

লোকটা আবার বলল, 'দেবেই তো। যা বাড়াবাড়ি করছিল! একেবারে ডাকাত মশাই, ডাকাত। ক-দিন ধরে শহরের মানুষকে তিষ্টুতে দিচ্ছিল না। মেরেছে, বেশ করেছে! গভর্মেন্ট তো হুকুমই দিয়েছে, যাযাবর দেখো আর খতম করো। অনেকগুলো ধরা পড়েছে। কটা পালিয়ে গেছে। শুনছি নাকি এই ট্রেনেও কটা লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের খুঁজে বার করার জন্যে পুলিশও এই গাড়িতে ওত পেতে আছে। ওঃ, এই এক জাত মশাই, যাযাবর! ব্যাটাদের না আছে ধম্ম, না আছে কম্ম! শয়তান! শয়তান!'

আমি বলতে পারি, অন্য সময় হলে বাছাধনের ঘাড়ে ধড় থাকত না। এতক্ষণে তিনি ধরাশায়ী হতেন। কিন্তু লোকটার মুখে এইসব আজেবাজে বদনাম শুনেও আনাতিদাদা বেমালুম হজম করে গেল। বোধ হয়, এই গাড়িতে পুলিশ যাযাবরদের ধরবার জন্যে ওত পেতে আছে, এই কথাটা শুনেই তার মাথা ঘুরে গেল! আনাতিদাদা এমনই ঘাবড়ে গেল যে, প্রায় চমকে দাঁড়িয়ে উঠে চক্ষের নিমেষে চলন্ত ট্রেনের চেন ধরে টান মারল! মেরেই, আমায় টানতে-টানতে পালাবার জন্যে দরজার

https://boierhut.com/fb

দিকে ধেয়ে গেল। মানুষ বিপদে পড়লে বোধ হয় এমনি করে তার বুদ্ধিটাও লোপ পেয়ে যায়! তা নইলে আনাতিদাদার মতো বুদ্ধিমান মানুষ হুট করে এমন একটা কাঁচা কাজ করে বসবে! এ-কথা ভাবাই যায় না! সঙ্গে-সঙ্গে একগাড়ি লোক হা-হা করে উঠেছে। আমাদের অমন করে পালাতে দেখে প্রথমটা তারা থতমত খেয়ে গেলেও, পরেই তারা 'ডাকাত, ডাকাত' বলে চিৎকার করে আমাদের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চেনের টানে ট্রেন তো এখন একেবারে স্টপ! আমরা ধস্তাধস্তি করতে করতে ট্রেন থেকে লাফ দেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না! ট্রেনের কামরায় শুরু হয়ে গেল ভীষণ হই-হুল্লোড়! আমি বোধ হয় আমার গলায় ঝোলানো এই ব্যানডুররিয়াটা আর রক্ষা করতে পারলুম না! এক্ষুনি চুরমার হয়ে গেল বলে!

হঠাৎ শুনি, সত্যিই চুরমার হয়ে যাওয়ার শব্দ! চুরমারের শব্দটা ব্যানডুররিয়ার নয়! পকেটে যে রিভলভারটা ছিল, সেইটা বার করে গুলি ছুড়েছে আনাতিদাদা! একটা লোকের গা ছুঁয়ে সেই গুলি ছিটকে লেগেছে ট্রেনের আলোর গায়ে। আলো নিবল। ঝনঝন করে আলোর কাচ ভেঙে পড়ল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেল সারাটা কামরা। সেই অন্ধকারে এক-কামরা মানুষ আতঙ্কে চিৎকার করে মরাকান্না শুরু করে দিল! দেখতে-দেখতে পুলিশও হাজির। তাদের হাতের টর্চ ঝলসে উঠেছে! দৌড়ে এসে তারা কামরাটার মধ্যে ঢুকে পড়তেই আনাতিদাদা আমাকে নিয়ে মেরেছে লাফ! লাফ মেরেই চোঁ-চাঁ দৌড়, একেবারে সামনের দিকে। কামরা-ভরতি অত লোকের মধ্যে একজনও যে আমাদের দেখতে পাবে না, এ তো হতে পারে না। সুতরাং যার নজর গেল, সে-ও অমনি সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই পালাচ্ছে, ওই পালাচ্ছে!'

আকাশে তখনও জ্যোৎস্না। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রেল-লাইনের ধারটা। যেখানে আমরা লাফিয়ে পড়েছি, সেখানে এবড়ো-খেবড়ো পাথর ছড়ানো। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়-মারা খুব শক্ত। তবু সেই পাথরের ওপর দিয়েই ছুটতে-ছুটতে আমরা রেল-লাইনের ঠিক ধারেই একটু নিচুমতো জলা জায়গায় ঝটপট নেমে পড়লুম। নামতে না নামতে পুলিশের বন্দুক থেকে ক-রাউণ্ড গুলি গুড়ুম-গুড়ুম করে বুক কাঁপিয়ে আমাদের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ভাগ্য বলতে হবে! ওই নিচু জায়গাটায় নামতে যদি আর এক মুহূর্ত দেরি হত, তবে আমাদের মরণের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারত না।



...ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ার ফলে আমরা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও পুলিশের হাত থেকে বাঁচলাম!

আনাতিদাদা কথা না বলে হাঁটু ভেঙে, গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল। আমাকে ইশারায় অনুসরণ করতে বলল। আমিও এগিয়ে চলি আনাতিদাদার পাশে-পাশে।

শুনতে পাচ্ছি, পুলিশ এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসছে ট্রেনের যাত্রীরা। আমি জানি, আর রেহাই নেই। এবার নিশ্চিত ধরা পড়ব। ঠিক তক্ষুনি জলাটার ধার ঘেঁষে বেশ একটা ঘন ঝোপঝাড়ের জঙ্গল যেন নজরে পড়ল আমাদের। মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে, কটা বড়ো বড়ো গাছ। আনাতিদাদা আর কিছু না পেয়ে আমাকে হ্যাঁচকা মেরে ওই ঝোপের মধ্যেই ধাঁ করে ঢুকে পড়ল। পুলিশের দল তো প্রায় এসেই পড়েছে। যতই জ্যোৎস্না ঝিলিক মারুক, চাঁদ তো আর সূর্যের মতো চারিদিকে স্পষ্ট আলোয় ভরিয়ে দিতে পারে না। রাত সে রাতই! সুতরাং বলতে পারি, ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ার ফলে আমরা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও পুলিশের হাত থেকে বাঁচলুম! কেননা, এই ঝোপের মধ্যে, এই জ্যোৎস্না রাতে সবকিছু ঠিক ঠিক ঠাওর করা খুবই মুশকিল।

কিন্তু মুশকিল সে তো তোমার-আমার কাছে। পুলিশের কাছে মুশকিল-টুশকিল বলে কোনো কথা নেই। তার ওপর তাদের হাতে বড়ো বড়ো টর্চ। ঝোপের মধ্যে তাদের টর্চের আলো ঝলসে উঠতেই, আমি জানি, নির্ঘাত ধরা পড়ে গেছি! এই বুঝি টর্চের আলো আমাদের গায়ের ওপর ঠিকরে পড়ল!

প্রথমে আমি ভেবেছিলুম, ঝোপটা তেমন কিছু নয়। বুঝি একটুখানি। ওই সাংঘাতিক উত্তেজনায় আর উৎকণ্ঠায় সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছল আমার। তার ওপর জ্যোৎস্নারাতের কুহেলি আলো!

https://boierhut.com/fb

সুতরাং ঝোপের চেহারাটা বুঝে ওঠা, আমি কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। শুনলে বোধ হয় অবাক হয়ে যাবে, এটা আদপে ঝোপই নয়। যেটাকে এতক্ষণ ঝোপ বলে ভ্রম হচ্ছিল, আসলে সেটা একটা মস্ত ঘন জঙ্গলের শুরু! এ-কথাটা আনাতিদাদাই বা জানবে কী করে! কিন্তু পুলিশের টর্চ জ্বলে উঠতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। অন্য সময় হলে এই রাত-দুপুরে কে আর শখ করে এই জঙ্গলে ঢুকতে সাহস করে! পুলিশও হয়তো সাহস করল না। কেননা, তাদের পায়ের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, জঙ্গলের বাইরে থেকেই তারা ঝোপঝাড় সরিয়ে মুড়িয়ে আমাদের খোঁজাখুঁজি করছে। আমি একেবারে স্পিকটি নট! আনাতিদাদার গা ঘেঁষে সিঁটিয়ে রইলুম! কিন্তু বিপদ যখন আসে, সে তো একা আসে না। হল কী, বোধ হয় একটা বড়ো-সড়ো গিরগিটি টপাস করে আমার পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়ল! আমি তো আঁতকে উঠেছি। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সেটাকে যেই সরিয়ে দিতে গেছি অমনি বেমক্কা হাতটা গিয়ে পড়ল আমার গলায় ঝোলানো ব্যানডুররিয়াটার তারে! আচমকা ঝন করে সেটা বেজে উঠতেই পুলিশের দল ও তার সঙ্গে জনতা চিৎকার করে উঠেছে, 'ওইখানে, ওইখানে!'

আমরা এবার ধরা পড়লুম বলে! ছিঃ! ছিঃ! আমার অসাবধানে এ কী বিপদ ঘটে গেল! আনাতিদাদা সেই বিপদের কথা বুঝতে পেরেই, ঝট করে আমার জামাটা খামচে ধরে মারল এক ঝটকা-টান! তারপর সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছুট!

ছুট বললেই তো আর জঙ্গলের মধ্যে ছোটা যায় না! চারিদিকে ছোটো-বড়ো নানান গাছ। কাঁটা-ঝোপ, ডালপালা! গায়ে লাগছে, পায়ে ফুটছে। হয়তো রক্ত পড়ছে। কিন্তু সে-সব এখন কিছু নয়! কারণ, আমাদের ধরবার জন্যে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে পুলিশদলও তেড়ে আসছে! তারা আমাদের সোজাসুজি দেখতে না পেলেও, আমাদের ছোটার সঙ্গে-সঙ্গে গাছে-গাছে, ঝোপে-ঝাড়ে গায়ের ধাক্কা যতই লাগছে, ততই শব্দ হচ্ছে আর ঝোপঝাড়গুলো নড়ে উঠছে। আমরা কোন দিকে পালাচ্ছি, হদিস করে ফেলতে তাদের এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। সুতরাং তারা চোখ-কান বুজে সেইদিকেই বন্দুক ছুড়ল গুড়ুম-ম-ম! আমার লাগেনি। আনাতিদাদার লাগল কি না বলতে পারছি না। কিন্তু আনাতিদাদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাতটা চেপে ধরল। তারপর সেই ঘুপচি জঙ্গলের মধ্যে ঝুপ করে বসে পড়ল। আমিও বসে পড়েছি। একদম নিশ্বাস চেপে, নিঃসাড়ে শুনতে লাগলুম গাছপালা টপকে ওরা এদিকেই আসছে! ওরা বোধ হয় ভেবেই নিয়েছে গুলি খেয়ে আমরা ঘায়েল হয়েছি।

ওরা যখন আমাদের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে, আমাদের প্রায় ধরে-ধরে, তখনও আনাতিদাদাকে চুপটি করে বসে থাকতে দেখে, আমি ধরেই নিয়েছিলুম, আনাতিদাদার গায়ে গুলি লেগেছে! কিন্তু তা তো নয়! কেননা, এবার হামাগুড়ি দিয়ে আনাতিদাদা আমাকে নিয়ে আরও একটু নিরাপদ জায়গায় যাবার জন্যে খুব সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলল। বুকে ভর দিয়ে চলতে হচ্ছে

বলে, আমার গলায় ঝোলানো ব্যানডুররিয়াটা হাতে নিয়েছি। কী যে অসুবিধা হচ্ছে, তোমাদের বোঝাতে পারব না! বুকের ছাল-চামড়া ছিঁড়ছে! ওরা যেদিকটা লক্ষ করে এগোচ্ছে, আনাতিদাদা একটু পাশ কাটিয়ে ঠিক তার উলটো দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের চোখে প্রায় ধুলো দিয়ে আনাতিদাদা এমন একটা জায়গায় এসে লুকিয়ে পড়ল যে, আমার মনে হল, হয়তো বা এ-যাত্রা ওদের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেলুম। আমার মনে হলে কী হবে! ওরা তো ছাড়বার পাত্র নয়! আমাদের খুঁজে না-পেয়ে, সেই পুলিশের দল একেবারে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু করে দিল। সেই জায়গাটাকে ঘিরে ফেলে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল। ওরা যেদিকে টর্চের আলো ফেলছে, ঠিক তার উলটো দিকে অন্ধকারটা মনে হচ্ছে, আরও গাঢ়। সুতরাং এই গাঢ় অন্ধকারে আমাদের আরও বেশ খানিকটা দূরে সরে আসতে সুবিধাই হল। ওরা ওদিকে চেঁচামেচি করে তল্লাশি চালাচ্ছে, এদিকে আমরাও নিঃশব্দে জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে পড়ছি। তারপর যখন মনে হল, ওদের নাগালের বাইরেই চলে এসেছি, আনাতিদাদা তখন দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে প্রায় ছোঁ মেরে টেনে নিল তার কাছে। তারপর ওই অসংখ্য গাছগাছালি আর ভয়ংকর অন্ধকার পেরিয়ে, খানিকটা হেঁটে, অনেকটা ছুটে আর মাঝেমধ্যে ডিঙিয়ে লাফিয়ে পিটটান দিল! আমি হলপ করে বলতে পারি, অন্য সময় হলে রাত-দুপুরে বনে-জঙ্গলে ঢোকা তো দূরের কথা, আনাতিদাদা আমাকে এর আশপাশে ঘুরঘুর করতেই দিত না। আজ সেই আনাতিদাদাই আমাকে নিয়ে জঙ্গলের জালে জড়িয়ে পড়ে এক ভয়াবহ বিপদের সঙ্গে লড়াই করছে! এই বিপদসংকুল জঙ্গলে এই মুহূর্তে হঠাৎ কোনো হিংস্র জীব আমাদের যে আক্রমণ করতে পারে, সে কথা হয়তো এখন আনাতিদাদা ভাবতেই পারছে না। কিন্তু কপাল বলো আর যাই-ই বলো, আমরা এখনও বেঁচে আছি। পুলিশের গুলি অথবা জঙ্গলের জন্তু, কেউ-ই এখনও পর্যন্ত আমাদের মেরে ফেলতে পারেনি। যদিও পুলিশের হাত থেকে আপাতত আমরা বেঁচেছি, কিন্তু গভীর জঙ্গলের জন্তুর হাত থেকে আমরা নিস্তার পাব কি না, তা এখনই বলতে পারি না। আমরা চুরি করিনি, ডাকাতি করিনি, করিনি খুন-জখমের মতো কোনো অন্যায় কাজ, তবু সেই দেশের মানুষের চোখে, সরকারের চোখে আমরা শত্রু। আমাদের শেষ করতে ওদের বারুদের গুলি তাই গর্জে উঠেছে। আমরা যতই গান গাই, যতই বাজনা বেজে উঠুক আমাদের হাতে, সে সুরে তোমার মনে দোলা লাগলেও, ওরা টলবে না। সুতরাং খুনি-দসু অথবা লুঠেরার মতো জঙ্গলের এই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমাদের ছুটে পালাতেই হবে!

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আচ্ছা, আমরা কি সত্যিই বেঁচে গেছি? বলতে পারি না। তবে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমাদের এখন। কারণ, যত ভয় পেয়েছি, তার চেয়ে দৌড়-ঝাঁপ করেছি অনেক বেশি। হাত দিয়ে ডালপালায় ঠেলা মারতে মারতে, অথবা পা দিয়ে কাঁটা মাড়াতে মাড়াতে আমাদের হাত-পা দুই-ই গেছে! শুনতে পাচ্ছি আনাতিদাদার নিশ্বাসের তীব্র শব্দ। হাঁপাচ্ছে! আমিও! আমাদের মুখে কোনো কথা নেই। দুজনেই অবাক। একটু আগে জঙ্গল জুড়ে ঝিঁঝির একটানা যে-শব্দ কানের ভেতর তোলপাড় করছিল, এখন তা-ও যেন কত অস্পষ্ট! এই প্রায় শব্দহীন অন্ধকার জঙ্গলের এইখানে এসে আমার পা-দুটো যেন আর চলতে চাইছিল না। আমি বুঝতে পারছি, আনাতিদাদারও কষ্ট হচ্ছে। তবু আনাতিদাদা হাঁটছে। আমি আর পারলুম না। একটা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরলুম। সেই গুঁড়ির গায়ে নিজের মাথাটা ঠেকিয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগলুম। আমি বুঝতে পারলুম, আনাতিদাদাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ তুলে দেখি, আমার মতো আনাতিদাদাও আর একটা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে ছটফট করছে।

কষ্টটা একটু যখন থিতিয়ে এল, আমি আগুপিছু কিছু না ভেবেই বসে পড়লুম সেই গাছের নীচে। উঃ! দাঁড়াতে পারছিলুম না। গাছের নীচের এই অসমান জায়গাটা ঘিরে কত যে ঘুপচি-ঝোপে ভরতি হয়ে আছে,তা কি আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি! হয়তো এটা সাপখোপের আড্ডাখানা। সে-কথা আর তখন কে ভাবছে! এখন একটু স্থির হয়ে বসতে পারলেই বাঁচি। শরীরের কোন জায়গাটায় যে কেটেছে, কোথায় লেগেছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, সারা শরীরটাই যেন জ্বলে যাচ্ছে আমার। অসহ্য যন্ত্রণা।

আমার কাছে এগিয়ে এসেছিল আনাতিদাদা। জঙ্গলের গাঢ় অন্ধকারে কেউ কারোরই মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আনাতিদাদাও আমার পাশে বসে পড়তে মনে হল, আমারই মতো তারও কষ্ট হচ্ছে। এই নিস্তব্ধ অন্ধকারে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মাঝে-মাঝে গর্জে উঠছে। আমি চমকে যাচ্ছি। এরই ফাঁকে অনেক কষ্টে আমিই প্রথম কথা বললুম। কাঁপা গলায় ডাক দিলুম, 'আনাতিদাদা!'

'অ্যাঁ?' আনাতিদাদার গম্ভীর গলার স্বরটা এখন কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা ক্লান্ত সুরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

'রিভলভারটা?'

আনাতিদাদার হাত দুটো ভীষণ ছটফটিয়ে পকেটটা পরখ করে স্থির হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, আছে।'

আমি বললুম, 'ওদের অনেক লোক। যদি জঙ্গলটা ঘিরে ফেলে?'

আনাতিদাদা বলল, 'আমরা জঙ্গলের অনেক গভীরে চলে এসেছি। হয়তো খুঁজে পাবে না।'

'এর পর?'

'আজ রাতটা এখানেই কাটাতে হবে!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'তারপর?'

'সকালে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব।'

'কোথায় যাবে?'

'জঙ্গলের বাইরে।'

'ওরা দেখে ফেললে?'

'রিভলভারটা যখন এখনও হারায়নি, তখন আশা করতে পারি ওটা কাজে লেগে যাবে।' আনাতিদাদার গলায় স্বরটা এখন ভারি দৃঢ়। বলল, 'মরার আগে কটাকে খতম করতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে না। ভয় পাস না!'

আনাতিদাদার সেই গলার স্বর শুনে, আমার গলার স্বর, স্তব্ধ হয়ে গেল।

আবার নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধ এই জঙ্গলে এখন আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে সকালের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমরা জানি না, এখন কত রাত্রি। জানি, আনাতিদাদার হাতে একটা ঘড়ি আছে। কিন্তু এই অন্ধকারে শত চেষ্টা করলেও সেই ঘড়ির মধ্যে সময়ের আঁকগুলো খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। হঠাৎ এমনই সময়ে আনাতিদাদাই আবার কথা বলল, 'ব্যানডুররিয়াটা?'

সেটা আমি হাত থেকে নামিয়ে পাশে রেখে দিয়েছিলুম। আনাতিদাদা জিজ্ঞেস করতেই আমি তাড়াতাড়ি সেটা হাত বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বললুম, 'এই তো!'

'যাক, বেঁচে গেছে।'

'ভেবেছিলুম ভেঙে যাবে।'

আনাতিদাদা আমার কথা শুনে নিশ্বাসে বুকটা ভরে নিয়ে বলল, 'কোনোদিনই ভাঙবে না।'

'কেন?'

'তুই যে ওটাকে বড্ড ভালোবাসিস।'

আনাতিদাদার এই কথা শুনে আমি নিশ্চুপ হয়ে গেলুম। মনে পড়ে গেল আমার বাবার কথা। গলায় ঝুলিয়ে সেই ব্যানডুররিয়া বাজানোর দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। বড্ড ভালোবাসত বাবা বানডুররিয়াটা। আর ভালোবাসত বলেই বুঝি অত মিষ্টি সুর তার হাতের আঙুল ছুঁয়ে ওই তারে বেজে উঠত।

'কী ভাবছিস, ইসতাসি?' আনাতিদাদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

আনাতিদাদার গলা শুনে আনমনা আমি থতমত খেয়ে গেছি। তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম, 'কিচ্ছু না।'

'চুপ করে আছিস কেন?'

'ভাবছি, সব দোষ আমার!'

'কীসের দোষ?'

https://boierhut.com/fb

'তখন আমার হাতটা আচমকা লেগে গেল বলেই তো ব্যানডুররিয়ার তারটা বেজে উঠল, আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঝোপের মধ্যে পুলিশও আমাদের হদিস পেয়ে গেল। তা নইলে পুলিশ হয়তো আমাদের খুঁজেই পেত না!'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আনাতিদাদা সামনে চেয়ে আচম্বিতে আমার মুখটা চেপে ধরল। আমি থতমত খেয়ে গেছি। ভয়-পাওয়া চোখদুটো আমার অন্ধকারে স্থির হয়ে গেল। যদিও আনাতিদাদা হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে আছে, বুঝতে পারলুম, তার চোখ দুটো অন্যদিকে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে সামনে। আমিও তাকালুম সেইদিকে। আনাতিদাদা গলার স্বরটাকে একেবারে না শোনার মতো চেপে বলল, 'দেখতে পাচ্ছিস?'

দেখতে পাওয়ার মতো তেমন কিছু তখনও দেখতে না পেয়ে আমিও আরও চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী?'

'দুটো চোখ!'

আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। স্বাভাবিক কারণেই সেই চোখদুটো দেখার জন্যে আমার চোখদুটোও ছটফটিয়ে ঝলসে উঠল। কিন্তু অন্ধকার ঘুটঘুটে বনে কোথায় যে সেই চোখ, আমি আঁতিপাতি করেও তা দেখতে পেলুম না। তাই আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'কই?'

জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, আনাতিদাদার চোখদুটো এতক্ষণ যে-দিকে স্থির হয়েছিল, সেদিকের ঝোপটা মড়মড় করে কেঁপে উঠেছে। মনে হল, দুরন্ত গতিতে কে যেন অন্য কোথাও লুকিয়ে পড়ল। আমি আঁতকে আনাতিদাদাকে জড়িয়ে ধরলুম। আনাতিদাদা চোখের পলকে রিভলভারটা পকেট থেকে বার করে ফেলল। আমরা দুজনেই ধড়ফড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। বুঝতেই পারছ, আমরা দুজনেই তখন বোবা হয়ে গেছি। উত্তেজনায় দুজনেই হাঁপাচ্ছি। আমাদের নিশ্বাসের শব্দগুলোকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। পারছি না। আমি ভেবেই নিয়েছিলুম, এ বোধ হয় পুলিশ! কারণ সেই মুহূর্তে পুলিশ ছাড়া আমার মাথায় আর কী ঠাঁই পাবে! সুতরাং আমি তখনই মনে মনে তৈরি হয়ে গেছি, এক্ষুনি মরব আমরা। এই বোধ হয় পুলিশের গুলি এসে লাগল আমাদের বুকে।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই অবস্থায় সেইখানে অনেকক্ষণ জবুথবুর মতো দাঁড়িয়ে থেকেও পুলিশের গুলির আওয়াজ অথবা অন্য কোনো শব্দ আমরা শুনতে পেলুম না। এমনকী আর কিছু নজরেও পড়ল না। তখনই আবার ভয়-জড়ানো গলায় আনাতিদাদাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'পুলিশ?'

আনাতিদাদা হাতের রিভলভারটা তেমনি হাতে উঁচিয়ে বলল, 'বোধ হয় না।'

আমি বললুম, 'তবে?'

'বুঝতে পারছি না।'

পুলিশ নয়, এই কথাটা শুনে আমার আরও গোলমাল হয়ে গেল সব কিছু। পুলিশ না হলে আর কী হতে পারে? এমন ঘন জঙ্গলে, এই গভীর রাতে আর কে আমাদের লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখবে? আমি ভেবে কূল পাচ্ছি না। এমন সময় আনাতিদাদা হঠাৎ আমার হাতটা আবার ধরল। একটু দূরে সরিয়ে আনল। অবশ্য আনাতিদাদা তার চোখের দৃষ্টিটা সেই ঝোপের দিকেই স্থির রেখে দিল। তারপর তড়িৎগতিতে আর একটা মস্ত গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সেখান থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পরে যখন মনে হল, তেমন কিছু নয়, তখন আমার নিশ্বাসের শব্দটাও প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু তবু আনাতিদাদাকে নিশ্চিন্ত হতে দেখলুম না। তার হাবেভাবে মনে হল না, এই গাছটার আড়াল থেকে আনাতিদাদা এখনই বেরিয়ে পড়বে। সুতরাং মনে মনে ভেবে নিলুম, তাহলে বোধ হয় বিপদ এখনও কাটেনি। কাজেই আনাতিদাদার গা ঘেঁষে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম।

এমন সময় হঠাৎই আমার মনে হল, আমার পিঠের ওপর যেন একটা গরম বাতাস ধাক্কা মারছে! আমি বুঝতে পারলুম, এ কারো নিশ্বাসের ধাক্কা! নিশ্চয়ই আমার পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে! ঝট করে পিছন ফিরে তাকাতেই আমি ভয়ে নিথর পাথর! আমার পেছনে তখন কোনো পুলিশ না, কোনো মানুষ না। একটা অচেনা জন্তু! জন্তুটা তার মাথাটাকে আমার পিঠে টিপ করে দাঁড়িয়ে আছে! মনে হল, এই বুঝি ঢুঁ মেরে আমার পিলে ফাটিয়ে দেয়! বুঝতেই পারছ, আমি নেহাতই ছোটো। সুতরাং আমার পক্ষে সেই ভয়ংকর চেহারার জন্তুটাকে দেখে, সেই সময় চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা কি সম্ভব? আমি চিৎকার করে উঠলুম, 'আনাতিদাদা—'

আচমকা আমার এমন চিৎকার শুনে আনাতিদাদাও বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে! সেই জন্তুটার দিকে নজর পড়তেই আঁতকে চিৎকার করে উঠল, 'ইসতাসি, বাইসন!' বলেই আমার হাতটা ধরে মারল লাফ! তারপর দৌড়!

আমি বুঝতে পারলুম,! এ-দৌড় আমাদের বাঁচার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা! কেননা, এখানে সহজে দৌড় দেওয়া যায় না, সে-কথা তোমাদের আগেই বলেছি। আর দৌড়তে পারলেও, জঙ্গলের জন্তুর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমাদের কম্ম নয়। সুতরাং আনাতিদাদা আমার হাত ধরে এর ফাঁকে ওর ফাঁকে ঘুরপাক খাচ্ছে বটে, কিন্তু জন্তুটাও তাড়া লাগিয়ে আমাদের প্রায় কাবু করে ফেলেছে! আমরা দুজনেই এমন ভয় পেয়ে গেছলুম যে সেই সময়ে রিভলভারটা ছুড়লে যে বাঁচি সেকথা কারোরই মনে পড়ল না! একবার যদি মনে পড়ত, তবে প্রাণ বাঁচাতে এত ছোটাছুটির দরকারই হত না! তাছাড়া জন্তুটার জঙ্গলের ঘোঁতঘাঁত সবই জানা! আমরা তার সঙ্গে পারব কেন! চরকি খেতে-খেতে আমাদের যতই দম ছুটে যায়, বাইসনটার ততই যেন তেজ বাড়ে! শেষমেশ আমারই পিঠের ওপর সেই বিকট চেহারার বাইসনটাটেনে মারল এক গোঁত্তা! আমি আর কিছু জানি না। শুধু এইটুকু মনে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আছে, বাইসনের মাথার সেই প্রচণ্ড গোত্তা যখন আমার পিঠে এসে পড়ল মনে হল, যেন খুব উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর থেকে একটা পাথরের চাঁই আমার ঘাড়ে পড়েছে! আমি গুঁড়িয়ে গেছি! আমার টুকরো-টুকরো হাড়গোড়গুলো সাত হাত দূরে-দূরে ছিটকে ছড়িয়ে গেছে! তারপরেই আমার চোখে সব অন্ধকার!

৫

ধীরে-ধীরে আমার চোখের অন্ধকার যখন কেটে গেল, তখন রাতের অন্ধকারও চলে গেছে। আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু কেমন যেন একটা আচ্ছন্নভাব। আমি কিছুই ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলুম না। সবই কেমন সেন অস্পষ্ট! সুতরাং আমি বুঝতে পারলুম না, এখন আমি কোথায় শুয়ে আছি!

একটু পরেই আমার চোখের ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতে গেছি। পারিনি। উঠতে গিয়ে পিঠের ওপর এমন একটা প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলুম যে, ওঠা তো দূরের কথা, মনে হল আমার পিঠের শিরদাঁড়াটা বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে! অন্য সময় হলে নিশ্চয়ই ওই ব্যথার চোটে ককিয়ে উঠতুম। কিন্তু এখন এই অসহ্য যন্ত্রণাতেও আমার মুখ ফুটে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত বেরুল না। আসলে এই মুহূর্তে আমার মুখ দিয়ে কথা না ফোটারই কথা! কারণ আমার জ্ঞান ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টি শব্দ যেন আমার কানে ভেসে এল। মনে হল, বুঝি বা আমার ব্যানডুররিয়ার তারে-তারে কার যেন আলতো হাতের ছোঁয়া লাগছে! তারগুলো টুংটাং করেবেজে উঠছে। তুমি হয়তো ভাবতে পারো, আমি এখনও সেই জঙ্গলেই পড়ে আছি, আর আনাতিদাদা আমার পাশে বসে বসে ব্যানডুররিয়ার তারে টান দিচ্ছে! এ তো আনাতিদাদা হতেই পারে না! আনাতিদাদার হাতে অমন সুরে ব্যানডুররিয়া কখনোই বাজতে পারে না। সুতরাং চোখদুটোকে আরও একটু ভালো করে মেলে ধরলুম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, এ জঙ্গলের ঝোপঝাড় নয়, আমি একটা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। সেই ঘরে আমার সামনে একটা ছোট্ট মেয়ে বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে, সে আমার চেয়েও ছোট্ট। তারই হাতে আমার ব্যানডুররিয়া। আমি চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে দেখতেই, তার বাজনা থামল। সে হাসল। ঠোঁটের হাসির সঙ্গে তার অবাক চোখের চাউনিটি আমার চোখ এড়াল না। সে বাজনা রেখে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমি তাকে এখন আরও কাছ থেকে দেখলুম। অবাক হয়ে গেছি। কারণ তার পরনের এ-রকম সাজ এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি। সে পরেছিল, কোমর থেকে হাঁটু অবধি লম্বা একটা ফুল-আঁকা গোল ঘাঘরা। দু-হাতের নীচ দিয়ে টান-টান করে এমন একফালি রঙিন কাপড় গায়ের ওপর

https://boierhut.com/fb

জড়িয়ে রেখেছে যে, দেখলেই তোমার মনে হবে পাখির ডানা। তার সেই গোল ঘাঘরাটার কোমর ঘিরে পাখির পালক সাজানো, মাথায় তার নানান রঙের বুনো ফুল। গায়ের রংটা তার তামাটে বলে, হাসতে হাসতে তার দাঁতগুলি যখনই হঠাৎ-হঠাৎ ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, একঝলক জলের ফেনা ঝকঝক করে উঠছে! সে আমার গায়ে হাত রাখল। তারপর সেই হাতটি আমার কপাল ছুঁয়ে মাথায় উঠে এল। আমি তাকে দেখে অথবা তার আদর-মাখা হাতের স্পর্শ পেয়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। সুতরাং এবার আমি আগের মতো ধড়ফড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে, খুব সাবধানে হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথা তোলবার চেষ্টা করলুম। মেয়েটি আমায় উঠতে দেখে এমন ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল যে, সেই চিৎকারে হয়তো-বা মেয়েটির মা-ই হবে, বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল আমার কাছে। আমায় উঠতে দিল না। আবার শুইয়ে দিল। তারপর মুখে কী-সব অদ্ভুত শব্দ করে কী যে বলল, তার ঠিক-ঠিক মানে আমি খুঁজে পেলুম না। তবে হাবেভাবে বুঝতে পারলুম, আমায় উঠতে বারণ করছে। সুতরাং আমি হতভম্বের মতো আবার শুয়ে পড়লুম, আর অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, কে এরা? এই ছোট্ট মেয়েটি আমায় শুতে দেখে আবার খুব নিশ্চিন্তে হেসে ফেলল। আর এই ছোট্ট মেয়েটির মা চোখের পলকে কোথায় যে চলে গেল। অবশ্য বেশিক্ষণ না। নিমেষে একটা পাত্র করে কিছু নিয়ে এল। আমায় অত্যন্ত সাবধানে নিজের কোলের কাছে টেনে নিল। সেই পাত্রটা আমার মুখের কাছে ধরে আদর করে কিছু বলল। আমি বুঝতে পারলুম, পাত্রের মধ্যে যা আছে, সেটা আমায় খেতে বলছে। আমি তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। আমি এদের কাউকে চিনি না। কেমন করে এখানে এলুম জানি না। সুতরাং ওই পাত্রে মুখ ঠেকিয়ে ওই খাবারটা খেতেও আমার মন সরল না। আমি মুখ সরিয়ে নিলুম। কিন্তু আশ্চর্য! আমি অবাধ্য হলে আমার মা যেমন একটুখানি গলার স্বর তুলে ছোট্ট করে বকে দিত, ওই মেয়েটির মা-ও আমাকে ঠিক তেমনি করে বকল! তারপর সে হয়তো বলল, না খেলে কষ্ট হবে। আমার মুখখানা তার কোলের কাছে আর একটু টেনে নিয়ে আমার মুখে সেই পাত্রের খাবার ধীরে-ধীরে ঢেলে দিল। আমি খেয়ে ফেললুম। কিন্তু কী খেলুম, বুঝতে পারলুম না। কেননা, এটা যে দুধ নয়, তা বুঝতে আমার দেরি হল না। আমি সেটা খেয়ে নিতেই সে আমার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে এমন স্বস্তির সঙ্গে নিশ্বাস ফেলল যে, তাই দেখে তার মেয়ের মুখখানিও খুশিতে উছলে উঠল। খুশি হয়ে তার মা আমার কপালে চুমু খেল। তাকে চুমু খেতে দেখে, মেয়েটিও আমার কপালে তার হাতটি রেখে, হাতের আঙুলগুলি আমার মাথায় নামিয়ে আনল। তারপর চুলের মধ্যে বিলি কাটতে-কাটতে কত কথা যে বলতে লাগল তার একটা অক্ষরও বোঝে কার সাধ্য! আসলে এখন আমি বুঝতে পারছি, আমি যেখানে এসেছি তাদের ভাষা আমার ভাষা নয়। সুতরাং তাদের কথার মানে বোঝার কথাই উঠতে পারে না।

এখন আমি শুয়ে-শুয়ে বেশ দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা ঘর। ওপরে গাছের পাতা বিছিয়ে ছাত হয়েছে। চারপাশে গাছের ডাল গেঁথে দেওয়াল হয়েছে। আমি শুয়ে আছি ঘরের ভেতর একটা গাছের ছালের বিছানায়। এতদিন তাঁবুতে শুয়ে-শুয়ে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, এই গাছের পাতা-ছাওয়া ঘরে শুতে আমার অস্বস্তি লাগারই কথা। কিন্তু আপাতত আমার তেমন কিছু হচ্ছে না। ঘরের মধ্যে দু-দিকে দুটো বড়ো জানলা। সেখান দিয়ে সকালের সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে যতটা ছড়িয়ে পড়ছে, তার চেয়েও বেশি ছড়িয়ে পড়ছে সূর্যের আলোর সঙ্গে গাছের ছায়া। হ্যাঁ, ওই জানলার দিকে চোখ রেখে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, তা খালি গাছ আর গাছ। সুতরাং আমি বুঝতে পারলুম, এ বোধ হয় সেই জঙ্গলের মধ্যেই কোনো-এক জঙ্গলের মানুষের ঘর। আমি শুনেছি, এখনও এমন অনেক মানুষ আছে, যারা গভীর জঙ্গলে বাস করে। শহরের আলো-বাতাসের খবর তাদের জানা নেই। অন্তত এদের দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। ছোট্ট মেয়েটির পোশাক, তার সাজগোজ, তার মায়ের পোশাক, নাকে একটা এত বড়ো পাথরের নাকচাবি, হাতে পোড়া-মাটির চুড়ি, পায়ে পাতাবাহারের মল, এমনকী মাথায় চুলের বেণী দেখলেও এ-কথাটা তোমাদেরও বিশ্বাস হবে। এদের দেখে, তাই, এখনই আমার যেটা মনে হল তা হচ্ছে, বাইসনের আক্রমণে আহত অবস্থায় জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখে এরা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। শুনেছি, গভীর জঙ্গলের মানুষ ভীষণ হিংস্র হয়। অনেক জঙ্গলের মানুষের পরনে কাপড়জামা কিছু থাকে না। তির-ধনুক বানিয়ে বনের জন্তু শিকার করে তারা খায়। এমনও শুনেছি, অনেক বন্য-মানুষ তো মানুষের মাংস পেলে আর কিছু চায় না। এই কথাটা মনে হতেই আমার বুক দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল। আর ঠিক তক্ষুনি এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে আমি আঁতকে উঠেছি! তাই তো, আনাতিদাদাকে দেখছি না তো! ঘর আর কতটুকু। ঘরের মধ্যে আনাতিদাদা থাকলে এতক্ষণে আমার চোখ ঠিক দেখতে পেত। আনাতিদাদাকে দেখতে না-পেয়েই আমি আবার ধড়ফড়িয়ে উঠতে গেছি। ঠিক সেই সময়ে সেই ছোট্ট মেয়েটি গলায় সুর টেনে-টেনে মুখ দিয়ে এমন সব অদ্ভুত শব্দ বার করে চেঁচিয়ে উঠল যে, তাই শুনে আমি একেবারে হতবাক! সেই শব্দের মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতে না পারলেও, সে যে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে গান গাইছে, সেটা ধরে নিতে আমার বেশি সময় লাগল না। গানের তালে তার ঢুলু-ঢুলু চোখ দেখে, মাঝে-মাঝে মুচকি-মুচকি হাসি আর থেকে-থেকে গানের ফাঁকে আঃ! আঃ! করে ধমকে উঠার শব্দ শুনে, আমি আরও কেমন ভয় পেয়ে গেলুম। আমার মনে হল, একটা জলজ্যান্ত মানুষ হাতে পেয়ে ছোট্ট মেয়েটা পর্যন্ত খুশি! আমাকে মেরে ভোজ বসাবে বলেই হয়তো আনন্দে গাওনা শুরু করে দিয়েছে। এই কথাটা মনে হতেই আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। আমার মাথা থেকে ছোট্ট মেয়েটার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলুম। পিঠে যদিও ব্যথা প্রচণ্ড, তবু প্রাণের চেয়ে এ-ব্যথা নেহাতই তুচ্ছ! আমার হাতের ঝটকা খেয়ে মেয়েটির গলার গান থেমে যেতেই আমি চিৎকার করে হেঁকে উঠলুম, 'আনাতিদাদা—'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মেয়েটা হাঁদার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি আবার ডাক দিলুম, 'আনাতিদাদা—'

সাড়া পেলুম না। সুতরাং দাঁড়াবার জন্যে অতি কষ্টে পায়ে ভর দিলুম। টাল খাচ্ছি। খেতে-খেতে প্রায় যখন পড়ি-পড়ি মেয়েটা আমায় দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তারপর এমন চোখ-মুখ করে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল যে, আমি বুঝতে পারলুম, সে আমাকে উঠতে বারণ করছে। কিন্তু এখন তার এ-সব কাকুতি-মিনতি আমার কানে ঢুকবে না। কেননা, এখন আমার মনের ভেতরটা গুমরে-গুমরে কেঁদে উঠছে, 'আনাতিদাদা তুমি কই?'

আমি যেন চোখে সব-কিছু শূন্য দেখছি। তবে কি আনাতিদাদা আমাকে এই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে পালাল? আনাতিদাদা কি ভাবল, বাইসনের আক্রমণে আমি মরে গেছি? না কি, বাইসনটা আনাতিদাদাকেই মেরে ফেলেছে? যতই ভাবছি, আমার বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠছে। আমার এ কী বিপদ হচ্ছে একের পর এক। আমি এখন কী করব, কোথা যাব? কে বাঁচাবে আমাকে এই জঙ্গলের মানুষের হাত থেকে?

আমি দাঁড়াতে পারলুম না। নিঃশব্দে আবার বসে পড়লুম। আমি বসে পড়তেই মেয়েটাও ক-পা পিছিয়ে গেল। তারপরই আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থ হয়ে গেছি! যে-মেয়েকে এতক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল, জঙ্গলের এক ভয়ংকর হিংস্র মানুষের মেয়ে, হঠাৎ দেখি, তার চোখ দুটি জলে টলমল করছে! সে কাঁদছে! আমার অবাক হবারই কথা। কেননা, এই তো একটু আগেই সে আমার দিকে চেয়ে হাসছিল! আমার মাথায় হাত রেখে গাইছিল! হঠাৎ সে কাঁদে কেন? আমার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল! এ তো আচ্ছা ধাঁধা! মেয়েটাকে যে কিছু জিজ্ঞেস করব, তারও তো উপায় নেই! আমার কথা বুঝতেই পারবে না। তবে কী করব এখন? আমার আর কী করার আছে? যা করার মেয়ের মা-ই করবে। মা তো আছে!

না, মা ছিল না তখন। আমাকে খাইয়ে সে যে কোথায় গেছে, আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। কাছেপিঠে থাকলে কি আর ছুটে আসত না? কারণ, আমি তখন ভীষণ চিৎকার করেই আনাতিদাদাকে ডাক দিয়েছি। তবে কি ঘাতককে ডাকতে গেছে! একটু পরেই বুঝি সে আসবে। এসে আমায় মেরে ফেলবে।

হ্যাঁ, এল। একজন নয়, একদল। জানি না এরা ঘাতক কি না! তাদের সঙ্গে এল মেয়েটার মা আর বাবাও। আমার একেবারে মুখের সামনে এসে যে দাঁড়াল, সে-ই বোধ হয় আমাকে হত্যা করবে। বোধ হয় দলের পাণ্ডা। কেননা, তার সাজগোজ রংচং দেখলে এটাই তোমার মনে হবে। লোকটা একটা ছোট্টমতো গাছের ছালের চাটাই কোমরে জড়িয়েছে। গায়ে তার নানান রকম উল্কি আঁকা। মুখে ছাই-ছাই মাটি মেখেছে। চোখ আর নাকের পাশে মোটা কালো-কালো দাগ! মাথায় লম্বা-লম্বা পাখির পালক গাঁথা টুপি। টুপিটা এত বড়ো যে, একেবারে ঘাড় অবধি নেমে এসেছে।

https://boierhut.com/fb

হাতে গলায় নানান রকমের গয়না। কোনোটা কাঠ কেটে-কেটে সুন্দর করে বানানো। আবার কোনোটা পাথর ঘষে-ঘষে তৈরি। লোকটার হাতে একটা কাঠের নল। অনেকটা বড়ো তালপাতার বাঁশির মতো দেখতে। মানুষ মারার-অস্ত্রের বদলে, কেন যে লোকটা অমন একটা নল হাতে করে নিয়ে এসেছে, আমি বুঝতে পারলুম না। এরই একফাঁকে আমার হঠাৎ নজর পড়ল সেই মেয়েটার দিকে। এ কী কাণ্ড। যে-মেয়ে এতক্ষণ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল, চেয়ে দেখো, তার মুখে হাসি। এমনকী, ওই যে লোকগুলো সঙ্গে এসেছে তারাও খুশিতে চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে এমন কথাবার্তা চালাচ্ছে যে, তা শুনে কানে তালা লেগে যাবার গোত্তর! কিন্তু অত চেঁচামেচি সত্ত্বেও আমার কানে যেন শব্দ ঢুকছে না। যত শব্দ যাচ্ছে তার চেয়েও বেশি ভয়ে থিরথির করছে আমার চোখ দুটো। কারণ, পাণ্ডামতো লোকটার ষণ্ডামার্কা চেহারাটা ও সেইসঙ্গে তার কিম্ভূত সাজের বহর দেখলে, তোমার মনে হবেই, লোকটা একটা আস্ত খুনি।

এইবার লোকটা এগিয়ে এল। আমার ভয়-পাওয়া চোখ দুটোর দিকে ভয়ংকর দৃষ্টি হেনে আর প্রচণ্ড চিৎকার করে আমায় কিছু জিজ্ঞেস করল। আমি যেমন বোবা, তেমনিই বোবা! লোকটা আমার কোনো উত্তর না-পেয়ে, একইভাবে, একই সুরে আবার চেঁচিয়ে উঠল। বোকার মতো তার মুখের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া, এখন আমি আর কী করতে পারি! মনে হয়, আমার এই বোকা-বোকা চাউনি দেখেই সব কটা লোক একসঙ্গে বিচ্ছিরি ঠাট্টার সুরে হেসে উঠল। যেন আমি নেহাতই কুকুর-ভেড়া। সুতরাং ভেতরে-ভেতরে ভীষণ জ্বলে গেলুম। এখন সত্যি বলছি, মরতে আমার ভয় নেই। আমি প্রস্তুত। আমি মরে গেলে কেউ কাঁদবেও না, কেউ মনেও রাখবে না। কিন্তু তাই বলে, মরার আগে আমাকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাশা করবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। আশ্চর্য, সেই ছোট্ট মেয়েটা কিন্তু হাসল না! সে সবার মুখের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি হেনে আমার মুখের দিকে এমনভাবে চাইল, বুঝতে কষ্ট হল না, সে-ও এ-হাসি সহ্য করে না। ওর মাকেও হাসতে দেখলুম। কিন্তু লক্ষ করলুম, সে-হাসিতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত দরদ-মাখানো।

কিন্তু সে যাই হোক, হঠাৎ ওই হাসির মধ্যেই পাণ্ডামতো লোকটা আবার বাজখাঁই গলায় হেঁকড়ে উঠল। অমনি চোখের পলকে লোকগুলো আমাকে সাঁড়াশির মতো জাপটে ধরল। আমি সঙ্গে-সঙ্গে তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ লাগিয়ে দিলুম। কিন্তু পারব কেন? ওই বন্য লোকগুলোর শক্তির কাছে আমার ক্ষমতা তো নেহাতই একটা টুনটুনি পাখির মতো। সুতরাং আমি যতই ধস্তাধস্তি করি ওদের সঙ্গে পারি না। ওরা অনায়াসে আমার হাত-পাগুলো চেপে ধরে আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল। প্রায় ঝুলিয়ে দুলিয়ে সেই ঘরটার ভেতর থেকে বাইরে টেনে আনল। আমার আর অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, আমাক খতম করবে বলেই বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব এখন আমি 'বাবা গো', 'মা গো' বলে গলা ফাটিয়ে মরাকান্না কাঁদলেও এরা আমায়

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

নিষ্কৃতি দেবে না। এখন এদের হাত থেকে ছাড়ান পাবার জন্যে আমার ধস্তাধস্তি করে আর কী লাভ! মরতে যখন হবে, চুপচাপ মরাই ভালো।

একটা অদ্ভুত ভাবনা, ঠিক এই সময়ে আমার মাথায় যে কোত্থেকে এল কে জানে! মনে হল, আচ্ছা, একটুপরে মরলে আমার কী হবে? কোথায় যাবে আমার প্রাণটা? আমি কি তখন সব দেখতে পাব? দেখতে পাব এই আলো, এই আকাশ, এই বন, এই সবুজ গাছ, পাখি—সব-কিছু? শুনতে পাব বন্দুকের আওয়াজ? বোমা? পিস্তল? বা হিংস্র মানুষের চিৎকার? আমি মরে গেলে তখন কি কেউ আমাকে বলবে, যাযাবর মানেই শয়তান, শঠ, চোর অথবা ঠগবাজ? নাকি তখন মানুষ ভাববে, যাক একটা শত্রু নিপাত হল। শত্রু মরলে মানুষ কি হাঁপ ছেড়ে বাঁচ? না কি তারা আরও শত্রু খুঁজে বেড়ায়? কে জানে!

হ্যাঁ, আমাকে বাইরে নিয়ে এসে একটা গাছতলার সামনে শুইয়ে দিল। কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালা হয়েছে। গনগনে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। ছোট্ট মেয়েটার মা প্রায় ছুটে এসেই আমার মাথার গোড়ায় বসল। বসে আমার মাথাটা তার কোলের ওপর তুলে নিল। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইতে না-চাইতে দেখি, সেই ছোট্ট মেয়েটাও এসে গেছে! সে-ও ঠিক আমারই পাশে হাঁটু-গেড়ে বসল। সে আমাকে যতটা না-দেখছে, তারচেয়ে বেশি দেখছে সেই পাণ্ডামতো লোকটাকে। পাণ্ডা-লোকটা এরই ফাঁকে আমার কাছে এগিয়ে এসেছে। দেখি, যে-লোকগুলো আমাকে চ্যাংদোলা করে এখানে নিয়ে এসেছে, তারা একটু তফাতে পিছিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে সার বেঁধে। আরও দেখি কী, দুটো লোক দু-দুটো মস্ত ঢাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই ঢাকগুলোকে ওরা বলে থুম্বা। আমার গলায় যখন খাঁড়ার কোপ বসাবে, তখন হয়তো বিকট শব্দ করে থুম্বা দুটো বেজে উঠবে ওদের হাতের তালে। তারপর এই বনের মানুষগুলো আমার রক্ত নিয়ে আনন্দে মাখামাখি করবে। কিন্তু আমায় যে কোন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হবে, তা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি দেখতে পাইনি। এখন, এই মুহূর্তে সেইটা দেখার জন্যেই আমার চোখদুটো ছটফটিয়ে উঠল। সেটা কি খাঁড়া, না আর কিছু? কিন্তু ধারালো অস্ত্র তো ধারে-কাছে নজরে পড়ছে না! তবে কি আমায় ওই আগুনে ঝলসিয়ে মারা হবে? মেরে আমার দেহের ঝলসানো মাংস দিয়ে তারা ভোজ বসাবে?

এমনি নানান চিন্তা যখন আমায় পেয়ে বসেছে, তখনই হঠাৎ পাণ্ডা-লোকটা একটা বিকট চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে কান-ফাটানো আওয়াজ তুলে সেই থুম্বা দুটো গুড়গুড় করে বেজে উঠেছে। বাজনার তালে-তালে সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো হাত-পা ছুড়ে বীভৎস ভঙ্গি করে নাচতে শুরু করে দিল! আমি ভাবলুম, বন্য-মানুষেরা বুঝি শিকার ধরে ভোজ বসাবার আগে এমনি করেই আনন্দ-উৎসব করে। তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, সেই সময়ে আমার মনের অবস্থা কী হয়েছে!

https://boierhut.com/fb

দেখলুম, সেই পাণ্ডা-লোকটা তার হাতের সেই ফুটো-ফোঁপরা নলটা নিয়ে এগিয়ে গেল গনগনে আগুনটার কাছে। তারপর আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ফুটো নলটা মুখে তুলে নিল। তুলে নিয়ে ফুঁ দিতেই সেটা একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে বেজে উঠল। সেটা বাজাতে-বাজাতেই পাণ্ডাটা আগুনের চারপাশে চরকি খেতে লাগল। থুম্বা বাজছে, লোক নাচছে, আর পাণ্ডাটা নল ফুঁকে চরকি খাচ্ছে, সে যেন এক ভয়ংকর দৃশ্য! অন্তত এখন আমার চোখে।

হঠাৎ পাণ্ডাটা করল কী, তার সেই মুখের নলটা মুখ থেকে সরিয়ে এনে চট করে আগুনের মধ্যে চেপে ধরল। নলের মুখটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। সেই জ্বলন্ত আগুন নিয়ে পাণ্ডাটা আমার কাছে এগিয়ে এল। একেবারে আমার মুখের সামনে। এবার আমার শেষ! মুখের সামনে আগুন ধরে পাণ্ডাটা হাঁকতে শুরু করে দিল। আমি বুঝতে পেরেছি, মন্ত্র পড়ছে। আমি জানি মন্ত্র পড়া শেষ হলেই ওই আগুন আমার গায়ে ধরিয়ে দেবে। আমি পুড়ে মরব। পুড়ে মরার যে কী জ্বালা আমার জানা নেই। আর জানি না বলেই বোধ হয় সেই সময় আমার মনের ভেতরে একটা অদ্ভুত সাহস ভর করল। মনে হল, এক্ষুনি যখন সব শেষই হয়ে যাবে, তখন আর মিছিমিছি ভয় পেয়ে কী লাভ! ইচ্ছে করলে আমি তো আর পালাতে পারব না। সুতরাং লক্ষ্মী-ছেলের মতো মরণের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আমি আর কী করতে পারি। কিন্তু মৃত্যুর জন্য এখন আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমায়? এরা এখনও কেন আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে না আমার দেহে?

আশ্চর্য ব্যাপার! হঠাৎ লোকটা আমার মুখের সামনে থেকে আগুনটা সরিয়ে নিয়ে শূন্যে বাঁই-বাঁই করে ঘোরাতে লাগল। ঘোরাতে লাগল আমার চারপাশে। ঘোরাতে-ঘোরাতে থুম্বার তালে-তালে ওই লোকগুলোর সঙ্গে নিজেও নাচতে লাগল। তারপর শুরু হয়ে গেল গান। তোমায় কী বলব, যেই গান শুরু হয়েছে, দেখি, ছোট্ট মেয়েটা আর তার সঙ্গে তার মা-ও উঠে পড়েছে। তারাও গাইতে শুরু করে দিল। এমনকী, দু-চারবার নেচে-নেচে পা-ও তাদের ছটফটিয়ে উঠল। আমি থ। সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। আগুন জ্বলছে গনগন করে। কাঠকুটোর পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগছে। হাওয়ায় দোলা খেয়ে ধোঁয়া লাগছে চোখে। সেই আগুন আর ধোঁয়াকে থোড়াই কেয়ার করে নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে সবাই যেন উন্মাদ। আর আমি বোকার মতো চুপটি করে পড়ে-পড়ে দেখছি, আমার মৃত্যুর আগে তাণ্ডব-নৃত্য!

কিন্তু নাচ আর গান যেন শেষ হয় না। বলতে কী, সেইসময় আমার সেইভাবে শুয়ে থাকতে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এখন বোধ হয় এভাবে শুয়ে থাকার আর কোনো মানে হয় না। আমি উঠেই বসলুম। বসে-বসে ফ্যালফ্যাল করে ওদের নাচ দেখতে লাগলুম। কী জানি কেন, আমার পিঠের ব্যথাটা আর তেমন করে চাগাড় দিল না! মরণ যখন সামনে হাতছানি দিচ্ছে, তখন কি আর ওই ব্যথা-ট্যথার কথা মনে থাকে! আশ্চর্য, আমি উঠে বসলুম, অথচ এবার কেউ আমায় সামাল দিতে এল না! উলটে তারা যেন দ্বিগুণ জোরে গেয়ে উঠল! বন্য-নাচে মেতে উঠল।

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি আরও কিছুক্ষণ অমনি হাঁদার মতোই বসে রইলুম। কিন্তু এমনি করেই বা মানুষ কতক্ষণ বসে তাকতে পারে! যা থাকে বরাতে, আমি উঠে দাঁড়ালুম। এবারও আমার কষ্ট হল না। কিন্তু অন্য আর একটা কাণ্ড হল। সেই ছোট্ট মেয়েটা আমার কাছে ছুটে এল। আমার হাত ধরল। আমায় টানতে-টানতে ওই নাচের দলে নিয়ে চলল। তারপরে আমাকেও নাচার জন্যে ইশারা করল। আমি হতবাক! এই একটু আগে আমি নড়তে পারছিলুম না। পড়েছিলুম মাটিতে। এখন উঠে দাঁড়াতে পেরেছি। এখন ইচ্ছে করলে আমি হয়তো নাচতেও পারি! এ কেমন করে সম্ভব হল! এরা কি তবে এতক্ষণ ধরে আমার ব্যথা সারাবার জন্যে এতসব কাণ্ডকারখানা করেছে! তবে কি ওই পাণ্ডামতো লোকটা ডাকিনীবিদ্যে জানে! হ্যাঁ, আমি শুনেছি এই ডাকিনীবিদ্যের জোরেই মরা-মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারে এই বনের মানুষেরা! আর সেই বিদ্যের জোরেই বুঝি বাইসনের গুতিয়ে দেওয়া আমার পিঠের ব্যথা এই লোকটা ভালো করে দিল! তবে কি এরা আমায় মারবে না! এরা আমার বন্ধু!

আমার বুকের ভেতরটা দুরন্ত আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আমার পা দুটোও ওদের পায়ের তালে নেচে উঠল। ওই বন্য-মানুষগুলোর সঙ্গে এই মুহূর্তে আমিও বন্য হয়ে গেছি! তাই, আমি ওদের গানের ভাষা না-বুঝলেও, ওদের সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার করে উঠলুম। আর মনে-মনে ভাবতে লাগলুম, শহর যখন হিংস্র মানুষের গুলির শব্দে তটস্থ, তখন বনের এই মানুষগুলো নাচ আর গানের বন্যায় সেই শহরেরই একটা ছোট্ট ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে! আশ্রয় দিয়েছে! আশ্চর্য মানুষ এরা!

৬

হ্যাঁ, আমায় আশ্রয় দিল এরা। অন্তত বলতে পারি, এরা যদি আমায় বনের ভেতর থেকে উদ্ধার করে না আনত, তবে ওইখানেই বাইসনের গুঁতো খেয়ে আমি পড়ে-পড়ে মরতুম। আর না-হয়তো, বনের অন্য কোনো হিংস্র জন্তু আমার রক্ত-মাংসে পেট ভরাত!

এত বিপদে পড়েও আমার ব্যানডুররিয়াটা যে বেহাল হয়ে পড়েনি, এ-কথা শুনলে তোমরাও বোধ হয় আমার মতো অবাক হবে! সত্যিই! ব্যানডুররিয়াটা আমার অটুট আছে! বাইসনের গুঁতো খেয়েও যে কেমন করে সেটা রক্ষা পেয়েছে, এ-কথা ভাবলেই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই! আমার বড্ড প্রিয় ওই ব্যানডুররিয়াটা। আমি জানি, এখন ওই ব্যানডুররিয়াটা ছাড়া আমার সবই গেছে। তাই, ব্যানডুররিয়াটা যদি হারিয়ে যেত, কিংবা ভেঙে খানখান হয়ে এই জঙ্গলের জঞ্জাল হয়ে পড়ে থাকত, তবে আমার দুঃখের কি শেষ থাকত! হ্যাঁ, আর একজনও নিশ্চয়ই দুঃখ পেত, সে আনাতিদাদা।

https://boierhut.com/fb

মানুষটা যেন ম্যাজিকের মতো কোথায় উবে গেল। আমার মা আর বাবার কথা, সে তো আমার অজানা নয়। আমারই চোখের সামনে আমার মাকে হত্যা করেছে ওই পুলিশের গুলি। সে-দৃশ্য আমার চোখের ওপর ভেসে উঠলে আমার বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তবু নিজেকে সামলে নিতে হয়। কেননা, প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা তো আমার এখনও হয়নি। সময় যখন আসবে আগুন হয়ে ঝলসে উঠে সেই হিংসার সামনে রুখে দাঁড়াব। ওই হত্যাকারীদের আমি জিজ্ঞেস করব, বিনা কারণে নিরীহ মানুষের প্রাণ নেবার অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে? ধিক তোমাদের! বারুদের তৈরি গুলি একদিন যে তোমাদের বুকেও আঘাত করতে পারে, সে কি তোমরা জানো না?

আপাতত আমি এই জঙ্গলেরই বাসিন্দা। গভীর জঙ্গলের মধ্যিখানে এই বন্য মানুষগুলির সঙ্গে আমি এখন যেখানে আছি, দেখলে তুমি ভয় পাবেই। মনে হবে, এই বুঝি বাঘ-ভাল্লুক লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ের ওপর! হ্যাঁ, বাঘ তো আছেই। মাঝে-মাঝে একটু দূরে জঙ্গলের আরও গভীরে তারা যখন গর্জে ওঠে, কী-রকম দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে আমার বুকের ভেতরটা! তবু নিজের ভয়টা নিজের মধ্যেই চেপে থাকি! কারণ, আমি জানি, এখান থেকে পালিয়ে যাবার পথ আমার জানা নেই। পালাতে গিয়ে যদি জঙ্গলের মধ্যে আমি চিরদিনের মতো হারিয়ে যাই, তখন কী হবে? তখন হয়তো বাঘের পেটেই যেতে হবে। তাহলে কী এখানে আমায় সারা জীবনই থাকতে হবে? কে জানে!

ওই ছোট্ট মেয়েটা আমায় যে কী ভালোবাসে, সে তোমরা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না। ওর কোনো ভয় নেই। ভয় নেই বাঘ-ভাল্লুক কিছুরই। কী-রকম দুঃসাহসে একা-একা জঙ্গলের মধ্যে ছুটে যায়। অবশ্য এখন আর একা-একা যেতে হয় না। এখন আমি ওর সঙ্গী। আমায় এখন সে কলকল করে যে কত কথা বলে, কে বোঝে সে-সব কথার মানে! ও হাসে, গান গায়, আর যখনই ওর মন চায়, আমার হাত ধরে ছুট দেয়। আমিও যে কথা বলি না, তা নয়। আমার কথা বোঝে না একবর্ণও। নইলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে কেন আমার মুখের দিকে! ওর দুটি চোখের দৃষ্টি ভারি মিষ্টি! ওর চোখ দুটির দিকে তাকালে আমার মুখ যেন আপনা থেকে কথা কয়ে ওঠে!

এতদিনে শুনতে-শুনতে আমি ওর নামটা জেনে ফেলেছি, ওতিয়া। একদিন যখন 'ওতিয়া' বলে ডাক দিয়েছি আমি, কী বলব তোমায়, একঝলক হাওয়ার মতো উড়ে এসে আমার গলাটি জড়িয়ে ধরল সে। তারপর অঝোরে হাসতে-হাসতে সে আমায় বুঝিয়ে দিল, কী খুশিই না সে হয়েছে! হাসতে-হাসতেই সে যখন আমার বুকে হাত রেখে ইশারা করল, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না, সে আমারও নাম জিজ্ঞেস করছে! আমিও হেসে ফেললুম। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আমার নাম ইসতাসি।'

'ইসতাসি!' মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে আমার নামটা যখন সে উচ্চারণ করল, তারপর ছুটতে-ছুটতে তার মায়ের কাছে গিয়ে আমার নামটা বার বার বলতে লাগল, তখন কী মিষ্টি শোনাচ্ছিল তার গলার স্বর। এমন খুশি তাকে আমি আর কোনোদিনই দেখিনি। সে যেন ভেবেই পাচ্ছে না, কী করবে এই মুহূর্তে। শুধু একটাই শব্দ তার মুখে। সে শুধু ডাকছে, 'ইসতাসি, ইসতাসি।' সে সেই শব্দটাকে সুরের মতো গেয়ে-গেয়ে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার ব্যানডুররিয়াটা হাতে করে নিয়ে এল। আমার হাতে তুলে দিল। ইশারা করল। মুখে শব্দ করল। যার মানে, 'বাজাও।' এখন মুখে যে-শব্দটা করল হয়তো এইটাই তার আবদারের ভাষা। সুতরাং আমি তার আবদার না-রেখে কেমন করে পারি? বাজাতে শুরু করে দিলুম। ওতিয়া হাততালি দিল।

এখনও ওতিয়া অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার বাজনার দিকে। আমি যখনই বাজাই, ওর চোখের দিকে তাকালে আমার মনে হয়, বুঝি— বা আমার বাজনার শব্দের মধ্যে কোনো জাদুমন্ত্রের আঁচ পেয়েছে সে। তাই মাঝে-মাঝেই আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ও জঙ্গলের ভেতরে। জঙ্গলের ভেতরে এইখানে, এই যে গাছে-গাছে ছাওয়া নিরিবিলি জায়গাটা, এইখানে সে আমায় নিয়ে আসে। তারপর আমার নাম ধরে ডাকে, আমার ব্যানডুররিয়াটার ওপর হাত রাখে। আমার চোখের দিকে তাকায়। ঘাড় নাড়ে। আমার হাতের বাজনা বেজে ওঠে। এই নির্জন জঙ্গলের গভীরে সেই বাজনার সুর শুনতে-শুনতে ওতিয়ার চোখ দুটি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার হাতের দিকে। তারপর ছুটতে ছুটতে নাচতে থাকে। আর নয়তো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে সুর করে গান গায়। গানের মানে না বুঝি, কী যে ভালো লাগে! খুব ভালো!

এখন এত ভালো লাগে ওতিয়াকে। ভালো লাগে ওর মাকে, বাবাকে। ওরা যেন আমাকে ওদেরই আপনজন ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। কেমন যেন আমারই অজান্তে আমিও ওদের একজন হয়ে গেছি। ওদেরই মতো বন্য আর আনন্দে উচ্ছল। যদিও আমার পরনে সেই লম্বা প্যান্ট আর জামাটা এখনও আছে, ক-দিন পরে এ-দুটোর যখন আর পরবার মতো হাল থাকবে না, তখন আমি জানি, ওদেরই মতো আমায় গাছের ছালের নামমাত্র পোশাক পরতে হবে। তখন হয়তো এরা আমার গায়ে উল্কি এঁকে দেবে। আর নয়তো নানা রঙের আঁকিজুকি। কপাল জুড়ে গাছের লতা জড়িয়ে তাতে এঁটে দেবে পাখির পালক। তারপর রাতের বেলা জ্বলন্ত আগুন ঘিরে ওদের সঙ্গে নাচতে হবে আমায়। ভয়ংকর যুদ্ধের নাচ। অথবা শত্রুকে জয় করার উল্লাসনৃত্য!

সত্যি এরা নাচে। রোজই নাচে। সারাদিন জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরবে। শিকার খুঁজে এনে রাতের বেলা এক জায়গায় সবাই জমায়েত হয়ে আগুন জ্বালায়। গুরু-গুরু শব্দে থুম্বা বাজায়। মুখে অদ্ভুত শব্দ করে নৃত্যে মেতে ওঠে। ওই আগুনে তারা শিকার ঝলসে নেয়। তারপর ভোজ বসায়। সে-ভোজে আমাকেও ভাগ বসাতে হয়। ভারি আনন্দের সে-ভোজ। ভারি তৃপ্তির।

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

প্রথম-প্রথম যখন আমার কিচ্ছু ভালো লাগত না, শুধু মনে পড়ত মাকে, বাবাকে, আনাতিদাদা অথবা আমাদের সেইদলের সবাইকে, তখন কোনো খাবারই রুচত না আমার মুখে। তখন ওতিয়ার মা কতদিন আমার নিজের মায়ের মতো আমাকে আদর করে খাইয়ে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে যখনই আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে, আমায় ভালোবেসে কাছে টেনে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে। চুমু খেয়েছে। তখনই আমার মনে হয়েছে, এ মা তো শুধু ওতিয়ার মা নয়, এ যেন আমারও মা। এই বন্য মায়ের মুখখানি আমার মায়ের কথা বার বার মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। আমার মন বলছে, সব মায়ের বুকের মধ্যে আছে একই আদর, একই ভালোবাসা। মা যদি হয় বনের, কী শহরের, তফাত কোথায়?

৭

আচ্ছা, ওতিয়া বুঝি আমাকে ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না! আমাকে নিয়ে সারাক্ষণ এত ব্যস্ত! কী যে করবে, যেন ভেবেই পায় না। আমার মুখে হাসি না-দেখলে, তার মুখখানিও শুকিয়ে যায়। দেখে আমারই কষ্ট লাগে। তাই হাসতেই হয় আমাকে। অন্তত তার জন্যে। তার গান শুনতে হয়, নাচ দেখতে হয়, আর বার বার হাতে তালি দিয়ে তারিফ করতে হয়। তার ওপর, যখনই সে আমার হাতে ব্যানডুররিয়াটা তুলে দেবে, তখনই বাজাতে হয়। না বাজালে কী রাগ!

ভারি মায়া লাগে মেয়েটাকে দেখলে। না আছে দামি জামা-কাপড়, না আছে খেলনা-পুতুল। ওর কানে ওই যে কাঠের দুল দুটি দুলছে, কিংবা গলায় কাঠের তৈরি ওই যে মালাটি, ওই কাঠের গয়না দুটিই যেন ওতিয়ার কাছে সাত রাজার ধন। ও জানে না, সোনা কাকে বলে। ও কোনোদিনই চোখে দেখেনি। তাই ভাবতেই পারে না, সোনা পরলে তাকে আরও কত সুন্দর দেখতে লাগবে।

ওতিয়া এই জঙ্গলের সবুজ ছায়ার মতোই ঠান্ডা আর শান্ত। হাসিখুশিতে ভরা ওই ছোট্ট মেয়েটা সত্যিই সুন্দর। এই বনের মতোই সুন্দর। ওকে ছেড়ে যাবার কথা আমি এখন ভাবতেই পারি না। এখন আমি সত্যিই ওতিয়ার মতো বন্য হয়ে গেছি। তোমরা ওকে আমার আপনজন বলে স্বীকার না-করলেও, আমি মনে-মনে জানি, ও আমার বোন। আমি ওতিয়ার ভাই। আমাদের খেলাঘর এই বন আর জঙ্গল।

ওতিয়ার কথা এখন আমি একটু-একটু বুঝতে পারি। যত কথা বুঝতে পারি, তার চেয়েও না-বোঝার কথা অনেক বেশি। যে-কথাগুলো আমি বুঝতে পারি না, ওতিয়া বোবা মুখে হাত-পা নেড়ে এমন করে বুঝিয়ে দেবে, বা দেখিয়ে দেবে যে, তা আমার কাছে জলের মতো সোজা হয়ে যায়। ও এমনি করে একদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল, গভীর জঙ্গলে একটি গুহা আছে। গুহার পাশে একটা

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জলপ্রপাত পাথর ডিঙিয়ে অঝোর ধারায় ছিটকে পড়ছে নীচে, চারিদিকে। সেই জলপ্রপাতের বিন্দু-বিন্দু জলের কণা যখন রোদের আলোয় দোল খায়, তখন রঙে-রঙে ছড়িয়ে যায় চারিপাশ । সে ভারি সুন্দর, ভারি অদ্ভুত। আভাসে ইঙ্গিতে ওতিয়া আমাকে জানিয়েছে, সেই জলপ্রপাত সে আমায় একদিন দেখাতে নিয়ে যাবে। আর বলতে কী, একদিন ওতিয়া সত্যিই আমায় নিয়ে গেছল সেই জলপ্রপাত দেখতে। সেই গভীর, আরও গভীর জঙ্গলে। তারপর? সেই কথাই এখন বলতে হবে আমায়! বলতে গিয়ে আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে। মনটা ভীষণ দুঃখে মুষড়ে পড়ে।

কথামতো সেদিন আমি আর ওতিয়া সেই গভীর জঙ্গলে জলপ্রপাত দেখতে চলেছি। অবিশ্যি মা আর বাবাকে বলে এসেছে ওতিয়া। আমিও। ওরা বারবার সাবধান করলেও অমত করেনি। গভীর জঙ্গল যত সুন্দর, তত ভয়ংকর, এ-কথাটা যে কত সত্যি, এতদিনে আমিও তা বুঝে গেছি। তবে হ্যাঁ, আগে যেমন ভয়ে গা-ছমছম করত, এখন তা করে না। এখন এই জঙ্গলই আমার সব-কিছু। এই জঙ্গলের সঙ্গে আমিও এখন জংলি ইসতাসি! এখানে আমি যাযাবর নই। ঘুরে-ঘুরে, দেশে-দেশে ঘর বাঁধার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে। আমার সেই স্বপ্নের দিনগুলি হারিয়ে গিয়ে আর-এক নতুন জীবন শুরু হয়েছে। আমি ভাবি, কোনটা ভালো, সেই পথে-পথে ঘর বেঁধে নানান মানুষের দেশে ঘুরে বেড়ানো, না, এই গভীর জঙ্গলে বনের মানুষের সঙ্গে বন্য হয়ে জীবন কাটানো!

সেদিন ওতিয়ার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে আমি জঙ্গলের যতই গভীরে চলেছি, ততই অবাক হয়ে ভাবছি, এই ছোট্ট মেয়েটার কাছে জঙ্গলটা যেন কিছুই নয়। এর পাতা-ঝরা পথ, সবুজ গাছের সারি, এর আলো কিংবা বাতাস, সবই ওতিয়ার আগপাছ জানা। ভয় নেই মনে। আমার তবু ভয় করে। কেননা, একবার যদি এই জঙ্গলের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাই, তবে পথ আর খুঁজে পেতে হচ্ছে না। তোমাদের বলতে ভুলে গেছি, ওতিয়া সঙ্গে একটা তির-ধনুক নিয়েছে। জঙ্গলের গভীরে যখন যেতে হয়, সঙ্গে তির-ধনুক নিতেই হয়। আমি অবিশ্যি এখনও ঠিক-ঠিক তির-ধনুক ছুড়তে পারি না। একেবারে পারি না বললেও ভুল হবে। আমিও তির ছুড়ি, কিন্তু ওতিয়ার মতো অত ওস্তাদ এখনও হতে পারিনি। ওস্তাদই বলব। কারণ, এই বয়সেও এক টিপে একটা নিশানা ও ঠিক ছিটকে দেবে। ওর ওই কেরামতি দেখলে অবাক না-হয়ে উপায় আছে! আমি অবাক হলে কী হয়েছে! তির ছোড়াটা এই বন্য মানুষগুলির কাছে জলভাত! সঙ্গে আমিও অবিশ্যি একটা তির-ধনুক নিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ওতিয়া নিতে দিল না। তার বদলে, আমার হাতে সে ব্যানডুররিয়াটাই তুলে দিল। আমি ভাবলুম, জঙ্গলের গভীরে যাচ্ছি—বাজনা কী হবে! যদি কোনো ভয়ংকর জন্তুর সামনা-সামনি পড়ি, তখন তাকে ব্যানডুররিয়া শোনালে সে কি লক্ষ্মীছেলের মতো বাজনা শুনে আমাদের বাহবা দেবে! না, আমাদের আক্রমণ করে মুণ্ডুপাত করবে! এখন অবিশ্যি আমিও তেমন জঙ্গলের জন্তু দেখলে ভয় পাই না। সয়ে গেছে। এখন রাত্তিরে বাঘের গর্জন যতই শুনি, আগের মতো দুরু-দুরু করে বুক কাঁপে না।

https://boierhut.com/fb

ওতিয়া চলতে-চলতে কলকল করে কত কথা বলছে। হা ভগবান! আমি যে কত বুঝছি! তোমাদের তো আগেই বলেছি, এদের সঙ্গে থাকতে-থাকতে সব কথা না-বুঝলেও, কিছু-কিছু কথা এখন বুঝতে পারি। তাই এখন ওতিয়ার অনেক কথার ফাঁকে-ফাঁকে যে-কথাগুলির মানে আমি জানি, তাতে আমার বুঝতে অসুবিধা নেই, ওতিয়া আমায় গল্প শোনাচ্ছে। গল্প শোনাচ্ছে আগুনের। আগুনকে ওরা মনে করে সব দেবতার সেরা দেবতা। ওরা ভাবে, এই বন্য মানুষের মনে যখন পাপ বাসা বাঁধে, তখন আগুনের দেবতা রুষ্ট হন। আর তখনই তিনি নিজমূর্তি ধারণ করে সব ধবংস করে দেন। এইরকমই একবার হয়েছিল। আর ওতিয়া এখন সেই গল্পটাই শোনাচ্ছে। শোনাতে-শোনাতে কখনো তার চোখদুটো এত বড়ো হয়ে যাচ্ছে! নয়তো ঠোঁটটা উলটে যাচ্ছে! মুখখানা ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে! তখন যা ভালো লাগছিল ওতিয়াকে!

হ্যাঁ, সত্যিই একবার আগুন লেগেছিল এই জঙ্গলে। শুধু জঙ্গলে কেন, এই জঙ্গলের মাঝে-মাঝে এই যে গাছপাতা-ছাওয়া ঝুপড়িগুলো, আগুন লেগেছিল তাতেও। প্রাণের ভয়ে, সেই আগুন-দেবতার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে, ওরা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়েছিল এই জঙ্গলেরই মাটিতে। দেবতা ওদের কথা শোনেননি। দেবতা তাদেরও আগুনে ছাই করে দিয়েছিলেন। কেননা, তখন সারা জঙ্গলের সমস্ত মানুষই হয়ে উঠেছিল পাপী, না-হয় অত্যাচারী! শুধু বেঁচেছিল চারজন। দুই বুড়ো-বুড়ি, তাদের এক ছোট্ট নাতনি আর একটি বালক। ওই বুড়ো-বুড়ি তাদের নাতনিকে বড়ো করেছিল। তারপর বিয়ে দিয়েছিল ওই বালকটির সঙ্গে। ক্রমে-ক্রমে আবার জন্ম নিল নতুন জীবন। আবার গড়ে উঠেছিল, নতুন মানুষের নতুন যুগ। তাই, এখনও ওরা মনে করে, আগুনই তাদের সব দেবতার শ্রেষ্ঠ দেব। তাই এখনও ওরা পুজো করে তাঁর। বনের অপদেবতার হাত থেকে বাঁচার জন্যে রাতের বেলা তাদের ঘরের চারপাশে জ্বেলে রাখে আগুন। আর সে-আগুনের ভয়ে অপদেবতাই শুধু নয়, ঘেঁষতে পারে না বনের বাঘ-ভাল্লুকও।

আমরা এগিয়ে এসেছি অনেকটা বনপথ। অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাইনি। মাঝে-মাঝে দু-একটা বুনো খরগোশকে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যেতে দেখেছি। একবার একটাকে ধরবার জন্যে ওতিয়া এমন এক ছুট দিয়েছিল। পারেনি। পারবে কেমন করে? ওরা তোমার চেয়েও চালাক! ধরতে যাও, এমন ভড়কি দিয়ে ঝোপের আড়ালে সুড়ুত করে লুকিয়ে পড়বে যে, তোমার আর সাধ্যি নেই তাকে খুঁজে পাও!

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ ওতিয়া গান ধরল। এমন হঠাৎ-হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে ওতিয়া যে, আমি নিজেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই। গাইতে-গাইতে সে আমার হাত ধরল। আমাকেও গাইতে বলল। আমি অবিশ্যি এখন ওদের সঙ্গে একটু একটু গাইতে পারি। শুনতে-শুনতে আমারও এখন গানের কলিগুলো সব মুখস্থ হয়ে গেছে। মানে-টানে সব না বুঝলেও সেই গান গাইতে আমার এত মজা লাগে! তার ওপর ওতিয়ার গলায় যদি সে-গান শুনি, তাহলে তো আর কথাই নেই। দারুণ ভালো

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

লাগে। এমন আধো-আধো সুরে গাইবে! আমি হলপ করে বলতে পারি, সে-গান শুনলে তোমারও মেয়েটাকে ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে হবে।

এতক্ষণ আমরা বনের এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে হাঁটলেও সে-পথ ছিল সমান। কিন্তু হঠাৎ যেন পথটা কেমন উঁচু-নীচু ঠেকছে। মনে হচ্ছে, আমরা যেন ওপরে উঠতে-উঠতে নীচে নামছি। এখানে মাটির চেয়ে পাথর বেশি। সেই পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে দেবদারু, পাইন আর ইউক্যালিপটাস গাছগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওতিয়াকে জিজ্ঞেস করলুম, 'এদিকে কোথায় যাবে?'

ওতিয়া বলল, 'নীচে। নীচে গভীর খাদ। কী অন্ধকার!'

জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার খাদের ভেতর যেতে হবে শুনলে কোন মানুষ না ভয় পায়? আমি তো কোন ছার! আশ্চর্য, আমি কিন্তু ওতিয়ার মুখে ভয়ের কোনো লক্ষণই দেখতে পেলুম না! পাছে আমার মনের ভয়টা ওতিয়া জেনে ফেলে, তাই ওতিয়া এতক্ষণ যে-গানটা গাইছিল, আমিও এখন এই পাথর টপকাতে-টপকাতে সেই গানটাই গেয়ে উঠলুম। ওতিয়া কী খুশি! আমার হাত ধরে আমার সঙ্গে গলা মিলাল সে। সে-গানের যা মানে দাঁড়ায়, সেটা তোমাদের শোনাবার লোভ সামলাতে পারছি না :

এই যে বন, এই যে পথ
এই যে বনের গাছ-গাছালি,
ওই যে বাঘ, কিম্বা ভালুক,
বন্ধু মোদের পাখ-পাখালি।

আর একটু নীচে নামতেই আমি জলের শব্দ শুনতে পেলুম। আমার গান থেমে গেল। আরও একটু এগিয়ে যেতেই দেখি ওই নিচু জায়গাটার মাঝ দিয়ে গাঢ় নীল রঙের জল উপচে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। দুপাশে খাড়া উঁচু পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে কত গাছ! কোথাও নানান রঙের বুনো ফুলের গাছ! ওই উঁচু-উঁচু পাথরের ফাঁক দিয়ে আকাশটা যখন দেখছি, কী আশ্চর্য লাগছে! ঝরনার ওপর ওই আকাশ ছায়া ফেলে দোল খাচ্ছে! আমি দেখতে পেলুম, ওতিয়া ওই ঝরনার ধার ঘেঁষে, পাথরের ওপর পা ফেলে-ফেলে ওপরে উঠছে। উঠতে-উঠতে চেঁচিয়ে আমার নাম ধরে ডাকল, 'ইসতাসি—।' তাকে জোরেই ডাকতে হল। কেননা, তার চিৎকারের চেয়ে জলের ছলাতকারের শব্দ আরও তীব্র। আমি অবশ্য শুনতে পেয়েছি। এমন একটা চমৎকার দৃশ্য দেখে আমার মনটা এত খুশি যে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও গলা ছেড়ে ওতিয়ার নাম ধরে ডেকে উঠেছি। দেখতে পেলুম, ওতিয়া পাথর ভেঙে ওপরে উঠতে-উঠতে আমার ডাক শুনে থেমে পড়ল। হাতছানি দিয়ে আমাকে ওপরে ডাকল। সত্যি বলতে কী, ওতিয়ার মতো অত সহজে আমি উঠতে পারছি না। ওতিয়া যেন একটা ছোট্ট হরিণ। তরতর করে এমন অনায়াসে পা ফেলে ওপরে উঠছে যে, দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। এদিকে আমি কোনোরকমে সামলে-সুমলে পাথর টপকাচ্ছি। ওপরে কোথায় যাচ্ছে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওতিয়া, আমি জানি না। ও যতই ওপরে উঠছে, দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! একবার যদি ফসকায়, তাহলে যে কী কাণ্ড হবে, সে আর কাউকে বলে দিতে হবে না!



ওতিয়া আমার হাতটা ধরে ফেলল।

আর একটু ওপরে উঠতেই আমি দেখতে পেলুম, সেই ঝরনার জল দল বেঁধে ওপর থেকে ঝর-ঝর করে নেমে আসছে। পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে যেন জলতরঙ্গের সুর তুলে নাচছে। আমি চোখ ফেরাতে পারি না। স্থির চোখে চেয়ে থাকি সেইদিকে।

'ইসতাসি—' আবার ডাক দিল ওতিয়া।

আমি এবার ওকে ধরবার জন্যে আরও চটপট পা ফেলতে লাগলুম। আর মাঝে-মাঝে যখনই টাল খাচ্ছি, সামনে যা পাচ্ছি তাই-ই ধরে ফেলছি। হাঁপিয়ে গেলুম। অবাক কথা, ওতিয়ার ওসব নেই। হাঁপাচ্ছেও না, টালও খাচ্ছে না। ওতিয়া বোধহয় বুঝতে পেরেছে, আমার কষ্ট হচ্ছে। তাই দেখি, এবার দাঁড়াল। আমার ওপরে ওঠার করসত দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল। আমিও ওতিয়ার মতো হাসতে পারলুম না বটে, কিন্তু হাসি শুনতে-শুনতে ওর কাছে পৌঁছে গেলুম। ওতিয়া আমার হাতটা ধরে ফেলল। টানতে-টানতে যেদিকে নিয়ে চলল, সেদিকটা তত উঁচু-নীচু না। কিন্তু এদিকে পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে জলের অজস্র ধারা। সেই জলের ধারা ছলকে-ছলকে পাথর ডিঙিয়ে ওইদিকের ঢালুপথে নেমে যাচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা পাথর ভেঙে ওপরে উঠেছি। এবার উলটোদিকে নীচে নামব আমরা। আমার হাত ধরে ওতিয়া আমায় জিজ্ঞেস করল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে তো?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি কষ্টটাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে বললুম, 'না-না!'

ওতিয়া আমার হাঁসফাঁসানি দেখে আবার বলল, 'তবে হাঁপাচ্ছ যে!'

আমি উত্তর দিলুম, 'অনেকটা উঁচু তো!'

সত্যি, কত উঁচুতে উঠেছি। এখান থেকে নীচের দিকে চাইলে মনে হচ্ছে, জঙ্গলের মস্ত বড়ো গাছগুলো যেন ছোট্ট-ছোট্ট চারাগাছ। পৃথিবীর দেহটা কে যেন সবুজ মখমলে ঢেকে দিয়েছে। এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি, জলের একটানা মৃদু শব্দ এখন দুরন্ত হয়ে উঠেছে। দেখতে পাচ্ছি, ঝরনার সব-কটা স্রোতের ধারা একই দিকে ছুটে চলেছে। একই সঙ্গে এই ওপর থেকে নীচে প্রচণ্ড বেগে ঝরে পড়ছে। অসংখ্য জলকণা ঠিক যেন কুয়াশার মতো জমাট বেঁধে সেই জলধারার মাথার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। যতই দেখছি, অবাক হয়ে থমকে যাচ্ছি। ওতিয়া আড়ে-আড়ে আমার দিকে দেখছে, আর হয়তো মনে-মনে বলছে, 'কী, কেমন লাগছে?'

এর আগে আমি তো আরও কত দেশ ঘুরেছি, না-দেখা কত কী দেখেছি! কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমি কখনো জলপ্রপাত দেখিনি! সুতরাং দেখতে-দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভাবছি, যে-পৃথিবী এত সুন্দর, যে-পৃথিবীর বুকে এত আনন্দ, এত জাদু, তার কোলে জন্ম নিয়ে আমরা কেন এত নিষ্ঠুর, নির্দয় আর হিংস্র!

একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল ওতিয়া। তার ওই মুখখানি জলের শব্দের মতোই উচ্ছল হয়ে উঠেছে। তারই পাশে আর-একটা বড়ো পাথরের ওপর বসবার জন্যে সে আমাকে ইশারা করল। বসব কী, ওই কুয়াশার মতো উড়ন্ত জলের বিন্দুগুলি গায়ে মুখে মাথায় চোখে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে। ওতিয়ার মুখের ওপর ওই বিন্দুগুলি ছড়িয়ে পড়ে কী সুন্দর দেখতে লাগছে!

আমি বসলুম। ওতিয়া ওই পাথরটার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে নীচের দিকে চেয়ে রইল। জল পড়ছে অঝোর ধারায়। একটানা তার শব্দ। আর সব নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। এমনকী ওতিয়া। তার সঙ্গে আমিও। এখন চুপ করে থাকারই সময়। এখন শুধু দেখার সময়। এই বন, এই পাথর-ঘেরা ঝরনা অথবা জলপ্রপাত। আর সেই জলের বিন্দুভরা কুয়াশার ওপর সূর্যের আলোয় রামধনু-রঙের বাহারি ছটা। চোখ ফেরাবে কে!

আমিও ওতিয়ার মতো হেঁট হয়ে নীচের দিকে চাইলুম। উঃ, কী ভীষণ গভীর! এই ওপর থেকে নীচের ওই গভীরে জলের ধারা লাফিয়ে পড়ে এমন তোলপাড় শুরু করেছে যে, তা দেখতে-দেখতে আমি বিভোর যাই!

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ওতিয়া। আমার গায়ে হাত দিল। আমার চমক ভাঙল। আমিও উঠে পড়েছি। আমার হাত ধরল ওতিয়া। নীচের দিকে নামতে লাগল। কেমন থরে-থরে সিঁড়ির মতো পাথরের সারিগুলি সাজানো রয়েছে! দেখলেই মনে হবে, কে যেন খুব যত্ন করে ওই পাথরে পা ফেলে নীচে যাবার পথটি পরিষ্কার করে রেখেছে। লাফিয়ে-লাফিয়ে আমরা নামতে লাগলুম। নীচে নেমে দেখি,

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওই জলরাশি যেখানে পড়ছে, সেখান থেকে সামনে জঙ্গলের মধ্যে তার স্রোত বয়ে চলেছে। ওতিয়া আমাকে ওই স্রোতের দিকেই নিয়ে চলল। কী ভয়ংকর সেই স্রোতের তেজ! আমি বলতে পারি, একবার যদি বেসামাল হয়ে সেই স্রোতে কেউ পড়ে যায়, তবে আর তাকে খুঁজে পেতে হচ্ছে না!

ওই স্রোতের তীর ধরে ওতিয়া আর আমি আরও গভীর জঙ্গলে চলেছি। আমি দেখলুম, ওই জলধারা ছুটতে-ছুটতে এখন যেন একটি নদীর রূপ নিয়েছে। আমরা আরও দেখলুম, ওই নদী সামনে অন্ধকার এক গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হয়তো গুহার জমাট অন্ধকারে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে ওপাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ওতিয়ার সঙ্গে আমি ওপাশেই ছুটলুম। এখন আমরা যতই দূরে চলে যাচ্ছি, ততই জলপ্রপাতের শব্দ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। শুধু শোনা যাচ্ছে, এই পাহাড়ি নদীটির জলের বাজনা। গুহার ভেতরে যেন জলের পরিরা নূপুর-পায়ে নাচছে।

আমরা যখন গুহার এপাশ থেকে ওপাশে পৌঁছুলুম, তখন সত্যি কী অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, গুহার মুখ থেকে যেন গলন্ত রুপো ঝলক-ঝলক করে বেরিয়ে আসছে। গাছের পাতায় হাওয়ার ঢেউ, জলের শব্দ, দু-একটি পাখির ডাক, আমাকে কেমন আনমনা করে দিল। আমি ব্যানডুররিয়াটা হাতে নিলুম। তারে-তারে সুর বেঁধে বাজাতে শুরু করলুম। সেই গানটা বাজাতে এখন আমার ভালো লাগছে। ভয়ংকর সেই রাতে যেদিন মা আমার শেষবারের মতো যে-গানটি গেয়েছিল। আর আমি যেদিন প্রথমবার মায়ের সুরে সুর মিলিয়ে ব্যানডুররিয়া বাজিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলুম। এই নির্জন জঙ্গলে, এই পাহাড়ি নদীর সামনে দাঁড়িয়ে সেই সুর বাজাতে-বাজাতে আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। দেখে ফেলল ওতিয়া। কী ভাবল আমি জানি না। জানি না, এখন আমার এই বাজনার শব্দ তার শুনতে ভালো লাগছে কি না! এখন হয়তো অবাক হয়ে ওতিয়া ভাবছে, এত আনন্দেও আমি কাঁদছি কেন! ও কি বুঝতে পারে আমার মনের কথা? হয়তো পারে। নইলে, ধীর পায়ে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ায় কেন সে? আমার যে-হাতটি বাজনার সুর তুলছে, সেই হাতটি ছুঁয়ে থামিয়ে দিল। তারপর নরম-সুরে জিজ্ঞেস করল, 'ভালো লাগছে না ইসতাসি?'

আমি তাড়াতাড়ি নিজের চোখের জল সামলে নিয়ে বললুম, 'না না। খুব ভালো লাগছে।'

'তবে কাঁদছ?'

'কই না।'

'বুঝতে পেরেছি। মাকে আর বাবাকে মনে পড়ছে বুঝি?'

আমি চুপ করে রইলুম।

ওতিয়া বলল, 'তুমি এত সুন্দর বাজনা বাজাও।'

'তুমিও তো খুব সুন্দর গান গাও।'

ওতিয়া যেন লজ্জা পেল। লজ্জা পেয়ে ওতিয়া যখন মুখখানি নিচু করে নেয়, তখন এত ভালো লাগে দেখতে! এখন যেন আরও ভালো লাগল। আকাশ থেকে সূর্যের ঝকঝকে আলোর মুক্তাগুলি

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওর চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। কী সুন্দর দেখতে লাগছে! আমি মনের দুঃখটা মনের ভেতর চেপে রেখে ওতিয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'ওতিয়া, তুমি একটা গান গাইবে? আমি বাজনা বাজাব।'

ওতিয়া আমার মুখের দিকে চাইল।

আমি আবার বললুম, 'গাও!'

ওতিয়া ছুটে পালিয়ে গেল। ওতিয়া পাথরের গায়ে লাফাতে-লাফাতে মস্ত একটা পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেল। তারপর দেখতে পেলুম, পাথরের গায়ে যে সবুজ গাছটা নদীর দিকে মুখ হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে উঁকি মারল ওতিয়া। আমি না-দেখার ভান করলুম। ওতিয়া আমার নাম ধরে ডাকল, 'ই-স-তা-সি।'

আমি মুখে সাড়া না-দিয়ে আমার ব্যানডুররিয়ার সুরে বাজিয়ে দিলুম, 'ও-তি-য়া।'

ওতিয়া হেসে উঠল। তারপর গেয়ে উঠল। গাইতে-গাইতে ওই পাথরের আড়াল থেকে আর-এক পাথরের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর এই পাথর থেকে ওই পাথর, সেখান থেকে আর-এক পাথর, লাফিয়ে নেচে গাইতে লাগল। আমি বাজাতে লাগলুম।

তুমি যদি তখন সেই দৃশ্য দেখতে, তোমার সাধ্যি ছিল না, চোখ ফেরাও। ওতিয়া এমন মজা করে গান গাইছিল! তেমনি মজার কথায়-ভরা সেই গান। আমার তো হাসতে-হাসতে পেটে খিল লেগে যাবার গোত্তর! আমি জানি না, সে সময় তুমি ওতিয়ার সামনে থাকলে কী করতে! কে জানে, তোমার হাসি পেত কি না! কিন্তু এখন হাসি পাক চাই না-পাক ওতিয়ার সেই গানের কথাগুলো শুনতে তো কোনো দোষ নেই। সেই গান অনেকটা এমনি .

এক্ষুনি যদি এক ভাল্লুক,
রেগে বলে, এই দ্যাখ হাঁচছি,
তারপর পায়ে দিয়ে বুট-শ্যু
ধিন-ধিন নেচে বলে নাচছি!
তখন কী মজা হয় বলো তো?

এক্ষুনি যদি এক নেকড়ে,
কেঁদে বলে, পেটে ব্যথা মরছি,
ওরে বাপ দে-না ডাক বদ্যির
মাথা খুঁড়ে তোকে গড় করছি।
তখন কী মজা হয় বলো তো?

এই যে গানটা শুনলে, এটা আমি ওতিয়ার গলায় শুনে মোটামুটি একটা মানে দাঁড় করিয়েছি। দেখছ, গানের এক জায়গায় আছে, 'পায়ে দিয়ে বুট-শ্যু'। আসলে, ওতিয়ার গানে 'বুট-শ্যু' কথাটা

https://boierhut.com/fb

ছিল না। ছিল অন্য আর-একটা শব্দ। সেই শব্দটার মানে করতে না-পেরে অগত্যা 'বুট-শ্যু' কথাটা আমিই জুড়ে দিয়েছি। অবিশ্যি মানের যে খুব একটা গোলমাল করে ফেলেছি, তা মোটেই ভেবো না যেন!

গানটা গাইতে-গাইতে ওতিয়া যেন কী দেখে হঠাৎ থমকে গেছল। আমিও ওর মুখের দিকে চেয়ে হকচকিয়ে গেছি। ওতিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলুম বলে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আমার পেছনে কী দেখে, ওতিয়ার মুখখানা এমন ভয়ে কুঁচকে গেল! আমি নিজে পেছন ফিরে দেখার আগেই ওতিয়া চিৎকার করে উঠেছে, 'ইসতাসি!'

আমি চোখের পলকে পিছনে তাকিয়েছি। তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠেছি আমি! আমার পেছনে একটা দাঁতালো শুয়োর! কী বিচ্ছিরি আর কিম্ভূতকিমাকার দেখতে শুয়োরটাকে! কুতকুতে চোখ দুটো পিটপিটিয়ে দেখছে আমাদের। আমি কী করব, ভাবতে না ভাবতেই দেখি, শুয়োরটা তার বিটকেল মুখটা উঁচিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমি পালাতে যাব, এমন সময় ওতিয়া ঝট করে এগিয়ে এসে আমায় আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধনুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে তির জুতল। বুনো শুয়োরটাকে তাক করল। আমি নিশ্চিত জানি, সেই সময় বুনো শুয়োরের সামনে পড়লে, আমার মতো তুমিও প্রাণের ভয়ে কাঁপতে। কারণ, তার চেহারাটা সত্যিই এমন বীভৎস আর ভয়ংকর যে, আচমকা দেখলে যে-কোনো মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা সব কোথায় উবে যাবে! কিন্তু আশ্চর্য, ওতিয়া ভয় পেল না। বুনো শুয়োরটা তার নাকের পাশে বাঁকানো খড়্গ দুটো খাড়া উঁচিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে। ওতিয়া মুখে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ করল। সে আওয়াজে ছিল একটা ভীষণরকমের ধমক। কিন্তু সেই জন্তু শোনেনি ওতিয়ার ধমক। সে তেড়ে এসেছিল। ওতিয়া চেঁচিয়ে উঠে আমাকে বলেছিল, 'ভয় পেয়ো না ইসতাসি।' বলেই তির ছুড়ে দিয়েছিল সেই বুনো শুয়োরের কপালের মাঝখানে। আমি জানতুম, ওতিয়ার তিরে ছিল বিষ মাখানো। তির কপালে বিঁধে যেতেই সেই বুনো শুয়োর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে লাফিয়ে পড়ল আমাদের সামনে। ওতিয়া চিৎকার করে উঠল, 'ইসতাসি ছুট দাও!' বলে ওতিয়া নিজেই আমার হাত ধরে সেই পাথরের ওপর ছুটতে লাগল। আমার তো অত অভ্যেস নেই। তবু প্রাণের ভয়ে পড়ি-মরি ছুটতে লাগলুম।

বেশ খানিকটা ছুটে এসেছি। পিছনে ফিরে দেখি, শুয়োরটা ছুটছে না। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে লাফাচ্ছে। যন্ত্রণায়। তার কপাল দিয়ে রক্তের বান বয়ে যাচ্ছে। আমি দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তার বুকটা হাঁসফাঁস করছে। হাঁপাচ্ছে সে। মনে হল, বিষের তেজ ওর রক্তে মিশে ওকে কাবু করে ফেলেছে।

সত্যিই তাই। সেই বুনো শুয়োরটা লাফাতে-লাফাতে কেমন ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ছে। দেখতে পেলুম, যেখানে সেটা লাফাচ্ছিল, সেইখানেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল। পড়ে মুখে কীরকম একটা

শব্দ করতে-করতে নির্জীব হয়ে গেল। ওতিয়া হেসে উঠল হাততালি দিয়ে। ওতিয়ার মুখে হাসি দেখে আমিও হেসে উঠলুম।

ওতিয়া বলল, 'খতম হয়ে গেছে।' বলেই ছুটে গেল সেখানে। আমিও ছুটলুম। জয়ের আনন্দে ওতিয়ার মুখখানা খুশিতে যতটা উছলে উঠছে, বুকখানা গর্বে ফুলে উঠছে তারও বেশি! আমি কাছে গিয়ে দেখলুম, সেটা তখনও ধুঁকছে। আমি জানি, এখনই ওর বুকের ধুকপুকুনি থেমে যাবে। বাছাধনের সময় হয়ে আসছে।

ওতিয়া হাতের ধনুকটা পাশে রেখে আমাকে বলল, 'ইসতাসি, এসো, শুকনো কাঠপাতাগুলো ওর গায়ের ওপর বিছিয়ে দিই।' বলে এ-ধার ও-ধার থেকে চটপট করে শুকনো কাঠপাতা কুড়ুতে থাকল। আমিও হাত লাগালুম। যদিও বুঝতে পারছি, এই শুকনো গাছপালা আর পাতা ছড়িয়ে ওর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেবে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছি না ওতিয়া এখানে আগুন পাবে কোথায়! তাই জিজ্ঞেস করে ফেললুম, 'শুধু-মুধু ওর গায়ে এগুলো চাপিয়ে কী করবে ওতিয়া?'

'দাহ করব।'

'আগুন?'

'দেখো-না।'

দেখতে বেশিক্ষণ হল না। সামনে থেকে দুটো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে এল ওতিয়া। অবাক হয়ে দেখলুম, সেই পাথর দুটো তার ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে ঠুকতে লাগল। আগুনের চকমকি ছড়িয়ে পড়ছে। সত্যিই, হঠাৎ সেই চকমকির ফুলকি ছিটকে ঝরাপাতায় ঝপ করে আগুন ধরে গেল। তারপরই দাউ-দাউ করে জ্বলে ধোঁয়ায় ভরে গেল চত্বরটা। খুশিতে চিৎকার করে উঠল ওতিয়া!

আমি এখন সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওই একটা ছোট্ট মেয়ে ওতিয়ার অমন দুর্দান্ত সাহস আর বুদ্ধি দেখে! জঙ্গলের মানুষ যারা, তাদের বুঝি এমনিই সাহসী হতে হয়! হ্যাঁ, সারাজীবনই তো বিপদ মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় তাদের। মনে সাহস আর বুকে তেজ না থাকলে উঠতে-বসতে মরতে হবে না!

ধোঁয়া উড়ছে, আগুনও জ্বলছে। এরই মধ্যে শুয়োরের পোড়া মাংসের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি জানি, একটু পরেই মাংসটা বেশ কিছু ঝলসে গেলে, ওতিয়া ওই শুয়োরটার ঘাড় থেকে খানিকটা পোড়া মাংস ছিঁড়ে এনে আমায় দেবে। নিজেও নেবে। তারপর সেই আগুনে ঝলসানো মাংস মুখে দিয়ে আঃ, উঃ করবে। করতে-করতে কত কথাই না কইবে!

কিন্তু তা হল না। হল যা, তা আর এক ভয়ংকর কাণ্ড! একটা ভয়াবহ বিপদ যে ওই ধোঁয়ার আড়ালে এতক্ষণ ওত পেতে বসে আছে, আমরা তা একেবারেই টের পাইনি! কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে ওতিয়া! ও যেন হাওয়ার স্পর্শ পেলে বলে দিতে পারে, কোথায় বিপদ উঁকি মারছে। কী সতর্ক দৃষ্টি ওতিয়ার চোখে! অথচ আমি? বুঝতেই পারি না কিছু! ওতিয়া যখন প্রায় লাফিয়ে উঠে ছোঁ মেরে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেই ধনুকটা আবার মাটি থেকে তুলে নিল, তখনই আমার টনক নড়ল। চোখের পলকে তার পিঠে বাঁধা তূণ থেকে একটা তির টেনে নিল সে। ছিলায় আটকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইসতাসি সাবধান!'

আমার বুকটা ধক করে আঁতকে উঠেছে। সত্যি বলছি, আমি এতক্ষণ মরা শুয়োরটার পোড়া গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে মনে-মনে ভাবছিলুম, মাংসটা দারুণ জমবে! মিথ্যে বলব না, নোলায় দু-এক ফোঁটা জলও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু ওতিয়ার অমন চিৎকার শুনে নোলার জল নোলায় শুকিয়ে গেছে! পিছন ফিরে দেখি, ওতিয়া যেদিকে তির উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে, সেদিকের ঘন জঙ্গলের আড়ালে কমসে-কম দশ-পনেরোটা বুনো শুয়োর দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেগে তাদের ল্যাজগুলো সব খাড়া! তাক করে আছে আমাদের দিকে। বুঝতে বাকি রইল না, এবার ওরা একসঙ্গে আমাদের আক্রমণ করবে।

ওতিয়া হেঁকে উঠল, 'ইসতাসি, শিগগির আমার পেছনে চলে এসো।'

আমি দেখেশুনে এমনই ঘাবড়ে গেছি যে, ওতিয়ার কথা যেন আমার কানেই ঢুকল না। ভয়ে আমার পা নড়ছে না। তখন ওই একটা শুয়োরের বিদঘুটে মূর্তি দেখেই আমার কালঘাম ছুটে গেছল। এখন একসঙ্গে অতগুলো। একবার যদি খড়্গ দিয়ে পেটের ভেতর ঢুঁ লাগায়, তবে যে কী হবে, সে-কথা তোমাদের না-বললেও চলবে।

হয়তো ওদের ভাবগতিক দেখে ওদের যে কী মতলব ওতিয়ার বুঝে নিতে একচুল দেরি হয়নি। শুয়োরগুলো আমাদের আক্রমণ করার আগেই ওতিয়া নিজেই তেড়ে গেল! আমি থতমত খেয়ে গেছি। আর্তনাদ করে ডাক দিয়েছি, 'ওতিয়া!'

ওতিয়া দৃঢ় গলায় সাড়া দিল, 'ভয় নেই ইসতাসি। তুমি এসো না। ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকো! শত্রু আক্রমণ করার আগে, তাকেই ঘায়েল করতে হবে।'

ওতিয়া আরও এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল, একেবারে শুয়োরগুলোর মুখোমুখি। ভয়ে আমার গায়ের লোম খাড়া! কী দুর্দান্ত সাহস ওতিয়ার!

কিন্তু তার চেয়েও আর এক দুঃসাহসী দৃশ্য আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দেখলুম, ওতিয়া সাঁই-ই-ই করে একটা তির ছুড়ে দিল শুয়োরের দঙ্গলে। একটার পিঠে গিয়ে প্যাঁট করে বিঁধে গেল সেই তির। বাছাধন কাত। বলব কী, তাই দেখে শুয়োরের পাল ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে মার ছুট! আশ্চর্য! ওতিয়া কিন্তু ওদের পালাতে দেখে পিছু হটে এল না। আমি দেখলুম শুয়োরগুলোকে তাড়া করতে-করতে ওতিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। শুনতে পেলুম, জঙ্গলের মধ্যে ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ আর ডালপালা ভেঙে পড়ার মড়মড়ানি! আমি বুঝতে পারলুম, ওতিয়া শুয়োরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শেষ না করা পর্যন্ত ছাড়বে না। তোমরাই বলো, এইরকম অবস্থায় আমার কি এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা সাজে? কে বলতে পারে কোথা থেকে বিপদ আসে! আমার এখনই উচিত ওর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। বিপদ হোক! হলে দুজনারই হবে। তবু তো কেউ বলতে পারবে না,

https://boierhut.com/fb

একটা ছোট্ট মেয়েকে মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি এখানে লুকিয়ে বসে স্বার্থপরের মতো গা বাঁচাচ্ছি!

আর মুহূর্তের জন্যেও অপেক্ষা করলুম না। থাক-না ব্যানডুররিয়াটা হাতে। আমি বাজনা নিয়েই চেঁচিয়ে উঠলুম, 'ওতিয়া, দাঁড়াও, আমি আসছি।' বলতে-বলতে ছুট দিলুম।

কিন্তু ওতিয়ার সাড়া পেলুম না। এমনকী, এতক্ষণ চারিদিকে ডালপালা ভাঙার যে-সব পটাং-পটাস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম, সেই শব্দও আর শুনছি না। হঠাৎ কেমন যেন সব নিথর, নিশ্চুপ হয়ে গেল। তবু আমি ছুটে গেলুম। ছুটতে-ছুটতে ডাক দিলুম, 'ওতিয়া!'

সাড়া পেলুম না।

এবার আমি আমার গলায় যত জোর ছিল, প্রাণপনে তত জোরে চিৎকার করে উঠলুম, 'ওতিয়া, তুমি কোথায়?'

এবারও সাড়া পেলুম না।

জলপ্রপাতের ক্ষীণ শব্দ, সেই শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে জঙ্গলের একটা অদ্ভুত নির্জনতা আমাকে কেমন যেন অসহায় করে দিল। মাথায় আসছে না, কী করি! যদিও আমি এখন এই জঙ্গলেরই মানুষ, তবু তার সব রহস্য তো আমার এখনও জানা হয়নি। হয়তো জঙ্গলের সব রহস্য কেউ কোনোদিন জানতে পারেও না। হলেই-বা ওতিয়া এই জঙ্গলেরই একজন। সে-ও যে এই ছোট্ট বেলায় সব-কিছু জেনে ফেলেছে, এ আমি কেমন করে বিশ্বাস করতে পারি। কে জানে, ওই জন্তুগুলো হয়তো ওই ছোট্ট মেয়েটাকে রহস্যের জালে জড়িয়ে ফেলেছে এতক্ষণে। হয়তো ওতিয়া বাইরে বেরিয়ে আসার পথ হারিয়ে ফেলেছে। এ-কথা ভাবতে-ভাবতে আমার মন ভীষণ ছটফট করে উঠল। আমার কী যে হল, আমিও ওতিয়াকে ডাকতে-ডাকতেই জঙ্গলের গভীরে ঢুকে পড়লুম। কখনো জোরে, কখনো অস্পষ্ট স্বরে ডাকতে লাগলুম, 'ওতিয়া, ওতিয়া।' তার দেখা পাওয়া দূরে থাক, সাড়া পর্যন্ত পেলুম না। এ যেন ভোজবাজি! চোখের পলকে হারিয়ে গেল! নাকি, শুয়োরগুলো তাকে আক্রমণ করেছে! তাহলে চিহ্ন তো থাকবে! কোথায়, তেমন তো কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না!

আমি আবার ছুটলুম পিছনদিকে। কিন্তু এ যে আবার আর এক সর্বনাশের কাণ্ড ঘটে গেছে! আমার অজান্তেই আমি নিজেই হারিয়ে গেছি! হারিয়ে ফেলেছি আমার পথ এই জঙ্গলের গোলকধাঁধায়। খেয়ালই করতে পারছি না, কোন পথ দিয়ে এখানে এসেছি! একবার এদিক, একবার ওদিক ছোটাছুটি করতে-করতে মাথা গোলমাল হয়ে গেল। ভীষণ ঘাবড়ে গেলুম। ঠিক-ঠিক চিন্তা করার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। অবশেষে চিৎকার শুরু করে দিলুম, 'ওতিয়া, আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।' চেঁচাতে-চেঁচাতে ঝোপ-জঙ্গল টপকাতে লাগলুম। জঙ্গলের চক্করে চরকি খেতে-খেতে দম শেষ হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। আমি বোধ হয় এক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়ে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

যাব! আঃ! ভারি তেষ্টা পাচ্ছে! গলা শুকিয়ে যাচ্ছে! আমার কি মরণের সময় ঘনিয়ে আসছে! আমি আর থাকতে পারলুম না। ঠোক্কর খেলুম। ছিটকে পড়লুম। বুঝতে পারলুম, প্রচণ্ড লেগেছে। কিন্তু তারপর সব যেন কেমন হয়ে গেল। আমি যেন আমাকে আর ধরে রাখতে পারছি না। আমি হারিয়ে যাচ্ছি। আর সত্যিই আমার জ্ঞান হারিয়ে গেল। আমি পড়ে রইলুম এইখানে। যেখানে পড়ে থাকলে আমি মরে গেলেও কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না।

৮

আমার আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল হঠাৎ-ই। কতক্ষণ পড়েছিলুম, তা আমার খেয়াল থাকার কথা নয়। হয়তো হবে অনেকক্ষণ। অবাক লাগছে, এতক্ষণ পড়েছিলুম, অথচ এখনও আমি বেঁচে আছি! বাঘে তো খেতে পারত! কিংবা অন্য কোনো হিংস্র-জন্তু! বলতেই হবে, এ আমার ভাগ্য!

কিন্তু ওতিয়া! ওতিয়া কোথায়? ওতিয়ার কথা মনে পড়তেই ছ্যাঁক করে উঠল আমার বুকটা। আমি চকিতে উঠে দাঁড়ালুম! সত্যিই তো, কোথায় গেল মেয়েটা! আমি ব্যস্ত-পায়ে ঘুরে দাঁড়ালুম। মুখ ফেরালুম। ওতিয়া নেই। কিন্তু আমার চোখের সামনে ওটা কী দাঁড়িয়ে আছে।

একটা ভাল্লুক!

আমি স্থির! না-পারি বসতে, না-পারি চলতে! পা দুটো অসাড় হয়ে কাঁপতে লাগল। বুকে সাহস এনে কাঁপুনিটাকে যতই ঠেকাবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই পারছি না। আমি স্পষ্ট দেখছি ভাল্লুকটাকে। দেখছি, জন্তুটার গায়ের রং বাদামি। নাকের সামনে সাদা ছোপ। গা-ভরতি লম্বা লোম। চোখ দুটো কুতকুত করছে। সে-চোখ দেখে বলা মুশকিল, এই মুহূর্তে সে পেটে-পেটে কী মতলব আঁটছে। কিন্তু তার পায়ের নোখগুলো দেখলে তোমার মনে হবেই, বাছাধন একবার যদি ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে আমাকে শেষ করে ফেলতে তার বেশি সময় লাগবে না।

এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে ভাল্লুকটার দূরত্ব খুব বেশি হলে চার-পাঁচ হাত! সুতরাং তোমরা ধরে নিতে পারো, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আহা রে! আমাকে মেরে ফেলার আগে এই গভীর জঙ্গলের জন্তুটা যদি আমার দু-চারটে কথাও বুঝতে পারে! তবে তাকে বলি, 'হে বন্ধু, এই দ্যাখো আমার গলায় ঝোলানো বাজনা। আমি তোমাকে মারতে আসিনি। আমার বন্ধু ওতিয়ার সঙ্গে আমরা আনন্দ করতে এসেছিলুম। কিন্তু আমাদের আনন্দে বাধা দিয়েছিল একদল বুনো শুয়োর। তারা আমাদের মারতে চেয়েছিল। আমার বন্ধু ওতিয়া ভয় করেনি তাদের। ওতিয়াও আক্রমণ করেছিল তির-ধনুক নিয়ে। তারপর ওতিয়া জঙ্গলের কোথায় যে হারিয়ে গেল, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তাকে খুঁজতে-খুঁজতে আমিও হারিয়ে গেছি। আমায় যদি মারতে চাও তুমি,

https://boierhut.com/fb

মারো! কিন্তু একটিবার যদি বলে দাও, কোথায় গেলে শেষবারের মতো আমি ওতিয়াকে দেখতে পাব, তবে তাকে শেষবারের মতো দেখে আমি নিজেই তোমার হাতে মরবার জন্যে এগিয়ে যাব।'

আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল বোধহয়। খুবই স্বাভাবিক। এইরকম অবস্থায় আমার মতো তুমিও যদি পড়তে, তোমার চোখে জল আসত না?

হঠাৎ আমি হকচকিয়ে গেছি! আমার চোখ দুটো ছটফটিয়ে উঠেছে! দেখি কী, আচমকা ভাল্লুকটা সামনের পা-দুটো তুলে খাড়া দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠল। দাঁড়াতেই, তার মুখের ঠোঁট দুটো দু-ফাঁক হয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। তারপর অমনি দু-পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তো জানি, এবার আমার সময় হয়ে এসেছে। আমি জানি, এবার ভাল্লুকটা তার সামনের দু-পা দিয়ে আমায় জাপটে ধরবে। জাপটে ধরে আমার হাড়গোড়গুলো সব গুঁড়িয়ে ফেলবে। আমি শেষ-নিশ্বাস ফেলার আগে হয়তো মাটির ওপরে আমাকে ছুড়ে ফেলে দু-পায়ের ওই তীক্ষ্ণ নোখগুলো দিয়ে আমার বুকটা চিরে ফেলে ভাল্লুকটা নিশ্চিন্ত হবে। কী জানি আমার কী হল, আমার বুকের মধ্যে কে যেন জাদুমন্ত্রের মতো সাহস এনে দিল। আমি ছুট দিলুম। এদিকটায় কত বড়ো-বড়ো ঘাস জন্মেছে। আমার একেবারে বুক অবধি লম্বা। আমি দু-হাত দিয়ে সেই ঘাস সরাতে-সরাতে যতটা সম্ভব জোর কদমে ছুটতে লাগলুম। তুমি তো জানো না, ঘাসের মধ্যে দিয়ে ছোটা কী দুঃসাধ্য কাজ! পায়ের দফারফা। বুঝতে পারছি, কেটে আর কাঁটা ফুটে রক্তারক্তি হচ্ছে। হোক। আমায় বাঁচতে হবে। ওতিয়াকে আমায় খুঁজে বার করতেই হবে।

আমি হঠাৎ-ই একবার দাঁড়ালুম। যদিও আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, হাঁপাচ্ছি, তবু ভেবো না যেন, আমার দম ফুরিয়ে গেছে। এখনও আমি আরও কিছুক্ষণ নিশ্চায়ই ছুটতে পারব। ওই ভাল্লুকটার খপ্পর থেকে বাঁচার জন্যে আরও খানিকক্ষণ যুঝতে পারব। তবু দাঁড়ালুম। কারণ, ভাল্লুকটার তেড়ে আসার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলুম না। শুনতে পাচ্ছিলুম না, ঝোপঝাড় ভেঙে পড়ার কোনো আওয়াজ। আমি চকিতে একবার পিছু ফিরলুম। হ্যাঁ, তাই তো। আমার পেছনে কোনো ভাল্লুকও নেই, কিচ্ছু নেই। আমি অবাক হয়ে গেলুম। তবে কি ভাল্লুকটা আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। এ-কথাটা আমি কেন, তোমরাও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না। সেটা নিশ্চয়ই এখানে কোনো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে। সুতরাং এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা নয়! যেমন করে হোক এখান থেকে পালাতে হবে। এইকথা মনে হতেই আমি আবার ছুট দিলুম।

কিন্তু চমকে গেলুম। ছুটতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। কেননা, যেদিক দিয়ে ছুটে যাব, ঠিক সেইদিকেই ভাল্লুকটা চুপটি করে বসে আছে। আমার চোখে ধুলো দিয়ে, কোন ফাঁকে, কোন পথ ধরে যে সে ওখানে গেছে, আমি বুঝতেই পারছি না। যেন ভেলকি! আমি এখন ভাল্লুকটার একেবারে নাগালের মধ্যে। এখান থেকে ছুটলেও আমার নিস্তার নেই।

কিন্তু আশ্চর্য! ভাল্লুকটার এখনই যা করা উচিত ছিল, সে তো তা করছে না! কই এক লাফে ছুটে এসে আমার গলাটা তো টিপে ধরছে না! স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে খালি! ও কী ভেবেছে, আমার এই যে ব্যানডুররিয়াটা, এটা কোনো মারাত্মক অস্ত্র! ভেবেছে, এগিয়ে এলেই এটা দিয়ে ওর মুণ্ডুপাত করব। এ-কথা যদি ভেবে থাকে জন্তুটা আমার বাঁচোয়া! এ-যাত্রা আমি রক্ষা পেলেও পেয়ে যেতে পারি। সুতরাং ভাল্লুকটাকে আরও বেশি করে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে আমার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আমি ব্যানডুররিয়াটা চটপট বাগিয়ে ধরে ভাল্লুকটার দিকে ঠিক বন্দুকের মতো তাক করে উঁচিয়ে ধরলুম। ভাল্লুকটা কিন্তু ভয় পেয়ে পালাল না। এমনকী, নড়েচড়ে ভয় পাবার ভাব-ভঙ্গিও করল না। আমি অবিশ্যি ঠিক অমনি করে ব্যানডুররিয়াটা উঁচিয়ে ধরে এক-পা এক-পা করে পিছু হটতে লাগলুম। ভাল্লুকটা ট্যাঁও করে না, টুঁও করে না। আমার দিকে যেমন করে চেয়েছিল, তেমনিই চেয়ে রইল। আমি এতক্ষণ প্রায় নিঃসাড়ে পিছু হটছিলুম। যখন দেখলুম, ভাল্লুকটার সত্যিই কোনো সাড়া-শব্দ নেই, দে টেনে দৌড়! ব্যাস ছুটতে গিয়েই চিতপটাং। ঝোপের মধ্যে বেটপকা পায়ে কিছু জড়িয়ে গেল! লাগল কি লাগল না সে-কথা ভাববার সময় কই! সামনে সাক্ষাৎ যমদূত! হাতের ব্যানডুররিয়াটা কোনোরকমে সামলে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। এক বুক নিশ্বাস নিয়ে আবার ছুটতে গেলুম। পারলুম না। দেখলুম, যেদিক দিয়ে পালাবার ফাঁক খুঁজছি, ভাল্লুকটা এখন সেইদিকেই ঘাপটি মেরে বসে আছে! আশ্চর্য!

ঠিক এইসময়ে আমার মনের অবস্থা যে কী, তা খুলে না-বললেও তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝে নিতে কষ্ট হবে না। আমি ভেতরে-ভেতরে এমন ভড়কে গেলুম যে, এখন কী করব সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। মনে হল, ভাল্লুকের খপ্পর থেকে রক্ষা পাওয়ার আর বোধ হয় পথ নেই। আমি ভাল্লুকের ফাঁদে পড়েছি। ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়ে এমনি করে ছটফটিয়ে মরতে হবে। আর সে-মরণ যে কী কষ্টের, তা এখন কেউ না-বললেও, বুঝে নিতে কষ্ট নেই। কিন্তু সেভাবে তিলে তিলে আমি মরতে চাই না। তাহলে কী করা? ভাল্লুকটার সঙ্গে লড়াই করব? আমার বয়েসটা যদি ঠিক-ঠিক মনে করতে পারো, মনে করতে পারো—আমি তোমাদেরই মতো ছোট্ট, তবে নিশ্চিত জেনো, ভাল্লুকের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই করা আমার সাধ্যে কুলাবে না। ভাবো তো একবার ভাল্লুকের সেই দশাসই চেহারাটার কথা! উফ! কী ভয়ংকর মূর্তি! সত্যি, যেন একটা কালো যম! এই গভীর জঙ্গলে, এমনি এক কেলেকিষ্টি যমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট ছেলে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, এ-ছবিটা কল্পনা করলে, তোমার গায়ে কাঁটা দেবে না?

আপাতত আমি বন্দি। অর্থাৎ এই ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে পালাবার আমি আর কোনো উপায় দেখছি না। কেননা, ভাল্লুকটা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে স্থির নজর রেখেছে আমার ওপর। একেই বোধ হয় বলে নজরবন্দি!

না, এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মানুষ! একটা কিছু করতেই হয়! এই কথা মনে হতেই, একটা দুরন্ত দুঃসাহস আমার বুকের ভেতরে নাড়া দিয়ে উঠল। আমি শেষমেশ ভাল্লুকটার দিকেই এগিয়ে গেলুম। বলে রাখা ভালো, আমার হাতের ব্যানডুররিয়াটাকে আর বন্দুক বানাতে সাহস হল না। ওটা যেমন বাজনা আছে, তেমনিই থাক। কিন্তু যতই এগিয়ে যাচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে, আমার শেষসময় বুঝি ঘনিয়ে এল! এই বুঝি ভাল্লুকটা লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে! শত্রুকে ঘায়েল করার এমন সহজ সুযোগ তার জীবনে বুঝি বা আর কোনাদিন আসেনি, আসবেও না।

কিন্তু ঠিক এইসময়ে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে ভাল্লুকটা কোথায় তেড়ে আসবে, তা নয়, পিছিয়ে যাচ্ছে। এ আবার কী ধরনের কৌশল! আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। ভাল্লুকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি পিছু হটলুম। ভাল্লুকটাও সামনে হেঁটে এল। আমি থামলুম। ভাল্লুকটাও থামল। আমি বাঁ দিকে গেলুম। ভাল্লুকটাও বাঁয়ে ফিরল। আমি ডাইনে হাঁটলুম। ভাল্লুকটাও ডাইনে হেলল। তাজ্জব ব্যাপারতো!

এখন আমার কী করা উচিত? মাথায় আসছে না কিছুই! নিস্তব্ধ চারিদিক। সেই নিস্তব্ধতারও একটা রহস্যময় শব্দ আমার কানে বাজছে। এখন জঙ্গলের সেই শব্দের সঙ্গে আমার বুকের ভেতরের ভয়ের শব্দটাও যেন একাকার হয়ে গেছে! অদ্ভুত একটা অবস্থা। সেই অবস্থায় নিশ্চুপ আর নিশ্চল হয়ে আমি ওই ভাল্লুকটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর আমার সঙ্গে তাল রেখে ভাল্লুকটাও দাঁড়িয়ে রইল অনড় হয়ে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড হয়ে গেল! হল কী, বেটপকা আমার হাত লেগে ব্যানডুররিয়ার একটা তার ঝন করে বেজে উঠল। চমকে গেল বোধ হয় ভাল্লুকটা। সে একটু চনমন করে নড়ে-চড়ে উঠল। তার উৎসুক চোখ দুটো এখন আমার মুখের ওপর থেকে সরে ওই ব্যানডুররিয়াটার ওপর গিয়ে পড়ল। সে রেগে গিয়ে আমার হাতের এই বাজনাটা দেখছে, না, শব্দ শুনে অবাক হয়ে চেয়ে আছে, তা আমি কেমন করে বলি! কিন্তু ব্যানডুররিয়ার এই ঝন শব্দটা আমার এই মুহূর্তের ভয়ের ভাবনাগুলিকে কেমন যেন হালকা করে দিল নিমেষের মধ্যে। আমার তক্ষুনি মনে হল, এখন এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে না-থেকে, মরবার আগে, শেষবারের মতো ব্যানডুররিয়াটা বাজাতে তো পারি! তুমি হলে এ-অবস্থায় কী করতে জানি না। কিন্তু আমি বাজালুম। আমার সাধের এই বাজনাটা নিয়ে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার মায়ের গাওয়া সেই গানটির সুর বাজালুম। নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকের ওপর আমার বাজনার সুর কেমন এক অদ্ভুত শোনাচ্ছে! এ যেন আমি বাজাচ্ছি না। আমার হাত ধরে বুঝি বা অন্য কেউ বাজিয়ে দিচ্ছে। আমি চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছি আমার মাকে। দেখতে পাচ্ছি, আমার বাবাকে। মনে হচ্ছে, তাদের হাসি-হাসি মুখ দুটি আমার কপালের কাছে, একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছে। তাদের ঠোঁটগুলি এইমাত্তর যেন আমার কপাল ছুঁয়ে গেল। আমি চমকে

উঠলুম। চমকে চেয়ে ফেলতেই আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। না, তারা কেউ নেই। আমার মা, আমার বাবা কেউ-ই না।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলুম আর-এক দৃশ্য দেখে। দেখলুম, সেই ভাল্লুকটা আমার বাজনার তালে-তালে সামনের দু-পা ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে! নাচছে! এ কি বিশ্বাস করবার কথা? না সম্ভব? এ গভীর জঙ্গলের এক হিংস্র জীব তার শত্রুকে হাতে পেয়েও মারছে না, তারই বাজনার তালে নাচছে, এ-কথা বললে কোন মানুষ আমাকে পাগল না বলে! কিন্তু আমি যা স্পষ্ট দেখছি, তাকে মিথ্যে বলি কেমন করে! আমি দেখছি, ভাল্লুকটা আমার বাজনার সুরে যেন বিভোর হয়ে গেছে! এখন তাকে দেখলে মনে হয়, নাচ ছাড়া ও বুঝি জগতের আর কিছুই জানে না। আর ঠিক এই মুহূর্তে আমি ছাড়া এই বন্য-জন্তুটার বুঝি আর-কোনো বন্ধুই নেই! আমারও এতক্ষণ ভাল্লুক নামে যে-জন্তুটাকে মনে হয়েছিল নৃশংস এক জীব, এখন তার নাচ দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছে, এই নিঃসঙ্গ, নির্জন বনে এমন চমৎকার বন্ধু বুঝি আর হয় না। কোথায় গেল আমার মরণের ভয়! কোথায় গেল আমার বিপদের ভাবনা! আমি এখন নিজেই নাচতে শুরু করে দিয়েছি। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! এখন এই বনের ভাল্লুকের সঙ্গে ইসতাসি নামে এই ছোট্ট ছেলেটার নাচ দেখলে, তোমার মনে হতে বাধ্য, ইসতাসি নিজেই বুঝি এক বন্য প্রাণী!

কে জানত, ওই নৃশংস জীবটার সঙ্গে আমার এ আনন্দের উচ্ছ্বাস একটুক্ষণের জন্যে। কে জানত, এমন এক গভীর জঙ্গলে অমন অসতর্ক হয়ে হই-হুল্লোড় করতে নেই। যে-কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে! সত্যি বলতে কী, এমন আশঙ্কা আমার মনে একেবারেই আসেনি। আমি কেমন যেন সব ভুলে গেছি। ভাল্লুকটার নাচ দেখে, নিজেও নাচতে-নাচতে তার একদম কাছে চলে এসেছি। তারপরেই সব শেষ! অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত পড়ল আমার ঘাড়ের ওপর। চকিতে আমার দু-চোখ ভরে অন্ধকার নেমে এল। আমি পড়লুম, না, মরলুম, কিছুই জানি না।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি মরিনি। মরলে কী আর আমার এ-গল্প তোমরা শুনতে পেতে! আমি আঘাত পেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম। পড়ে-পড়ে অচৈতন্য হয়ে ধুঁকছিলুম। আমার যখন চেতনা ফিরে এল, আমার চোখে তখন আলোর রোশনাইটা ভারি অসহ্য লাগছিল। ভালো করে চাইতে পারছিলুম না। সব যেন কুয়াশার মতো ঝাপসা। ভাবতে পারছি না কিছুই। যেন একটা জবুথবু জীবন্ত জঞ্জাল পড়ে আছি জঙ্গলে।

একটু-একটু করে যখন আমার চোখের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, আমি ধীরে-ধীরে মনে করতে পারছিলুম আমার নিজের কথা, তখন যেন পর্দায় ভেসে ওঠা ছবির মতো আমার চোখে ফুটে উঠেছিল প্রথম সেই ভাল্লুকটার ছবি। আমি পরিষ্কার মনে করতে পারছি, তার সেই নাচের সেই উদ্ভট চেহারাটা! সে নাচছিল আমার ব্যানডুররিয়ার সুরে তাল মিলিয়ে। আমি মনে করতে পারছি, এমনই সময়ে আমার ঘাড়ের ওপর কে যেন প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। আমি কিছু খেয়াল করার

আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলুম। কিন্তু আমার শেষ মুহূর্তের শেষ দৃষ্টিটি ঠিক মনে করিয়ে দিচ্ছে, এ-আঘাত আমায় সেই ভাল্লুক করেনি। যে করেছে, তাকে আমার দেখতে পাওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। কারণ সে আমায় আক্রমণ করেছিল পিছন থেকে। আর আক্রমণ এমনই অতর্কিতে যে, আমার তখন করার কিছুই ছিল না।

হঠাৎ বুকটা চমকে উঠল। কে যেন আমার বুকের মধ্যে ধাক্কা মেরে ওতিয়ার মুখটা মনে পড়িয়ে দিল। আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলুম। আমার ব্যানডুররিয়াটা হাতের কাছে দেখছি না। কষ্ট হচ্ছে, তবু উঠে দাঁড়ালুম। খুঁজতে লাগলুম বাজনাটা। দেখতে পেলুম, একটু দূরে ছিটকে পড়ে আছে সেটা। আমি হন্তদন্ত হয়ে সেটা তুলে নিতে গিয়ে দেখি, ভাল্লুকটা আহত অবস্থায় শুয়ে আছে সেটার পাশে। তার সারা গায়ে ক্ষত। রক্ত। সে যেন আমার অপেক্ষায় সেটা আগলে বেঁচে আছে। বুঝতে বাকি রইল না, সে কোনো হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াই করেছে। হয়তো আমাকে বাঁচাবার জন্যে। অথবা ব্যানডুররিয়াটা রক্ষা করতে। আমি তার কাছে ছুটে গেলুম। আমার দিকে ভারি করুণ দৃষ্টিতে চাইল সে। উঠে বসল। আমার চোখ থেকে তার চোখ সরিয়ে নিয়ে ওই সামনের ঝোপটার দিকে তাকাল। আঁতকে উঠলুম। দেখলুম, সেই ঝোপে একটা চিতা বাঘ ক্ষতবিক্ষত হয়ে মরে পড়ে আছে। দেখে মনে হল, কিছুক্ষণ আগে বনের দুই জন্তুর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়ে গেছে এইখানে। গাছের ডালপালা ঝোপঝাড় ভেঙে ছড়িয়ে একেবারে ছয়লাপ! বুঝতে পারলুম, এই চিতাটাই তখন আমায় আঘাত করেছিল। আর তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যেই ভাল্লুকটাও লাফিয়ে পড়েছিল তার ঘাড়ে। দেখে বুঝতে কষ্ট নেই, এ-লড়াইয়ে জিতেছে ভাল্লুকটা। চিতা মরেছে, আমি বেঁচেছি। সুতরাং এখন নিশ্চিত হয়ে গেছি ভাল্লুকটা আমার বন্ধু। আনন্দের উত্তেজনায় আমি ভাল্লুকটার গলা জড়িয়ে ধরলুম। তার ক্ষত জায়গাগুলিতে হাত বুলিয়ে দিলুম। সে উঠে দাঁড়াল। তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে খুশির আনন্দে আমার বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। সে হাঁটল। সেই মৃত চিতাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, বাঘটা সত্যি মরেছে কি না। ছিটকে-পড়া ব্যানডুররিয়াটা তুলে নিয়ে আমিও পৌঁছে গেলুম চিতাটার সামনে। বিশ্বাস করতে পারছি না, এখন আমি বনের এক দুর্ধর্ষ জীবন্ত প্রাণী ভাল্লুকের পাশে দাঁড়িয়ে আর-এক ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী চিতাবাঘের মৃতদেহটার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছি। চিতাটার একটা চোখ ফুটো হয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বুকের চামড়াটা ভাল্লুকের নোখের তীক্ষ্ণ আঁচড়ে দু-ফাঁক হয়ে ঝুলে পড়েছে। মনে হচ্ছে, কেউ যেন কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার বুকটা ফালা করে দিয়েছে। গায়ে কাঁটা দিল আমার। চিতাটাকে দেখতে-দেখতে তাচ্ছিল্যে চোখ ফেরাল ভাল্লুকটা। ঘুরে দাঁড়াল। আমায় দেখল। কী বুঝল জানি না। কিন্তু আমার মনে হল, ও যেন বলতে চাইছে, 'ভয় নেই ইসতাসি, আমি যতক্ষণ আছি তোমার গায়ে কেউ একটি আঁচড়ও কাটতে পারবে না।'

আমার তখন বলতে ইচ্ছে করল, 'হে আমার প্রিয় ভাল্লুকবন্ধু, তোমার এই দয়ার কথা আমি কোনোদিনই ভুলব না। তুমি ছিলে বলেই আমি বেঁচেছি। তোমাকে দেখে আজ আমি ভাবতে পারছি, বনের হিংস্র প্রাণী শুধু মানুষের প্রাণ নেয় না, তাকে ভালোওবাসে। দুঃখ এই, আমি তোমার এই ভালোবাসার প্রতিদান তো কিছুই দিতে পারব না । এ প্রতিদান আমি আমার মানুষবন্ধু ওতিয়াকেও যে দিতে পারিনি। হঠাৎই সে হারিয়ে গেল এই জঙ্গলে। তাকে আর খুঁজে পেলুম না। খুঁজতে-খুঁজতে আমি তোমার দেখা পেয়েছি। তুমি কি পারো না আমাকে একটু সাহায্য করতে?'



...কিছুক্ষণ আগে বনের দুই জন্তুর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়ে গেছে এইখানে।

আমার মনের এত কথা ভাল্লুক বুঝল কি না জানি না। আবার দু-পায়ে ভর দিয়ে আমার মুখের সামনে সে উঠে দাঁড়াল। চিতাকে খুন করার রক্তে তার পায়ের থাবাদুটো এখনও রাঙা হয়ে আছে। ধারালো নোখগুলো কী ভয়ংকর তীক্ষ্ণ। দু-পায়ের সেই থাবা দিয়ে আচমকা সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। এবার বুঝি আমার পালা! বুঝি আমার প্রাণ নেয়! আমি আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠার আগেই, সে আমাকে নরম স্পর্শে বুকের মধ্যে টেনে নিল। সে বুকে ভালোবাসা, শুধু ভালোবাসা! আতঙ্ক নয়, আনন্দে চিৎকার করে উঠলুম আমি। তারপর তার বুকের ভেতরে হাবুডুবু খেতে-খেতে আমিও তাকে জড়িয়ে ধরার জন্যে আমার ছোট্ট দুটি হাত মেলে দিলুম। পারলুম না তাকে জড়িয়ে ধরতে। কারণ, বিরাট ই জন্তুটাকে ধরার জন্যে আমার এই হাতদুটি নিতান্তই ছোট্ট। হেসে উঠলুম আমি। হাসতে-হাসতে ওর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমার ব্যানডুররিয়ার তারে ঝংকার তুলে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভাল্লুকটাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছি। ভাল্লুকও ঘুরছে আমার সঙ্গে। হয়তো আমার ব্যানডুররিয়ার শব্দের তালে সেও দুলছে! ভারি একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুচ্ছে এখন আমার ব্যানডুররিয়ার তারে, 'জোরো—জোরো।' বাজনার শব্দটাকে আমার মুখে লুফে লুফে আমিও গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগলুম, 'জোরো—জোরো।' তখনই আমার মনে হল, আচ্ছা, ভাল্লুকটাকে যদি 'জোরো' বলে ডাকি। মনে হতেই, ছুটতে-ছুটতে আমি ভাল্লুকটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লুম। গলা ছেড়ে ডাক দিলুম, 'জোরো—'

দেখতে পেলুম, আমার ডাক শুনে ভাল্লুকটার ছোট্ট দুটো চোখ খুশিতে চকচক করেছ। আমি আর একবার ডাকতেই সে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে আমার কাছে প্রায় লাফিয়ে ছুটে এল। আমি ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। তারপর আমার মাথাটা ওর মাথায় ঠেকিয়ে ডাকতে লাগলুম, 'জোরো, জোরো, জোরো।'

ভাল্লুকটা হাঁপাচ্ছে। তার বুকের শব্দটা আমি শুনতে পাচ্ছি। তার নিশ্বাসে খুশির উত্তেজনা। সে-নিশ্বাস এত গরম!

৯

মনে হচ্ছে, কতদিন পরে তোমাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল। এখন আমি অন্য এক ইসতাসি। ওই বনজঙ্গল পেরিয়ে আমি এখন শহরের মানুষ। ওই বন পেরিয়ে কেমন করে যে আমি শহরে এসেছি, সে আর এক গল্প। হ্যাঁ, আমার বন্ধু জোরোই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন সে-ই আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী। জোরোকে নিয়ে আমার আবার শুরু হয়ে গেছে পথে-পথে আর এক নতুন জীবন। ও নাচে, আমি বাজনা বাজাই। তোমরা শুনলে অবাক হবে, আমার এখন অনেক পয়সা। আর তা সব জোরোর জন্যে।

এখন যে শুধু জোরো আমার ব্যানডুররিয়ার তালে-তালে নাচে তাই নয়। খেলা দেখায়। অনেকরকম খেলার ভেলকি দেখাতে পারে সে। সামনের দু-পা উঁচিয়ে দাঁড়ানোটা তো সে টুসকি মারলেই করতে পারে। কিন্তু পেছনের পা শূন্যে তুলে, আর্চ হয়ে, মাথাটা নিচু করে সে যখন হাঁটে, দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে। ওই অবস্থায় হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ এমন ভলট দেয় যে, দেখলেই হাততালি।

হ্যাঁ, এখন অনেক হাততালি আমার কপালে জুটছে। এখন যেন আমার আবার সেই যাযাবরের জীবন শুরু হয়ে গেছে। আমি এখন এক ভাল্লুক-নাচিয়ে যাযাবর। সত্যি বলছি, এই ব্যানডুররিয়া বাজিয়ে পথে-পথে আমি যে এইভাবে জোরোর নাচ দেখিয়ে বেড়াব এটা আমি কল্পনাই করতে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পারিনি কোনোদিন। একদিন হঠাৎই ব্যাপারটা ঘটে গেল। সেদিন রাস্তার ধারে বসে নিজের খেয়ালেই আমি ব্যানডুররিয়াটা বাজাচ্ছিলুম। সেই বাজনার তালে-তালে এমন সব আজব কাণ্ড করছিল জোরো যে, তাই দেখে আমি নিজেই তো থ। হঠাৎ দেখি, তার সেই আজব কাণ্ডকারখানা দেখতে-দেখতে একটি একটি করে অগুনতি লোক আমার সামনে এই পথের ওপর জমে গেল। জোরোকে দেখে তারা হেসে কুটোকুটি। আনন্দে লুটোপুটি। আমার বাজনার তালে তারাও নাচতে লাগল। চেঁচাতে লাগল, 'বাহাবা! বাহাবা!' আর আমিও মনে-মনে জোরোকে বলতে লাগলুম, 'বহুত আচ্ছা! বহুত আচ্ছা!'

হ্যাঁ, আমি এখন আর ভাবতেই পারি না, এই বন্য জন্তুটা একটা নৃশংস জানোয়ার। এখন আমার মনে হয়, বনের এই ভাল্লুকটা যেন আমার অনেক কাছের এক আপনজন। এই পৃথিবীতে ও জন্ম নিয়েছে বুঝি আমারই জন্যে। হয়তো তাই। এই প্রাণীটা যদি না থাকত, ওই দুর্গম বনের বিপদ থেকে কে আমাকে রক্ষা করত! কিংবা আজ আমাকে কে এত পয়সা দিত!

এখন আমার কত পোশাক হয়েছে। রঙের ছড়াছড়ি। লাল নীল হলদে সবুজ। কত রঙের পোশাক। যখন যেটা মন চায় পরি। আর পরতে-পরতে ভাবি, আমার সেই জঙ্গলের বন্ধু ওতিয়ার গাছপাতা-সাজানো সেই পোশাকের মতো আমার এই পোশাক কি অত সুন্দর!

হঠাৎ-হঠাৎই মনে পড়ে যায় আমার ওতিয়ার কথা। হঠাৎ-হঠাৎ তার সেই মুখের হাসিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার সেই গান, কিংবা কলকল করে কথা বলার মিষ্টি শব্দগুলি আমার কানে বেজে উঠলে আমার অশ্রুর ফোঁটাগুলিকে আমি ধরে রাখতে পারি না। তখন আমায় দেখে এই বনের ভাল্লুকটা যে কী ভাবে, জানি না। সে কী বুঝে যে এই সময়ে আমার হাতের ওপর তার মাথাটি এগিয়ে দেয়, তা-ও আমি জানি না। শুধু আমার চোখের জল সামলে নিয়ে আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। আর অস্পষ্ট গলার স্বরে বলি, 'পারিস না তুই ওতিয়াকে খুঁজে দিতে? পারিস না আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে?'

আমার ইচ্ছে আছে একটা গাড়ি কিনব। ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। একটা-একটা করে এখন এতসব জিনিসপত্তর জমে গেছে যে, আর গাড়ি না-হলেই নয়। আমার পিঠে বাঁধা এই ব্যাগটা আর কাজে আসছে না। তাছাড়া পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে মুসাফিরের মতো ঘোরাঘুরি করতেও বেশ ঝামেলা। আমার এই তাঁবুটাই দ্যাখো কী ভারী! অবিশ্যি তাঁবুটা জোরোই পিঠে নিয়ে বয়ে চলে। দরকার মতো খাটিয়ে নিতে আমার তেমন কষ্ট হয় না।

আমি যে ঘোড়ায়-টানা গাড়ির কথা বলছি, সেই গাড়িগুলো দেখতে কিন্তু দারুণ। টায়ার-আঁটা চারটে চাকার ওপর ফ্রেমে এঁটে কে যেন একটা বাক্স বসিয়ে রেখেছে। এতে যত খুশি জিনিসপত্তর তো রাখতে পারোই, তার ওপরে বেশ গুছিয়ে বিছানা পেতে ঘুম দিতেও দিব্যি আরাম। গাড়ির দরজাটা পেছনদিকে। ওই তোমাদের পুলিশ-ভ্যানে যেমন থাকে আর কী! সামনে বসে তুমি গাড়ি

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চালাও গড়গড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে। ছোটো এক দেশ থেকে আর-এক দেশে! তবে জোরোকে নিয়ে মুশকিল আছে। গাড়ির ভেতরে তো আর সে ঢুকতে পারবে না। যা কুঁদো। অবিশ্যি গাড়ির চালের ওপর ইচ্ছে করলেই জোরো উঠে পড়তে পারবে। চালে বসেই সে দেশে-দেশে ঘুরতে পারবে।

কদিন হল আমি এক কারনিভলে জোরোর খেলা দেখাতে এসেছি। এখানেই তাঁবু গেড়েছি। এ যেন নানান খেলার মজার মেলা। যত পারো আনন্দ করে নাও। একটা মস্ত মাঠে কারনিভল সাজিয়ে কত খেলাই না দেখানো হয়। এখানে ম্যাজিক দ্যাখো, ভেলকি দ্যাখো, গান শোনো, নাচ দ্যাখো—যা খুশি তাই। ইচ্ছে করলে ওই জায়েন্ট হুইলে চড়ে যত খুশি চরকি খেতে পারো। মেরি-গো-রাউণ্ডে ঘুরপাক খাও। মিনি-রেলে চেপে যেখানে খুশি চলে যাও। আমিও এসেছি এখানে। আমি জানতুম, এখানে জোরোর খেলা দেখিয়ে আর আমার ব্যানডুররিয়া শুনিয়ে বেশ কিছু পয়সা হবে। গাড়িটা তো কিনতে হবে!

কিন্তু আমি যা ভাবতে পারিনি এ যে তাই হল। জোরো যে এত তাড়াতাড়ি সবার এমন প্রিয় হয়ে উঠবে, এ যে আমার কল্পনার বাইরে। কারনিভলের সব ভিড় যেন উপচে পড়ছে জোরোর খেলা দেখবার জন্যে। কারনিভল জুড়ে অত যে সব মজার কাণ্ড, সেদিকে কেউ ছোটে না। ছুটে আসে আমার দিকে। খেলা দেখাব কী, ভিড় সামলাতেই হিমশিম। আর তারপরেই হল উলটো বিপত্তি! অন্য যারা খেলা দেখাতে এসেছে, তারা আমার ওপর ভীষণ চটিতং! আমার ওপর ভীষণ হিংসে! বটেই তো! ব্যাবসা করতে এসে মার খেলে, কার আর মন-মেজাজ ঠিক থাকে বলো! সুতরাং আমি যাতে পাততাড়ি গুটিয়ে মানে-মানে কেটে পড়ি তার জন্যে কুচক্রীরা ফন্দি আঁটতে বসল। কে জানে, হয়তো আমায় মেরেই বসে।

কথাটা কানে এল আমার আজ। আমার এত যে উৎসাহ, এত যে খুশি, সব যেন চুপসে গেল নিমেষে! দুঃখে মনটা মুষড়ে পড়ল। আমি যেন কেমন হতাশ হয়ে পড়লুম। কী করব এবার?

যখনই আমার মনটা এমনি দুঃখ আর হতাশায় ভেঙে পড়ে, তখনই যেন আমার কানে-কানে কে বলে যায়, 'ভেঙে পড়ছ কেন ইসতাসি? ওই তো তোমার বন্ধুটি সঙ্গে রয়েছে! তোমার ব্যানডুররিয়া। ওর তারে তোমার হাতের আঙুলগুলি আলতো ছোঁয়ায় টান দাও, তোমার সব দুঃখ শেষ হবে।'

আমি তখন সত্যিই ব্যানডুররিয়াটা হাতে তুলে নিই। বাজাই। আজও তাই খেলার শেষে তাঁবুতে ফিরে, হাতে তুলে নিলুম আমার ব্যানডুররিয়া। তার একটি-একটি তারে ঝংকার টেনে ভাবতে লাগলুম, সত্যি ভারি প্রিয় আমার এই বন্ধুটি। কত গভীর সংকট থেকে সে আমাকে রক্ষা করেছে। কত মৃত্যুর হাত থেকে সে আমাকে বাঁচিয়েছে। আর এই বাজনাটার জন্যেই তো আজ আমি জোরোকে পেয়েছি। জঙ্গলের অন্ধকার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এক আশ্চর্য ভাল্লুক! আর ওতিয়া?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এখন রাত। ব্যানডুররিয়ার তারে-তারে সুর বেজে ওঠে আমার হাতের স্পর্শে। আমার গলা গেয়ে ওঠে ওতিয়ারই সেই গান :

দুঃখ কীসের বন্ধু
আমি তো আছি,
তোমারই যে পাশে-পাশে
এত কাছাকাছি।

গাইতে-গাইতে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি এই মুহূর্তে। আমার গানের শব্দগুলি ভারি ধীরে-ধীরে এই রাতের অন্ধকারে গুনগুনিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। মনে পড়ে যায়, আমার সেই ফেলে-আসা দিনগুলির কথা। আমার মা, আমার বাবা, আমাদের সেই দল। মনে পড়ছিল, সেই ভয়ংকর রাতের কথা। সেই রাতে প্রথমে মায়ের গানের সঙ্গে ব্যানডুররিয়া বাজাচ্ছিলুম আমি। তারপর সেই বন্দুকের গুলি। বোমা, পিস্তল, পুলিশ। তারপর আনাতিদাদার সঙ্গে—

'ইসতাসি!'

'কে!' আমি চমকে উঠলুম। আমার গান স্তব্ধ হয়ে গেল।

'ইসতাসি!'

আমি তাঁবুর বাইরে ছুটে এলুম!

'ইসতাসি!'

অত্যন্ত চেনা গলা আমার! অথচ অন্ধকার রাতে আমি তখনও ভালো করে চিনতে পারিনি। তাই ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলুম, 'কে?'

'আমি।'

হঠাৎ আমার চোখের ওপর একঝলক আলো কে যেন ছুড়ে দিল। আমি দেখতে পেয়েছি। আমি চিনতে পেরেছি। আমি চিৎকার করে উঠেছি, 'আনাতিদাদা—।' ছুটে গেলুম তার কাছে। জড়িয়ে ধরলুম। কেঁদে ফেললুম। তারপর দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলুম না।

আনাতিদাদাই প্রথমে কথা বলল, 'এতদিন কোথায় ছিলি ইসতাসি?'

উপছে-পড়া চোখের জল সামলাতে-সামলাতে আমিও জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমিই-বা কোথায় ছিলে আনাতিদাদা?'

আমার মুখের দিকে চাইল আনাতিদাদা। তারপর বলল, 'জেলে।'

আমি শিউরে উঠলুম।

'পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলুম। ওরা আমার পায়ে গুলি মেরে আমায় কাবু করে ফেলে। তারপর ধরে নিয়ে যায়।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি বুঝতে পারলুম,আনাতিদাদার সেই গুরুগম্ভীর গলার স্বর কেমন যেন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। সেই ক্ষীণস্বরে আনাতিদাদা আবার বলল, 'কদিন আগে ছাড়া পেয়েছি। পয়সা নেই। তাই কারনিভলে ম্যাজিক দেখাতে এসেছি। এখন আর তেমন পারছি না। শরীরটা গেছে। পায়ে গুলি লেগে যে ঘা হয়েছিল, সেটা বিষিয়ে গেছে। তাই আমার ম্যাজিক দেখার লোকই জুটছে না। তার ওপর শুনলুম, একটি ছোট্ট ছেলে ভাল্লুক-নাচ দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। এই কারনিভলে লোকে দল বেঁধে তার খেলাই দেখতে ছুটছে। অন্যের খেলা কেউ দেখছে না। আমার কৌতূহল হল, কে ছেলেটি! কী এমন খেলা! দেখতে গেলুম। দেখে চমকে উঠলুম। এ যে ব্যানডুররিয়া হাতে আমার ইসতাসি! আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলুম। কিন্তু না, তখন আর কিছু করিনি। শুধু চুপিচুপি ইসতাসির আস্তানাটা খুঁজে বার করেছি। ইসতাসিকে অবাক করে দেব বলে, এই অন্ধকারে, লুকিয়ে-লুকিয়ে এখন এসেছি। এসে দেখছি, আমার চেয়েও এক বড়ো জাদুকরকে।' বলে আনাতিদাদা আমার মাথায় হাত রাখল। আমায় কাছে টেনে নিয়ে আদর করে চুমু খেল। তারপর হাঁপাতে লাগল। আমার মনে হল, আনাতিদাদার হাত-পাগুলো থরথর করে কাঁপছে। আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার কষ্ট হচ্ছে, আনাতিদাদা?'

'কই? না।'

আমি বুঝতে পারলুম, আনাতিদাদা দাঁড়াতে পারছে না। তার পিঠে-বাঁধা ম্যাজিকের ঝুলিটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে বললুম, 'এসো, এসো, ভেতরে এসো।'

'হ্যাঁ, তাই চ। একটু বসে যাই।'

ভেতরে এল আনাতিদাদা। তাঁবুর ভেতর জ্বলন্ত আলোয় আনাতিদাদার মুখখানা ভালো করে দেখে আমি শিউরে উঠলুম।

'তোমার এ কী চেহারা হয়েছে আনাতিদাদা?'

'আর বাঁচব না বেশিদিন।'

'ও-কথা বোলো না আনাতিদাদা।'

'গুলির বিষে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেছে যে।'

হাঁটুর ওপরে ব্যান্ডেজ-বাঁধা জায়গাটা আনাতিদাদা দেখাল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'এখন কোথায় আছ?'

'পথে।' বলেই হেসে উঠল আনাতিদাদা। হাসি দেখে বুঝতে কষ্ট হল না, আনাতিদাদার কিছুই নেই।

আমি বললুম, 'আর পথে-পথে তোমায় ঘুরতে হবে না আনাতিদাদা। আজ থেকে মনে করো, আমার তাঁবুই তোমার নিজের তাঁবু।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'ইসতাসি!' বুকের ভেতর থেকে একটা চাপা আনন্দে আমার নাম ধরে ডাক দিল আনাতিদাদা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার চোখের দিকে চাইল। ভারি নিশ্চিন্ত সেই চাউনি।

আমি আবার বললুম, 'তোমাকে আমি যেমন করেই হোক ভালো করে তুলব, আনাতিদাদা।'

'কী করে পারবি?'

'যেমন করে তুমি পেরেছে আমাকে ব্যানডুররিয়া শেখাতে।'

'হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিলুম তোর বাজনা। এখন কী চমৎকার বাজাস!' বলতে-বলতে একঝিলিক মুচকি হাসি আনাতিদাদার ঠোঁটে ঢেউ খেলে গেল। আমি দেখলুম, সে-হাসিতে জৌলুস নেই। যেন কষ্ট মেশানো।

আমি বললুম, 'আনাতিদাদা, বিছানায় শুয়ে পড়ো। তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

আনাতিদাদা বলল, 'না, তেমন না। তবে শুতে আপত্তি নেই।'

আমার খাবারের কৌটোতে দুধ আর রুটি ছিল। এনে বললুম, 'খেয়ে নাও।'

'তোর?'

'আমি খেয়েছি।'

'না কি লুকোচ্ছিস?'

'তোমাকে কখনো মিথ্যে বলিনি আনাতিদাদা।'

'তাহলে খেতে পারি, দে!'

আনাতিদাদা দুধ আর রুটি খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করল, 'গান শিখলি কোথায়?'

'নিজে-নিজে।'

অবাক হল আনাতিদাদা, 'বলিস কী! নিজে-নিজে এত সুন্দর শিখেছিস?'

'সব তো তোমারই জন্যে।' আমি উত্তর দিলুম।

'ভাল্লুকটা? কিনেছিস?'

'না!'

'তবে?'

'জঙ্গল থেকে পেয়েছি।'

'হঠাৎ-হঠাৎ এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যায়, ভাবাই যায় না।'

আমি বললুম, 'তোমার সঙ্গেও দেখো, হঠাৎ কেমন দেখা হয়ে গেল। এও তো এক আশ্চর্য ঘটনা।'

আনাতিদাদা উত্তর দিল, 'আশ্চর্য তো বটেই। কেননা, আমার ঠিক মৃত্যুর আগে, আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আনাতিদাদার কথা শুনে আমার বুকটা ছ্যাঁত করে চমকে উঠল। আমি বললুম, 'ও-কথা কেন বলছ আনাতিদাদা? তুমি মরবে কেন? কে তোমাকে মরতে দেবে?'

আনাতিদাদা আমার মুখের দিকে চাইল। আমার একটা মস্ত বড়ো ছায়া তাঁবুর গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার সেই ছায়ার মতো, আনাতিদাদাও নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ!

হঠাৎ আমিই সেই নিস্তব্ধতা ভাঙলুম। বললুম, 'ঘুমিয়ে পড়ো।'

আনাতিদাদা জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাজনাটা কই?'

'শুনবে?'

'শুনব। বাজনার সঙ্গে তোর গান।'

আমি গাইলুম। অবাক হয়ে আমার গান শুনতে-শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল আনাতিদাদা। তার ঘুমে-নিজঝুম মুখখানি দেখতে-দেখতে কত কথাই না মনে পড়ে যায়। মানুষটার সেই লোহার মতো শক্ত-পুরুষ্টু চেহারাটা যেন ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে। এই এতখানি চওড়া বুক, সেই শক্ত দুটি হাত, সেই জীবন্ত দূটি চোখ, সবই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। এখন একটা হাড়-জিরজিরে মানুষের কঙ্কাল যেন আনাতিদাদা। বড়ো কষ্ট হল। মনে-মনে ভাবলুম, এমন-একটা নির্দোষ মানুষকে গুলি মারতে হাত কাঁপল না!

সকালে ঘুম ভাঙল যখন, আনাতিদাদাকে বললুম, 'আজ থেকে তোমাকে আর কষ্ট করে ম্যাজিক দেখাতে হবে না। তুমি তাঁবুতে শুয়ে থাকো। খেলা দেখাব আমরা, আমি আর জোরো। পয়সা আনব। তোমাকে আবার আগের মতো ভালো করে তুলব। শুরু করব নতুন জীবন। একটা গাড়ি কিনব। গাড়ি করে দেশে-দেশে ঘুরব। তখন আবার তুমি ম্যাজিক দেখাবে। জোরো নাচের ভেলকি দেখাবে আমি গান গাইব, ব্যানডুররিয়া বাজাব।'

আমার কথাশুনে শুধুই হাসল আনাতিদাদা। কথা বলল না। উঠতেও পারল না। বোধ হয় বন্দুকের গুলি খাওয়া বিষাক্ত ঘা আরও বিষিয়ে উঠেছে আজ। বোধ হয় ব্যথাটা বেড়েছে।

১০

আরও সাতদিন কারনিভল এখানে থাকবে। আরও সাতদিন আমি আর জোরো কারনিভলে খেলা দেখাতে পারব। আরও সাত দিনে আরও পয়সা হবে। আজও যেমন হল।

আজ অবিশ্যি একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়ে গেল। খেলার শেষে সব লোকজন চলে গেলে, আমিও যাব বলে গোছগাছ করছি, হঠাৎ দেখি একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। সে আমার ব্যানডুররিয়ার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রথমটা তেমন গা করিনি। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন দেখলুম,

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তার সেই দৃষ্টি একইভাবে অবাক হয়ে আছে, তখন কেমন সন্দেহ হল। আমি তাকে ডাকলুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'অমন অবাক হয়ে কী দেখছ?'

সে প্রস্তুত ছিল না। একটু থমকে গেল। তারপর বলল, 'বাজনা।'

আমি বললুম, 'ওঃ! বাজাতে ইচ্ছে করছে?'

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল।

আমি বললুম, 'বেশ তো, বাজাও।'

ছেলেটি ব্যানডুররিয়ার তারে হাত দিল। বেজে উঠল টুং-টাং-টুং। তার মুখখানা হাসিতে ভরে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার নাম কী?'

সে বলল, 'জুতসু।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথা থাকো তুমি?'

সে বলল, 'এখানে, এই কাছেই। দিদি নাচ দেখাতে এসেছে কারনিভলে।'

'তুমিও নাচতে পারো বুঝি?'

'ধ্যাত!' ছেলেটি লজ্জা পেল। বলল, 'নাচি না, দিদি নাচে। আমি তালি বাজাই।'

আমি হেসে ফেললুম। একটু জোরেই হেসেছি। আর ঠিক তক্ষুনি কোথা ছিল ছেলেটির দিদি, দৌড়ে এসে গম্ভীর গলায় ডাকল তার ভাইকে, 'জুতসু।'

ভাই চমকে চাইল।

দিদি ধমকে উঠল, 'এখানে কী করছিস?'

'বাজনা বাজাচ্ছি।'

'শিগগির আসবি!'

'একটু পরে যাচ্ছি।'

গলাটা আরও একটু চড়িয়ে দিদি বলল, 'এক্ষুনি আসবি।'

ছেলেটা যাচ্ছে না দেখে আমি বললুম, 'এখন যাও, পরে এসো।'

চলে গেল জুতসু নামে ছেলেটি। আমি জানি না তারপরে কী হল। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতে বসলুম, ছেলেটির দিদি অমন তিরিক্ষি মেজাজে কথা বলল কেন! ও তো কোনো দোষ করেনি!

দেখি, ছেলেটি পরের দিনও এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আবার এলে? দিদি বকবে না?'

সে বলল, 'দিদিকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

আমি বললুম, 'লুকিয়ে? ঠিক করোনি।'

সে বলল, 'তোমাকে আমার ভালো লাগে।'

'কেন?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'তুমি খুব ভালো। কী সুন্দর বাজনা বাজাও তুমি। আমি রোজ শুনি। এটা কী বাজনা?'

'ব্যানডুররিয়া।'

'আমায় শিখিয়ে দেবে?'

'দিদির নাচের সঙ্গে বাজাবে বুঝি?'

'ধ্যাত! ওই আবার নাচ! কেউ দেখেই না। সক্কলে তোমারই বাজনা শোনে আর ভাল্লুকের খেলা দেখে। তোমার ওপর দিদির কী রাগ।'

ছেলেটির এই কথা শুনে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন?'

সে বলল, 'দেখনি, খবরের কাগজে তোমার নাম বেরিয়েছে?'

আমি বললুম, 'আমি জানি না তো।'

'দেখে দিদির গা জ্বলে গেছে। আর অন্য যারা খেলা দেখাতে এসেছে, তাদের কী হিংসে তোমার ওপর। কেউ পয়সাই পাচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'এতে আমার কী দোষ। আমিও তো পয়সা উপায় করতে এসেছি। আমাকে পয়সা উপায় করতেই হবে। আমার আনাতিদাদার খুব অসুখ। তাকে যে আমায় ভালো করতে হবে।'

ঠিক এই সময়ে ছেলেটির দিদি আচমকা এসেছিল। আমি বুঝতেই পারিনি সে এসেই আমার সঙ্গে চোটপাট শুরু করে দেবে। সে হঠাৎই এসেছিল ঝড়ের মতন। ঝড়ের মতন ঝাঁকিয়ে উঠে সে বলেছিল, 'আমি পছন্দ করি না, তুমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলো। তোমার মতলবটা কী, তা আমার জানা আছে।'

আমি বললুম, 'কী জানো? আমি জানতে পারলে খুশি হব।'

ছেলেটির দিদি আরও রেগে উঠল। প্রায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আমিও জানতে পারলে খুশি হব, ওর কানে তুমি কী-মন্ত্র দিচ্ছ!'

আমি বললুম, 'জুতসু আমাকে ভালোবাসে।'

সে বলল, 'আমি তোমাকে অপছন্দ করি।'

আমি থমকে গেলুম। আর কথা বলা যায়! এমন কথা যার মুখ দিয়ে বেরোয়, তার সঙ্গে কথা না-বলাই ভালো। দেখতে পেলুম, ছেলেটির মুখখানি ভারি করুণ হয়ে আছে আমার দিকে চেয়ে। আমার কেমন মায়া লাগল। আমি তাকে বলতে পারলুম না, তুমি আর এসো না আমার কাছে। দিদিই তার হাত ধরে টান দিল। হেঁচকা মেরে বলল, 'ফের যদি আসবি, পুঁতে ফেলব!'

ছেলেটি শেষবারের মতো আমার দিকে চাইল। তারপর দিদির সঙ্গে চলে গেল।

মনটা ভারি খারাপ লাগছে আজ। তাঁবুতে ফিরে দেখি, আনাতিদাদা আরও কাহিল হয়ে পড়েছে। অন্য দিন খুশিতে উছলে আমি তাঁবুতে ফিরি। আজ ওইরকম একটা কাণ্ড ঘটে যেতে স্বাভাবিকভাবেই আমার সে-খুশি মুখ থেকে মুছে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও নিজের দুঃখটা মনের

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারলুম না। ধরা পড়ে গেলুম আনাতিদাদার কাছে। অবাক হয়েই আনাতিদাদা জিজ্ঞেস করল, 'ইসতাসির মুখখানা আজ অমন শুকিয়ে কেন? কী হয়েছে?'

আমি বললুম, 'এমনি।'

'একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। নইলে হাসি নেই কেন ইসতাসির মুখে?'

আমি বললুম, 'ভাবছি, কারনিভলে আর খেলা দেখাব না। চলে যাব। আমার জন্যে অন্য সকলের ক্ষতি হচ্ছে।'

'কী ক্ষতি?'

'সক্কলে আমার খেলাই দেখে। ওদের খেলা দেখতে লোক হয় না।'

আনাতিদাদা রুগণ হাতটা এগিয়ে আমার মুখটা তার চোখের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'ছিঃ! ছিঃ! ইসতাসি হেরে গেল!'

আমি বললুম, 'ওরা আমায় পছন্দ করে না।'

'না, তোকে হিংসে করে।'

আমি চুপ করে গেলুম। আমায় চুপ থাকতে দেখে আনাতিদাদা বলল, 'আমার জন্যেই তোকে এমন হেনস্তা হতে হচ্ছে।'

'কে বলল তোমার জন্যে?' আমি প্রায় রেগে চিৎকার করে উঠেছিলুম। নিজেকে সামলে নিলুম। বললুম, 'আনাতিদাদা, কেউ আমাকে হেনস্তা করল, কি অপছন্দ করল তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি। তোমাকে ভালো হতে হবে আনাতিদাদা। আবার সেইরকম সাহসী আর শক্ত-সমর্থ হয়ে তুমি আমার হাত ধরে আমায় নিয়ে যাবে দেশে-দেশে। আমি ব্যানডুররিয়া বাজিয়ে গান শোনাব। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সকলকে বলব, 'আমার এই আনাতিদাদার কাছে আমি শিখেছি ব্যানডুররিয়া বাজাতে।'

আমি দেখতে পেলুম, আনাতিদাদার চোখের পাতাদুটি ভারি ছটফট করে ওঠা-নামা করছে। সেই আধো-আলো, আধো-ছায়াতে আমি দেখতে পেলুম না সেই চোখের পাতায় কোনো কান্নার ফোঁটা দুলে উঠছে কি না! সত্যি বলতে কী, সেই কান্না আমি দেখতে চাই না। আমি চাই, আনাতিদাদা হেসে উঠুক। তার একবুক হাসি হা-হা-হা করে উপচে আমাকে বলুক, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ভালো হব আবার। আমার শক্ত হাতখানা তোর হাতের ওপর রাখব। তারপর দু-জনায় ছুটে যাব পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। সঙ্গে যাবে জোরো, এই ভাল্লুক আর এই ছোট্ট তাঁবুটা। আমরা সারা দুনিয়ায় আনন্দ বিলিয়ে বেড়াব। শুধু আনন্দ। যে আনন্দ মানুষকে দুঃখ ভোলায়!'

কিন্তু কিছুই বলল না আনাতিদাদা। চেয়েই রইল। ভারি শূন্য সেই চাউনি।

আজও আমি কারনিভলে এসেছি। আজও জোরোর খেলা দেখাতে হবে আমায়। কেননা, আজ এই শহরের মেয়র আসবেন কারনিভলে। তিনি কারনিভল দেখবেন। দেখবেন, হাসি-হল্লা খুশি-

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মজার মেলা। আজ তাই কারনিভলের এই মস্ত চত্বরটা ঝাড়পোঁছ করে ধুলো-জঞ্জাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। নতুন করে সাজানো হয়েছে কারনিভল। কত রংচঙে বেলুন উড়ছে। কত রঙিন পতাকা। রং-ঝলমল কাগজের ফুল। আর কত আলোর বাহার। আসলে কালকের ওই ঘটনার পর থেকে মনটা আমার এমন মুষড়ে আছে যে, কিছুই যেন ভালো লাগছে না। তবু ব্যানডুররিয়া বাজাতে হবে। তবু জোরো খেলা দেখাবে।

মেয়র যখন এসেছিলেন, তখন সন্ধে পার হয়েছে। তিনি এসেছিলেন একা নয়, সঙ্গে আরও কত লোক। সন্ধ্যার কারনিভল জমজমাট। বুঝতেই পারছ, মেয়রকে খুশি করবার জন্যে, সবাই তাদের সব-সেরা খেলাগুলি দেখাচ্ছে আজ। সব-সেরা মজা।

একটি-একটি মজা দেখার জন্যে তিনি এক-এক জায়গায় দাঁড়ান। একটু মাথা হেলান, একটু খুক করে কাশেন, তারপর হাঁটেন। এমনি করে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি আমার খেলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার ব্যানডুররিয়া বেজে উঠল। আমার ভাল্লুক মেয়রকে দেখেই মারল ভলট। মেরেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মেয়রকে সাল্যুট করল। সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিক থেকে হাততালি। তারপর জোরো মাথায় একটি রঙিন ছাতা ধরে, শূন্যে তারের ওপর হাঁটতে-হাঁটতে, একবার এ-পাশ থেকে ও-পাশ, আবার ও-পাশ থেকে এ-পাশ এল। তারের ওপর জোরোর এ এক আশ্চর্য ব্যালেন্সিং-এর খেলা। আমার ব্যানডুররিয়া সেই ব্যালেন্সিং-এর তালে-তালে বেজে ওঠে। হাততালি, শুধু হাততালি। মেয়রসাহেব কিন্তু হাতে তালিও মারেন না, মুখে হাসিও আনেন না। গম্ভীর হয়ে দেখেন। যেন পাথর-কাটা মূর্তি।

দেখতে-দেখতে মেয়রসাহেব তাঁর পাশের লোককে ইশারায় কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন। পাশের লোকটি আমার কাছে এল। একে মেয়রসাহেবের মুখখানা অমন গম্ভীর, তার ওপর তাঁর একজন পার্শ্বচর যখন আমার কাছে এসে দাঁড়াল, তখন আমার ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। এবার বোধ হয় সাহেব নিজেই আমাকে এখান থেকে চলে যাবার ফরমান জারি করবেন। কিন্তু না। তাঁর পার্শ্বচর গলার স্বরটা একটু উঁচিয়ে, সবাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে ভাল্লুক-নাচিয়ে, তোমার নাম কী?'

আমি ধরা-ধরা গলায় বললুম, 'ইসতাসি।'

আবার সেই ব্যক্তিটি চিৎকার করে বললে, 'ইসতাসি, তোমার ভাল্লুকের খেলা দেখে আর তোমার অদ্ভুত বাজনা শুনে মাননীয় মেয়র অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।'

আমি মেয়রকে উদ্দেশ্য করে মাথা নোয়ালুম।

পার্শ্বচর আবার বলল, 'মাননীয় মেয়র মনে করেন, এখানে যতরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তার মধ্যে তোমার খেলাই সব-সেরা।'

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আবার মাথা নিচু করলুম। আবার হাততালি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'তাই মাননীয় মেয়র তোমার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তোমাকে একটি উপহার দিতে চান।'

উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। দেখতে পেলুম মেয়রসাহেব আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তেমনি গম্ভীর তিনি। তেমনি চুপচাপ।

আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এখন তিনি আমাকে দেখে একটু মুচকি হাসলেন। তারপর আমার কাঁধে হাত রাখলেন। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'শাবাশ।' বলে তিনি পকেটে হাত পুরলেন। একটি সোনার মেডেল বার করে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

এতক্ষণ থমথম করছিল চারিদিক। সবার মুখে কী-হয় কী-হয় ভাব। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমার গলায় মেডেল ঝিকমিকিয়ে উঠল, সকলের মুখে সে কী খুশির হল্লা। আমি হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালুম। তিনি আমায় দু-হাত দিয়ে তুলে নিলেন। তারপর আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'এমনি করে সবাইকে আনন্দ দাও।' বলে তিনি যেমন করে এসেছিলেন, তেমনি করে চলে গেলেন। আমি হতবাক।

আমার খেলার চারিপাশে যত লোক জমায়েত হয়েছিল, তারা সবাই চিৎকার করে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমি হাত তুলে সে-অভিনন্দন গ্রহণ করছি। হঠাৎ দেখি, জুতসু। কোথায় ছিল? ওই অত লোকের ভিড় ঠেলে, একেবারে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। সে কী আনন্দ তার! যেন তারই কেউ আপনজন এই সোনার মেডেল জয় করেছে। আমি তাকে দেখে, এত আনন্দেও শিউরে উঠলুম। এই বুঝি তার দিদি এসে পড়ে। এই বুঝি লাগিয়ে দেয় চেঁচামেচি। রক্ষে, তার দিদি এল না।

আমি এবার জোরোকে নিয়ে প্রায় লাফাতে-লাফাতে তাঁবুর দিকে ছুটলুম। এখন আনাতিদাদা একা আছে তাঁবুতে। দেখে এসেছি তার শরীরটা আজ আরও খারাপ। কী খুশিই-না হবে আনাতিদাদা। আমার এ-জয় তো তারই জয়। তাঁবুতে ফিরেই ওই সোনার মেডেল তারই গলায় আমি পরিয়ে দেব। তারপর আনাতিদাদার বুকের ওপর মাথা রেখে বলব, 'আজ আমি জিতেছি আনাতিদাদা, আমি জিতেছি।'

কিন্তু বলতে পারলুম না। কেননা, তাঁবুতে ফিরে দেখি, আনাতিদাদা নেই! প্রথমটা ভেবেছিলুম, বুঝিবা আনাতিদাদা এদিক-ওদিক কোথাও আছে। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও নেই! সবদিক আঁতিপাতি করে খুঁজেও যখন পেলুম না তখন ডাক দিলুম, 'আনাতিদাদা, আনাতিদাদা।' সাড়া পেলুম না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। তবে কি আনাতিদাদা চলে গেল। হঠাৎই আনাতিদাদার ম্যাজিকের ব্যাগটা আমার নজরে পড়ে গেল। কিন্তু ওটা কী! রিভলভারটা বাইরে কেন! হাতে তুলে নিলুম। এ কী! রিভলভারটার সঙ্গে একটা চিঠি! চিঠিতে লেখা :

প্রিয় ইসতাসি,

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি চলে যাচ্ছি। আমার মৃত্যুর দিন যখন এগিয়ে আসছে, তখন তোমাকে কষ্ট দিতে আমি খুবই ব্যথা পাচ্ছি। আমার মৃত্যুর আগে এই যে তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হল, এই যে তোমাকে শেষবারের মতো দেখতে পেলুম এই তো আমার জয়। আমার ব্যাগ-ভরতি ম্যাজিক আর রিভলভারটা দিয়ে গেলুম। রিভলভারে একটাই গুলি আছে। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করার আগে ওটা মাটির তলায় পুঁতে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তোমার কাছেই থাক। বলা যায় না, কোনোদিন কাজে লেগে যেতে পারে। সুখী হও। ইতি

আনাতিদাদা

চিঠিটা পড়া শেষ করে থমকে গেলুম। মনে হল, এই মুহূর্তে পৃথিবীটা যেন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার চোখ ফেটে কান্নাও এল না, মুখ ফুটে কথাও বেরুল না। আমি নির্বাক। বসে পড়লুম। মুখখানাকে লুকিয়ে ফেললুম দুই হাঁটুর ফাঁকে। তারপর ফুঁপিয়ে উঠলুম।

আমি জানি না এমনি করে কতক্ষণ বসেছিলুম। দেখিনি জোরো কখন নিঃসাড়ে আমার পাশে এসে বসেছে। হয়তো আমার মতো সে-ও দুঃখ পেয়েছে। তাই আমার মতো সেও এখন নিশ্চুপ, নির্বাক।

এমনই সময়ে হঠাৎ একটা শোরগোল শুনে আমার চমক ভাঙল। দেখলুম, সেই মেয়েটি একেবারে মারমুখী হয়ে আমার তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়েছে। দেখি, তার পেছনে আরও অনেকজন। দেখে চিনতে কষ্ট হল না, এরা সবাই কারনিভলে এসেছে খেলা দেখাতে। আমি অবাক চোখে তাদের মুখের দিকে চাইলুম। আমায় কোনো কথা বলতে দিল না তারা। আচমকা চিৎকার করে তাণ্ডব শুরু করে দিল তাঁবুর ভেতরে। আমাকে জাপটে ধরল আচম্বিতে। এমন অবস্থার জন্যে আমি একেবারেই তৈরি ছিলুম না।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমার পাশেই জোরো। আমি জানি জোরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে আর রক্ষে নেই। তাই আমি চিৎকার করে উঠলুম, 'আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।'

কে শুনছে! আমি ধস্তাধস্তি করে কোনোরকমে এদের হাত ছাড়িয়ে জোরোকে জড়িয়ে ধরলুম। জড়িয়ে ধরে আবার চেঁচালুম, 'তোমরা থামো। এক্ষুনি আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাও! জোরো খেপলে তোমাদের একজনও প্রাণে বাঁচবে না!'

কিন্তু তারা শুনল না। হিংসায় উন্মাদ হয়ে তারা আমায় শেষ করে ফেলতে চায়। তারা আমার সব-কিছু লুঠ করছে। তাঁবু তছনছ করে দিচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, রাগে ফুলছে জোরো।

তারা আমার জিনিসপত্তর ভাঙচুর করছে।

জোরোও ফুঁসছে।

তারা আমার তাঁবুটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলছে।

জোরো আমার হাত ছাড়াবার জন্যে আমায় ধাক্কা দিল।

দেখতে পেলুম সেই মেয়েটা চোখের পলকে আমার ব্যানডুররিয়া নিয়ে পালাচ্ছে।

জোরো দেখতে পেয়েছে। আমাকে সে ঝটকা মারল। আমি পড়ে গেলুম। পারলুম না তাকে ধরে রাখতে। আমি ধমকে উঠলুম, 'জোরো।'

ততক্ষণে জোরো বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। আমি ছুটে এসে লাফিয়ে পড়লুম জোরোর ঘাড়ের ওপর। জোরোর সঙ্গে আমার ধস্তাধস্তি লেগে গেল! তাই দেখে যে-যেদিকে পারল মারল ছুট! কিন্তু জোরোর অন্য দিকে লক্ষ নেই। লক্ষ্য ওই মেয়েটা!

আমি আর জোরোর সঙ্গে কতক্ষণ ধস্তাধস্তি করতে পারি! জোরো শেষে আমারই ওপর খেপে উঠল। আমাকেই বুঝি আক্রমণ করে! আমি ছিটকে গেলুম। সেই তক্কে জোরো ছুটল ওই মেয়েটাকে ধরবার জন্যে।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। আমি জানি, জোরো এক্ষুনি এক ভয়ংকর কাণ্ড করে বসবে। আমি জোরোর পেছনে ছুটলুম। আমার হাতে আনাতিদাদার রিভলভার। এই ক্ষিপ্ত বন্য-জন্তুটাকে শায়েস্তা করতে এখন এই রিভলভার ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি যদি এখনই ওকে রুখতে না পারি, তবে মেয়েটার নির্ঘাত মরণ।

আমি ছুটতে-ছুটতে দেখতে পেলুম, জোরো প্রায় ধরে ফেলেছে মেয়েটাকে। ভয়ে পিছু ফিরে চিৎকার করে উঠল মেয়েটা, 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।'

আর দেরি করা যায় না। আমাকে এখনই রিভলভার ছুড়তে হয়। এই ক্ষিপ্ত একটা বন্য-জন্তুর হাত থেকে একটি অসহায় মেয়েকে যদি রক্ষা করতে না পারি, তবে এ-রিভলভারের মূল্য কী! আমি রিভলভার তাক করলুম। আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে ধমক দিয়ে শেষবারের মতো চিৎকার করে ডাক দিলুম, 'জোরো—'

https://boierhut.com/fb

বোধ হয় জোরো একটু থতমত খেয়ে গেছল। হয়তো চকিতে সে একবার আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। ঠিক এই ফাঁকে, মেয়েটি আশ্চর্য কৌশলে জোরোকে এড়িয়ে আমারই দিকে ছুটে এল। আর্তনাদ করছে সে। আমাকে আচমকা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচাও!' আমাকে এমনভাবে সে জাপটে ধরল যে, আমি টাল সামলাতে পারলুম না। আমার আঙুলের চাপ লেগে রিভলভারের গুলি ছুটল এলোমেলো। নিশানা ফসকে গুলি জোরোর গায়ে না-লেগে হাওয়ায় উড়ে গেল।

গুলির শব্দে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল জোরো। সে বুঝতে পেরেছে, আমি তাকে মারতে চাই। তাই সে লাফিয়ে পিছু ফিরে আমাকেই আক্রমণ করল। আমি ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে মেয়েটিকে বললুম, 'পালাও!' মেয়েটি পালাল।

জোরো আমাকে আক্রমণ করল তার সামনের পায়ের থাবা দিয়ে। আমি সে-আঘাত সহ্য করতে পারলুম না। এত তীব্র সে-আঘাত যে, আমি মুখ থুবড়ে ক-হাত দূরে ছিটকে পড়লুম। বুঝতে পারছি, মাথায় লাগল। অসহ্য যন্ত্রণা। আমার বুকের ভেতরটা এত হাঁপিয়ে উঠল যে, আমি নিশ্বাসটাকে কিছুতেই সামলাতে পারলুম না। অসহায়ের মতো সেই রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পর যখন আমার ঘোর কাটল, তখনও আমার ওঠার ক্ষমতা নেই। শুয়ে-শুয়েই অতি কষ্টে এ-পাশ ও-পাশ করছি। এ-দিক ও-দিক দেখছি। হঠাৎ বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। দেখি, জোরো! একটু দূরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! আমার চোখে চোখ পড়তেই সে যেন একটু চনমন করে উঠল। তখনকার সেই হিংস্র চোখ দুটো তার এখন মনে হচ্ছে কত শান্ত! বুঝি বা বন্ধুকে অমন আঘাত করে এখন অপরাধীর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে!

একটু পরেই আমি উঠে বসতে পারলুম। আর-একটু পরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারলুম। হাঁটতে-হাঁটতে তাঁবুতে ফিরে এলুম। আমার এই ছোট্ট তাঁবুটা এখন কেবলই একটা ধ্বংসস্তূপ। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই আবার শুয়ে পড়লুম।

এখন কী করব আমি! কাল এখান থেকে আমায় চলে যেতেই হবে। হয়তো কাল একটু সুস্থ হয়ে উঠব। কিন্তু কোথায় যাব আমি এই শূন্য হাতে? শূন্যই তো! আমার যে আপন বলতে আর কেউ রইল না। অমন যে জোরো, যাকে নিয়ে এত স্বপ্ন আমার, সেই স্বপ্নও আজ ভেঙে গেল। আমার প্রিয় আর সবসেরা বন্ধু ব্যানডুররিয়া, সেটাও কেড়ে নিয়ে গেল ওরা! কেন এত হিংসা ওই একটা ছোট্ট বাজনার ওপর! আমার বাজনা তো শুধু সুরে-সুরে ছড়িয়ে দিয়েছে আনন্দ। ক্ষতি তো কারো করেনি। তবে কেন এত রাগ!

আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভেবেছিলুম, খুব সকাল-সকাল উঠব। পারিনি। ঘুমিয়েই ছিলুম। হঠাৎ একটা গরম নিশ্বাসের উত্তাপ আমার পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ঘুম ভেঙে গেল। চমকে চেয়ে দেখি, জোরো। মনে হয় সারারাত জেগেই বসেছিল আমার পাশে। আমি উঠে পড়লুম। বাইরে রোদ। এবার যেতে হবে। যেতে হবে আমায় এক দেশ থেকে আর-এক দেশে। এ-জগৎ থেকে আর-এক অজানা জগতে। পড়ে রইল আমার ছেঁড়া টুকরো তাঁবু। পড়ে রইল তাঁবুর ভেতর ভাঙাচোরা আমার শখের জিনিসগুলি। ওগুলির দিকে চেয়ে দেখতে আমার মন চাইছিল না। চোখ ফেরালুম জোরোর দিকে। দেখতে কষ্ট লাগছিল। কেননা, ওর কাছ থেকে এবার আমায় বিদায় নিতে হবে। এগিয়ে গেলুম তার কাছে। তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলুম কিছুক্ষণ। তার পিঠে হাত রাখলুম। কাঁপছে সে। তার গলাটা দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললুম, 'আমায় তুই মেরেছিস বলে মনে করিস না যেন, আমি তোর ওপর রাগ করেছি জোরো! তোর আবার দোষ কোথায়? আমিই তো রিভলভারের গুলি ছুড়ে তোকে মারতে চেয়েছিলুম। আমিই তো অপরাধী। এই জঘন্য কাজের জন্যে আমি যে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না জোরো! আমার বারবার মন বলছে, আমি বিশ্বাসঘাতক! আমার বিপদের দিনে তোর মতো বন্ধু পেয়েছিলুম বলে, আজও আমি বেঁচে আছি। সেই বন্ধুকে গুলি মারতে যার হাত ওঠে, সে বিশ্বাসঘতক বিশ্বাসঘাতককে আর বিশ্বাস নয়। তুই বনে ফিরে যা জোরো। খোলা আকাশের নীচে সেই তোর ঘর। সেইখানেই তোর সুখ। তোর আনন্দ। সেখানে আর যাই থাক, বিশ্বাসঘাতক নেই।' বলতে-বলতে কেমন যেন ভার হয়ে আসছিল আমার গলার স্বর। না আমার ভেঙে পড়লে চলবে না। আমি বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। জোরোর দিকে আর ফিরে তাকালুম না। আমার শূন্য হাতের মুঠি দুটো শক্ত করে চেপে ধরে পা ফেললুম।

'ইসতাসি'।

আমি থতমত খেয়ে গেছি। হঠাৎ এ-সময়ে কে ডাকল? সামনে চমকে চেয়ে দেখি, এ যে সেই মেয়েটি! ' দেখি, তার হাতে আমার ব্যানডুররিয়া। তার চোখদুটিতে যেন অনেক দুঃখের কালোছায়া জড়িয়ে আছে।

মেয়েটি ব্যানডুররিয়াটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরা-গলায় বলল, 'ইসতাসি, তোমার ব্যানডুররিয়া!'

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। দেখলুম, তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তার ছোট্ট ভাই জুতসু। মুখখানা তার থমথম করছে।

মেয়েটি বলল, 'কিছু মনে কোরো না ইসতাসি। আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি।'

ক্ষণেক চেয়ে, হাত বাড়ালুম। ব্যানডুররিয়াটা হাতে নিলুম। বললুম, 'অনেক কষ্ট দিলুম। চলি।' পথে নামলুম।

'ইসতাসি!' সে আবার ডাকল।

আমি থামলুম।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সে বলল, 'তুমি যদি না যাও ইসতাসি?'

আমি বললুম, 'আমি যাযাবর।'

মেয়েটি আমার হাতদুটি জড়িয়ে ধরল। তার মুখখানি কান্নায় ভরে গেছে।

আমি বললুম, 'বোন, আমায় যেতে দাও! হয়তো আবার দেখা হবে।'

ওর হাতদুটি আলতো সরে গেল আমার হাত থেকে। আমি এগিয়ে গেলুম জুতসুর কাছে। দু-ফোঁটা চোখের জল ওর গালের ওপর দিয়ে ভেসে গেছে। আমি ওর চিবুকটি ধরে ওর চোখের ফোঁটাদুটি মুছে দিলুম। সে-কান্নার জল আমার হাতে ছড়িয়ে রইল। কথা বলতে পারল না জুতসু। হাতটা বাড়িয়ে দিল। তার হাতে একটা খেলনা-গাড়ি। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কী?'

'তোমার।' বলে সে আমায় জড়িয়ে ধরল। তারপর আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

বোধ হয় এই খেলনা-গাড়ি কারনিভল থেকে কিনেছে সে, নিজে খেলবে বলে। আমি হাতে নিলুম। আমার সব গেছে। মনে-মনে ভাবলুম, একদিন স্বপ্ন দেখেছিলুম, একটা গাড়ি কিনব আমি। ঘোড়ায় টানা গাড়ি। সেই গাড়ি চেপে এক দেশ থেকে আর-এক দেশে যাব। দেশে-দেশে ব্যানডুররিয়া বাজিয়ে গান গাইব, জোরোর খেলা দেখাব। কিন্তু সে-স্বপ্ন আমার মিথ্যে। সত্যি যেন এই খেলনা-গাড়ি। এ-গাড়ি কত সুন্দর! এ যে একটি ছোট্ট ছেলে, জুতসুর, ভালোবাসায় ভরা! তাই এই খেলনা-গাড়িটা আমার ছেঁড়াখোঁড়া জামার পকেটে পুরে ফেললুম। তারপর ব্যানডুররিয়ার তারে সুর তুললুম। গেয়ে উঠলুম আমার হারিয়ে-যাওয়া বন্ধু ওতিয়ারই গাওয়া সেই গানটি :

আমি তো কখনো দিইনিকো ব্যথা
একটিও কোনো প্রাণীকে,
অনেক দুঃখ পেয়েও তো আমি
বন্ধু আমার জানি কে!

তারপর হাঁটা দিলুম।

অনেকক্ষণ পর, যখন ক্লান্ত পা-দুটো অবশ হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল, পথের পাশে ওই গাছের নীচে বসি একটু, তখন আমি পিছু ফিরেছিলুম একটিবার। অনেক দূরে পিছনের হাঁটা-পথে চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠেছিলুম। এ কী! জোরো সে আসছে ক্লান্ত পায়ে একা-একা। আমি দাঁড়ালুম। সে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎই সে দু-পা ওপরে তুলে আমায় জড়িয়ে ধরল। যেন সে বলতে চাইল, 'তোমাকে একা-একা আমি কোথাও যেতে দেব না। তুমি যেখানে যাবে, সেখানেই আমি যাব। আমাকে মারতে চাও মারো। তবু জেনো, আমি তোমার বন্ধু।'

আনন্দে চোখে জল এসে গেল আমার। ওর মুখখানা দু-হাত দিয়ে চেপে ধরে আমার মুখের সামনে তুলে ধরলুম। চেয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুট গলায় বলে উঠলুম, 'বন্ধু।' তারপর দুজনে ওই সবুজ গাছের আড়ালে হারিয়ে গেলুম।

https://boierhut.com/fb

আবু ও দস্যু-সর্দার

একদিন আমার মা আমার চিবুক ছুঁয়ে আদর করতে-করতে আমার বাবাকে বলছিল, 'দেখো, দেখো, আবু আমার কত বড়ো হয়ে গেছে!'

বাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো! দেখতে-দেখতে সত্যিই কত বড়ো হয়ে গেছে আবু। আর ক-দিন পরে পাশার পিঠে চেপে আবুও আমার মতো কাজে বেরোবে।'

সে-কথা শুনে, সত্যি বলছি, আমি আনন্দে শিউরে উঠেছিলুম। কেননা, আমি যে এই স্বপ্নই দেখি। স্বপ্ন দেখি, দিনে-রাতে, ওই বালির সমুদ্র যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এ-সমুদ্রের শেষ নেই। বালি, বালি, যেদিকে চাইবে, দেখবে শুধু বালি। ওই দূরে, অনেক দূরে, আকাশ যেখানে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে, সেখানে এই সমুদ্রও হারিয়ে গেছে। সূর্যের কিরণে এ-সমুদ্র জ্বলন্ত আগুন। মন বলে, বারবার বলে, পাশার পিঠে চেপে আমিও হারিয়ে যাই ওই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে।

হ্যাঁ, এখন আমি সত্যিই বড়ো হয়েছি। জানি না, তোমার চেয়ে বড়ো কি না। তবে এখন আমি জানি, এই যে রাশি-রাশি বালির রাজত্ব, এই যে ধু-ধু মরুভূমি, এইখানেই আমার দেশ। আমি জানি, ওই যে লম্বা-চওড়া রোদে-পোড়া মানুষগুলি, যারা দুঃখ আর কষ্টের সঙ্গে লড়াই করে প্রতিদিন উঠের পিঠে চেপে নানান কাজে ওই সমুদ্রে পাড়ি দেয়, তারা আমার দেশের মানুষ। এই মানুষেরা কেউ আপন, কেউ পর। কেউ দূরের, কেউ কাছের।

তুমি হয়তো ভাবছ পাশা কে!

পাশা আমাদের উট।

আমি বড়ো হয়েছি বলে এখন আমি পাশার পিঠে চেপে রাশি-রাশি বালির ওপর দিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসতে পারি। এখন পাশার পিঠে বসে, পড়ন্ত সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দেখতে ভালো লাগে বালির ওপর রক্ত-আলোর দোলন। এখন আমি জানি, মাথার পাগড়িটা কেমন করে মুখে-নাকে জড়িয়ে নিলে সূর্যের ঝলসানো আগুনে আমার কিচ্ছু হবে না। এই সূর্য, এই বালি, এই আকাশ, সব আমার চেনা। আমার আপনার। ওই যেখানে একটুখানি জায়গা ঘিরে খেজুর-গাছের ছায়ারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, ওই ছায়ার নীচে আমাদের ঘর। তুমি আমাদের ঘরটা যদি একটু দূর থেকে দেখ, তোমার মনে হবে, যেন একটি চৌকো-মতো খেলনার বাক্স। এরকম ঘর পর-পর তোমার আরও নজরে পড়বে। তবে যারা বড়োলোক, যাদের পাঁচ-দশটা উট আছে, তাদের ঘরগুলো সব ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি। ভারি সুন্দর দেখতে।

শুনি তোমরা খুব সুখে আছ। আমাদের মতো তোমাদের কোনো কষ্টই নেই। আমি শুনেছি, তোমাদের মাঠ ভরতি সবুজ গাছগাছালি। শুনেছি, সে-গাছে ফুলে-ফলে ছড়াছড়ি। কত নদী-নালা। বর্ষার দিনে মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। ঝমঝমিয়ে বিষ্টি নামে। মাঠ-ঘাট সব জলে-জলে থই থই! অবাক হয়ে যাই একথা শুনে। কেননা, এখানে এসব কিচ্ছু নেই। তবে হ্যাঁ আমি কী আর বলছি এখানে বিষ্টি হয় না। হয়, এখানে হঠাৎ যেমন আকাশ ভেঙে বিষ্টি নামে, তেমনি আবার হঠাৎ-ই থামে। হলে কী হবে। মরুর এই আগুনের রাজ্যে আকাশের ওই জলটুকু কিচ্ছু কাজে লাগে না। রাক্ষুসে বালি যেন তেষ্টায় হাঁ করে ধুঁকছে! জল একবার পড়লে হয়। নিমেষের মধ্যে ঢক-ঢক করে গিলে খেয়ে ফেলবে! তাই দেখে ভাবি, মরুর তেষ্টা বুঝি কোনোদিন মেটে না। মিটবেও না।

কিন্তু আমার সবচেয়ে অবাক লাগে পাশার কথা ভেবে। আমি দেখেছি, পাঁচ-পাঁচটা দিন এক ফোঁটা জল মুখে না দিয়েও দিব্যি আছে! পিঠে ভারী-ভারী মাল-পত্তর নিয়ে, দিনের পর দিন ওই বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। তবু তেষ্টা নেই! অথচ আমাদের? জল না হলে আর রক্ষে আছে! কী ছটফটানি!

রক্ষে, আমাদের ঘর থেকে দু-পা এগোলেই জলের ইঁদারা। তোমাদের যেমন পাতকুয়ো, তেমনি। এখানে এই একটিই ইঁদারা। তারপর তুমি মাইলের পর মাইল খুঁজে বেড়াও, একটু জল পাবে না। আমি দেখি রোজ কত মানুষ এখানে আসে। কত দূর-দূরান্ত থেকে। সঙ্গে সারি-সারি উট। তাদের পিঠে কত কী জিনিসপত্তর। এই মরুর সীমানা পেরিয়ে বাণিজ্য করতে চলেছে। একটু জলের জন্যে ওরা এখানে থামবে। তাঁবু ফেলবে। বিশ্রাম নেবে। তারপর আবার চলো। চলো ওই মরুর জাহাজে চড়ে। জাহাজ? অবাক হলে? জানো না বুঝি আমরা উটকে বলি জাহাজ? ওই যে উট, দেখো না কেমন চলেছে দলে-দলে সার বেঁধে দুলতে-দুলতে ওই বালির সমুদ্রের ওপর দিয়ে!

আমার বাবাও এই কাজ করে। পাশার পিঠে বেঁধে নিয়ে যায় কত দামি-দামি সওদা। সার বেঁধে চলে বালির ওপর দিয়ে। মাথার ওপর সূর্য। কী অসহ্য তার তেজ। শরীর যেন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। তবু থামলে চলবে না। একটু ছায়ায় যে জিরিয়ে নেবে, সেই ছায়াই বা কই এই শূন্য মরুভূমিতে! যেদিকে চাইবে, খালি বালির ঢেউ আর ভয়ংকর নিস্তব্ধতা! ওই নিস্তব্ধতা ভেঙে শুধু চলেছে ওরাই, ওই বোবা উটের দল। বালির ওপর ওদের পায়ের শব্দ ভারি নরম, ভারি অস্পষ্ট!

আমার বাবার পোশাকটা দেখলে তোমার ভালো লাগবে কি না জানি না। একদম পায়ের নীচ অবধি একটা লম্বা জামা। সেই জামা কোনোটা নীল, কোনোটা সাদা। কোমরে আঁট-সাঁট বাঁধা একটা শক্ত কাপড়ের বেল্ট। সেই বেল্টে গোঁজা একটা ঝক-ঝকে ছোরা। কোমরের বাঁ পাশে তরোয়াল ঝোলানো। মাথায় পাগড়ি আর পায়ে চপ্পল।

আমার পোশাকও এমনি। তবে, আমার একটা এত সুন্দর নীল ডোরা-কাটা জামা আছে যে, দেখলেই তোমার ভালো লাগবে। তোমার ইচ্ছে হবে এখুনিই গায়ে দাও। আমি মনে-মনে ভাবি আমি যেদিন প্রথম বাবার মতো একা-একা পাশার পিঠে চেপে মরুতে পাড়ি দেব, সেইদিনই ওই জামাটা গায়ে পরব।

আমি জানি তুমি ঠিক ভাবছ, আমার বাবার কোমরে কেনই-বা ছোরা আঁটা আর কেনই-বা তরোয়াল ঝোলানো। এই কথাটা তোমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো। কারণ তোমরা তো মরুভূমির মানুষ নও। ধরো, তুমি চলেছ তোমার উটের পিঠে চেপে একা-একা ওই মরুভূমির ওপর দিয়ে নির্জন দুপুরে কিংবা গভীর রাত্রে। হয়তো তোমার সঙ্গে রয়েছে এমন কিছু মূল্যবান ধনরত্ন যেগুলি কালই তোমাকে এই মরুভূমি পেরিয়ে শহরে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি চলেছ, তোমার উটের গলায় ছোট্ট একটি ঘন্টা বেজে যায়, টিং-লিং, টিং-লিং। সেই শব্দ মরুভূমির নিস্তব্ধতা ভেঙে যতই বেজে-বেজে উঠছে, ততই যেন ওই রাশি-রাশি বালির বুকেও শিহরণ জাগছে।

ঠিক এমনই সময়ে তুমি যদি হঠাৎ দেখতে পাও, দূরে, তোমার চোখের সামনে বালির মেঘ উড়িয়ে একদল ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে! যদি দেখ তাদের চোখে-মুখে কালো কাপড় ঢাকা! তাদের হাতে ঝকঝকে তরোয়াল! তবে তোমার কি বুঝতে বাকি থাকবে যে ওরা এই মরুর দস্যু! ওরা তোমার এই ধনরত্ন লুঠ করবে! তখন বলো, তুমি কী করবে? ভীতুর মতো কাঁপতে-কাঁপতে ওদের হাতে ধনরত্ন তুলে দিয়ে নিজে বাঁচবে? না, তোমার ওই কোমরে-বাঁধা চকচকে ছোরা হাতে নিয়ে মুখোমুখি রুখে দাঁড়াবে?

আমরা মরুর দেশে বাস করি। রুক্ষ মরুভূমি আমাদের সাহসী হতে শিখিয়েছে। শিখিয়েছে বিপদের মুখোমুখি কেমন করে দাঁড়াতে হয়। ওই সূর্যের ঝলসানো আগুন মাথায় নিয়ে আমরা বড়ো হয়েছি। আমরা জানি, কষ্টকে যে জয় করতে পারে সে-ই তো বীর।

সত্যি, তুমি আমার বাবাকে দেখলে, একথা বিশ্বাস না করে পারবে না। কী সাহস আমার বাবার! তুমি তরোয়াল নিয়ে লড়াই করতে বলো, বাবা পিছপা হবে না। তুমি তির-ধনুক ছুড়তে বলো, চোখের নিমেষে দূরের লক্ষ্য ভেদ করে দেবে। বাবার কাছে কষ্ট-টষ্ট কিচ্ছু না। দিনের পর দিন ওই মরুভূমির ওপর দিয়ে চলেছে বাবা। কত ঝঞ্ঝা, কত বিপদ, কত কালো অন্ধকার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে। বুক পেতে সব সহ্য করেছে। ভয়? ভয় পেলে চলে! বিপদকে নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি! আর সত্যি বলছি, বিপদ না-থাকলে বাঁচার মজাই নেই!

কেমন করে তির-ধনুক ছুড়তে হয়, আমিও শিখে ফেলেছি। আমি শিখে ফেলেছি, কেমন করে তরোয়াল ঘোরালে শত্রু আমার ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না। ওই সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখন আমি গান গাইতে পারি। আগুনের গান। আর এই গান, এই আনন্দ, এই হাসি, আর দুঃখ নিয়ে মরুর মানুষ আমরা, আমি, আমার মা, আমার বাবা!এই পৃথিবীতে তোমাদেরই মতো।

আজ ঘুম থেকে উঠে আমি তোমাদের আনন্দের কোনো খবর দিতে পারছি না। ভালো লাগার কোনো কথা আমার মুখে আজ শুনতে পাবে না তুমি। মনটা যেন আপনা থেকে থমকে গেছে। চমকে গেছি আমি এখনও বাবাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে। মা কেন বসে আছে বাবার মাথার কাছে? আমি দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে মা?'

বাবা ভারি কষ্টে হাতটি নেড়ে আমায় কাছে ডাকল।

আমি ছুটে গেলুম, 'কী হয়েছে বাবা?' বাবার কপালে আমার হাত রাখলুম। ইশ! বাবার জ্বর! গা যে পুড়ে যাচ্ছে। আমি তো কক্ষনো বাবার জ্বর হতে দেখিনি। হঠাৎ কেন হল!

হঠাৎ-ই। কারণ কালও বাবা সারাদিন ধরে সাত-পাঁচ কত কাজ করেছে। করতেই হয়েছে। কেননা, আজ বাদে কাল বাবাকে শহরে যেতে হবে। শহরে যেতে হবে উট-পাখির পালক নিয়ে। শহর মানে সে কোথায়! এই মরুর বালি ভাঙতে-ভাঙতে সেই শেষ প্রান্তে। যেতে দশদিন, আসতে তদ্দিন। আমি জানি এই পালক যদি ঠিক দিনে না পৌঁছয়, মুখ রক্ষা হবে না বাবার। কেননা, বাবা যে কথা দিয়েছে পালকের সওদাগরকে! এখন কী হবে? যা হোক হবে। আগে তো মানুষের শরীর। তারপর কাজ! কিন্তু সে-কথা শোনার মানুষ নয় আমার বাবা। এই তো এখনও আমি দেখছি কষ্ট হচ্ছে, তবু বাবা হাসছে আমায় দেখে। আমি জিজ্ঞেস করছি, 'বাবা তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

বাবা ঘাড় নাড়ছে। ঘাড় নেড়ে বলছে, 'আমার কিচ্ছু হয়নি। কাল সকালে শহরে যাব আমি।'

আমি বললুম, 'কাল না-ই বা গেলে। দুদিন পরে একটু ভালো হয়ে তারপরে যাবে।'

বাবা আমার চোখের দিকে চাইল। ধীরে-ধীরে হাতটি আমার মুখের কাছে তুলে, আমার গালের ওপর হাতটি রেখে বলল, 'আমি যে কথা দিয়েছি আবু।'

'কিন্তু এই জ্বর-গায়ে তোমার কষ্ট হবে বাবা। তুমি পারবে না।'

'পারব।' বাবার গলায় কঠিন স্বর।

আমি জানি, বাবাকে রাজি করানো কারো সাধ্য নয়। কিন্তু যে মানুষটার অসুখ, তাকে আমরাই বা ছাড়ি কোন সাহসে! না জানি কোন অজানা বিপদ বুঝি এগিয়ে আসে! এই ভয়ে আজ সারাদিন আমি বাবার কাছছাড়া হইনি। বাবার বিছানার পাশটিতে বসে সারাদিন আমি বাবার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। আর নয়তো কপালে হাত রেখে বলেছি, 'বাবা, পালকগুলো অন্য কাউকে দিয়ে পৌঁছে দিলে হয় না?'

আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই বাবার ঠোঁট দুটি ভারি কষ্টে কেঁপে উঠল। তারপর বলল, 'যার কাজ তাকেই যে করতে হয় বাবা। আমার বোঝা অন্যের কাঁধে চাপালে আমি যে শান্তি পাব না।'

আমি আর কিছু বলিনি। এরপর আমার বলারই বা কী আছে! হ্যাঁ, আমি বলতে পারতুম যদি আমি আরও একটু বড়ো হতুম। তখন আমি পাশার পিঠে পালকের বোঝা চাপিয়ে নিজেই পাড়ি

দিতুম ওই বালির ওপর। বাবা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শুনত পাশার গলার ঘন্টা বাজছে, আর নয়তো ঘরের ওই জানলাটায় মুখ ঠেকিয়ে দেখত, তার ছেলে বাণিজ্যে চলেছে। দেখত, দূর থেকে দূরে পাশা হেঁটে চলেছে। তার মস্ত উঁচু মাথাটা দুলছে খুশিতে। আমি তার পিঠে বসে দুলতে-দুলতে হারিয়ে যাচ্ছি বালির রাজ্যে। আহা! সত্যি যদি এমন হত! সত্যি-সত্যি যদি আমি ওই আগুনের সমুদ্রে হারিয়ে যেতুম! যদি আমি সত্যি-সত্যি পারতুম ওই উটপাখির পালক পাশার পিঠে বেঁধে শহরে পৌঁছে দিতে!

কে বলেছে আমি পারি না। কে বলেছে ওই আগুনের সমুদ্রে হারিয়ে যেতে আমার ভয় করে! না, আমি ভয় পাই না। আমি যদি চিৎকার করে বলে উঠি, হ্যাঁ, আমি পারি। যদি বলি, ওই পালকের বোঝা পাশার পিঠে বেঁধে আমি পৌঁছে দিতে পারি শহরে, সেকথা কি শুনবে কেউ? শুনবে আমার মা? আমার বাবা? জানি না। শুধু জানি, আমি তাদের একমাত্র ছেলে। এই একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তাদের মনে হয়তো কত স্বপ্ন। হয়তো তারা দেখতে পাচ্ছে, সে-স্বপ্নের মণিমুক্তাগুলি যেন আমার গলায় ঝিকমিকিয়ে উঠছে। হয়তো তাদের স্বপ্নের রাজপুত্তুর হয়ে উঠছি আমি!



‘পারব।’বাবার গলায় কঠিন স্বর।

না, রাজপুত্তুর হবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি চাই না, আমাদের এই চৌকো ঘরখানা আজ, এখনই রাজপ্রাসাদ হয়ে গড়ে উঠুক। আমি যেন আমার মা আর বাবাকে বলতে পারি, 'আমি যা আছি সেই তো ভালো! তোমাদের ওই হাসি, ওই আদর, এই ভালো, এই মন্দ নিয়ে আমাকে তোমাদের কাছে-কাছে রাখো। মা আর বাবার চেয়ে আমার কাছে কী-ই বা সুন্দর! কে-ই বা বড়ো!'

হ্যাঁ, বাবার কষ্ট দেখে তাই আজ সারাদিন আমি ছটফট করেছি। তবু পারিনি আমার মনের কথা বলতে! পারিনি বলতে, 'বাবা, এই দেখো, তোমার আবু বড়ো হয়েছে। তোমার আবু পারবে, ঠিক পারবে ওই উটপাখির পালক শহরে পৌঁছে দিতে। তোমার জ্বর হয়েছে বাবা! তুমি কদিন এই ছোট্ট ঘরের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম নিলে, তোমার ছেলে কি তোমায় দেখবে না? নাকি, সে পারবে না তোমার বোঝা বইতে?'

কিন্তু কেন একথা আমি বাবাকে বলতে পারিনি। কারণ, একথা শুনলে বাবা যে খুশি হয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে না, তা আমি জানি। আমি ঠিক জানি, একথা শুনলেই বাবা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বে। যত কষ্টই হোক পাশার সামনে গিয়ে ওর পিঠের ওপর পালকের বস্তা ঝুলিয়ে হাসতে-হাসতে বলবে, 'আমি ভালো হয়ে গেছি। আমি চললুম শহরে।' তখন শত চেষ্টা করেও যে কেউ বাবাকে রুখতে পারবে না!

এই ভয়েই বোবা হয়েছিলুম সারাদিন। ভীষণ কষ্টে মনটা আমার বারবার শিউরে উঠছিল, তবু কাউকে বলতে পারছি না আমার মনের কথা। শেষে, কিছুতেই থাকতে না পেরে আমি ছুটে গেছি পাশার কাছে। বসে ছিল পাশা। ওর পিঠের ওপর লুটিয়ে পড়লুম। আমার দু-হাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলুম। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, 'পারবি না পাশা, পারবি না আমায় শহরে নিয়ে যেতে? পারবি না ওই পালকের বোঝা শহরে পৌঁছে দিতে?'

পাশা আমার কথা শুনল। কী বুঝল জানি না। ঘাড় হেলিয়ে আমার দিকে চাইল। তারপর ভীষণ জোরে মাথাটা নাড়তে-নাড়তে আমাকে পিঠে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাঁটা দিল। ক-পা দূরে খেজুর গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে সে মুখ বাড়াল। এক থোকা পাকা খেজুর মুখে ছিঁড়ে এনে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল। যেন সে বলতে চাইল, 'খাও!' আমি আনন্দে চিৎকার করে লুফে নিলুম সে খেজুর। মুখে দিলুম। সঙ্গে-সঙ্গে পাশা হাঁটল। ফিরল সে ঘরের দিকে। আমার মায়ের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল পাশা। মা জিজ্ঞেস করল, 'কী রে?'

বসে পড়ল পাশা। পাশার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে মায়ের কাছে ছুটে গেলুম। মাকে জড়িয়ে ধরলুম। মায়ের গায়ের চাদরে আমার মুখখানা হারিয়ে গেল।

মা অবাক হল। মা আমার মুখখানা চাদরের আড়াল থেকে সরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছিস?'

আমি বললুম, 'মা, তুমি তো বলেছ আমি এখন বড়ো হয়ে গেছি!'

মা বলল, 'হ্যাঁ, আমার সেই সেদিনের ছোট্ট আবু এখন কত বড়ো!

'তুমি তো জানো মা, এখন আমি তির ছুড়তে পারি। তরোয়াল ঘোরাতে পারি।'

'হ্যাঁ, আবু যে আমার বীর ছেলে।'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'তুমি তো দেখেছ মা, একটু-একটু করে এখন কত দূর অবধি পাশার পিঠে চেপে আমি বালির ওপর হাঁটতে পারি!'

মা বলল, 'এরপর আবু আমার বালি পেরিয়ে শহরে যাবে। শহরে গিয়ে আমার জন্যে রেশমি সুতোর কামিজ আনবে।'

আমি লাফিয়ে উঠলুম। মায়ের হাত দুটি আরও জোরে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'আনব, আনব মা, তুমি যা চাইবে তাই-ই আনব। তবে মা শহরে আমায় এখনই যেতে দাও,' বলে মাকে আবদার করে জড়িয়ে ধরলুম।

মা চমকে উঠল। আমায় আরও কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'এ কী সববনেশে কথা!' ভয়ে মায়ের গলা কেঁপে উঠল।

আমি বললুম, 'না মা, সববনাশ নয়! বাবার অসুখ। তুমিই বলো, বাবার কি এখন ওই বালি ভেঙে শহরে যাওয়া ঠিক হবে। আমি যাব। আমি পারব। আমি ওই উটপাখির পালক শহরে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

আমার কথা শুনে মায়ের বুকটা কেঁপে উঠছিল কি না আমি জানি না। কিন্তু মায়ের হাত দুটি আমার মাথা ছুঁয়ে অস্থির হয়ে শিউরে উঠছিল। মা কেমন অদ্ভুত চোখে চাইল আমার মুখের দিকে। তারপর মায়ের চোখ দুটি নিমেষে সামনের ওই খেজুর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে, দূরে ওই সোনা-রং বালির রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। মা কথা বলল না।

আমি মায়ের চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে খুব নরম সুরে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'যাব না মা?'

মা আমায় টেনে নিয়েছিল তার কাছে, আরও কাছে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলেছিল, 'যাবি।'

ইচ্ছে হল আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠি। কিন্তু পারিনি। হঠাৎ আমার নজর পড়ল মায়ের চোখ দুটি যেন ছলছলিয়ে উঠেছে। চোখ দুটিকে লুকিয়ে নিয়ে মা ছুটে গেছল বাবার কাছে। আমি অবাক হয়ে গেলুম! ভাবলুম, মা আমার কাঁদছে কেন! মা কি আমার কথায় দুঃখ পেল!

না, হয়তো ছেলের কথা শুনে মায়ের বুকখানা গর্বে ভরে উঠেছিল। হয়তো মা ভেবেছিল, যাদের এমন ছেলে ঘর আলো করে, তাদের বুঝি দুঃখ থাকে না কোনোদিন।

আমি তো জানি, মা আমার কথা বাবাকে বলবে। বাবা শুনলে, যদি রাজি না হয়! এই কথা ভাবতে-ভাবতে সারাদিন আমি ছটফট করেছি। সারাদিন আমার চোখ দুটি মায়ের পিছু-পিছু এ-ঘর ও-ঘর করেছে। আমি ভেবেছি মা কখন আমার কথা বাবাকে বলবে! কখন?

বলেছিল মা। বলেছিল, যখন দিনের আলো ছিল না। রাতের অন্ধকারটা তখন নিঃসাড়ে গুটি-গুটি নেমে এসেছিল। নেমে এসেছিল ওই বালির ওপর, ওই খেজুর গাছের ছায়ায়, আমাদের এই ছোট্ট ঘরে। রাত কত গভীর আমি জানি না। শুধু জানি, আজ আর আমার চোখে ঘুম ছুঁই-ছুঁই করছে না। এই যে ঘরের ভেতর ছোট্ট ঘরটা দেখছ, এটা আমার। ঘরের দেওয়ালে ওই যে

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আঁকাবাঁকা লাইনটানা ছবিটা দেখছ, ওটা আমি এঁকেছি। ছবির আকাশে এক ফালি চাঁদ। কটা তারা। নীচে বালির পাহাড়। এক পাশে তাঁবু। পাশে দুটো উট। ছবিটা কতদিন আগে এঁকেছি, এখনও একটুও আবছা হয়ে যায়নি। তবে, আমার আঁকা এই ছাবিটা দেখলে যে তোমরা না-হেসে থাকতে পারবে না, তা আমি জানি! কিন্তু জানো, এখন ওই রাত্রে চুপটি করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওই ছবিটাই আমার এত দেখতে ভালো লাগছিল। দেখতে-দেখতে আমার মনে হচ্ছিল, সত্যি যেন ওই ছবির চাঁদ আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে আমার এই ছোট্ট ঘরখানা। মনে হচ্ছিল, ওই ছবির তারারা বুঝি এখন স্পষ্ট হয়ে কোনোদিনই ঝলমলিয়ে ওঠেনি। ভালো লাগছে, হয়তো এই কারণে যে, আজ আমি বলতে পেরেছি, বাবার কাজ আমি মাথা পেতে নিতে পারি। বাবার বয়েস বাড়ছে, এবার বাবা আয়েস করুক। আমি ছেলে। ছেলে যদি বাপ-মাকে না দেখে, কে দেখবে?

কিন্তু জানো, এই মুহূর্তে আমার সমস্ত স্বপ্ন যেন এক ঝটকায় ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিল কে! সে-কথা বলতে আমার বুকের পাঁজরগুলো দুমড়ে-মুচড়ে উঠছে। সে-কথা আমি কেমন করে বলি তোমাদের! শোনো না, ওই তো বাবাকে আমার কথা বলছে মা। শুনতে পাচ্ছ আমার মায়ের গলা? আমি পাচ্ছি। শোনো শোনো, ওই তো মা বলছে, 'আবু বলছে তোমার গায়ে জ্বর। এই জ্বর নিয়ে শহরে যাওয়া তোমার ঠিক হবে না। কাজটা যখন খুব দরকারি, উটপাখির পালকগুলো যখন তাড়াতাড়ি পৌঁছে না-দিলেই নয়, তখন, ও বলছিল, তুমি যদি বলো, তবে আবুও পাবে তোমার এই কাজটা করে দিতে।'

মায়ের মুখে ওই কথা শুনে বাবা থমকে গেছল কি না জানি না। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে সারা ঘরখানা কেমন যেন থমথম করে কাঁপছিল?

প্রচণ্ড উত্তেজনায় আমি কান পেতে আছি। কিন্তু কথা নেই, শব্দ নেই। তবে কি বাবা মায়ের কথার কোনো উত্তর দেবে না? নাকি মায়ের কথা শুনে বাবার শরীর আরও মুষড়ে পড়ল।

না, বাবা কথা বলেছিল। হঠাৎ নিস্তব্ধ ঘরে বাবার গলা কেঁপে উঠেছিল। কাঁপতে-কাঁপতে সেই স্বর মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী বলছ তুমি? এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার আবু তোমাকে এ-কথা বলেছে! গর্বে যে আমার বুকখানা ফুলে উঠছে। আমার যে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি আমার আবুকে আমার মতো করে গড়ে তুলতে পেরেছি। হ্যাঁ, আবু আমারই ছেলে।' বলে বাবা থামল। একটুখানি চুপ। তারপর বাবার গলার স্বর যেন অনেক, অ-নে-ক দিন আগের কোনো এক হারানো দিনে ফিরে গেছে। বাবা জিজ্ঞেস করল মাকে, 'তোমার সেদিনের কথা মনে আছে?'

মা বলল, 'সে-কথা কি ভোলার কথা। আমার বোনের বিয়েতে তুমি আর আমি গেছি শহরে, আমাদের বাড়িতে। বিয়ের পর ফিরে আসছি। তখনও মাঝ-বরাবর পথে আমরা। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর। বালির ওপর বালি। হাওয়া নেই। শুধু গরম হলকা বইছে মরুর ওপর দিয়ে। মাথার পাগড়িটা

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

খুলে ফেলে তুমি মুখে-চোখে জড়িয়ে ফেলেছ। আমি তোমার পেছনে পাশার পিঠে বসে আছি। তোমার পিঠের ছায়ায় আমার মুখখানা আড়াল করেছি। আড়াল থেকে দেখছি, আর কত দূর? কোথায় গেলে একটু জল পাব! আর যে পারছি না!'

মায়ের মুখের কথা যেন কেড়ে নিয়ে বাবা বলে উঠল, 'হ্যাঁ এমন সময়, ঠিক এমনি সময়ে শুনতে পেলুম কান্না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কান্না! কে যেন কাঁদছে!' মা বলে উঠল।

বাবা বলল, 'এ যে নিতান্ত নরম কচি একটি শিশুর কান্না! আমি নিমেষে পাশার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লুম। লাফিয়ে ছুটলুম। বালির ওপর ছুটতে-ছুটতে কখনো আমি হুমড়ি খাই। কখনো আমি থমকে দাঁড়াই। চিৎকার করি, কে কাঁদে? কার ছেলে কাঁদে? কাউকে দেখতে পেলুম না। তারপর হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, সামনে রক্ত-মাখা একটা তরোয়াল! তারপর দেখলুম বালির ওপর এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছেটানো জুতো, জামা, পাগড়ি! তারই পাশে ওই তো শুয়ে-শুয়ে হাত-পা ছুড়ে কাঁদছে একটি শিশু! একেবারে এইটুকু। আমি ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিলুম। তপ্ত বালির ঝাপটা লেগে তার মোমের মতো নরম গায়ে ফোসকা পড়ে গেছে। আমি ছুটে এসে তোমার কোলে তাকে তুলে দিলুম।'

বলতে-বলতে বাবা থামল। বাবার কথার রেশ টেনে মা এবার বলল, 'হ্যাঁ, তাকে আমি বুকে তুলে নিলুম। আহা রে! তার সারা গায়ে চোখে-মুখে বালি। চোখ দুটি চাইতে তার যেন কত কষ্ট হচ্ছে! যেন এতক্ষণ বালিতে ডুবে-ডুবে সে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আমি আমার ওড়না দিয়ে ভারি আলতো করে ওকে জড়িয়ে নিলুম। তখনও কাঁদছে! তুমি ছুটলে ওর মাকে খুঁজতে!'

বাবার গলায় এবার ক্লান্ত স্বর। বাবা বলল, 'ওর মাকে আমি খুঁজলুম। সেই শূন্য মরুভূমির এ-প্রান্ত ও-প্রান্তে আমি দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটেছি। ওর মাকে আমি দেখতে পাইনি। দেখতে পেয়েছিলাম সেই রক্তমাখা তরোয়ালটা। তুলে এনেছিলুম সেটা। ভারি ক্লান্ত তখন আমি। তোমার কাছে যখন ফিরে এসেছিলুম, তখন তোমার কোলে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। যেন সূর্যের আলোয় নিস্তেজ একটি ফুলের মতো তার মুখখানি। আঃ! তোমার কোলে যেন ছড়িয়ে আছে সেই ফুলের রং-ছোঁয়া পাপড়িগুলি! আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'এখন কী করবে?' তুমি বলেছিলে, 'এখানে তো করার কিছু নেই। এ যে নির্জন মরুভূমি। চলো ফিরে যাই।' আমরা ফিরে এসেছিলুম। কিন্তু কেউ ফিরিয়ে নিতে এল না আমাদের কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেকে। তাকে আমরা বুকে নিয়ে বড়ো করেছি। তাকে রোদের সঙ্গে রোদ হয়ে, বালির সঙ্গে বালি হয়ে লড়াই করতে শিখিয়েছি। দেহটাকে তার লোহার মতো শক্ত করেছি। তাকে শিখিয়েছি কেমন করে ভালোবাসতে হয় বন্ধুকে। কেমন করে রুখে দাঁড়াতে হয় শত্রুর বিরুদ্ধে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি শুনতে পেলুম মা কাঁদছে। কান্নার ফোঁটাগুলি মায়ের কথা হয়ে যেন বেজে-বেজে ঝরে পড়ছে। মা বলছে, 'তাই সে আজ শিখেছে কেমন করে মা-বাবার দুঃখ ঘোচাতে হয়। তাই বুঝি তোমার দুঃখ ঘোচাতে সে এগিয়ে এসেছে তোমার কাজের বোঝা কাঁধে নিতে!'

বাবা বুঝি আর থাকতে পারল না। আমি শুনতে পেলুম, বাবা চিৎকার করে উঠেছে, 'শাবাশ! শাবাশ আবু! এই তো চাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবু যাবে। উটপাখির পালক নিয়ে ও শহরে যাবে। আমি জানি ও পারবে! আমার ছেলে কখনো হারবে না। হারতে পারে না।' বলেই বাবা, ভীষণ জোরে হাঁক দিল, 'আবু-উ-উ!'

আমি চমকে উঠলুম। এতক্ষণ মা আর বাবার কথা শুনতে শুনতে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম। বাবার ডাক শুনে সামলে নিলুম নিজেকে। তাড়াতাড়ি দরজা পেরিয়ে বাবার ঘরে ঢুকলুম। বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমি শান্ত হয়ে দাঁড়ালুম বাবার সামনে। অনেক কষ্টে নিজের চোখের জল সামলে নিলুম। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে গলা আমার কথা বলতে পারে না। ধরা গলায় আলতো-স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, 'ডাকলে বাবা?'

বাবা বিছানায় শুয়ে-শুয়েই হাত দুটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। বলল, 'হ্যাঁ, আমার কাছে আয়।'

আমি এগিয়ে গেলুম।

বাবা জড়িয়ে ধরল আমায়। জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'তুই আমার সাত রাজার ধন এক মানিক। তুই আমার ছেলের মতো ছেলে।'

আমি বাবার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠলুম। কোনো কথাই বলতে পারলুম না।

তুমি শুনলে হয়তো অবাকই হবে, আমার জীবনে আমি আজই প্রথম বাবাকে কাঁদতে দেখলুম। আর সে-কান্না দেখে আমারও বুকের কান্না চোখের জলে আজই প্রথম উপচে পড়েছিল।

আজ আমি সারা রাত ঘুমোইনি। ঘুমোতে পারিনি। তুমি কি বিশ্বাস করবে, আজ সারা রাত আমি কেঁদেছি একা-একা। কাঁদব না? এতদিন আমি যাদের মা আর বাবা বলে জেনেছি, তাদের যে আমি কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে! আমি এদের পর। এদের দয়ায় আমি বেঁচেছি। তাহলে কে আমার সত্যিকারের বাবা? কে আমার মা? এই কথা ভাবতে-ভাবতে আমি ছটফট করেছি আর ভেবেছি, সেদিন যারা এই বালির সমুদ্রে আমায় ফেলে গেছল, তারাই বুঝি আমার মা? আমার বাবা?

শুনতে পাচ্ছ, আর কোনো শব্দ? না, এখন রাত গভীর। ছেলে তার বাপের বোঝা কাঁধে নিতে চেয়েছে, এ ভেবে বাবা ভারি শান্তিতে খুমিয়ে পড়েছে! না এখন বুঝি আর কোনো ভাবনা নেই তার। তাই কষ্টও নেই। আমি একা। একা আমি অন্ধকারে। অন্ধকারের সঙ্গেই এখন আমি লড়াই করছি। কেননা, এই অন্ধকারেই যে আমি হারিয়ে গেছি। হারিয়ে গিয়ে ভাবছি শুধু আমি কে? কে আমি? কে উত্তর দেবে? ওই বোবা অন্ধকারটা?

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঘুম না পেলে রাত তো আর তোমার জন্যে ঘুমের কাজল হাতে নিয়ে বসে থাকবে না। সে সময় হলেই পগার পার। তার পেছনে ছুটতে-ছুটতে ভোরের আলো যখন পৌঁছে যাবে মাটিতে, তখন কোথায় ঘুম আর কোথায় রাত!

চোখে ঘুম ছিল না বলেই আজ খুব সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। খুব সকালে বাবার ঘরে উঁকি মেরে দেখেছিলুম, তখনও ঘুমুচ্ছে বাবা। ঘুমোক। মা তো অনেক আগেই উঠেছে। মায়ের মুখখানা ঘুমের আমেজে তখনও ফুলে আছে। কে জানে কেন, মাকে দেখে আজ আমি খুশিতে হাসতে পারলুম না। আমি বুঝি হারিয়ে ফেলেছি আমার হাসি, আমার কথা, আমার আনন্দ! আমি কি বোবা হয়ে গেলুম?

মায়ের চোখকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। হয়তো আমার মুখে হাসি না দেখেই মা আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আবু, মান খারাপ করছে?'

আমি বললুম, 'মন? কেন খারাপ করবে?'

মা বলল, 'তবে কথা বলছিস না?'

আমি ও-কথায় আর কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'বাবা কেমন আছে মা?'

'ঘুমোচ্ছে।'

'আমি তবে শহরে যাবার জন্যে তৈরি হই মা?'

মা কথা বলল না। ঘাড় নাড়ল।

আমি সেজে নিলুম। আমার সাদা পায়জামার ওপর সেই নীল ডোরা-কাটা জামাটা গায়ে দিতে দিতে আমি ভাবছিলুম, কবে থেকে আশা করে আছি যেদিন প্রথম মরুতে পাড়ি দেব, সেইদিন এই জামাটা পরব। আজ সেইদিন এসেছে। নীল পাগড়িটা এখন মাথায় দিয়েছি বটে, কিন্তু খানিক পরে সে কি আর মাথায় থাকবে। নাকে মুখে নেমে আসবে। উটপাখির পালকগুলো দুটো টুকরিতে সাজিয়ে, আলতো করে বেঁধে পাশার পিঠের দু-পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিলুম। তারপর খেতে দিলুম পাশাকে, খানিকটা শুকনো কাটা ঘাস। অনেকটা খেজুর পাতা। আর বেশ খানিকটা জল। কারণ ক-দিন উপোস করে থাকতে হবে কে জানে! তোমরা শুনলে অবাক হবে, পাশা দিনের পর দিন না খেয়েও থাকতে পারে! পিঠের ওপর ওই যে কুঁজটা দেখছ, দেখো এখন কত মোটাসোটা! চর্বিতে ভরতি। মরুভূমির গভীরে চলে গেলে, ক-দিন পরে দেখবে কুঁজটা শুকিয়ে একেবারে চিপসে গেছে। কেন বলো তো? কুঁজের ভেতরে যে পাশা খাবার ভরে রাখে। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তা হলে বলছি শোনো। পাশা খাবার খায় তো মুখ দিয়ে। যতই খায় ততই চর্বি জমে ওই কুঁজের মধ্যে। তারপর যখন খাবার জোটে না, জল পায় না, তখন ওই কুঁজের চর্বি গলে গলে পেটের খিদে মেটায়, তেষ্টা মেটায়। কী মজা বলো তো?

https://boierhut.com/fb

হ্যাঁ, একথা শুনতে তোমাদের মজাই লাগবে। কিন্তু আমার? অন্যদিন এই সকালে এই বাড়ি আমার। একেবারে আমার নিজের। আমার রাজত্ব। এখানে আমি হাসব, খুশিতে নাচব। নয়তো খেলব, গান গাইব। কিছু না পারি, মায়ের গলা জড়িয়ে দোল খাব।

কিন্তু আজ? দেখবে এসো না একবার আমাকে? আমি আজ অন্য মানুষ! একেবারে অন্য। এ-মানুষটার আজ আর কোনো পরিচয় নেই। আজ আমি শীতের রাতের মতো থমকে আছি। কেন? ভয়ে? না। আমি যে আজ বিশ্বাস করতে পারছি না, যাদের আমি এতদিন মা আর বাবা বলে জেনেছি, তারা আমার কেউ না, কেউ না!

'আবু-উ-উ!' বাবার ঘুম ভেঙেছে। ডাকল আমায়। এমনিতে বাবার গলাটা খুব গম্ভীর। তার মানে এই নয়, সেই গলার আওয়াজ শুনলে তুমি ভয় পাবে। ভারি আদর-মাখানো সেই ডাক। ওই ডাক শুনলে আমার মতো তুমিও হয়তো ভাববে, তোমার খুব কাছের মানুষ, এক আপনজন ডাকছে। সে-ডাকে সাড়া না দিয়ে তুমি থাকতে পারবে না। সেই ডাক শুনে তুমি নিশ্চয়ই ছুটবে। ছুটতে-ছুটতে সাড়া দেবে, 'যাই-ই-ই।'

আমিও তাই করি।

কিন্তু আজ? না, পারলুম না ছুটতে। আমার পা-দুটি আজ আনন্দে লাফিয়ে উঠল না। ধীরে-ধীরে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বাবা বিছানায় বসে আছে। বাবার মুখের দিকে তাকালুম। বাবার ঠোঁট দুটিতে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। আজ বোধহয় বাবা ভালো আছে। কিন্তু মুখখানি বড্ড শুকিয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ভালো আছ বাবা?'

বাবা হেসে উঠল হো-হো করে। হাসতে-হাসতে বলল, 'হ্যাঁ, ভালো আছি, খুউব ভালো।'

আমি আবার তেমনি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'আমায় ডাকলে, কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ বলব।' বলে বাবা একটু চুপ করে রইল। যেন কিছু ভাবল। তারপর ভাবনায় ডুবে থাকা চোখ দুটি আমার দিকে ফিরিয়ে বলল, 'আবু, তোমার মতো বয়সে আমিও আমার বাবার কাজ মাথায় নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলুম। আমার বাবা আমায় শিখিয়েছিল কেমন করে বিপদ মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। আজ আমিও তোমায় সেই কথাই বলতে ডেকেছি আবু।'

'আমি তোমার কথা শুনব বাবা।' খুব আলতো গলায় উত্তর দিলুম আমি। বাবার মুখখানি খুশিতে উছলে পড়ল। বলল, 'তা আমি জানি।' বলে আমায় কাছে টেনে নিল বাবা। আমার পিঠে হাত রাখল। তারপর আবার বলল, 'আমি আর তোমার মা তোমাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। আমাদের কষ্টের দিন এসেছে, তোমাকে সে কষ্ট ছুঁতে দিইনি। আমাদের দুঃখ এসেছে, সে-দুঃখ তোমাকে বুঝতে দিইনি। তোমাকে আমরা সব সাধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছি আবু!'

আমি তেমনি নরম-সুরে জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন একথা বলছ বাবা, আমি কি তোমাদের কোনোদিন দুঃখ দিয়েছি?'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

হঠাৎ মায়ের মুখখানি আমি দেখে ফেলেছি। ছলছল করছে। চোখের কান্না সামলে নিয়ে মা বলল, 'না বাবা, দুঃখ কেন দেবে! যে-ছেলে দুঃখ দেয়, তুমি তো সে-ছেলে নও।'

বাবা আবার বলল, 'তুমি তো জানো আবু, এই মরুর সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। মরুর তপ্ত আগুনের ভেতর দিয়ে কখনো আমরা ছুটি, কখনো বসি, কখনো ঘুমোই। এর নিশ্বাসে-নিশ্বাসে বিপদ। আজ প্রথম মরুর বুকে তুমি পাড়ি দিচ্ছ। তাই তোমাকে বলি, ভয় পেয়ো না বাবা। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে বিপদের সামনে। যে বীর তাকে দেখলে শয়তানেরও যে বুক কাঁপে!'

আমি বললুম, 'বাবা, তুমি আমাকে তোমার বীর ছেলের মতো গড়েছ। তুমি আমাকে সাহসী হতে শিখিয়েছ। অন্যায়ের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখিয়েছ। যতই বিপদ আসুক, সে-বিপদ আমি জয় করবই। যত কষ্টই আসুক, আমি বুক পেতে দেব।'

বাবা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'শাবাশ! শাবাশ!'

আমি বললুম, 'এবার বিদায় নিই বাবা।'

বাবা বলল, 'আবু, যাবার আগে তোমাকে আমি একটি জিনিস উপহার দেব।' বলে বাবা মাকে বলল, 'সিন্দুক থেকে সেই তরোয়ালটা এনে দাও তো আমায়!'

মা তরোয়ালটা বার করে নিয়ে এল। খাপে ঢাকা। বাবা তরোয়ালটা হাতে নিয়ে, খাপ থেকে সেটা বার করতেই আমার চোখ ঝলসে গেল। আমি বুঝতে পেরেছি, এই সেই তরোয়াল। সেই রক্তমাখা তরোয়াল। সেই যেদিন আমায় কুড়িয়ে পেল বাবা, সেইদিনই তো এই তরোয়ালটাও কুড়িয়ে পেয়েছে। অবিশ্যি এখনও কি আর রক্ত লেগে আছে! না, না। তরোয়ালের ঝকমকি জৌলুস ঠিকরে পড়ছে চারদিকে।

বাবা তরোয়ালটা হাতে নিয়েই বলল, 'আবু, তুমি যখন খুব ছোটো, তখন এই তরোয়ালটা আমি কুড়িয়ে পাই। এতদিন যত্ন করে তুলে রেখেছিলুম। মনে-মনে ভেবে রেখেছিলুম, যেদিন তুমি বড়ো হবে, যেদিন তুমি একা একা ওই মরুর পথে পাড়ি দেবে, সেদিন তোমার হাতে তুলে দেব এই তরোয়াল। আজ আমার সেই স্বপ্নের দিন এসেছে, আবু। নাও।'

আমি বাবার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দু-হাত তুলে সেই তরোয়াল হাতে নিয়ে মাথা হেঁট করলুম, 'এবার তবে আসি বাবা?'

বাবা আমার চিবুকে হাত দিল। আমার কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'এস।'

আমি মায়ের কাছে গেলুম। মায়ের বুকের ওপর মাথা রেখে এবার আমি কেঁদে ফেললুম। কাঁদতে-কাঁদতে বলে ফেললুম, 'মা, বিদায়!'

মা আমার মুখখানি নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'বিদায়।' বলে মাও আমার কপালে চুমু খেল। তারপর কেঁদে ফেলল।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি তরোয়ালটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে, কোমরে বেঁধে, অনেকটা কাঁদতে-কাঁদতে, খানিকটা ভাবতে-ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর পাশার পিঠে চেপে কোন না-দেখা জগতের দিকে এগিয়ে চললুম।

তুমি হয়তো ভাবছ, আমি বুঝি একাই চলেছি। বুঝি একাই পাশাকে নিয়ে মরুতে পাড়ি দেব! না, না, তা কেন হবে। আরও অন্তত তিরিশটা উটের পিঠে মাল বোঝাই করে, আরও তিরিশ জন চলেছে শহরে। চলেছে মাল কেনাবেচা করতে। এমনি করে দল বেঁধেই তো যেতে হয়। এমনি করে দল বেঁধে যেতে-যেতে মরুর ওপর কেটে যায় দিনের পর দিন। দল বেঁধে না গেলে, কে বলতে পারে কার কখন কী বিপদ আসে। ওই শোনো উটের গলায় ঘন্টা বাজছে, টিং-লিং, টিং-লিং! সার বেঁধেছে ওরা। সারে-সারে আকাশে ঘাড় উঁচিয়ে, পা ফেলছে। দেখলে তুমি চোখ ফেরাতে পারবে না। এত ভালো লাগবে! মনে হবে উটের পিঠে চেপে তুমিও মরুতে পাড়ি দাও!

আমি চলেছি। আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি, মা আমার অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে চোখ মেলে। দেখতে পাচ্ছি, বাবাও বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। একটি হাত ওপরে তুলে বাবা আমায় বিদায় জানাচ্ছে। আমি এতদূরে চলে এসেছি যে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না, যে-হাতটা তুলে আমায় বিদায় জানাচ্ছে, সে হাতটি বাবার কাঁপছে কি না। তবু যতক্ষণ পারলুম, আমিও হাত তুলে রইলুম। তারপর দুজনেরই চোখের দৃষ্টি থেকে দুটি হাত হারিয়ে গেল। আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল বালি আর বালি। আমাদের মাথার ওপর খোলা আকাশ, নীল। আগুনের গোলার মতো সূর্যের তেজ। এই সময় তুমি এখানে থাকলে তোমার মন বলত, আকাশটা যদি শুধুই আকাশ হত! আকাশের গায়ে যদি ওই জ্বলন্ত সূর্যটা না থাকত!

কতদূর চলে এসেছি! ক-ত দূর! এখন পাশার পিঠে দুলতে দুলতে বারবার আমার চোখে নেমে আসছে কাল রাতের না-ছোঁয়া ঘুমটা। তা বলে ঘুম আমায় জড়িয়ে ধরতে পারছে না। কেননা, যতবারই সে আমার চোখের পাতায় বসি-বসি করছে, ততবারই যেন আমার বুকটা চমকে-চমকে উঠছে। মন বলছে, কেমন করে মনে করি এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই!

আমরা বোধহয় কয়েক ঘন্টা হেঁটেছি। আকাশের সূর্য এখন ঠিক আমাদের মাথার ওপর। ওই দেখো, দূরে দেখা যাচ্ছে মরূদ্যান! ওখানে ইঁদারা আছে। ওখানে আমরা থামব! যার সঙ্গে তাঁবু আছে, সে তাঁবু খাটাবে। ইঁদারার জল চোখে-মুখে দিয়ে কিছু খেয়ে নেব আমরা। মা আমার জন্যে কত খাবার যে দিয়েছে, একা খেয়ে শেষ করতে পারব না। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নেব। তারপর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে মাথা হেলাবে, আমরা আবার চলব।

এমনি চলতে-চলতে দুদিন কেটে গেল আমাদের। দুদিনে আমরা কতখানি পথ চলে এসেছি। কত অজানা মানুষের সঙ্গে আমার কত পরিচয় হল। ওরা গল্প বলে। কত না-জানা কথা শোনায়। কত নিশ্চিন্ত আমি। ভাবলুম, বুঝি এমনি করেই পৌঁছে যাব শহরে।

https://boierhut.com/fb

কিন্তু হল না। তিনদিনের দিন পথে আবার আমরা হাঁটা শুরু করলুম। শুরুতে কি জানতাম এক ভয়ংকর বিপদ আমাদের মাথার ওপর ওত পেতে আছে। আমরা অনেকটা এসেছি। এতক্ষণ পর্যন্ত দেখেছি ঝরঝরে আকাশ। হঠাৎ দেখি কোথাও কিছু নেই, আকাশ মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। উটের পিঠের মানুষরা আতঙ্কে চুপসে গেল।

ওরা চেঁচিয়ে উঠল, 'থামো, থামো, ঝড় উঠবে!'

সে-চিৎকার শুনে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আমার। ঝড় উঠবে! কী হবে তা হলে! তোমরা তো জানো না মরুর বুকে ঝড় ওঠা মানে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! আমাদের মাথার ওপর ঝড়ের মেঘ! এখন মরুভূমির এই শূন্য ভূমিতে কোথাও আশ্রয় নেই যে সেখানে ছুটে যাবে।

হ্যাঁ, সত্যি-সত্যি ঝড় উঠল। ওই দ্যাখো রাশি-রাশি অসহ্য গরম বালি ঝড়ের ঝাপটায় উড়ে আসছে! নিমেষের মধ্যে বেগুনি নীল অন্ধকারে ঢেকে গেল সারা দিগন্ত। মনে হচ্ছে, ওই রাশি-রাশি বালি যেন এক-একটা আগুনের ফুলকি! ঝাঁকে-ঝাঁকে গায়ে-মুখে ছিটকে আসছে। ওঃ! জ্বলে যাচ্ছে শরীর! যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে আর সবার মতো আমিও সারা মুখ ঢেকে ফেললুম! তপ্ত হাওয়ায় যেন ফুটন্ত লোহার ছেঁকা! কোথায় পালাব! একটু যদি আশ্রয় পাই! আশ্রয় কোথা এখানে! আমি লাফিয়ে পড়লুম পাশার পিঠ থেকে। নিজেকে ওই ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বালির ওপরই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লুম। তবু নিস্তার নেই। চেয়ে দেখি, ভয়ে কুঁচকে সবাই শুয়ে পড়েছে ওই বালির ওপর। যত মানুষ, যত উট, সব। আমার মতো সবাই কাতরাচ্ছে বালির ওপর। হঠাৎ ঝড়ের প্রচণ্ড শোঁ-শোঁ শব্দ! আচমকা চোখ মেলে চেয়ে দেখি, রাশি রাশি বালি যেন এক বিরাট জাল বিছিয়ে শূন্যে উড়তে-উড়তে ভেসে আসছে! আমি চিৎকার করে উঠলুম! আমি দেখতে পাচ্ছি, ওই জাল যেন কাঁপতে-কাঁপতে ধেয়ে আসছে আমারই দিকে! আমি ঝড়ের সঙ্গে ঝড় হয়ে ছোটা দিলুম! কোনদিকে ছুটব! আর কেমন করেই বা ছুটব! পা যেন ছুটতে পারছে না! আমার সমস্ত শক্তি ওই আগুনের তেজে যেন ছাই হয়ে গেছে! তবু ও শেষ শক্তিটুকু উজার করে পালাচ্ছি আমি। কিন্তু না। পারলুম না। চক্ষের নিমেষে ওই বালির জাল আমার ঘাড়ের ওপর ছিটকে পড়ল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠতে গেলুম, 'বাঁচাও, বাঁচাও।' কিন্তু স্বর বেরোল না আমার। আমি বালির জালে চাপা পড়ে গেলুম। মনে হল, কে যেন আমায় আগুনের গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিল। আমি তারপরে আর জানতেও পারলুম না, সেই গহ্বরে তখন আমি বেঁচে আছি কি না! কেননা, আমি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি!

অনেকক্ষণ পর, কতক্ষণ পর বলতে পারি না, আমার নিজেরই নিশ্বাসের শব্দটা আমার কানে ভেসে এসেছিল। আমি তখনও বুঝতে পারিনি, আমি বালির নীচে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। আমার সারা দেহ বালির নীচে চাপা পড়েছে। রক্ষে এই, মুখখানা কেমন করে যেন বেঁচে গেছে! যদি মুখখানাও বালিতে চাপা পড়ত, তখন আমিও শেষ হয়ে যেতুম! তখন এই গল্প কি আর তোমাদের

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বলতে পারতুম আমি! মরুর শেয়াল হয়তো বালি খুঁড়ে বেরিয়ে এসে আমার দেহটা নিয়ে ভোজ বসাত!

আমি বাঁচলুম। অনেক কষ্টে ওই বালির গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু আমার চোখে যেন সব ঝাপসা ঠেকছে! এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছি। দাঁড়াতে পারব কি না বুঝতে পারছি না। নিশ্বাস নিতে ভারি কষ্ট হচ্ছে আমার। দম আটকে আসছে। বালির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে, ওই বালির ওপরই আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারতুম যদি!

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আরে! দলের আর কারও গলা শুনছি না কেন! তাই তো! এত নিস্তব্ধ কেন চারদিক! ওই তো ঝড় থেমেছে! ওই তো আবার রোদ উঠেছে! তবে কি সবাই আমার মতো বালির ভেতর চাপা পড়েছে!

আতঙ্কে শিউরে উঠলুম আমি। ঝাপসা চোখেই চেয়ে দেখলুম এদিক-ওদিক, চারদিক। কই, কেউ তো নেই! দেখি চারদিকে শুধু উঁচু-উঁচু বালির পাহাড় খাড়া হয়ে আছে। এতক্ষণ যে জায়গাটা খোলামেলা ছিল এখন সেখানে শুধু বালির পাহাড়। কী শক্তি ওই মরুর ঝঞ্ঝার! চক্ষের নিমেষে স্তূপ-স্তূপ বালি উড়িয়ে এনে পাহাড় তৈরি করে ফেলেছে! কিন্তু পাশা! পাশা কোথা? দেখতে পাচ্ছি না তো! আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি! খুব জোরে চিৎকার করে হাঁক পাড়লুম, 'পাশা-আ-আ-।'

কোনো সাড়া নেই। শুনতে পেলুম না আমি পাশার গলার সেই ঘন্টার চেনা শব্দ! কী ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি! বুকের ভেতরটা ঢিপ-ঢিপ করে কেঁপে উঠল! নিমেষের মধ্যে আমার কষ্ট-টষ্ট যেন হাওয়ায় উবে গেল। আমি বালির ওপর চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে দিশেহারা হয়ে ছোটাছুটি লাগিয়ে দিলুম। আকাশ ঝকঝকে নীল। সূর্য আবার তেমনি ভয়ংকর! মরু আবার আগুনে ঝলসাচ্ছে! কিন্তু যে-কষ্টে এতক্ষণ আমি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলুম, যে-কষ্ট এতক্ষণ আমায় দগ্ধে মারছিল, এখন যেন সে-কষ্ট আর কষ্টই নয় আমার কাছে। কেননা, পাশাকে যে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি পাশাও ডুবে গেছে বালির তলায়!

আমার ভীষণ ধাঁধা লেগে গেল! আমি যে বাবাকে কথা দিয়েছি, যেমন করে হোক ওই উটপাখির পালক শহরে পৌঁছে দেব। কিন্তু এখন কী হবে!

আমি স্তূপ স্তূপ বালির পাহাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম। দুহাত দিয়ে খামচাতে লাগলুম ওই বালি। খামচে-খামচে খুঁজতে লাগলুম পাশাকে। আমি এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে যাই। এদিক থেকে ওদিক। কিন্তু কই, পাশা তো নেই! ভয়ে আমার হাত-পা যেন সিঁটিয়ে গেল! কী করি আমি! কোনদিকে যাই! আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি ক্লান্ত! উঃ! কী ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে! একটু জল দাও! তোমরা আমায় একটু জল দাও! আমি যে আর পারছি না! কিন্তু কে দেবে জল! এখানে কেউ

https://boierhut.com/fb

নেই। চিৎকার করে মরে গেলেও কেউ আমার কথা শুনতে পাবে না। শূন্য! চারদিক শূন্য! খাঁ-খাঁ! কই, আকাশে একটা কাক-পক্ষীও যে দেখা যায় না!

তেষ্টার জ্বালায় এখন আমি ওই বালিগুলোকেই মুঠো-মুঠো চেপে ধরছি! নিঙড়ে নিঙড়ে একফোঁটা যদি জল বার করতে পারি! ভুলে গেলুম আমি এগুলো শুধুই বালি! রোদে পোড়া ঝলসানো পাথরের গুঁড়ো! এর বুকে জল নেই, জল নেই!

হঠাৎ চোখের ওপর ভেসে উঠল, জলের ঢেউ! চিকচিক করছে? তখন আমি বুঝতে পারলুম না এ মরীচিকা! এ আমার চোখের ভুল! মরীচিকা আমি কত দেখেছি! মরীচিকা দেখে আমি কত হেসেছি। আমি জানি, বালির ওপর রোদের এ ঝিলিমিলি শুধুই হেঁয়ালি! কিন্তু আজ আমার মনে হল, এ সত্যি! এ তেষ্টার জল! একফোঁটা জলের জন্যে যখন মানুষের বুকের ভেতরটা ছটফটিয়ে ওঠে, তখন বুঝি মরীচিকা মানুষকে বোকা বানায়! তার বুদ্ধি কেড়ে নিয়ে তাকে ছোটায় তারই দিকে!

আমিও ছুটলুম, দু-হাত বাড়িয়ে ছুটলুম। ভাবলুম ছুটলে বুঝি নাগাল পাব ওই জলের! কিন্তু না, নাগাল আমি পেলুম না। শুধু ছুটছি আর হাঁপাচ্ছি। আমার প্রাণ বুঝি বেরিয়ে যায়! গলায় আমার কথা নেই! হারিয়ে গেছে! পা আমার চলছে না! টলছে যেন! আমার চোখের পাতা বুজে এল। পড়ে গেলুম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আমার যেন মনে হল, কাদের গলার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। মনে হল, কারা যেন অনেকদূর থেকে এদিকেই আসছে। আমি খুব সম্ভব অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিলুম। মনে হচ্ছিল, এখনই আমার নিশ্বাস বুঝি ফুরিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, স্পষ্ট শুনছি ওরা ছুটে আসছে বালির ওপর দিয়ে, ঘোড়ায় চেপে। ওরা আমায় দেখতে পেয়েছিল। থামল। ওদের কাছে জল ছিল। আমায় কাতরাতে দেখে তাড়াতাড়ি আমার মুখে জল দিল। আঃ! যেন প্রাণ ফিরে পেলুম। আমি চোখ চাইলুম। হাত বাড়ালুম। ওরা আমায় তুলে ধরল। বসতে পারলুম আমি। তারপর ওদের অস্পষ্ট গলায় বললুম, 'আমায় বাঁচান।'

ওদের কেউ-ই আমার সঙ্গে কথা বলল না। এমন কী নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা কইল না। ওরা আমায় ধরাধরি করে দাঁড় করাল। আমি হাঁটতে পারলুম। ওরা আমায় ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে আমাকে নিয়ে ছুটল। বসেছি আমি একজনের পেছনে, তাকে জড়িয়ে ধরে। হয়তো তখন আমি বিশ্বাস করতে পারছিলুম, আমি বেঁচে আছি। কে জানে এরপর আমার কী হবে! যতবারই ভাবছি সে-কথা, ততবারই যেন শিউরে উঠছিলুম।

হঠাৎ আমি চমকে উঠছিলুম এই ঘোড়াসওয়ারদের দেখে। হ্যাঁ দেখছি আটটা কালো ঘোড়ার পিঠে চেপে আটটা লোক ছুটছে। কোমরে তাদের তরোয়াল আর ছোরা আঁটা। পোশাকগুলোও কালো। এই কালো পোশাকের আড়ালে কী মতলব লুকনো আছে আমি জানি না। তবু আমার

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল। আচ্ছা, মরুর দস্যু নয় তো! এ-কথা মনে হতেই আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। কেননা, আমি জানি এরা ভীষণ নির্দয়, ভয়ংকর হিংস্র! বাবার মুখে এদের কত গল্প আমি শুনেছি। শুনেছি অতর্কিতে এরা মরুযাত্রীদের আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব লুঠ করে নেয়। তবে কি এরাও তাই! এরাও কি তবে লুঠ করে ফিরছে! সামনে ওই যে লোকটা চলেছে, ওর কোলে-বাঁধা ওই পুঁটলিটাতে কী আছে! তবে কি কারো লুঠের মাল! হবেও বা! কিন্তু তাহলে আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা! এরা তো মানুষকে খুন করে! তবে কি আমাকেও খুন করবে!

করুক খুন। আমি এত ভীতু! আমার কোমরেও তরোয়াল আছে। আমাকে মারার আগে ওদেরও ছেড়ে দেব না আমি! কাপুরুষের মতো ওদের তরোয়ালের সামনে মাথা পেতে দেব, তেমন ছেলে আমি নই। আমিও জানি দুশমনকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়!

কিন্তু ছিঃ ছিঃ, আমি এ-কথা আগেই কেন ভাবছি। ওরা যদি অতই নিষ্ঠুর হয় তবে আমায় বাঁচাবে কেন! ওই বালির ওপর একটু জলের জন্যে আমি যদি ধুঁকতে-ধুঁকতে মরি তাতে দস্যুর কী! এদের মনে দয়া কেন হবে?

হ্যাঁ, আমি তো মরেই গেছলুম! আর একটু দেরি করে এই ঘোড়সওয়ারের দল এখানে যদি আসত! ওরা যদি আমায় দেখতে না পেত! অবিশ্যি আমি মরলেই বা কী! এখন তো আমি জানি এই মরুভূমিতে আমি কুড়িয়ে-পাওয়া এক অনাথ ছেলে! আমি জানি না, নিজের বাবা-মা কেমন হয়। কিন্তু এরা? যাদের আমি এতদিন মা বলে ডেকেছি বাবা বলে জেনেছি, তারা? কোনোদিনই তো জানতে পারিনি এরা আমার কেউ নয়! কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেকে যারা আপন করে নিতে পারে, তারা কি শুধুই মানুষ না মহাপুরুষ!

হঠাৎ মায়ের মুখখানি আমার চোখের সামনে কেমন ভেসে উঠল! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মাকে! দেখতে পাচ্ছি, মা আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে। আমি ওই মুখখানি জড়িয়ে ধরে কতদিন যে খেলা করেছি। মায়ের গলায় দু-হাত রেখে দুলতে-দুলতে মাকে কত আদর করেছি। না এ হতে পারে না। মা আমার পর না। কক্ষনো না। আমার মা আমারই। আমার আপনার!

'এ খোকা, এখানে কোত্থেকে এসেছিস?' হঠাৎ আমি যার ঘোড়ার পিঠে বসেছিলুম সে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে গেছলুম। তারপর ভয়ে-ভয়ে উত্তর দিলুম, 'আমি এখানে আসতে চাইনি। আমার সঙ্গে আমার উট ছিল। আমি উটপাখির পালক নিয়ে শহরে যাচ্ছিলুম। ঝড় উঠে আমি হারিয়ে গেছি।'

'কোথা থাকিস?'

'জানজি।' আমি বললুম। অবিশ্যি তোমাদেরও বলতে ভুলে গেছি, আমরা যেখানে থাকি, সে-জায়গাটার নাম জানজি।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সে জিজ্ঞেস করল 'বাড়ি যাবি?'

আমি বললুম, 'আমার বাবাকে বলে এসেছি, শহরে উটপাখির পালক পৌঁছে দিয়ে ফিরব।'

'পালক পাবি কোথায়?'

'আমার উটের পিঠে বাঁধা আছে।'

আমার কথা শুনে লোকটা কোনো কথা বলল না। বিচ্ছিরি সুর করে হেসে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'হাসলেন কেন?'

সে বলল, 'আজ প্রথম বেরিয়েছিস?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

'একা-একা?'

'আমার বাবার যে অসুখ করেছে!'

'তোর বাবার আক্কেল নেই।'

এ-কথা শুনেই আমার যেন গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠল। আমি প্রতিবাদ করে উঠলুম, 'এ-কথা কেন বলছেন? তিনি তো আপনার কোনো ক্ষতি করেননি।'

আমার এই কথায় লোকটা যে অমন হুট করে চটে উঠবে, আমি বুঝতে পারিনি। হঠাৎ ঘোড়ার লাগাম ধরে সে ঝপ করে থেমে দাঁড়াল। ঘোড়ার পিঠের ওপর বসে-বসেই আমার বুকের জামাটা খামচে ধরে টান মারল। চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বলছিস?'

আমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলুম!

লোকটা আবার হাঁক পাড়ল, 'কী বলছিস, আর একবার বল!' বলেই ঘোড়ার পিঠ থেকে আমায় নীচে ফেলে দিল। আমি কী করি, কী বলি ভাবতে-ভাবতেই লোকটা তার কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে তরোয়ালটা বার করে ফেলেছে। সঙ্গে-সঙ্গে দেখি, তার আরও সাতজন সঙ্গী দাঁড়িয়ে পড়েছে! আমি কিছু বলার আগেই লোকটা আমাকে মারবার জন্য তরোয়াল তুলল। লোকটা যে এমন তুচ্ছ কথায় হঠাৎ চটে উঠে আমাকে একেবারে কেটে ফেলার জন্যে তরোয়াল তুলেছে, সত্যি বলছি, এটা আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। আসলে আমি তো রেগে যাবার মতো অন্যায় কথা বলিনি। উলটে লোকটাই তো বলল, আমার বাবার আক্কেল নেই! তোমরাই বলো, বাবার নামে এমন কথা বললে কোন ছেলে সহ্য করে!

আমায় ঘিরে ফেলল ওরা। ওরা আটজনই একসঙ্গে তরোয়াল বার করল। কোথা থেকে যে কী হল, তখন আমার কোত্থেকে যে সাহস এল, বলতে পারব না। আমিও ঝটপট খাপ থেকে তরোয়াল বার করে ফেললুম। আমি মনে-মনে ভাবলুম, মরতে হয় মরব, তবু ভীরুর মতো কেন মরব! তাই, যেই ওরা তরোয়াল চালিয়েছে, ওদের তরোয়ালের বুকে ঘা মেরে আমার তরোয়ালও ঝনঝনিয়ে উঠল। আমি আটজনের সঙ্গে একাই মুখোমুখি লড়াই শুরু করে দিলুম। তুমি যদি তখন আমায়

https://boierhut.com/fb

দেখতে, হলপ করে বলতে পারি, তুমি অবাক হয়ে যেতে। আমি তখন আর সে আবু নই। তখন আমি যোদ্ধা। এই নিঃশব্দ, নিজঝুম বালির সমুদ্রে আমি এখন একা-একা যুদ্ধ করছি আটজন দস্যুর সঙ্গে। জানি না, কে আমায় এত শক্তি দিল। একটু আগে যে-আমি মরতে-মরতে বেঁচেছি, সে-ই আমি এখন শত্রুর তরোয়ালের আঘাত আটকাবার জন্যে কখনো সামনে লাফাচ্ছি। পেছনে হাঁটছি। ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। প্রচণ্ড শব্দে তরোয়াল বেজে উঠছে, ঝনাত, ঝনাত!

কিন্তু এ তো অসম্ভব ব্যাপার! একা আমি এতজনের সঙ্গে কতক্ষণ লড়ব? আমি জানি, এক্ষুনি আমার হাতের মুঠির থেকে তরোয়াল ছিটকে পড়বে। আমি জানি, আমার মরণ নিশ্চিত! এখনই আমার বুক দিয়ে রক্ত গড়াবে। তারপর হয়তো আমার ক্ষত-বিক্ষত দেহটা এইখানে ফেলে রেখে ওরা দুরন্ত বেগে ছুটে পালাবে। তখন এই তপ্ত বালির ওপর দেহটা পড়ে-পড়ে শুকিয়ে-শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবে!

না, আমি আর পারছি না। আমার হাতটা অবশ হয়ে আসছে। আমি ঘুরন্ত চরকির মতো ছিটকে পড়ছি। নিমেষের মধ্যে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছি। লাফাচ্ছি, কিন্তু টাল খাচ্ছি। বালির ওপর আমার পা স্থির রাখতে পারছি না। ঠিক এমন সময় হঠাৎ আটটা তরোয়ালই এক সঙ্গে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি শেষবারের মতো লাফিয়ে উঠেছি। কী বলব, কোত্থেকে যে শক্তি পেলুম জানি না। চোখের পলকে আমি একজনের পেটে তরোয়াল চালিয়ে দিয়েছি। লোকটা চিৎকার করে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে দেখি, সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একজন প্রাণের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগো, ভাগো, ওরা আসছে।'

আমিও চমকে গেলুম। একেবারে চোখের পলক পড়তে-না পড়তেই দেখি, লোকগুলো পিছু ফিরেছে। আমিও পিছু ফিরেছি। দেখি, দূরে বালির ধুলো উড়িয়ে আর-একদল লোক ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছে। আর দেখতে! এরা সঙ্গে-সঙ্গে আহত লোকটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে তির-বেগে ছুট মারল। আমি তো থ। কিচ্ছু ভেবে না পেয়ে, একবার এদের দিকে আর একবার ওদের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলুম! আমার হাতে তরোয়াল রক্তমাখা। তাড়াতাড়ি সেটা খাপে পুরে ফেললুম। বলব কী, সঙ্গে-সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশটা ঘোড়সওয়ার আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তাদের কিছু বলার আগেই একজন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঝটপট আমার মুখখানা একটা কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর একটা শক্ত দড়ি দিয়ে আমার হাত দুটো আর কোমরটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চাপল সে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা, আমি বালির ওপর দাঁড়িয়ে। আমার কোমরে বাঁধা লম্বা দড়িটা লোকটার হাতে। লোকটা ঘোড়ার ওপর বসে। ঘোড়া ছুটল। আমার দড়িতে টান পড়ল। আমিও ছুটলুম বালির ওপর দিয়ে ঘোড়ার পিছু-পিছু। কিন্তু তোমরা তো জানো ঘোড়ার সঙ্গে ছোটা আমার সাধ্য নয়। যতই টান খাচ্ছি, ছুটতে ছুটতে উলটে পড়ছি। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। কখনো পারছি, কখনো হারছি। শেষে লুটিয়ে পড়লুম বালির ওপর। ঘষটাতে

ঘষটাতে গড়িয়ে চললুম। আমি বুঝতে পারছি আমার গা-হাত-পা ছড়ছে। আমি জ্বলে যাচ্ছি। রোদের জ্বালার চেয়ে এ যে আরও ভয়ংকর! আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, লোকগুলো আমাকে এমনি করে বাঁধল কেন! এমন করে বেঁধে টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! ওরা কি বালির ওপর ঘষতে-ঘষতে এমনি করে আমায় মেরে ফেলবে! আমি তো কোনো দোষ করিনি। আঃ! আমি যে আর পারছি না। একটার পর একটা বিপদ এসে কেন বারবার আমায় জড়িয়ে ধরছে! আমার এখন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'হে মরু, তুমি আমায় বাঁচাও! একদিন তোমার বুকে জানি না কারা আমায় ফেলে যায়! তুমি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলে বলেই না আমি পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে দেখেছি, কী সুন্দর এ পৃথিবী! দেখেছি তাদের, ওই যারা তোমার বুক থেকে তুলে এনে, তাদেরই বুকের ছায়ায় আমায় বড়ো করেছে। আমি জেনেছি, এরাই আমার মা, আমার বাবা। এই সুন্দর পৃথিবীতে এরা যে আমার কাছে আরও সুন্দর। আরও আপন। হে মরু, যারা আমাকে প্রাণ দিল, তাদের কথা ভেবে, আমার প্রাণ তুমি কেড়ে নিও না! আমি যদি মরে যাই কে তাদের দেখবে! হে মরু, বলো তুমি, ছেলে যদি মা-বাবাকে না দেখে কে দেখবে?'

ঘোড়া ছুটতে-ছুটতে থামল। আমিও থামলুম। কিন্তু দাঁড়াতে পারলুম না। ওরা নেমে এল ঘোড়ার পিঠ থেকে। আমার মুখের কালো কাপড়ের ঢাকনাটা আর হাতের বাঁধনটা ওরা খুলে ফেলে দিল। আমার চোখে অন্ধকার! ওরা আমার ঘাড়টা ধরে টান মারল। আমি উঠতে গিয়েও পড়ে গেলুম। কিন্তু ওরা ছাড়বে না। আমাকে দাঁড়াতেই হবে। অনেক কষ্টে কাঁপতে-কাঁপতে আমি দাঁড়ালুম। কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা আমার সারা দেহে।

ওরা আমার কোমরের দড়ি ধরে টানতে-টানতে নিয়ে চলল। কোথায় নিয়ে চলল, জানি না। শুধু জানি, আমার চোখের সেই কালো অন্ধকারটা ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে! আমি একটু-একটু করে চাইতে পারছি। মনে হচ্ছে, হয়তো বা মরুভূমির বালির কোলে আর এক নতুন জায়গায় এসেছি আমি। কেননা, আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে একটা পুরোনো বাড়ির ভাঙা ফটক। কেমন যেন রহস্য-ঘেরা! ওর আমায় টানতে টানতে ফটকের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি একটা শান-বাঁধানো ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। একটা সুন্দর পালঙ্ক। মখমলের গদির ওপর ভেলভেটের বালিশে হেলান দিয়ে যে লোকটা বসে আছে, তার মাথায় লম্বা চুল। দাড়ি আর গোঁফের সঙ্গে চুলে পাক ধরেছে। তবু তীক্ষ্ণ তার চোখের দৃষ্টি। লম্বা আর শক্ত সমর্থ মানুষ। ওরা আমায় তার সামনে দাঁড় করাল। আমি বুঝলুম ইনিই বোধহয় পালের গোদা! ইনিই বোধ হয় সর্দার! বিদ্যুৎ যেমন চমকে যায় তেমনি তার চোখ দুটো হঠাৎ ঝলসে উঠল আমার মুখের ওপর। তারপর স্থির আর গম্ভীর তার গলার স্বর বলে উঠল, 'এই বাচ্চাটাকে কোত্থেকে ধরে আনলে?'

আমায় যারা ধরে এনেছিল তাদের পান্ডা যে লোকটা, সে বলল, 'হুজুর ছেলেটা দলে ছিল।'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আবার সে বলল, 'এত কম বয়সে দস্যুগিরিতে নেমেছে! ছেলেটার কাছ থেকে লুঠের মাল কিছু উদ্ধার করতে পারলে?'

'আজ্ঞে না। ছেলেটাকে ফেলে রেখে ওরা মাল নিয়ে ভাগল!'

এবার রেগে যেন সেই সর্দার গর্জন করে উঠল, 'তোমরা এতগুলো লোক কী করছিলে? এতজনের চোখের ওপর দিয়ে ভাগে কেমন করে?'

এবার আর কোনো উত্তর বেরোল না তার মুখ দিয়ে। মনে হল ভয় পেয়েছে।

সর্দার আবার জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটার কাছে কিছুই পাওয়া গেল না?'

'আজ্ঞে না।'

সর্দার তখন আমার দিকে আবার ফিরে চাইল। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় তোদের আস্তানা?'

আমি অনেক কষ্টে কথা বলতে পারলুম, 'জানি না।'

সে অমনি সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'না বললে মরবি!'

আমি আবার বললুম, 'আমি দস্যু নই। আমি জানি না।' লোকটার তীক্ষ্ণ চোখের চাউনি এবার কেমন ভয়ানক চকচক করে জ্বলে উঠল। সে আরও চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'কোনখানে তোদের আস্তানা?'

আমি তেমনি শান্ত গলায় উত্তর দিলুম, 'আমি দস্যুগিরি করি না।'

লোকটা এবার হো-হো করে হেসে উঠল। কী হিংসুটে সে হাসির শব্দ। হাসতে-হাসতে আচমকা থেমে পান্ডাকে বলল, 'চাবুক লাগাও!'

এ-কথা যদি আমার আপনজন কেউ বলত, তবে নিশ্চয়ই আমার দু-চোখ বেয়ে জল গড়াত। কিন্তু এই লোকটার হুকুম শুনে মাথা তুলে, বুক ফুলিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলুম, 'কেন তোমরা আমায় চাবুক মারবে? আমি মিথ্যে বলি না। খবরদার! আমার গায়ে হাত তুলবে না!'

লোকটা বোধহয় থতমত খেয়ে গেছল আমার কথা শুনে। শুধু এই লোকটা কেন যে-লোকটাকে চাবুক মারতে বলেছিল সে-ও বোধহয়। কেননা, তার হাতের চাবুক হাতেই থমকে গেছল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে চাবুক হাতে লোকটা আমাকে মারবে বলে যেই আবার চাবুক তুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সর্দার পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'থামো!'

চাবুক আমার পিঠে না পড়ে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এবার সে নিজেই চাবুকটা ছিনিয়ে নিয়ে, আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে প্রচণ্ড জোরে সেই চাবুক শূন্যে ঘোরাল। কিন্তু তার আগেই আমি আমার কোমরে বাঁধা তরোয়ালটা খাপ থেকে বার করে চাবুকের ওপর চালিয়ে দিয়েছি। চাবুকের দড়ি ছিঁড়ে ছিটকে পড়ল। আমার হাতের তরোয়াল খাপের মধ্যে ঢুকে গেল। লোকটা তার হাতের চাবুকের ভাঙা টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে আমার গলাটা দু-হাত দিয়ে

https://boierhut.com/fb

চেপে ধরল। কিন্তু আশ্চর্য! আমার চোখের ওপর তার চোখ পড়তেই লোকটা যেন কেমন চমকে গেল। তাড়াতাড়ি আমায় ছেড়ে দিল। তারপর আমার মুখের দিকে ফ্যালফাল করে বেবাক তাকিয়ে রইল। কেন যে লোকটা এমন করল, কেন যে আমায় মারতে-মারতেও ছেড়ে দিল, আমি বুঝতে পারলুম না। আমি কেন, ঘরসুদ্ধ অত লোক সবাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে।

লোকটা কেমন হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে-হাঁপাতে চেঁচিয়ে উঠে বিছানায় ছুটে গেল। মাথার বালিশটাকে খামচে ধরে হুকুম করল, 'ছেলেটার কোমর থেকে তরোয়ালটা কেড়ে নাও। ছেলেটাকে বন্দি করে রাখো। যাও, নিয়ে যাও ওকে আমার সামনে থেকে।'

ওরা আমায় টানতে-টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চলে গেল। তারপর আমার কোমর থেকে তরোয়ালটা কেড়ে নিয়ে, আমাকে একটা গরাদ-আঁটা ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে, ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমি কয়েদ হয়ে রইলুম। আমি জানি না, আমার ভাগ্যে এখন কী আছে। তবে একথা ঠিক, এখন আমি ভয়ংকর কিছুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছি, তবে কি এবার এরা আমায় মেরে ফেলবে!

হ্যাঁ, এখন আমি কয়েদ হয়েই আছি। আমি ভয় পেয়েছি কি না জানি না। কিন্তু আমার মা আর বাবার মুখ দুটি বারবার আমার চোখের ওপর ভেসে উঠছে। আর যখনই ভাবছি, হয়তো আমি আর তাদের দেখতে পাব না, তখনই আমার চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠছে। আমি জানি, আমার নিস্তার পাওয়ার আর কোনো রাস্তা নেই। হয়তো বেঁচে আছি কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু সে কিছুক্ষণ যে কতক্ষণ, তা জানি না।

ঘরটা অন্ধকার। আমি যেন অন্ধকারে ডুবে আছি। ভাবছি, আমার মা আর বাবা এখনও হয়তো ঘুমোচ্ছে। হয়তো ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আমারই স্বপ্ন দেখছে। কিংবা জেগে-জেগে ভাবছে, আজকের রাত কি কালকের চেয়েও বড়ো! তা না হলে, এ-রাত কাটে না কেন! শেষ হয় না অন্ধকার! এমন মানুষ ক-জন হয়। পথের ছেলেকে ঘরে তুলে এনে, নিজের ছেলে বলে বুকে তুলে নিতে পারে ক-জন! আমি তাদের কাছে যা চাইনি, তাই-ই পেয়েছি। মা-মানে যা চেয়েছি, তাও যে আমার চাইবার আগেই তারা ভালবেসে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। তাই আজ এই কয়েদখানার অন্ধকারে বসে-বসে মন আমার বারবার কেঁদে-কেঁদে বলে উঠছে, আমি যদি কোনো দোষ করে থাকি, তোমাদের যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, সে-দোষ তোমরা নিয়ো না। আমায় ক্ষমা কোরো!

হয়তো এখন গভীর রাত্তির। মনে হচ্ছে, ঠান্ডা হাওয়ার আমেজ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে! আমার তরোয়ালটা এরা কেড়ে নিয়েছে। বাঁচোয়া, আমার গায়ের ছেঁড়া জামাটা আরও ছিঁড়ে দেয়নি। তুমি এখন এই অবস্থায় আমায় দেখলে, ঠিক বলছি, 'ছিঃ ছিঃ' করে উঠবে। কারণ রোদে আর বালিতে, ঝড় আর ঝঞ্ঝায় আমার যা অবস্থা হয়েছে। আমার গায়ে কত জায়গা যে কেটেছে, না দেখলে বুঝতে পারবে না। সঙ্গে-সঙ্গে পোশাকগুলোও ফর্দাফাঁই হয়ে ঝুলঝুল করছে। এ তবু ভালো।

ছিঁড়ুক। গায়ে তো আছে। কিন্তু মাথার পাগড়িটা যে কোথায় গেল, আমি খেয়ালই করতে পারছি না।

এরা আমায় খেতে দিল না। না-ই দিক। এখন কী আর খিদের কথা মনে আসে! আমার ভারি ক্লান্ত লাগছিল। তাই ঘুম পাচ্ছিল। চোখ দুটো যেন আপনা থেকে ঘুমে ঢুলে পড়ছিল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানেই বসে পড়লুম। বসে-বসে আমার মুখখানা দুটো হাঁটুর মধ্যে চেপে ঢুলতে লাগলুম। তারপর যে কখন আমি আপনা-আপনি লুটিয়ে পড়েছিলুম ঘরের মেঝেয়, জানি না। এখন আমি বলতে পারব না, কখন আমার চোখ দুটি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎই হয়তো ঘরের দরজাটা খুলে গেছল। হঠাৎই ঝনাত করে একটা আলতো শব্দ আমার কানে বেজে উঠেছিল। আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি চমকে চিৎকার করে উঠেছিলুম, 'কে?'

আলো। কার হাতে যেন আলো জ্বলছে। আমি আলো দেখছি, কিন্তু যার হাতে আলো তাকে দেখছি না। আলো-ছায়ায় দেখছি, পা থেকে মাথা অবধি একটা কালো জোববায় সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। আমার দিকে সে এগিয়ে আসছে। আমি ভাবলুম, আর ভয় পেয়ে, চিৎকার করে কিচ্ছু লাভ নেই। এবার বোধহয় আমায় এই লোকটার হাতেই মরতে হবে। তাই লোকটা আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়াতেই, আমি তাকে আর অন্য কোনো কথা না জিজ্ঞেস করে বললুম, 'তুমি বুঝি আমায় মারবে?'

সে তখনই কোনো কথা বলল না। হয়তো ওই কালো কাপড়ের আড়াল থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল। ভয়ে যেন নিথর চারদিক। শুধু নিজেদের বুকের নিশ্বাস ছাড়া কোনো সাড়া নেই। আমি হাত বাড়ালুম তার দিকে। অস্ফুষ্ট স্বরে বললুম, 'চলো। কোথায় নিয়ে যাবে আমায়।'

দেখলুম লোকটার হাত কাঁপছে। তার হাতের ওই আলোর শিখাটিও কাঁপতে-কাঁপতে নিভু-নিভু হয়ে আবার জ্বলে উঠছে।

আমার কথা শুনে সে কথা বলল। খুব চাপা সে গলার স্বর। সে বলে উঠল, 'তোকে আমি মরতে দেব না।' বলেই একটা হাত আমার মাথায় রাখল। আমি অবাক হয়ে গেলুম। অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলুম, 'কে তুমি?'

আমার মাথায় রাখা তার হাতটা যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে আমার গাল দুটির ওপর নেমে এল। তার হাতের পুরুষ্টু আঙুলগুলো আনন্দে আমার গালের ওপর নাচতে লাগল। আর তখনই আমি তার মুখখানি দেখার জন্যে ছটফটিয়ে উঠলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম না। সে আবার তেমনি চাপা-স্বরে বলল, 'আহা! তোর খুব লেগেছে, না?'

আমি বললুম, 'কই, না!'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সে তখন আমার গাল থেকে হাতটি সরিয়ে এনে, প্রদীপের আলোয় আমার ক্ষত জায়গাগুলি হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন আপন মনেই বলে ফেলল, 'ভারি নিষ্ঠুর আমরা, ভারি নির্দয়!'

আমার আরও অবাক লাগছে। এই অন্ধকারে কোনো মানুষ যে আমায় আদর করতে পারে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আমি তো এদের হাতে বন্দি। আমাকে নিশ্চয়ই আদর করার জন্যে এরা বন্দি করে রাখেনি। কিন্তু এ লোকটা তাহলে কে? আমায় আদর করে এমন সব অদ্ভুত কথা বলছে! আমি তাই আবার তাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি কে? অমন করে নিজেকে কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছ কেন? তোমার মুখখানা আমায় দেখতে দিচ্ছ না কেন?'

সে বলল, 'না, দেখিস না, দেখিস না এ-মুখ। আমি বড়ো পাপী! কিন্তু তুই বিশ্বাস কর, আমি পাপ করতে চাই না। আমি দস্যু হতে চাইনি। একদিন আমার সব ছিল। আমার ছেলে ছিল, আমার মেয়ে ছিল, আমার ঘর-সংসার সবই ছিল। একে-একে সব চলে গেছে। মানুষ বড়ো নিষ্ঠুর। বড়ো হিংস্র! তারাই আমার সব কেড়ে নিয়েছে। আজ তাদের জন্যেই আমি একজন খুনি দস্যু!'

আমি চুপ করে গেছি। মনে-মনে ভাবছি, যে হাত দিয়ে মানুষ খুন করে, সেই হাত দিয়ে আবার আদরও করে! তাই আমি তাকে আবার বললুম, 'তুমি আমাকে এত কথা বলছ কেন?'

সঙ্গে-সঙ্গে সে আমার একটা হাত চেপে ধরল। চেপে ধরে বলল, 'তুই আমাকে বাঁচা। তোকে দেখে আমার মন বলছে, আমি আর দস্যু হয়ে থাকতে চাই না। এদের কবল থেকে আমায় তুই মুক্ত করে নিয়ে যা। এদের জালে জড়িয়ে গেছি আমি। এরা আমায় ছাড়বে না।'

আমি বললুম, 'তুমি তো ভারি আশ্চর্য কথা বলছ। আমি তো নিজেই বন্দি।'

হঠাৎ সে চুপ করে গেল। 'ওই শোন, বাইরে কারা যেন ফিস-ফিস করে কথা বলছে।' তাড়াতাড়ি সে প্রদীপটা নিবিয়ে ফেলে আমার মুখখানা তার হাত দিয়ে চেপে ধরল। তারপর আমার হাত ধরে টানতে-টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চলল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় যাব?'

সে বলল, 'বাইরে।'

'কেন?'

'ওরা আসছে।'

'এলেই বা।'

সে জিজ্ঞেস করল, 'মরতে তোর ভয় করে না?'

আমি বললুম, 'না।'

ততক্ষণে ওর হাত ধরে অনেকটা ছুটে এসেছি। ছুটতে ছুটতেই লোকটা আমার উত্তর শুনে বলল, 'তুই মরে গেলে তোর বাপকে দেখবে কে?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমার বুকটা দুরু-দুরু করে কেঁপে উঠল। সত্যিই তো, আমি মরে গেলে আমার বাবাকে দেখবে কে? কে দেখবে আমার মাকে। আর তখনই আমার মনের মধ্যে যেন কে চেঁচিয়ে উঠল, না, আমি মরব না, কিছুতেই না। আমাকে বাঁচতেই হবে আমার বাবার জন্যে, আমার মায়ের জন্যে। এ-কথা মনে হতেই আমি তার হাত ধরে আরও জোরে ছুট দিলুম। ছুটতে-ছুটতে জিজ্ঞেস করলুম, 'কোনদিকে যাবে? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

সে বলল, 'তোকে দেখতে হবে না। আমি দেখছি। আমার হাতটা ভালো করে ধরে থাক। আমি তোকে বাইরে নিয়ে যাব।'

আমি তার কথামতো, তার হাতটা ভালো করে জাপটে ধরলুম। তারপর ছুটতে-ছুটতে ফটক পেরুতেই সে বলল, 'এসে গেছি।'

'কোথায়?' আমি জিজ্ঞেস করলুম।

'বাইরে।' বলে হাঁপাতে-হাঁপাতে লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল, 'আলো দেখতে পাচ্ছিস?'

আমি বললুম, 'ঘরের চেয়ে এখানে কম অন্ধকার।'

সে জিজ্ঞেস করল, 'এবার যেতে পারবি?'

আমি বললুম, 'পারব।'

বলতে-বলতেই আমি শুনতে পেলুম, কারা যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগল, ভাগল।'

সে যেন ভয় পেল। আমায় আড়াল করে সে বলল, 'ওরা তোকে দেখতে পেয়েছে!'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কী করব?'

সে আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে তেমনি চাপা-গলায় বলল, 'লুকিয়ে পড়।' বলেই সে কোথায় গা ঢাকা দিল। বোধহয় সেও লুকিয়েই পড়ল। কেননা, আমি তাকে আর দেখতেই পেলুম না। সে যে চট করে এইটুকু সময়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে পারে, তা আমি ভাবতেই পারিনি। কিন্তু এখন আমি কী করব! কোথায় লুকোই! আর ভাববার সময়ই নেই। তাই আমিও ঝটকরে সামনের ফটকটার আড়ালেই ঢুকে পড়লুম। উঃ! কী ভাগ্য আমার! আর একটু হলেই ওরা দেখে ফেলত। আমার বুকটা কী প্রচণ্ড উত্তেজনায় ধক-ধক করছে। বুকটাকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরে ফটকের আড়ালে পাথরের মতো চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ আমি আঁতকে উঠেছি। আমার গায়ের ওপর কী যেন একটা ছিটকে পড়ল! বোধহয় একটা পোকা। সুড়সুড় করে উঠতেই আমি ঝটপট হাত দিয়ে সরিয়ে ফেলতে গেছি। তক্ষুনি আমার হাতে ঠকাস করে কী একটা ঠেকল। চেপে ধরেছি। টান পড়তেই আমার মনে হল, আমার গলায় যেন কী একটা ঝোলানো। আশ্চর্য তো! কোত্থেকে এল। আমার গলায় তো কিছু ছিল না। আমি তো কিছুই পরিনি। তবে? তবে কি সেই লোকটা কিছু পরিয়ে দিল আমার গলায়?

https://boierhut.com/fb

আমি অন্ধকারেই সেটা পরখ করছিলুম। করতে-করতে ভাবছিলুম, এটা আমার গলায় রাখব, না ছুড়ে ফেলব! কিন্তু হঠাৎ আমার চোখ দুটো ঝলসে উঠল। চোখের ওপর এক ঝলক রুপোলি আলো ঠিকরে পড়ল আমার। নিমেষে চোখ বুজে ফেলেছি। আমি থ হয়ে গেছি! একটু পরে ভয়ে-ভয়ে আবার চোখ খুলে ভাবছি, এ কি তবে এক টুকরো হিরে! আমার গলায় মালা হয়ে ঝুলছে! ঝুলতে ঝুলতে অন্ধকার ঝলমলাচ্ছে! আমি আবার দেখলুম! বারবার দেখলুম। তারপর চমকে উঠলুম! কেননা ওরা হল্লা করতে-করতে ছুটে আসছে। পাছে আমার বুকের এই আলোটা ওরা দেখতে পায় তাই চটপট আমি মালাটা আমার জামার ভেতর বুকের মধ্যে গলিয়ে ফেললুম। গলিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একটু পরে যখন আর ওদের গলার স্বর শোনা গেল না, যখন মনে হল, লোকগুলো বোকা বনে গেছে, তখন আমি এই ফটকটার আড়াল থেকে একবার উঁকি মেরেছিলুম। কাউকে দেখতে পেলুম না। আরও একটু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে আর একবার উঁকি মেরেছি। না, সত্যিই কেউ নেই। আমি বেরিয়ে পড়েছি। ছুট দিয়ে পালাতে গেলে যদি নজরে পড়ে যাই, তাই না-ছুটে, ডিঙি মেরে পা ফেললুম। একটাই ভয়। সামনেটা শুনসান ফাঁকা। ঝট করে কারও নজরে পড়ে যেতে পারি! একবার দেখে ফেললে কী হতে পারে সে তো তোমরা বুঝতেই পারছ। তার ওপর আমার তরোয়ালটাও ওরা কেড়ে নিয়েছে। ধরতে এলে বুঝব কেমন করে! খালি হাতে কি লড়াই করা যায়! অগত্যা দু-হাত তুলে ওদের হাতে আবার ধরা দিতে হবে!

এমনি করে ডিঙি মেরে দু-চার পা হেঁটেছি হয়তো। হয়তো, থেমে-থেমে দু-একবার এ-পাশ ও-পাশ দেখেছি। হঠাৎ আমার গা-টা কেমন শির-শির করে উঠল। পেছনে শত্রু। এমনি করে হাঁটলে ধরা পড়তে কতক্ষণ! সুতরাং ছোটো! আর বলতে। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দিলুম!

বালির ওপর ছুটতে গিয়ে আমার পা ফসকাচ্ছে! হোঁচট খাচ্ছি। গায়ের কাটা-ছেঁড়ার ব্যথাগুলো টনটন করে উঠছে। তবু ছুটছি। আমি জানি, এখন বাঁচতে গেলে ছুটতেই হবে।

অনেকটা ছুটে এসেছি। না, মনে হচ্ছে, আর দেখতে পাবে না। গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে আছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে দূর থেকে দূরে আমি যতই ছুটে যাচ্ছি, ততই যেন হারিয়ে যাচ্ছি। অবিশ্যি আকাশে যদি পূর্ণিমার চাঁদ থাকত, চাঁদের আলো যদি ছড়িয়ে পড়ত মরুভূমির ওপর, তখন যদি আমায় দেখতে, তবে তোমার নিজেরই এত ভালো লাগত! দেখতে আকাশের ওই আলোর ঝর্নায় ভাসতে-ভাসতে একটি ছোট্ট ছেলে হারিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে একটি বিন্দুর মতো।

কিন্তু ওরা কি দেখে ফেলেছে? শুনতে পাচ্ছি, ঘোড়ার পিঠে কারা যেন ছুটে আসছে। পিছু ফিরে দেখলুম। হ্যাঁ, সত্যি তো! কী করি এবার! ওই তো সামনে বালির পাহাড়। উঁচু-নীচু পাহাড় থরে-থরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানি বাঁচার আর কোনো পথ নেই। তাই পড়ি-মরি বালির পাহাড়ের আড়ালেই আমি লুকিয়ে পড়লুম!

কিন্তু দস্যুর চোখকে তো আর ফাঁকি দেওয়া যায় না। তার ওপর একজন হলে কথা ছিল। অতজন! আমি যে কোথায় লুকিয়ে পড়লুম, তারা ঠিক দেখে ফেলেছে!

সুতরাং এই বালির পাহাড়ের সামনেই তাদের ঘোড়া থামল। ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝটপট নেমেই আমায় খুঁজতে শুরু করে দিল। সত্যি বলতে কী, এই আঁধার রাতে বালির পাহাড়ে তখন তাদের সঙ্গে আমার লুকোচুরি খেলা শুরু হয়ে গেল। ওরা বাঁয়ে গেলে, আমি সামনে পালাই। ওরা সামনে গেলে আমি ওপরে উঠি। মজা কী, আমি ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি যে কোথায় আছি, ওরা টেরই পাচ্ছে না। দেখতে না-পাওয়ার কারণও তো আছে! তোমাদের বললুম বটে বালির পাহাড়, কিন্তু তোমরা হয়তো বুঝতেই পারছ না, সে-পাহাড় কেমন পাহাড়। সে-পাহাড় মরুর ঝড়ে গড়ে ওঠে। একদিন নয়, দুদিন নয়, দিনের পর দিন ঝড়ের বালি জমে-জমে এই পাহাড় গড়ে উঠেছে। কোনোটার মাথা উঁচু, কোনোটা নীচু। কোনোটা বড়ো, কোনোটা ছোটো। কোনোটা শক্ত, কোনোটা আবার বালির মতোই ঝুরঝুরে। সুতরাং আমার লুকিয়ে পড়তে কষ্ট নেই।

অনেকক্ষণ ধরে ওরা আমায় খুঁজল। আমিও অনেকক্ষণ ধরে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে বেড়ালুম। শেষমেশ আমাকে দেখতে না পেয়ে কী যে ভাবল তারা কে জানে! রণে ভঙ্গ দিল। আমি দেখতে পেলুম, ওরা ঘোড়া ছুটিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে। যাক! এ-যাত্রায় বোধহয় রক্ষে পেলুম।

কিন্তু রক্ষে পেলেও, এখনই হুট করে এই আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। তাই আরও কিছুক্ষণ এই আড়ালেই বসে রইলুম। বসে-বসে ভাবতে লাগলুম, সেই লোকটার কথা। যতই ভাবছি, অবাক হয়ে যাচ্ছি। কে লোকটা? কে আমার প্রাণ বাঁচাল অমন করে? আমার গলায় হিরের মালা পরিয়ে দিল!

হ্যাঁ, তাই তো! আমি ভুলেই গেছলুম। আমার জামার বুকে মালাটা তো এখনও লুকোনো আছে! ভাগ্যিস! দস্যুগুলোর সঙ্গে ছুটোছুটি করতে গিয়ে হারিয়ে যায়নি! আমি হলপ করে বলতে পারি, তোমরা ভাবছ, এই ফাঁকে আমি একবার বার করে দেখি মালাটা! কী, তোমাদেরও দেখতে ইচ্ছে করছে বুঝি?

তবে তাই ভালো। এসো আমার কাছে! আরও কাছে! এই দেখো, আমি বার করছি। চুপ! একদম কথা বোলো না! এখানে কেউ না থাকলেও, কে বলতে পারে বালিরও কান নেই! ওই আকাশের দিকে চেয়ে দেখো! তারাগুলো কেমন মিটমিট করে চাইছে! দেখুক! ওরা তো আর আকাশ থেকে নেমে এসে আমায় ছুঁতে পারছে না!

এই দেখো, আমি বার করেছি! আরে, এ কী! হঠাৎ অন্ধকার যে কেটে যাচ্ছে! ভোরের আলো আকাশে যেন উঁকি মারছে! ওই তো দেখো না, আকাশ থেকে তারার আলো একটি একটি করে নিবে যাচ্ছে। মরুর বুকের ওপর থেকে অন্ধকার রাত্তিরটা কেমন মুছে যাচ্ছে একটু-একটু। দেখো, দেখো, আমার বুকের ওপর আকাশের আলো কেমন ঝলমলিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আঃ! ঠিকরে

পড়ছে হিরের রোশনাই! সে রোশনাই তোমার চোখে ছড়িয়ে পড়ছে না? দেখতে পাচ্ছ না, আমার গলার এই হিরের হারটি? আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি দেখতে-দেখতে। ভোরের আকাশ যখন লাল হল, আমার বুকের আলোও যে রঙিন হয়ে ছড়িয়ে গেল। যখন লাল আকাশে রোদ উঠল, আমার গলার হিরে রুপোর আলোয় উছলে উঠল। আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমাকে। দেখতে পাচ্ছি, এই বালির পাহাড়ের কোন চূড়াটা সবচেয়ে উঁচু। কোনটা নিচু। ইচ্ছে করলে, আমি এখনই বালি ডিঙিয়ে ওই উঁচুতে উঠতে পারি। আবার নামতে-নামতে ছুটতে পারি। কিংবা এই স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে পারি, 'পাশা, পাশা, পাশা-আ-আ।'

আমি ডাকতেই যাচ্ছিলুম। থমকে গেলুম। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম, আমার চোখের সামনে একটা উটপাখির পালক পড়ে। এ কি তবে সেই পালক! যে-পালক আমি পাশার পিঠে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিলুম! তবে কি পাশা এই বালির নীচে চাপা পড়েছে! আমি ছুটে গিয়ে হাত বাড়ালুম। হাতের মুঠোয় ধরতে গেলুম পালকটা। কিন্তু আশ্চর্য! পারলুম না। পালকটা আমার হাতের নাগাল থেকে ছিটকে হুশ-শ-শ করে উড়ে গেল! উড়ে গেল আরও উঁচুতে।

আমি উঁচুতে উঠে গেলুম। আবার হাত বাড়ালুম। আবার সেই পালক চরকি খেয়ে আকাশে উড়ল। আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম সেইদিকে। ব্যাপারটা কী! আমি ধরতে গিয়েও ধরতে পারছি না কেন? ধরতে গেলেই আকাশে উড়ছে! এ কী আজব কাণ্ড! পালক তো আর পাখি নয়! তবে পাখির মতো উড়ছে কী করে!

আরে! আরে! দেখো, দেখো! একটা নয়, অন্তত আরও একশোটা পালক হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এসে শূন্যে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে যে! শুধু ভাসছে না, ভাসতে-ভাসতে আমার গায়ে খোঁচা দিচ্ছে। আমি ভীষণ ঘাবড়ে গেছি। হাত-পা ছুড়ে পালক তাড়াতে শুরু করে দিয়েছি। আমি জানি এখানে একরকম একটা উদ্ভুট্টি ব্যাপার বেশিক্ষণ চললে, কারো-না-কারো নজরে পড়বেই। অত কী! যদি দস্যুদলের নজরে পড়ে যায়! তখন কী হবে! সেই ভেবে আমি নিজেই শিউরে উঠলুম। কিন্তু কী করব ছুটে পালাব? না পালক তাড়াব? এই কথা ভাবতে-না ভাবতেই দেখি পালকগুলো হঠাৎ যেন একটা গর্তের ভেতর সুড়ুত-সুড়ুত করে ঢুকে পড়ছে। আমি ছুটলুম সেইদিকে। শুনলে অবাক হবে, ওই যে অত পালক এই যে এতক্ষণ ধরে ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল আমার চোখ, এখন সেই পালকের একটিও আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাজ্জব ব্যাপার তো! তবে কি পালকগুলো সব বালির ভেতর লুকিয়ে পড়ল!

আমি এই অদ্ভুত কাণ্ডটা দেখার জন্যেই পালকগুলোকে খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে গেলুম! আচমকা আমার নজরে পড়ল, উঁচু ওই বালির স্তূপের মধ্যে ডুবে-ডুবে যেন উঁকি মারছে, একটা ভাঙা গম্বুজ! আরও একটু ভালো করে দেখার জন্যে, আমি আরও ক-পা এগিয়ে গেলুম। হ্যাঁ, সত্যিই তো গম্বুজ! তবে কি বালির তলায় কোনো প্রাসাদ লুকিয়ে আছে! অথবা কোনো

কেল্লা ! আমি শুনেছি, মরুর বালি-ঝঞ্ঝার দুর্যোগে কোথাও-কোথাও এমনি নাকি বড়ো-বড়ো প্রাসাদ, কিংবা যুদ্ধজয়ের কেল্লা ধ্বংস হয়ে বালির নীচে তলিয়ে গেছে! আমি এগিয়ে গেলুম। মাথা-ভাঙা গম্বুজের ভেতরটা দেখার জন্যে হেঁট হলুম। হতেই দেখি, গম্বুজ বেয়ে ওপর থেকে নীচের দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে। সেদিকে চেয়ে আমি মনে-মনে যেই ভেবেছি, সিঁড়ি দিয়ে নেমে একবার ভেতরটা দেখলে হয়, অমনি এক অজানা ভয়ে আমার গা ছমছম করে উঠল। জানি না ভেতরে কী আছে! কী রহস্য উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে! ভয়ের রহস্য যেখানে উঁকি দেয়, সেখানেই যেন মন টানে বেশি। নিজেকে সামলে নিয়ে, বুকে সাহস আনলুম। ভাবলুম, আমি তো হারিয়েই গেছি! মরতে আমার ভয় কী! কে বলতে পারে, গম্বুজ বেয়ে নীচে নামলে অজানা কোনো গোপন রহস্যের সন্ধানও তো মিলে যেতে পারে! এই কথা ভেবেই আমি গম্বুজের ভেতরে ঢুকে পড়লুম। গম্বুজের সিঁড়ি ডিঙিয়ে নামতে শুরু করে দিলুম। প্রথমটা ভয় ছিল, সিঁড়িগুলো বুঝি ভাঙা, এবড়ো-খেবড়ো। কিন্তু নামতে-নামতে দেখি, একেবারে উলটো। আমি বলছি না যে, একেবারে নতুনের মতো তকতকে ঝকঝকে। তবে ভাঙা-বাড়ির সিঁড়ি যেমন ধসে যায়, তেমন নয়। সিঁড়িটা সাপের মতো পাক খেতে-খেতে নেমে গেছে নীচের দিকে। অবিশ্যি অন্ধকার। গম্বুজের ভাঙা-চূড়াটার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আবছা আলো এসে পড়ছে, সেটুকুই দেখা যাচ্ছে। তা-ও আবার যতই নামছি, আলোও ততই হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার বুকের হিরেটা ঝলসে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি সেটাকে আবার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললুম। বলা যায় না, নীচে যদি কেউ থাকে! কেউ যদি দেখে ফেলে!

হ্যাঁ, নীচে জমাট অন্ধকার। মনে হচ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে আমি একটা মস্ত চত্বরে এসে থেমে গেছি। এখন কোনদিকে যাই আমি, ওপর থেকে মনে হয়েছিল, ভেতরটা বুঝি শুধুই ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না। কারণ আমার তো এদিক-ওদিক পা ফেলতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে তো আর কোনো কিছুর হদিস করা যাবে না। তাই মনে হল, হিরের মালাটা বার করি। হিরের টুকরো-আলোয় যদি কিছু দেখতে পাই! তাই আমি আমার বুকে হাত দিলুম!

চুপ! চুপ! শুনতে পাচ্ছ, অন্ধকারে কে যেন কেঁদে উঠল! এ যে একটি মেয়ের কান্না! এই ভয়ংকর নির্জনতা হঠাৎ যেন ভেঙে খানখান হয়ে গেল! আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড়িয়ে লাফিয়ে উঠল! কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। হ্যাঁ, আমার কানে ভেসে আসছে সেই কান্না! খুব নরম সেই কান্নার শব্দ! একটি মেয়ের গলায় সেই কান্না যেন ঝিরি-ঝিরি বিষ্টির মতো ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ছে। আমার চোখের দৃষ্টিকে খুব সাবধানে এ-পাশ ও-পাশ হেলাতে লাগলুম! অন্ধকারে থাকতে-থাকতে আমার চোখ দুটো যেন এখন আর তেমন অন্ধ হয়ে নেই। দেখতে পাচ্ছি, আবছা-আবছা। দেখছি, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে বড়ো-বড়ো থামের ছায়া। মনে হচ্ছে, থামের গা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে একটা লম্বা বারান্দা সিধে ভেতরে চলে গেছে! আমি

চট করে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। আগে যা মনে হয়েছিল, এখন দেখছি তা তো নয়! এটা তো বালির তলায় লুকিয়ে থাকা ভাঙা স্তূপের জঞ্জাল নয়। এখানে কান্না শুনি কার! নিশ্চয়ই কেউ আছে। নিশ্চয়ই আছে প্রাণ! ভেবে পাচ্ছি না, এখন কী করব আমি। ধরো, যে-মেয়েটি কাঁদছে, সে যদি কোনো বিপদে পড়ে থাকে! আমার কি উচিত নয় তাকে বাঁচানো?

এ কথা মনে হতে, আমি আর লুকিয়ে থাকতে পারলুম না। কিন্তু এই অচেনা জায়গায় তাড়াহুড়ো করে কিছু করে ফেলা ঠিক না। তাই হুট করে আড়াল থেকে বেরিয়ে না-পড়ে এই থাম থেকে ছুটে ওই থামে, তারপর ওই থাম থেকে আর-এক থামে লুকিয়ে পড়লুম। লুকিয়ে-লুকিয়ে সেই কান্নার খোঁজ করতে লাগলুম। আমার যেন কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেল। কেননা, যখন আমি ভাবছি কান্নাটা সামনে থেকে আসছে, আর সেই ভেবে যেই সামনে যাচ্ছি, অমনি যেন সেই কান্না পিছন দিক থেকে ভেসে আসছে। পিছনে গেলে সেই কান্না পাশে শুনি। পাশ থেকে আরও ভেতরে আরও অন্ধকারে।



এখন কোনদিকে যাই আমি

হঠাৎ দেখি, কোথাও কিচ্ছু নেই, কান্নার শব্দ ছাপিয়ে হাওয়ার শব্দ উঠল। হাওয়ার সঙ্গে ঝাঁক-ঝাঁক ধুলো উড়ে এসে আমার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছে! আমি তাড়াতাড়ি চোখ সামলে, মুখ নিচু করে বসে পড়লুম। ভাবলুম, একী অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড!

অনেকক্ষণ পর যখন মনে হয়েছিল, হাওয়ায় দাপটটা কমেছে, হয়তো চোখের ভেতরে আর ধুলো-বালি পড়বে না, তখন খুব সাবধানে চোখ থেকে হাত সরালুম। উঠে দাঁড়ালুম। দাঁড়াতেই

আমার পা থেকে মাথা অবধি আতঙ্কে শিউরে উঠল। আমি দেখি, এই দরদালানটা শেষ হয়েছে যেখানে, সেখানে একটা দরজা। দরজা দিয়ে সরু রুপোলি মতো এক টুকরো আলো ছিটকে এসে কার যেন মুখে ছড়িয়ে পড়েছে! আমি খুব ভালো করে দেখব বলে চোখ দুটো আলোর দিকে স্থির রাখলুম। রাখতেই আমার নজর পড়ল, একটি ছোট্ট মেয়ের দিকে। আমি আর এই থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারলুম না। আমি বেরিয়ে এলুম। দেখলুম, দরজাটার দুপাশে দুটো বড়ো-বড়ো জানালা। খোলা। একদিকের একটি জানালার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে আছে মেয়েটি! আমার চেয়ে একটু বড়ো। ভারি স্থির। একেবারে নিশ্চল। মুখখানি কী মিষ্টি! কেঁদে-কেঁদে ফুলে আছে। তার দু-চোখ বেয়ে কান্নার ফোঁটাগুলি ঝরতে-ঝরতে যেন গালের ওপর মুক্তোর মতো দোল খাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। যতই তাকে দেখছি, ততই যেন আমার মনে হচ্ছে তার চোখ দুটি আমাকে তার কাছে ডাকছে! আমায় বুঝি দেখে ফেলেছে সে! নইলে অমন করে চেয়ে আছে কেন! আমি তার কাছে না গিয়ে পারলুম না। এদিক-ওদিক দেখে যখন নিশ্চিন্ত হলুম আমার আশে-পাশে কেউ নেই, তখন খুব সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে গেলুম মেয়েটির দিকে। মেয়েটির কাছে। আরও একটু কাছে। কিন্তু আশ্চর্য, এখন তো ও আমায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তবুও ছোট্ট পা দুটি তার ছুটে-ছুটে লুকিয়ে তো পড়ল না। চোখ দুটি তার অবাক হয়ে চেয়ে তো দেখল না! ঠোঁট দুটি তার হেসে-হেসে কাঁপল না তো! আমি আরও এগিয়ে গেলুম। জানালার সামনে এসে দাঁড়ালুম, একেবারে তার মুখোমুখি। তবু সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মুখখানি তার গরাদে ঠেকিয়ে। আমি বুঝতে পারছি না, কী করব। তবু অজান্তেই যেন আমার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

সে উত্তর দিল না।

আমি একটু থামলুম। একটু দেখলুম। আবার জিজ্ঞেস করলুম, 'আমাকে তোমার ভয় করছে?' তবু সে যেমন ছিল তেমনি স্থির।

আমি বললুম, 'ভয় পেও না। আমাকে তোমার ভয় নেই। আমি যদি তোমাকে দিদি বলে ডাকি , তবে তুমি মনে করো আমি তোমার ভাই আবু। বলো, এখানে তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? কীসের দুঃখ তোমার?'

সে বলল না কিছুই।

তখন আমি হাত বাড়ালুম ওই জানালার মধ্যে। আমার হাত ওর হাতটি ছুঁয়ে থমকে গেল। এ কী! এ যে পাথর! আমি খানিক অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালুম। দু হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলুম আরেকবার। অনেকবার। হ্যাঁ, ঠিক তাই। ঠিকই পাথর! কঠিন পাষাণ। তখন আমি সেই পাথরের চোখের পাতা দুটিতে আমার হাতটি ঠেকালুম। ঠিক তখুনি, হঠাৎ আচমকা আমার দু-কানের দু-পাশে বিচ্ছিরি আওয়াজ করে কে যেন শিস দিয়ে উঠল। কী তীক্ষ্ণ সে আওয়াজ! শিস-

স-স! একটানা। কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেল। বুঝিবা কানের পর্দা আমার ফেটে যায়! আমার দু-হাত দুই কানে চেপে ধরলুম আমি। কিন্তু কে কার কথা শুনছে! সেই শব্দ আমার কানের গর্তে ঢুকে তোলপাড় শুরু করে দিল! উঃ! অসহ্য সেই শব্দ। আমার মাথা ঘুরে পড়ছে! আমি বোধহয় এক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়ব আবার। আমাকে পালাতে হবে। আমি ছুটলুম। কিন্তু কোনদিকে ছুটব! কোনদিকে সেই ভাঙা গম্বুজের সিঁড়ি! আমি জানি না। অন্ধকারে আমার সব এলোমেলো হয়ে গেছে। আমি যেন গোলকধাঁধায় চরকি খাচ্ছি। কিন্তু এ কী! অন্ধকারে আমার মাথার ওপর ওটা কী ঝুলছে! যেন একটা কাঁটার জাল! ওই শিসের ভয়ংকর শব্দের তালে-তালে দুলতে-দুলতে যেন আমার মাথার ওপর নেমে আসছে। এ-জাল বুঝি আমায় জড়িয়ে ধরবে! বুঝি, কাঁটাগুলো আমার সারা গায়ে বিঁধে-বিঁধে রক্তে আমায় ভাসিয়ে দেবে! এবার বোধহয় সত্যি-সত্যি আমায় মরতে হবে! সুতরাং ভাবলুম, মরতেই যখন হবে, তখন শেষ চেষ্টা করতে বাধা কোথায়? এই অন্ধকারে কি লুকিয়ে পড়তে পারি না আমি? কিন্তু হায়! কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সামনে, পেছনে। নিজেকে লুকিয়ে ফেলব যে কোথায়, ঠাওর করে উঠতে পারলুম না। অগত্যা আনিমানি ছুটছি আমি। ছুটছে মাথায় কাঁটার জাল। ঘুরছি আমি। পড়ছি আমি। আমি ঘেমে, নেয়ে হয়রান হয়ে গেলুম।

আমি আর কতক্ষণ পারব! এই দেখো, আমার দম আটকে আসছে। আমার গলা শুকিয়ে আসছে। চিৎকার করতে গিয়েও আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরোল না। আমি বোধহয় এবার মরে যাচ্ছি! হঠাৎ যেন সেই তীব্র শব্দ থমকে গেল। কী এক অদ্ভুত রহস্যের মতো নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারদিক। আমার হাত-পা কেমন নিস্তেজ হয়ে গেল। আমি টলছি। টলতে-টলতে কীসে যেন ঠোক্কর খেলুম। পড়তে-পড়তেও কী একটা ধরে ফেললুম! ধরে হাঁপাতে লাগলুম! হাঁপাতে-হাঁপাতে ভাবছি, আমি কি এখনও বেঁচে আছি!

'ছেলেটা কি বেঁচে আছে?' এমন সময় কে যেন হঠাৎ কঠিন গলায় বলে উঠল।

সেই কথা শুনে আমার নিস্তেজ চোখের পাতা দুটি বুজেও বুজতে পারল না। এ কী! আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি! কার গলায় আমি হাত রেখেছি। ওরা কারা? দাঁড়িয়ে আছে! জীবন্ত মানুষ নাকি! না, না, এ যে পাথরের মূর্তি! নিশ্চল।

'ছেলেটা কী মরে গেল?' আবার সেই কঠিন গলা চিৎকার করে উঠল!

'না।' আমি যার গলা জড়িয়ে ছিলুম, সেই পাথরের মূর্তি চেঁচিয়ে উত্তর দিল। বলল, 'মরেনি, আমার গলা জড়িয়ে আছে।'

আমি অবিশ্য যার গলা জড়িয়ে ছিলুম, সে কথা বলতেই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। আমি তখনই বুঝতে পারলুম, এই অন্ধকারে ওই পাথরের মূর্তিরাই কথা বলছে! আমি অবাক চোখে তাদের দিকে তাকাতে-তাকাতে ভাবছি, একী সত্যি! পাথর কথা বলছে!

হ্যাঁ সত্যি! আমি আবার শুনতে পেলুম তাদের কথা। কে যেন বলল, 'মরু-দানবের খপ্পরে আমাদের মতো আর-একজন নতুন বন্দি ধরা পড়ল।'

আর একজন উত্তর দিল, 'দুঃখের কথা, বন্দিটি বয়সে নিতান্তই ছোটো। আহা রে, কোন মা-বাবার বুকের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল শয়তান মরু-দানব, কে জানে! একটু পরেই আমাদের মতো পাথর হয়ে যাবে!'

সে-কথা শুনে আমার নিশ্বাস যেন আটকে এল। আমিও তবে পাথর হয়ে যাব! তবে কি মরু-দানবই আমায় কাঁটা জালে বাঁধতে চায়!

'ছেলেটির গলায় সোনার লকেটে-গাঁথা একটি হিরে কেমন অন্ধকারে জ্বলছে দেখো!'' একজন বলে উঠল।

আমি থতমত খেয়ে গেছি তার কথা শুনে। কেননা, হিরেটা তো আমি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম। কখন বেরিয়ে পড়েছে সেটা! হয়তো ছোটাছুটি করতে গিয়ে অসাবধানে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে! আমি তাড়াতাড়ি সেটা আবার বুকের ভেতর লুকিয়ে ফেলতে গেছি, আর একজন মূর্তি বলে উঠল, 'হয়তো মা পরিয়ে দিয়েছে। কিংবা বাবা।'

'মা!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল একজন পাথরের মূর্তি, তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'আমার মা, আমার বুড়ি-মা এখন কী করছে, তোমরা কেউ বলতে পারো? মা আমার হয়তো পাগলের মতো কেঁদে-কেঁদে পথে-পথে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। জানতেও পারছে না, তার ছেলে মরু-দানবের মায়ায় পাথর হয়ে এখন এই ভাঙা-প্রাসাদের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাঁদছে! জানো, তোমরা জানো, আমি ছাড়া মায়ের আর কেউ নেই! মরুর পথে পা বাড়াবার আগে মা আমার কপালে চুমু খেয়ে আমাকে বলেছিল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস বাবা। সাবধানে যাস!' মা আমার জানে না, তার ছেলে আর কোনো দিনই ফিরবে না। না না, আমি আমার মাকে আর কোনো দিনই দেখতে পাব না!' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

'আহা! কেঁদো না, কেঁদো না।' ওই কোণ থেকে আর একজন মূর্তি সান্ত্বনা দিল। বলল, 'কান্না আমারও পাচ্ছে, কিন্তু আমি কি কাঁদছি! জানো, আমি যখন পথে পা বাড়াচ্ছি তখন আমার ছোটো ছেলেটা ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। আমি তাকে কোলে তুলে আদর করলুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'কী হয়েছে বাবা? আমি শহর থেকে তোমার জন্যে ভালো দেখে একটা কাঠের ঘোড়া কিনে আনব। যাও, মায়ের কাছে যাও।' বলে যখন তাকে মায়ের কোলে তুলে দিতে গেছি, সে তখন আমার বুকের ওপর মাথা রাখল। যেন সে আমায় যেতে দেবে না। সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। একটা অজানা ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আমি তার মুখখানি আমার মুখের কাছে টেনে আনলুম। তার চোখদুটি মুছিয়ে দিতে গিয়ে, আমারও চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। তারপর তাকে আমি ফেলেই

চলে এসেছি। তার মুখখানি আমার চোখে এখনও স্পষ্ট ভাসছে। আহা! সে এখন কী করছে? এখনও কি কাঁদছে?'

অমনি চারদিক থেকে চিৎকার ভেসে উঠল। পাথরের কঠিন স্বর তাদের গলা দিয়ে ছিটকে পড়ছে। তারা আর্তনাদ করছে:

আমার মা কাঁদছে!

আমার বাবা কাঁদছে!

আমার ছেলে কোথায়!

আমার মেয়ে কোথায়!

আমার বোনকে এনে দাও!

আমার ভাইকে ডেকে দাও!

আমাদের বাঁচাও!

আমাদের বাঁচাও!

আমাদের বাঁচাও!

হঠাৎ একটি বৃদ্ধ পাথর গম্ভীর গলায় হাঁক দিল, 'থামো, থামো!'

অমনি নিমেষের মধ্যে সবাই চুপ করে গেল!

বৃদ্ধ বলল, 'অমন করে চেঁচালেই কি আমরা বাঁচব। আমরা তো পাথর। আমরা তো মরেই গেছি! শুধু আমাদের মনটা মরেনি বলেই আমাদের সব মনে পড়ে যাচ্ছে! কিন্তু যা শেষ হয়ে গেছে, তাকে মনে এনে দুঃখ করে লাভ কী?'

হঠাৎ একটি মূর্তি বলে উঠল, 'তাহলে আমাদের বাঁচার আর পথ নেই?'

'না।'

'আমরা আর কাউকে দেখতে পাব না?'

'না, না, না। আমরা ভগ্ন-প্রাসাদের বালির নীচে বন্দি। এই বালির নীচে থাকতে-থাকতে আমরা আরও নীচে নেমে যাব। নামতে-নামতে চাপা পড়ব আরও বালির নীচে। তারপর গুঁড়িয়ে-গুঁড়িয়ে মরুর বালির সঙ্গে মিশে আমরাও মরুভূমি হয়ে যাব!'

একজন আর্তনাদ করে উঠল, 'না।'

সঙ্গে-সঙ্গে আর-সকলেও ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল, 'না, না, না।'

সবাই চুপ করে গেল হঠাৎ! হঠাৎ কানে এল আবার সেই কান্না, সেই মেয়েটির কান্না! হয়তো এখান থেকে একটু দূরে সে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভারি অস্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে সেই কান্নার শব্দ!

'শোনো, শোনো, সেই মেয়েটি আবার কাঁদছে।' একটি পাথরের মূর্তি ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

https://boierhut.com/fb

সবাই চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। শুধু তার কান্নার শব্দটাই শুনছি। শুনছি যেন খাঁচার ভেতর বন্দি একটি ভয়-পাওয়া পাখি থমকে-থমকে কেঁদে উঠছে।

'আহা! কদিন ধরে শুধুই কাঁদছে মেয়েটা!' একজন বলল।

আর একজন উত্তর দিল, 'ও বোধহয় জানে না, চোখের কান্না ছড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা যায় না। মৃত্যুকে রুখতে হলে বীরের মতো বুকের রক্ত ঝরাতে হবে। কিন্তু কোথা সে বীর!'

'তুমি ওকে বাঁচাতে পারো না? ওই মেয়েটিকে?' হঠাৎ বৃদ্ধ বলল।

আমি চমকে গেছি! কাকে বলছে বৃদ্ধ?

'তুমি, তুমি! তোমাকে বলছি। তুমি তো এখনও পাথর হয়ে যাওনি। তুমি ওর জন্যে একটু আলো আনতে পারো না?'

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বৃদ্ধ-পাথর আমাকেই বলছে। কিন্তু আমি তাকে উত্তর দেবার আগেই, 'আলো, আলো' বলে সবাই আর্তনাদ করে উঠল। আকুল হয়ে তারা চেঁচাতে লাগল, 'আমাদের জন্যে একটু আলো এনে দাও। একটু আলো।'

বৃদ্ধ আবার বলল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? সময় বয়ে যাচ্ছে। খানিক পরে এই অন্ধকারটা তোমায় যখন জাপটে ধরবে, তখন আমাদের মতো তোমাকেও এখানে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যদি পারো, তাড়াতাড়ি করো। পারবে না আমাদের জন্যে একটু আলো আনতে? এই অন্ধকারটা ভেঙে টুকরো করে দিতে পারো না তুমি?'

হঠাৎ আমার বুকের ভেতর থেকে আমার সাহস যেন চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ আমি পারি। হ্যাঁ, আমি পারব। আমি তোমাদের বাঁচাব। না পারি, তোমাদের মতো আমিও পাথর হয়ে, তোমাদের সঙ্গে এখানেই থাকব।'

হঠাৎ যেন সেই মেয়েটি ডাক দিল 'আবু-উ-উ!' বাঁশির সুরের মতো তার গলার স্বর কান্নায় দোল খেতে-খেতে আমার কানে বেজে উঠল। আমি চমকে উঠেছি। তখনও ভাবছি আমি, সে কি ডাকল? 'আবু-উ-উ!'

হ্যাঁ, সত্যিই ডেকেছে। আমার চমক ভাঙল। আমিও সাড়া দিলুম, 'আমি আবু এখানে'।

বৃদ্ধ-পাথর বলল, 'তোমায় ডাকছে মেয়েটি। সময় নষ্ট কোরো না। জীবন শেষ হয়ে যাবার আগে, সেটাকে কাজে লাগাও। নইলে বেঁচে থাকার মানে কী!'

হ্যাঁ, ঠিক বলেছে বৃদ্ধ। আমি আবার অন্ধকারে পা বাড়ালুম। আমি তার কান্নার ডাক শুনে তাকে আবার খুঁজে পেলুম। সে কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে আমায় দেখছে। আমিও তাকে দেখছি। শান্ত মুখখানি তার এখনও জানালার গরাদ ছুঁয়ে স্থির হয়ে আছে। ডাগর-ডাগর চোখ দুটি তার ভ্রমরের মতো উড়তে-উড়তে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এত ভালো লাগছে! আমি তার কাছে এগিয়ে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গেলুম। বললুম, 'এই তো আমি এসেছি। আমি, তোমার ভাই আবু। বলো, ডাকছ কেন? বলো, কেমন করে তোমার দুঃখ আমি ঘোচাব!'

আমার কথা শুনে, এবার সে কথা বলল। অস্থির হয়ে সে বলল, 'আবু, তুমি তো ছোট্ট। আমার দুঃখ তুমি কেমন করে ঘোচাবে। আমার একটি কথা শোনো তুমি। এখান থেকে এক্ষুনি চলে যাও। নইলে তুমিও পাথর হয়ে যাবে।'

আমি বললুম, 'আমি পাথর হই সে-ও ভালো। কিন্তু আমি জানতে চাই, কে তোমায় পাথর করল।'

সে বলল, 'সে-কথা তোমার শুনে কী লাভ! তুমি চলে যাও আবু।'

'আমি যাব। তুমি শুধু বলো, কে তোমায় এখানে নিয়ে এল! তাকে আমি দেখে যাব।'

'না, না, সে আমি বলতে পারব না।' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

'আমি আবু। মরুর বুকে আমার জন্ম। তোমার কান্না আমারও কান্না। তুমি যদি না বলো, তবে জেনে রাখো, আবু এখানেই থাকবে, এই অন্ধকারে পাথর হয়ে। তবু তো কেউ বলতে পারবে না, দিদিকে এই বালির গহ্বরে একা ফেলে ভীতুর মতো পালিয়েছে আবু। ভয় পেয়ে বাঁচতে আমি চাই না। যে তোমায় পাথর করল তাকে আমি দেখতে চাই। বলো, বলো আমাকে, একটিবার বলো কে তোমায় পাথর করল!' বলতে-বলতে আমি তার হাতে হাত রাখলুম।

সে দ্বিগুণ জোরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'কোন দেশের, কোন বিভুঁইয়ের আবু তুমি, আমি জানি না। কোথায় তোমার মা থাকেন, কোথায় তোমার বাবা আছেন, আমি তাও জানি না। তবু একবার যদি তোমার মাকে মা বলে ডাকতে পাই! যদি বলতে পারি, মাগো, তোমার বুকের ধন আবু আমার বীর ভাই। সে যে আমার আপন।' বলতে-বলতে তার কান্না থেমে এল। তার পাথরের ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে।

ধীরে-ধীরে সে বলতে শুরু করল তার নিজের কথা। সে বলল, 'আমার মা নেই। আমি জানি না কখন মা আমায় ছেড়ে চলে গেছে। হয়তো তখন আমি খুব ছোটো। আমার বাবাও আমাকে সে-কথা কোনো দিনই বলেনি। আমাদের বাড়িটা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। খুব মস্ত। আর অনেক পুরোনো। আমাদের অনেকগুলো ঘোড়া আছে। কটা উট আছে। কিছু না-চাইলেও বাবা আমায় কত কিছু দিয়েছে। কী সুন্দর একখানা ঘর আমার! কী সুন্দর সাজানো! কত পুতুল! কত রঙিন ছবি! কত পোশাক। বাবা সারাদিন ঘরে থাকে না। কী যে করে বাবা তাও আমার জানার কথা নয়। কারণ আমি তো ছোটো। আমি একা-একা থাকি। ঘরের ছায়ায় বসে-বসে খেলা করি। নয়তো, গান গাই। আর যখন কিছুই ভালো লাগে না, জানালার ফাঁকে চোখ রেখে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকি। বাবা হঠাৎ আসে। হঠাৎ এসে আমাকে আদর করে। আমাকে গল্প শোনায়। তারপর সময় হলে আবার চলে যায়!

https://boierhut.com/fb

'এমনি করে দিন যায়। হঠাৎ একদিন বাবার আসতে দেরি হল। বাবার দেরি দেখে, ভারি ছটফট করছিল আমার মন। কখনো বার, কখনো দোর করছি আমি। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন বাবা এল না, বাবার পথের দিকে চেয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে রইলুম। দাঁড়িয়ে, দূরের দিকে চেয়ে রইলুম। কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও যখন বাবাকে আসতে দেখলুম না, তখন আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। হাঁটা দিলুম এই বালির ওপর। কেউ আমায় দেখতে পেল না। আমিও জানি না, হাঁটতে-হাঁটতে কোথায় চলেছি আমি। জানি না, কোন পথে গেলে বাবাকে খুঁজে পাব।

'হঠাৎ আমার চোখে জল এসে গেল। আমি কেঁদে ফেললুম। চিৎকার করে ডেকে উঠলুম, 'বাবা-আ-আ'। কিন্তু কে শুনবে আমার ডাক!

'এমন সময় আচমকা আমার মনে হল, এই শূন্য মরুভূমির কোথাও যেন কারা নূপুর পরে নাচছে। রুনু-রুনু ঝিনি-ঝিনি নানান সুরে নূপুর বেজে যায়, আমি শুনতে-শুনতে খুঁজি তাই। তারপর আমি যেন কেমন আনমনা হয়ে গেলুম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই নূপুর শুনতে-শুনতে আমি কোথায় চললুম, নিজেও জানি না। কিন্তু আশ্চর্য, যতই খুঁজে পাচ্ছি না, ততই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেই নূপুরের রিনি-ঝিনি! বেজে যায়, শুধু বেজে যায়। আমার মনও তত ভরে যায়।

'একসময় হঠাৎ আমার মনে হল, বালির পাহাড়ের ওপরে যেন সেই সুর ঘুরে-ঘুরে নেচে বেড়াচ্ছে। আমি অন্ধের মতো পাহাড়ের ওপরে উঠে পড়লুম। এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে হঠাৎ আমার নজর পড়ল, একটা ভাঙা-গম্বুজের দিকে। মনে হল, এই গম্বুজের নীচেই যেন কারা নেচে-নেচে গান গাইছে। আমি আনমনে গম্বুজের সিঁড়ি বেয়ে এই অন্ধকারেই নেমে এলুম। কিন্তু কাউকেই খুঁজে পেলুম না। কেউ-ই তো দেখা দিল না।

'কিন্তু তারপর হঠাৎ নূপুরের শব্দ থেমে গেল। হঠাৎ গানের সুর হারিয়ে গেল। আমার মনে হল, আমার চারপাশে কে যেন ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে। আমি ভয় পেয়ে। চিৎকার করে উঠলুম, 'কে-এ-এ!'

'সঙ্গে-সঙ্গে দেখি আমার সামনে ভাঁটার মতো দুটো জ্বলন্ত চোখ নিবছে, জ্বলছে! জ্বলতে-জ্বলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে! আমি ছুটে পালাতে গেলুম। পারলুম না। চারিদিকে অন্ধকার। ভীষণ জোরে হোঁচট খেয়েছি। টাল সামলাতে না-পেরে ছিটকে পড়লুম। সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো ভয়ংকর দৃষ্টিতে আমায় তেড়ে এল। কী জানি তখন কী যে মনে হল আমার, কিছু না-পেয়ে সেই জ্বলন্ত চোখ দুটোকেই খামচে ধরেছি। সে আর্তনাদ করে উঠল। আমার হাত দুটোকে প্রচণ্ড শক্তিতে দুমড়ে দিল! উঃ! কী ভীষণ যন্ত্রণা! আমার এই হাত দিয়েই তাকে আমি একটা বেদম জোরে ঘুঁষি মারলুম। দেখলুম, সে আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। আমাকে খামচে ধরল। আমাকে টেনে তুলল। তারপর আমার চুলের ঝুঁটি ধরে এমন হ্যাঁচকা মারল যে মনে হল, আমার শরীরটা উড়ন্ত চাকির মতো উড়তে-উড়তে গোঁত খাচ্ছে! আমি হুমড়ি খেয়ে একটা ঘরের মধ্যে যেন ছিটকে এলুম। হ্যাঁ, সত্যিই

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তাই! কেননা, তারপরেই দেখতে পেলুম, এই ঘরের দরজাটা দড়াম করে কে যেন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল! আমি চকিতে লাফিয়ে উঠে দরজায় ধাক্কা মেরে চেঁচালুম, 'দরজা খোলো, দরজা খোলো!' কিন্তু কেউ খুলল না, সাড়াও দিল না। আমি কেঁদে ফেললুম।

'আমি জানি না, কতদিন এই বন্ধ ঘরে বন্দি হয়ে আছি। জানি না, ঘরের এই খোলা জানালার গরাদ ধরে কাঁদতে-কাঁদতে কতদিন বয়ে গেছে। আমি জানি না, কেমন করে আমার পা দুটি নিশ্চল হয়ে গেল। আমার হাতের আঙুলগুলি ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে কবে যে কঠিন হয়ে গেল আমি টের পেলুম না। বুঝতে পারলুম না, কেমন করে দৃষ্টি আমার স্থির হয়ে গেছে! আমার বুকের ভেতরটা শক্ত কঠিন হয়ে থেমে আসছে। আমি যেন পাথর হয়ে যাচ্ছি! একটি কঠিন পাথরের মূর্তি!

'হ্যাঁ, সত্যিই আমি পাথর হয়ে গেলুম!

'তারপর হঠাৎ একদিন ওই দরজা খুলে গেল। আমি ছুটে দরজার কাছে যেতে পারলুম না। কেননা, আমার পা দুটি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আমি চিৎকার করতে পারলুম। আমার পাথরের গলার স্বর চিৎকার করে বলে উঠল, 'কে-এ-এ।'

'বুঝতে পারলুম, আমি দেখতে পাচ্ছি। চোখে দেখে মনের ভেতর কাঁদতে পারছি। কথা কইতে পারছি। ভাবতে পারছি আমি পাথর। নিশ্চল।'

সে থামল। এবার আমি মেয়েটির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলুম, 'আমার নাম আবু। যে তোমায় পাথর করেছে, তাকে আমি শেষ করে তবে ছাড়ব। কে, কে সে শয়তান, যে তোমায় এমন করল?' বলে আমি চিৎকার করে উঠলুম। আমার চিৎকার ঘুরপাক খেতে-খেতে সেই অন্ধকারে মিশে গেল। অমনি সঙ্গে-সঙ্গে শুনতে পেলুম আমার চিৎকারের চারগুণ জোরে কে যেন হেসে উঠল। আমিও তৈরি। বুক ফুলিয়ে, কোমরে হাত রেখে আমি হুকুম করলুম, 'যদি তোর সাহস থাকে বেরিয়ে আয়! ভীতুর মতো লুকিয়ে-লুকিয়ে যে হাসে, তাকে আমি বলি কাপুরুষ! মুরদ থাকে দেখা দে! বল, কে তুই?'

অমনি হাসি থেমে গেল। এবার যেন বাজ পড়ল তার গলায়। প্রচণ্ড জোরে হেঁকে উঠল, 'এই দেখ, এই আমি!'

বলতেই আমি চোখের পলকে ফিরে তাকিয়েছি। দেখি, আমার সামনে অন্ধকারে কী যেন একটা দোল খাচ্ছে। দেখি তালগোল পাকানো উদ্ভট চেহারার একটা জীব!

সেটা না ছোটো, না বড়ো,
না বেঁটে, না ঢ্যাঙা,
না সাদা, না কালো।
দাঁতগুলো ভ্যাংচানো,
হাত দুটো চ্যাপটানো।

https://boierhut.com/fb

চোখ দুটো জ্বল-জ্বল,
নোলায় জল টলটল!

আমি তার সামনে এগিয়ে যেতেই সে গর্জন করে বলে উঠল, 'আমি যদি ছোটো হতুম, পিটিয়ে তোকে লম্বা করতুম। আমি যদি বেঁটে হতুম, ঠেঙিয়ে তোকে ঢ্যাঙা করতুম। আমি যদি সাদা হতুম, কিলিয়ে তোকে কালো করতুম। কিন্তু তা আর আমায় করতে হবে না। এক্ষুনি তোর ঠ্যাঙদুটো বালির তলায় সেঁদিয়ে যাবে। তারপরে তুই পাথর হয়ে অন্ধকারে গুমরে-গুমরে মরবি।'



আমি তার সামনে এগিয়ে যেতেই সে গর্জন করে বলে উঠল,....

'তবে রে, এত বড়ো কথা!' এই বলে চিৎকার করে আমি তালগোল-পাকানো দানবটাকে ধরতে গেলুম। অমনি সে আমার গায়ে এমন জোরে ফুঁ দিয়ে দিল যে, আমি সাত হাত দূরে ছিটকে গেলুম! আমি তাড়াতাড়ি উঠে যেই আবার তেড়ে গেছি, সে এমন ঠ্যাঙ ছুড়লে যে, আমি সাত দুগুণে চোদ্দো হাত দূরে পটকে গেলুম। তখনই আমার মনে হল, একে তো সামনে থেকে ঘায়েল করা যাবে না। তাই, একফাঁকে পেছনে গিয়েই তার পিঠের ওপর মেরেছি লাফ! কিন্তু আশ্চর্য, তাকে আমি ধরতে পারলুম না। কেমন যেন পিছলে তার পিঠ ফসকে মাটিতে জিগবাজি খেলুম। আমি জিগবাজি খেতেই ফ্যা-ফ্যা করে কে হেসে উঠল। তাই শুনে জ্বলে গেল আমার সারা শরীর। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, আমার গলায় হিরের মালা! মনে ছিল না, লড়াই করতে গেলে এ-মালা হারিয়ে যাবে। তাই আমি চটপট আমার গলার মালা খুলে ফেলে, ওই মেয়ের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে উঠলুম, 'এই মালা তোমার কাছে রইল। যদি মরি তো মনে রেখো, তোমার ভাই তোমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে।'

বলে আমি আবার ঘুরে দাঁড়ালুম। কিন্তু আচমকা সে খপাত করে আমার একটা হাত ধরে ফেলল। হাত ধরে আমায় শূন্যে বাঁই-বাঁই করে ঘোরাতে লাগল। আমি হকচকিয়ে গেছি। চরকির মতো পাক খেতে-খেতে আমি হাত-পা ছুড়তে লাগলুম। ঘুরতে-ঘুরতে আমার মনে হল, এইবার হয়তো মুণ্ডুটা আমার উপড়ে পড়বে। হাতটা আমার ছিঁড়ে যাবে। নয়তো পা-দুটো লটকে গিয়ে ছিটকে পড়বে!

উঃ! খুব বেঁচে গেছি! মরতে-মরতে সুযোগ এসে গেল। হঠাৎ আমি দু-পা জড়িয়ে সাঁড়াশির মতো তার গলাটা জাপটে ধরলুম! কেমন করে যে পারলুম, তা এখন কিছুতেই বলতে পারি না। গলায় চাপ পড়তেই সে কেঁদে ককিয়ে উঠল। ঝটপটিয়ে আমার হাতটা ছেড়ে দিল। আমি তার গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়লুম। আমার পায়ের চাপে তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরোচ্ছে। সে আমায় খামচে দিল। আমিও তেড়েমেড়ে গলাটা আরও জোরে পেঁচিয়ে ধরলুম। তখন সে এমন জোরে হাঁসফাঁস করতে লাগল, আমি ভাবলুম, এবার সে মরবে। কিন্তু মরল না। হঠাৎ মনে হল, তার মুখের ভেতর থেকে যেন একটা আগুনের গোলা বেরিয়ে আসছে। আমার গায়ের ওপর পড়ার আগেই আমি তার গলা ছেড়ে মেরেছি এক ডিগবাজি! তারপর দে ছুট! কিন্তু আজব ব্যাপার! দেখি, তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া আগুনের গোলাটা আমার পেছনেই ছুটে আসছে! যেন আমায় পুড়িয়ে সে শেষ করবে। আমি কী করি, কোনদিকে ছুটব? এবার আমার নির্ঘাত মরণ! কেননা, বালি-চাপা এই প্রাসাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে যাবার পথ আমার এখন আর জানা নেই। আগুনের তাড়া খেয়ে আমায় ছুটতে দেখে ঠিক সেই সময়ে সেই দানবটাও এমন বিচ্ছিরি সুরে হেসে উঠল যে, আমার ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল! হাসতে-হাসতে সেও তেড়ে এল! রক্ষে এই যে, আগুনের গোলায় এই অন্ধকারটা আলোয় ভরে গেছে। সুতরাং আমি এদিক-ওদিক দেখে ছুটতে পারছি। কিন্তু জানি বাঁচার জন্যে আমার এ-ছোটা মিথ্যে! আগুনের গোলা এমন জোরে তেড়ে আসছে যে, আমায় মরতেই হবে। তবু যদি কোথাও লুকিয়ে পড়তে পারতুম ! এদিকে দেওয়াল, ওদিকে ঘর। চারপাশে লম্বা-লম্বা থাম। কিন্তু আগুনকে আমি ফাঁকি দেব কেমন করে! আগুনের সঙ্গে আমি কতক্ষণ পারব! সামনেই একটা ঘর। এই তালে যদি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারি।

হয়তো বন্ধ করতে পারতুম। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই এমন একটা বিশ্রী গন্ধ আমার নাকে এল! যেন একটা বিষাক্ত গ্যাস! আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। কী অসহ্য জ্বালা করে উঠল আমার চোখ দুটো। জ্বলে উঠল সারা শরীর। হয়তো আর একটু হলেই জ্ঞান হারাতুম। কোনোরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি। আর ঠিক সেই সময় আগুনের গোলাটা ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। পেছনে-পেছনে সেই দানবটা। সে চিৎকার করে হাসছে! সে জানে, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে!

কিন্তু বলব কী, সেই আগুনের গোলাটা যেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে দাউ-দাউ করে আগুন লেগে গেল। তারপর, 'দুম-ম-ম।' প্রচণ্ড আওয়াজ। আমার মনে হল আমি আর নেই। সেই শব্দের সঙ্গে আমিও বোধহয় শেষ হয়ে গেছি! আমি ছিটকে গেলুম। এক

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ঝলক জমাট ধোঁয়া আমায় ঢেকে ফেলল! রক্ষে, আমি ঘরের মধ্যে ছিলুম না। তা হলে এতক্ষণে আমি ছাই হয়ে যেতুম! কিন্তু আবার সেই বুক-কাঁপানো শব্দ দুম-ম-ম! দুম-ম-ম!

হঠাৎ দেখি সেই বালি-চাপা প্রাসাদের চারপাশের পাঁচিল জ্বলতে জ্বলতে ভেঙে পড়ছে। আমি উঠে পড়লুম। প্রাসাদের ছাদের পাথরগুলো আগুনে ফেটে-ফেটে আকাশে ছিটকে যাচ্ছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি দূরে ছুটলুম! দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি সেই আগুনের শিখা সামনে যা পায়, তাই গিলে খাবার জন্যে লক-লক করছে।

তারপর আবার দুম-ম-ম! ঈশ! দেখো দেখো, প্রাসাদের ছাতটা চৌচির হয়ে উড়ে যাচ্ছে! দেখো, ছাতের চাঁই-চাঁই পাথরের সঙ্গে লটকাতে-লটকাতে সেই দানবটাও যে উড়ে যায়। শুনতে পাচ্ছ তার মরণ-কান্না! হ্যাঁ, শূন্যে ঝুলতে-ঝুলতে নিজের আগুনে সে নিজেই দাউদাউ করে জ্বলছে। কী ভয়ংকর তার চেহারা! কী বীভৎস সেই দৃশ্য!

আবার দুম-ম-ম! প্রাসাদটা ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। আমি দেখতে পেলুম, আকাশ ভেঙে মুঠো-মুঠো আলো নেমে এসেছে প্রাসাদের ভেতরে। আমি ছুটলুম। এমন সময় শুনতে পেলুম কে যেন ডাকল আমায়, 'আবু-উ-উ!'

কে ডাকে?

'আবু-উ-উ!'

এ যেন সেই মেয়েটির গলা! সেই পাথর!

আমি সাড়া দিলুম, 'আমি এখানে।'

সে আমার কাছে ছুটে এল। এ কী ! সে কেমন করে ছুটে এল! সে তো পাথর! আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি!'

সে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। তার মুখে হাসি। সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি। অন্ধকারে দানব আমায় পাথর করে রেখেছিল। কিন্তু জানো আবু, আকাশের আলো আমার গায়ে পড়তেই, সে পাথর গলে গেল। আবু, এখন আমি তোমার মতো!' বলে সে আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরল।

আর অমনি সঙ্গে-সঙ্গে আরও অসংখ্য মানুষের চিৎকার শুনতে পেলুম। সেই অসংখ্য মানুষেরাও আনন্দে চিৎকার করছে। আকাশের আলোয় তাদেরও পাথর গলে গেছে। তারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপতে-কাঁপতে সেই মেয়েটি তার গলায় পরিয়ে দেওয়া আমার হারটি হাতে ধরে বলল, 'আবু, এ-হার তুমি কোথায় পেলে?'

আমি বললুম, 'এ-হার যে আমায় দিয়েছে, সেই তো আমায় মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। এখন তাকে আমায় বাঁচাতে হবে।'

শোনা গেল সেই জীবন্ত মানুষেরা আবুর নাম ধরে উল্লাস করছে। তারা খুঁজছে আবুকে। সেই মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আবু, আবু, যে তোমায় ওই হার দিয়েছে, তাকে কেমন দেখতে?'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আমি বললুম, 'তাকে তো আমি দেখিনি। কালো কাপড়ের আড়ালে নিজেকে সে লুকিয়ে রেখেছিল।'

সেই জীবন্ত মানুষেরা এগিয়ে আসছে।

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'সে কি বলল তার মেয়ে হারিয়ে গেছে?'

'কেন এ-কথা বলছ?' আমি জিজ্ঞেস করলুম! সেই মানুষদের কণ্ঠস্বর এখন কাছে এগিয়ে এসেছে।

সেই মেয়েটি আবার বলল, 'জিজ্ঞেস করছি, কারণ, আবু, এ-হার আমার। আমার বাবার কাছে ছিল। আমার মনে হয় আবু, এ-হার তোমায় যে দিয়েছে, সে আমার বাবা।'

আমি কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, 'সত্যি?'

মেয়েটি বলল, 'সত্যি! সত্যি! সত্যি!'

'তবে এসো।' আমি তার হাত ধরে ডাক দিলুম।

ততক্ষণে সেই জীবন্ত মানুষেরা আনন্দে চিৎকার করতে করতে সেখানে পৌঁছে গেল। তারা আমাকে বুকে তুলে নিল। বুকে তুলে আত্মহারা হয়ে নাচতে লাগল।

তারপর তাদের বুক থেকে নামলুম আমি। বললুম, 'শোনো বন্ধুগণ, মরু-দানবের জাদু-প্রাসাদ ভেঙেছে। মরু-দানব নিজের আগুনে নিজেই পুড়েছে। আমরা সবাই মুক্তি পেয়েছি। এবার আমাদের আর একজনকে মুক্ত করতে হবে। তোমরা কি সে-কাজে আমার সঙ্গী হবে?'

সবাই চেঁচিয়ে উঠে হাত তুলল, 'যে আমাদের মুক্ত করেছে, তার জন্যে আমরা প্রাণ দেব।'

ওদেরই মধ্যে কেউ একজন চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'সে একজন কে? কোথায় তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে?'

আমি বললুম, 'জানি না সে কে!'

তখন সেই মেয়েটি বলে উঠল, 'এ-মালা যদি আবু তার কাছ থেকে পেয়ে থাকে, তবে এ-মালা আমার। আর এ-মালা যদি আমার হয়, তবে সে আমার বাবা!'

তখন আবার সবাই চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমরা তাকে মুক্ত করব, আমরা তাকে মুক্ত করব!'

আমি বললুম, 'তবে এসো আমার সঙ্গে।'

অমনি সবাই সেই ভাঙা প্রাসাদের জঞ্জাল ডিঙিয়ে মরুর বালির ওপর উঠে এল। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চারদিকে বিরাট উঁচু-উঁচু বালির স্তূপ। সেই স্তূপের চড়াই-উতরাই ভাঙতে-ভাঙতে আমরা চলেছি সেইখানে, সেই দস্যুদের আস্তানায়। আমার হাতটি ধরে আছে সেই মেয়েটি। আমরা এখন নতুন প্রাণ পেয়েছি, তাই মরুর অসহ্য উত্তাপ আমাদের বাধা দিতে পারল না। আমরা বাধা মানবও না।

https://boierhut.com/fb

আমরা অনেকখানি পথ ফেলে চলে এসেছি। এখান থেকে অনেকটা দূরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বালির পাহাড়ের আড়ালে একটা বাড়ি উঁকি মারছে। আমি বুঝতে পারছি না, কাল আমি যেখানে বন্দি হয়েছিলুম, এই বাড়িটাই সেই বাড়ি কি না! বোঝা তো সম্ভব নয়। কাল ছিল অন্ধকার রাত, আর আজ এখন স্পষ্ট দিন!

ওরা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আবু, আমরা কি ওইখানে যাব?'

আমি বললুম, 'আগে যা দেখা যায়, সেইখানেই আগে চলি।'

কিন্তু আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি, ওই দূর কোঠার অলিন্দ থেকে ওই বাড়ির বাসিন্দারা আমাদের দিকে সতর্ক নজর রেখেছে। আমরা জানবই বা কী করে! কেননা এখান থেকে অত দূরে সেই নজরদারের দিকে আমাদের নজর যেতেই পারে না। কে জানে কোথায় চলেছি আমরা!

যতই কাছে এগোচ্ছি, মনে হচ্ছে ওই বাড়িটা যেন একটা সাদামাটা বাড়ি নয়। মনে হচ্ছে ঠিক একটা ভাঙা কেল্লা! বালির পাহাড়ের অনেকটা ওপর থেকে বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে তার শক্ত পাঁচিল। চট করে নজর পড়বে না। পড়লেও মনে হবে, এখানে কি আর মানুষ বাস করতে পারে! কিন্তু ভাবছি, এখানে এই কেল্লা এল কোথা থেকে? এখানে কি তবে আগে মরু ছিল না! সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তবে কি মরুর বালি এই কেল্লাটাকেও গিলে খেয়েছে! হবেও বা।

আমরা ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালুম। মেয়েটি বলল, 'আবু, এখানে তো আমার বাবা থাকে না। এ তো আমার চেনা নয়!'

আমিও বুঝতে পারলুম না, এই ফটক, সেই ফটক কি না। বুঝতে পারলুম না, এরই আড়ালে কাল আমি লুকিয়েছিলুম কি না! যাই হোক, আমরা ফটকের ভেতর ঢুকে গেলুম। আমরা সবাই চিৎকার করে উঠলুম। কেল্লার চত্বরটা গমগম করে উঠল। কিন্তু কারো সাড়া পেলুম না। তবু চিৎকার থামল না। তবু আমরা আরও ভেতরে ঢুকে যাচ্ছি। বুঝতে পারছি না, আরও ভেতরে গেলে সেই মানুষটাকে আমরা উদ্ধার করতে পারব কি না! সেই মানুষটার কথাই আমার বারবার মনে পড়ছে। সে আমাকে বাঁচিয়েছিল। কথা ছিল তাকে আমি বাঁচাব। আমরা ছড়িয়ে পড়লুম চারদিকে। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। এই খালি হাতেই আমরা কেল্লা দখলের লড়াইয়ে নেমেছি। জানি না বরাতে কী আছে।

আমরা এখনও কাউকে দেখতে পাইনি। আমরা এখনও বুঝতে পারিনি, যতই ভেতরে চলেছি বিপদ ততই গুটিগুটি আমাদের পেছনে হেঁটে আসছে! আমরা একটুও ধারণা করতে পারিনি, আমাদের ঘিরে ফেলে একদল দস্যু তরোয়াল উঁচিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে! আমরা অজানতে তাদের হাতে ধরা দিতে চলেছি! আমি বলব না এটা আমাদের বোকামি। কেননা, অজানা এই কেল্লার গোপনে লুকিয়ে থাকার জায়গাগুলো তো আমাদের নজরে পড়ার কথা নয়! সুতরাং আমরা এগিয়ে চলেছি।

হঠাৎ থমকে গেলুম আমরা। চমকে চেয়ে দেখি, কোন গোপন-পথ দিয়ে বেরিয়ে এসে দস্যুদল একেবারে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের ঘিরে ফেলেছে। খাপ থেকে তরোয়াল খুলে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে তারা। আমাদের চিৎকার থমকে গেছে। আমরা জানি, এই শূন্য হাতে ওদের সঙ্গে আমরা লড়াই করতে পারব না! এবার দস্যুদের হাতে আমাদের মরতে হবে। মরতেই যদি হয় তবে মাথা তুলেই মরব আমরা। তাই আমি চিৎকার করে বললুম, 'ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

'না-আ-আ!' সামনে ছুটে এসে এবার চিৎকার করে উঠল সেই মেয়েটি। বলল, 'আবু, অনেক কষ্টে যখন আমরা জীবন ফিরে পেয়েছি, তখন এমন করে কেন প্রাণ দেব? আবু, এসো আমরা ধরা দিই! আমরা যদি কোনো অন্যায় না করে থাকি, তবে আমাদের মিথ্যে-মিথ্যে মারবে কে! মারতেই যদি চায় ওরা, তখন শেষ রক্তটুকু দিয়ে তো লড়াই করতে পারব। এখন দেখি না ওরা কী বলে।'

আমি ভাবলুম, ঠিক কথাই বলেছে মেয়েটি। আমরা এগোলুম না। আমরা বন্দি হলুম ওদের হাতে। ওরা আমাদের নিয়ে চলল কেল্লার ভেতর। আরও ভেতরে একটা ঘরের সামনে।

হ্যাঁ, এই ঘরেই বোধহয় ওদের সর্দার আছে। এই ঘরেই সেই সর্দারের সামনে হয়তো দাঁড় করাবে। আমাদের বিচার হবে।

'বাবা-আ-আ!' ঘরের দরজা ডিঙোতে আচমকা ডেকে উঠল সেই মেয়েটি। আমরা তো সবাই থ। এমনকী, যারা আমাদের ধরে নিয়ে এসেছে. সেই দস্যুদল, তারাও থতমত খেয়ে চমকে উঠেছে! কী ব্যাপার! মেয়েটি বাবা বলে ডাকল কাকে!

নিমেষে ওদিক থেকে অবাক-কণ্ঠে সাড়া এল, 'রুবানা-আ!'

চেয়ে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেছি। কেননা, যাকে বাবা বলে মেয়েটি ডাকল,তাকে আমি চিনি। এ সেই দস্যু-সর্দার! এ-ই তো আমাকে বন্দি করে রেখেছিল অন্ধকার ঘরে, এই লোকটাই তো আমার গলা টিপে মারতে চেয়েছিল! সে হয়তো এখনও আমাকে ভালো করে দেখেনি। কিন্তু আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দু-হাত বাড়িয়ে সে আবার ডাক দিল, 'রুবানা-আ!'

সেই মেয়েটি আবার খুশির সুরে চিৎকার করে উঠল, 'বাবা-আ-আ!'

আমার বুঝতে বাকি রইল না, এতক্ষণ যার হাত ধরে এই পথ আমি হেঁটে এসেছি তার নাম রুবানা। আর সামনে ওই যে দাঁড়িয়ে আছে দস্যু-সর্দার, সে ওর বাবা!

ওর বাবা মেয়েকে অমন আচমকা দেখতে পেয়ে দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই সে ছুটল বাবার দিকে। কেউ তাকে বাধা দিল না। কেউ তাকে মানা করল না। কিন্তু আমি? হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম সেইখানে! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, এই দস্যু-সর্দার ওর বাবা! আমার মনটা কেমন যেন মুষড়ে গেল।

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ওরা আমাকে দাঁড়াতে দিল না। আমার গলায় ধাক্কা মারল। আমি ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলুম আর একটু হলে। ঠিক সেই সময়ে সর্দারের নজর পড়ল আমার দিকে। তার চোখ দুটো স্থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল।

ভয় পেল হয়তো মেয়েটি। তাই সে তার বাবাকে শান্ত করার জন্যে বলল, 'বাবা, এই হার তো তুমি ওকে দিয়েছ!'

এ-কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। চিৎকার করে বললুম, 'না, এ-হার আমায় যে দিয়েছে সে-জন দস্যু নয়।'

দস্যু-সর্দার হারটা ছিনিয়ে নিল মেয়ের কাছ থেকে। তারপর ভয়ংকর হুংকার ছেড়ে বলল, 'ধরে আনো ছেলেটাকে আমার কছে!'

আমি বুক ফুলিয়ে চেঁচিয়ে বললুম, 'ধরে নিয়ে যাবার কী দরকার। আমি নিজেই যেতে পারি। আমি দস্যুকে ভয় পাই না।' বলে, আমি নিজেই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'কী বলতে চান আপনি?'

'এ-হার তুই কোথা পেলি?' ভারী গম্ভীর-গলায় সর্দার জিজ্ঞেস করল।

আমি উত্তর দিলুম, 'জানি না।'

'মানে!' অবাক হল সর্দার।

'মানে, আমি যা জানি না তা আপনাকে বলব কেমন করে।' সর্দার বলল, 'তোকে আমি বন্দি করেছিলুম। তুই এই হার চুরি করে পালিয়েছিস!'

আমি বললুম, 'মিথ্যে কথা। আমার বাবা আমায় চুরি করতে শেখায়নি। শিখিয়েছে চোরের মুখোমুখি বুক ফুলিয়ে কেমন করে দাঁড়াতে হয়!'

আমার এই উত্তর শুনে দস্যু-সর্দার হয়তো থতমত খেয়ে গেল। কেননা, কেমন যেন অপ্রস্তুতের মতো ঘাড় দুলিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল। আমার মুখ থেকে যে তাকে এমন উত্তর শুনতে হবে এটা ভাবতেই পারেনি দস্যু-সর্দার। কিন্তু নিজেকে সামলাবার জন্যেই হয়তো আচমকা চিৎকার করে সে তার পাশেই রাখা তরোয়ালটা হাত দিয়ে উঁচিয়ে ধরল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এ তরোয়াল কার?'

আমি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটু দেখেই চিনতে পেরেছি এ আমার সেই তরোয়ালটা। এরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল, তাই আমি উত্তর দিলুম, 'আমার তরোয়াল আপনারা কেড়ে নিয়েছেন!'

'এ-তরোয়াল তুই কোথা পেয়েছিস?'

'আমার বাবা দিয়েছে!'

'তবে তোর বাবাই সেই তস্কর, সেই শয়তান!'

https://boierhut.com/fb

দস্যু-সর্দারের সব কথা না-শুনে, শুধু এইটুকু শুনেই আমার সারা শরীর রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল। আমিও তার গলার ওপর গলা চড়িয়ে বললুম, 'এখন এই তরোয়াল আপনার হাতে না থেকে যদি আমার হাতে থাকত, তবে আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিতুম তস্কর কে! আপনি, না আমার বাবা!'

আমার এই দুঃসাহসী কথা কোনো দস্যু কি আর সহ্য করতে পারে! তার ওপর সে- দস্যু যদি হয় দলের সর্দার! সুতরাং দস্যু-সর্দার তরোয়াল চালাল। ভয় কী! মরতে হয় মরব। তবু আমার বাবাকে যে তস্কর বলেছে, তার কাছে মাথা নিচু করব না। আমি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কিন্তু সে পারল না। আমার বুকে তরোয়ালের আঘাত লাগার আগেই তার মেয়ে বাবার সামনে দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চিৎকার করে সে বলল, 'না, তুমি আবুকে মারতে পারবে না। যার বুকে তুমি তরোয়াল তুলেছ বাবা, সে যে তোমার মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়ে, তোমার কাছে ফিরিয়ে এনেছে। আমি ওকে ভাই বলে ডেকেছি। তুমি যদি আবুকে মারতে চাও, তবে আমাকেও মারো।'

দস্যু-সর্দারের তরোয়াল আমার বুক ছুঁতে পারল না। তরোয়াল হাতের মুঠো থেকে আবার খাপে ঢুকে গেল। আমি দেখতে পেলুম, দস্যু-সর্দারের মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে থমকে গেছে। আমার মুখের দিকে চেয়ে দস্যু-সর্দার হঠাৎ হাঁক পাড়ল তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। তারা ছুটে আসতেই হুকুম করল, 'আমি এই ছেলেটার বাবার কাছে যাব। তোমরাও চলো আমার সঙ্গে। ঘোড়া তৈরি করো। ছেলেটাকেও নিয়ে যেতে হবে। এক্ষুনি!'

হ্যাঁ, ঘোড়া তৈয়ার হল। আমাকেও একটা ঘোড়ার পিঠে বসাল ওরা। দাঁড়িয়ে ছিল রুবানা-বোন। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমাকে একা ঘোড়ার পিঠে দেখে, হঠাৎ সে ছুটে এসে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে ঘোড়ার লাগাম ধরে টান মারল, 'হ্যাট হ্যাট।' ঘোড়া তির বেগে ছুটতে শুরু করে দিল। সে আমায় নিয়ে পালাল।

আচমকা এমন একটা কাণ্ড দেখে একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে সবাই! কী করবে, কী না-করবে ভাবতে না ভাবতেই দস্যু-সর্দার চেঁচিয়ে উঠল, 'রুবানা-আ-আ।'

ততক্ষণে আমাদের পিঠে নিয়ে ঘোড়া অনেক দূর চলে এসেছে! সঙ্গে সঙ্গে সর্দারেরও ঘোড়া ছুটল। সর্দারের লোকেদের যেন এতক্ষণে চমক ভাঙল। তারাও ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে আমাদের পিছু নিল। চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগল, ভাগল!' শুরু হয়ে গেল মরুর বুকে সে আর এক আজব ঘোড়-দৌড়! একটি ঘোড়ার পিঠে একটি ছোট্ট ছেলে আর একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটে চলেছে ধু-ধু মরুর বুকের ওপর দিয়ে। আর তাদের ধরতে তাদের পেছনে ছুটে আসছে একদল মরু-দস্যু! ভয়ংকর হিংস্র তারা! নির্দয়, নিষ্ঠুর!

আমি এখন ঠিক মনে করতে পারছি না, কেমন করে রুবানা-বোনের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে দুরন্ত বেগে আমাদের সেই ছোট্ট ঘরে আমি আবার ফিরে এসেছিলুম। শুধু জানি দস্যু-সর্দারের সাঙ্গোপাঙ্গরা শত চেষ্টা করেও আমাদের ধরতে পারেনি। তাদের নাগালের অনেক—অ-নে-ক বাইরে

ছুটে চলেছিল আমাদের ঘোড়া। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই সে ছুটতে ছুটতে থেমেছে যতক্ষণ না সে দেখতে পেয়েছে দূরে দস্যুদলকে। তখনই সে একটু করে জিরিয়ে নিয়েছে। দম নিয়ে আবার ছুটেছে। হ্যাঁ, ছুটতে-ছুটতে যখন সে আমাদের ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছল, তখনই হঠাৎ দস্যু-সর্দার তিরের মতো ছুটে এসে আমাদের প্রায় ধরে! কিন্তু পারেনি। এখন বেশ মনে আছে, তার আগেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আমি আর রুবানা-বোন ঘরের ভেতর ছুটে গেছলুম। আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলুম, 'মা-আ-আ! বাবা-বা-আ!' তাদের চোখগুলি আমাকে খুঁজে -খুঁজে আর কেঁদে-কেঁদে ক্লান্ত হয়ে গেছে! হঠাৎ আমার ডাক শুনে থমকে গেছল আমার মা, আমার বাবা। তারা দুজনেই আমাদের দুজনকে দেখে হতবাক। তারপর মা ছুটে আমায় জড়িয়ে ধরতে এলেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছি। বললুম, 'মা, ওই দেখো সামনে শত্রু!'

হ্যাঁ, সামনে শত্রু! ততক্ষণে দস্যু-সর্দার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মাটিতে পা রেখেছে। তার হাতে আমার সেই তরোয়াল। আমার বাবার দিকে এগিয়ে আসছে সে ধীর পায়ে। আমি বাবাকে আড়াল করে দাঁড়ালুম। রুবানা-বোন ছুটে এসে তার বাবাকে রুখে দাঁড়াল। বলল, 'আমি যেমন তোমার মেয়ে, তেমন এদেরও মেয়ে আমি। তোমার হাতে এদের আমি মরতে দেব না।'

দস্যু-সর্দার কোনো কথা বলল না। আমার বাবার মুখোমুখি দাঁড়াল সে। বাবার চোখের ওপর চোখ রেখে নিজের হাতের তরোয়ালটা দোলাতে লাগল। বাবা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একবার সেই তরোয়ালের দিকে আর একবার দস্যু-সর্দারের মুখের দিকে ফ্যাল-ফাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎই দস্যু-সর্দার কথা বলল, 'এই তরোয়াল তোমার ছেলের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তোমার ছেলে বলেছে, এই তরোয়াল তুমি ওকে দিয়েছ। আমি কি জানতে পারি, এ তরোয়াল তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'আমি মরু থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।' বাবা উত্তর দিল।

দস্যু-সর্দার বাবার উত্তর শুনে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ, না আজ থেকে অনেক বছর আগে মরুর বুকে দস্যু-গিরি করে এই তরোয়াল তুমি লুঠ করেছ?'

বাবা বলল, 'আমি কখনো দস্যুগিরি করিনি।'

এবার যেন দস্যু-সর্দার ধমকে উঠল, 'যে মিথ্যে বলে, তাকে আমি আস্ত রাখি না!'

বাবা এতক্ষণ শান্ত-স্বরে কথা বলছিল। এবার একটু কঠোর-স্বরে বলল, 'তবে শুনুন! আপনি কে আমি জানি না। একটা তুচ্ছ তরোয়ালের জন্য আপনাকে মিথ্যে বলতে যাব কোন দুঃখে? আমি দস্যু নই! আমি আবার বলছি, অনেক দিন আগে এ তরোয়াল আমি কুড়িয়ে পেয়েছি!'

'তুমি কি জানো, এ তরোয়াল আমার?'

'হতে পারে!'

'এই দেখো, তরোয়ালের হাতলের নীচে আমার নাম লেখা!' বলে দস্যু-সর্দার তরোয়ালের হাতলের নীচে গোপনে লেখা নিজের নামটা স্পষ্ট করে বাবার চোখের সামনে তুলে ধরল।

বাবা দেখতে-দেখতে বলল, 'আপনার নাম যদি মনসুর হয়, তবে, এ তরোয়াল আপনার।'

'হ্যাঁ, আমার নাম মনসুর। আর তুমি যদি এ তরোয়াল পেয়ে থাকো, তবে তুমিই সেই দস্যু-দলের একজন। তারা আমার বউকে মেরেছে, আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

বাবা যেন চমকে উঠল দস্যু-সর্দারের কথা শুনে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ছেলে?'

বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আমিও চমকে উঠলুম। সেদিনের সব কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেই সেদিন, যেদিন আমি মরুতে পাড়ি দেব প্রথম, তার আগের রাত্রে বাবা আর মা যে এই কথাই বলছিল। সেদিনই যে আমি জেনেছিলুম, বাবা আমায় মরু থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে। এখন ভাবছি, তবে কি আমি এই দস্যু-সর্দারেরই ছেলে!

বাবা এবার ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনার মনে আছে কতদিন আগে এ-ঘটনা ঘটেছিল?'

'দশ বছর আগে।' উত্তর দিল দস্যু-সর্দার। উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন এ কথা বলছ তুমি?'

'কোনো কারণ নেই। এমনি জিজ্ঞেস করছি।' বলে বাবা চকিতে মায়ের দিকে চাইল। মায়ের মুখখানা কেমন যেন অজানা ভয়ে শিউরে উঠল। হয়তো এই কথা শুনে আমার মা আর বাবা ভুলে গেল, তাদের ছেলে ঘরে ফিরেছে। এখন তাদের আনন্দ করার সময়। কিন্তু দস্যু-সর্দারকে বাবা আবার জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কেমন করে এ-ঘটনা ঘটেছিল আপনার মনে আছে?'

'কেন থাকবে না!'

'বলবেন সেই ঘটনার কথা?' জিজ্ঞেস করল বাবা।

'বলতে আপত্তি নেই।' উত্তর দিল দস্যু-সর্দার।

'তবে দয়া করে যদি বলেন!' জিজ্ঞেস করল বাবা।

দস্যু-সর্দার তখন বলতে শুরু করল, বলল, 'আজ থেকে সেই দশ বছর আগে, একদিন আমার বউ, আমার ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে শহর থেকে মেলা দেখে ফিরছিলুম মরুর পথ ধরে। তখন বেলা পড়ছে। আমরা দলে ছিলুম আরও অনেকে। কেউ বা যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে। কেউ বা উটে। আমার বউ আর ছেলে-মেয়ে চলেছিল উটের পিঠে, আর আমি চলেছি ঘোড়ায় চড়ে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, অতর্কিতে মরু-দস্যু আমাদের আক্রমণ করল। আমাদের ওই অতবড়ো দলটা নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে পালাতে শুরু করল , দস্যুদল লক্ষ করল আমাদের। ভেবেছিল আমাদের কাছে বুঝি অনেক সোনা-দানা আছে। তারা আমার বউকে আক্রমণ করল। আমার বউয়ের কোলে ছিল আমার ছোট্ট ছেলে। তখনও সে হাঁটতে জানে না। কথা জানে না। মায়ের

কোলটি ছাড়া কিচ্ছু জানে না। দস্যুরা আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিল তার মায়ের কোল থেকে। কিন্তু তার মায়ের কাছে লুকানো ছিল ধারালো একটা ছোরা। ছেলেকে কেড়ে নেবার আগে, সেই ছোরা দিয়ে সে আঘাত করতে ছাড়েনি সেই শয়তানটাকে! সেই শয়তান মরল কি না জানি না। কিন্তু আমার বউয়ের বুকে তারা তরোয়াল মারল। পড়ে গেল সে মাটির ওপর। আমার ছেলেটাকে তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কী যে করল আমি দেখতে পেলুম না। কেননা, তখন তারা আমার ওপর চড়াও হয়েছে। হবেই তো! আমি যে তখন কোনোরকমে আমার মেয়েকে ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। নিয়ে ঘোড়ার পিঠে দৌড় দিচ্ছি। ওরা আমায় প্রথমে ঘিরে ফেলল। আমি তখন জানি আমার নিশ্চিত মৃত্যু। কিছু আর ভেবে না-পেয়ে এই তরোয়ালটা দিয়েই আমি ওদের সঙ্গে একা-একা লড়াই শুরু করে দিলুম। ভাবলুম, আমি মরি মরব, আমার মেয়েকে আমি বাঁচাবই! এক হাতে আমার মেয়ে, এক হাতে আমার তরোয়াল। আমি এই অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে বসে-বসে জীবন-মরণ লড়াই করছি। আমার তরোয়াল ওদের বুকে বিঁধছে। রক্ত ছুটছে। তাদের কেউ মরছে, কেউ ভাগছে। কিন্তু হঠাৎ একজন দস্যু পিছন দিক থেকে আমাকে আক্রমণ করে বসল। আমার হাতের ওপর প্রচণ্ড জোরে সে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে আঘাত করল। আমার হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে পড়ল। আমার কাছে আর কোনো অস্ত্র ছিল না। সুতরাং আমার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে আমি ঘোড়া ছোটালুম। আমি পালালুম। ওরা আমার পিছু নিয়েও আমার নাগাল পেল না। পালালুম আমার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে। না, আমি মরলেও আমার মেয়েকে আমি মরতে দেব না।

'হ্যাঁ, আমার মেয়েকে আমি মরতে দিইনি। কিন্তু আমার বউ আর ছেলের কথা ভেবে-ভেবে বুকের ভেতরটা আমার প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠত। ভাবতুম, যারা আমার বউকে মেরেছে, যারা আমার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের যতক্ষণ না মারছি, ততক্ষণ বুঝি আমার শান্তি নেই। কিন্তু তাদের আমি মারতে পারিনি। কেনা শত চেষ্টা করেও তাদের আমি খুঁজে পাইনি আর।

'কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন আমার আর-এক সর্বনাশ হয়ে গেল। আমার মেয়েও হারিয়ে গেল! আমি ছিলুম না। সেদিন কী একটা জরুরি কাজে বাইরে গেছলুম। ঘরে ফিরে দেখি, আমার মেয়ে নেই! আমি পাগলের মতো আমার মেয়ের খোঁজে ছুটে বেড়ালুম। কিন্তু কই আমার মেয়ে? তাকে আমি কোথাও খুঁজে পেলুম না। তখনই আমার মনে হল, এ বুঝি সেই মরু-দস্যুরই কাণ্ড। এ-কথা মনে হতেই প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে উঠলুম আমি। প্রতিজ্ঞা করলুম, যদি মরতে হয় তবু ভালো, আমার মেয়েকে আমি যেমন করে হোক উদ্ধার করব। তাই আজ আমি দস্যু হয়েছি। আমি অস্ত্র ধরেছি। আমি বুঝেছি, দস্যুকে শায়েস্তা করতে হলে, আমাকে দস্যু হতেই হবে। আমি আজ এক শক্তিশালী দস্যু-দলের সর্দার। আমি যা পাই, তাই লুঠ করি। আমি যাকে পাই, তাকে খুন করি। আর তাই তোমার ছেলেও একদিন আমার দলের লোকের হাতে ধরা পড়ে। এক দস্যু-দলের সঙ্গে তোমার ছেলে ভাগছিল। আমার লোকেরা তোমার ছেলেকে ধরে নিয়ে এল আমার কাছে। তরোয়ালটা আমি

ওর কাছ থেকে কেড়ে নিলুম। তখনও আমি জানতুম না এই তরোয়ালই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া তরোয়াল। আমি জানতুম না এই তরোয়ালের গায়ে আমারই নাম খোদাই করা আছে। আমি তোমার ছেলেকে শত্রু ভেবেই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে গেছি। পারিনি।

'তোমার ছেলেকে মারতে গিয়ে আমারই ছেলের কথা মনে পড়ে গেছে! কেমন যেন অজানা ভয়ে আমার বুকের ভেতটা কেঁপে উঠেছিল ওকে দেখে। কী জানি কেন, তোমার ছেলের মুখখানি দেখে আমার চোখের জল আমি আটকে রাখতে পারিনি। কিন্তু কান্না কি আমার সাজে! কেননা, আমি দস্যু। তরোয়ালের ঝনঝনানি শব্দ শুনে আমার ঘুম ভাঙে। শত্রুর রক্ত দেখে আমার মন ভরে। কিন্তু তবু গোপনে আমি কেঁদেছি। তোমার ছেলের জন্যে আমার মনটা ব্যথায় ডুকরে উঠছিল বলেই গভীর-রাতে ওর কাছে আমি গেছি। গেছি সেই ঘরে, যে-ঘরে আমি বন্দি করে রেখেছিলুম। আমি ওকে বুঝতে দিইনি, আমি সেই দস্যু-সর্দার। সারা গায়ে কালো কাপড়ের ঢাকায় নিজেকে লুকিয়ে রেখে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ওকে গোপনে সেই বন্দি-ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেছি। ওর অজান্তে ওর গলায় একটি হার পরিয়ে দিয়েছি। এই হারটি ছিল আমারই মেয়ের। তারপর ওকে হাত ধরে গেটের বাইরে নিয়ে গিয়ে ওকে মুক্ত করে দিয়েছি। ওকে দেখে আমার মন বার-বার বলে উঠেছে, ছিঃ ছিঃ আমি কেন দস্যু! আমি কেন খুন করি! কেন আমি লুটেরা! আমি চাই না দস্যু থাকতে! আমি এই জঘন্য জীবন থেকে মুক্তি চাই, তাই আমি ওর হাত ধরে বলেছিলুম, পারিস তো আমায় নিয়ে যাস এখান থেকে। আমায় মুক্ত করিস!'

বলতে বলতে দস্যু-সর্দার হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢাকল। আমার চোখেও জল এসে গেল। ভাবলুম, তা হলে এই সর্দারই সেদিন আমায় মুক্ত করে দিয়েছিল! এই কথা ভাবতে-ভাবতে আমি লুকিয়ে ফেলেছিলুম আমার চোখ দুটিকে। কেউ না দেখে ফেলে! কিন্তু দেখতে পেয়েছিল। দেখেছিল রুবানা-বোন। সে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমায় চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কাঁদছ, আবু?'

আমি উত্তর দিইনি। । মুখ নিচু করে ভেবেছিলুম, আমিই কি তবে সেই কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে।

'কী ভাবছ, আবু?' রুবানা-বোন খুব আলতো-স্বরে আবার জিজ্ঞেস করেছিল আমায়। আমি বলেছিলুম, 'ভাবছি, তোমার বাবার কথা। ভারি দুঃখী!'

আমি এতক্ষণ যে-মানুষটাকে দেখলুম নিজের কথা বলতে-বলতে দুঃখে ভেঙে পড়ছে, চোখে জল টলটল করছে, সেই মানুষটাই আবার দেখি হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল। সেই জলে-ভেজা চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠেছে তার। বাবাকে শাসিয়ে বলল, 'তুমি যদি সত্যি করে না-বলো এ-তরোয়াল তুমি কোথা থেকে পেলে, তবে সামনে চেয়ে দেখো আমার লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। হুকুম পেলেই ওরা তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে।'

হ্যাঁ, সত্যিই! সামনে চেয়ে দেখি, অন্তত পঁচিশটা ঘোড়ার ওপর আরও পঁচিশজন দস্যু অস্ত্র উঁচিয়ে বসে আছে। বাবাও তাদের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর দস্যু-সর্দারকে নরম গলায় বলল, 'আপনি আমার অতিথি। আপনাকে মিথ্যে আমি বলছি না। ওই তরোয়াল আমি মরুর বুক থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

দস্যুসর্দার এবার যেন ভয়ংকর রেগে গেল। চিৎকার করে তার দলের লোকদের হুকুম করল, 'আগুন লাগাও।' 'না--আ-আ।' ওরা ছুটে আসার আগেই রুবানা-বোন দু-হাত আড়াল করে ওদের পথ আটকাল। সর্দার ধমকে উঠল, 'রুবানা!'

তবু রুবানা-বোন নিশ্চল।

দস্যুরা এগোতে পারল না। আমি এগিয়ে গেলুম দস্যু-সর্দারের কাছে। আমি বললুম, 'সর্দার, আপনারা দলে অনেক। আমাদের আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে আপনাদের কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু সর্দার, দস্যু বলেই কি আপনি আমার বাবাকে বিশ্বাস করবেন না? দস্যুরা কি শুধু নির্দয়ই হবে? দস্যুরা কি শুধু মানুষের প্রাণই নেবে? তাদের ধন-সম্পত্তি লুঠ করবে? ঘরে আগুন দেবে? তবে শুনুন সর্দার, আমার বাবা মিথ্যে বলেন না। আমি জানি, ওই তরোয়াল বাবা কুড়িয়ে পেয়েছেন। সেই সঙ্গে আর একটা কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই চমকে উঠবেন, ওই তরোয়ালের সঙ্গে বাবা আমাকেও ওই মরুর বুক থেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন।'

বুঝতেই পারছ এ-কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মা, আমার বাবার মনের অবস্থা কী হয়েছিল। সে-কথা শুনে দস্যু-সর্দারের গলার স্বর নিমেষের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেছল! আর রুবানা-বোনের চোখ দুটি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে ছিল।

কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা একটুক্ষণের জন্য। কেননা, হঠাৎ আমার মা ছুটে এসেছিল আমার কাছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'অমন কথা বলিস না আবু, অমন কথা বলিস না। তুই যে আমার বুকের মানিক!' বলে মা কেঁদে উঠল।

মাকে জড়িয়ে আমিও কেঁদে ফেললুম। কাঁদতে-কাঁদতে বললুম, 'জানি মা, জানি আমি তোমাদের বুকের মানিক। জানি মা, তুমি আর বাবা আমাকে মরুর বুক থেকে তুলে এনে আমার প্রাণ দিয়েছ। তোমাদের সব আদর ঢেলে, তোমাদের সব ভালোবাসা দিয়ে আমাকে বড়ো করে তুলেছ। মাগো, তোমরা আমাকে কোনোদিনই বুঝতে দাওনি, আমি তোমাদের পর। কোনোদিনই তোমরা মনে করোনি, আমি তোমাদের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। তাই আমি যখন কেঁদেছি, তোমরা আমায় কোলে তুলে নিয়েছ। আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছ। তোমাদের কাছে কিছু না চাইতেই তোমরা আমায় সব কিছু দিয়েছ। মাগো, তোমরা যদি আমায় কুড়িয়ে না-পেতে, তবে যে আমি কোনোদিনই তোমাকে মা বলে ডাকতে পারতুম না। কোনোদিনই যে বাবাকে আমি আপন বলে চিনতে পারতুম

না। তোমাদের মতো এমন মানুষের ঘরে যে আগুন লাগাতে চায়, তাকে আমি কী বলে ডাকি! বলবে মা, তাকে আমি কী বলে ডাকব?' বলে আমি ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠলুম।

বাবা আমার এতক্ষণ বোবার মতো চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিল। যেন পাথর। আমায় এমন করে কাঁদতে দেখে এবার আমার পাশে এসে দাঁড়াল বাবা!



দস্যুসর্দার এবার যেন ভয়ংকর রেগে গেল।

আমার মাথায় হাত রাখল। বলল, 'কেঁদো না আবু। আজ তো আমার আনন্দের দিন। আজ তুমি তোমার আপনজনকে ফিরে পেয়েছ! আবু, আমরা তোমার পর। আমরা তোমাকে কুড়িয়ে পেয়ে শুধু বড়ো করেছি, এর বেশি আর কী।' বলতে-বলতে আমি দেখলুম আমার বাবারও দু-চোখ ছলছল করছে।

চোখের জল সামলে নিয়ে বাবা এগিয়ে গেল দস্যু-সর্দারের দিকে। তারপর বলল, 'সর্দার, আবু যা বলেছে সব সত্যি! ও আমার কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে। কিন্তু বিশ্বাস করুন সর্দার আপনার ছেলেকে আমরা কোনোদিন অযত্ন করিনি। নিজের ছেলের মতো গড়ে তুলেছি। সর্দার, ওকে আমরা কোনোদিনই বুঝতে দিইনি ও আমাদের কেউ না। ও জেনেছে, ও যাকে মা বলে ডেকেছে, সে তারই মা। আমি ওর বাবা। আমি ওকে সাহসী হতে শিখিয়েছি সর্দার। বিপদ মাথায় নিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছি। শিখিয়েছি, দুঃখকে কেমন করে জয় করতে হয়। আর ওর মা তার মনের সব স্নেহ ঢেলে দিয়ে ওকে সুন্দর করেছে। সর্দার, আবু আমাদের প্রাণ, আবু আমাদের আলো।' বাবার গলা যেন আর কথা বলতে পারল না। একটু থামল বাবা। তারপর আবার বলল, 'সর্দার, আপনার

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছেলেকে আপনি নিয়ে যাবেন, এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! আবু যাবে বইকি তার আপনজনের কাছে। কিন্তু সর্দার, বিশ্বাস করুন, দস্যুগিরি করে আপনার ছেলেকে আমরা ছিনিয়ে আনিনি। সর্দার, আপনার ছেলেকে আমরা চুরি করিনি।'

আমি দেখলুম, বাবার কথা শুনতে শুনতে সর্দার যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাবা এবার আমার চিবুকটি হাতে রেখে বলল, 'আবু তোমার আপনজন তোমায় নিতে এসেছেন। আবু, তুমি ওঁর সঙ্গে ফিরে যাও! যেমন করে তুমি আমাদের ভালোবেসেছ, তেমন করে ওঁকে ভালোবাসবে। যেমন করে আমাদের কথা শুনেছ তুমি, তেমনি করে ওঁকে মান্য করবে। আবু, ফিরে যাও! তুমি এখন আর একা নও। ওই তোমার দিদি, তোমার বোন রুবানা। দিদির সঙ্গে আনন্দে, খুশিতে হেসে-খেলে তুমি সুখে থাকবে। এর বেশি আমরা আর কী চাই!' বাবার কথা আবার থেমে গেল। আমি বাবার বুকে মাথা রাখলুম।

এতক্ষণ যে-সর্দার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এতক্ষণ যে-সর্দারের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছিল, হাতের তরোয়াল সূর্যের পড়ন্ত আলোয় ঝলসে উঠছিল, এখন সেই দস্যু-সর্দারের মুখখানা আমাকে দেখতে-দেখতে কেমন যেন থমথম করছে।

আমি বাবার বুকের থেকে মুখ তুলে মায়ের কাছে গেলুম। মায়ের চোখের জল মুছতে-মুছতে বললুম, 'মা, দুঃখ কোরো না। আমি যাচ্ছি মা। আবু তার মাকে ভুলবে না কোনোদিন, কোনোদিনও না।'

মা আমার কপালে চুমু খেয়ে তবুও কাঁদল।

এবার আমি এগিয়ে গেলুম দস্যু-সর্দারের কাছে। বললুম, 'কোথায় যেতে হবে আমাকে? কোথায় নিয়ে যাবেন? চলুন।'

আমার কথা শেষ হল না। হঠাৎ সেই দস্যু-সর্দার যেন চাপা-কান্নায় গুমরে উঠল। যেন কতদিন জমাট মেঘের মতো সেই কান্না একসঙ্গে আকাশ ভেঙে অঝোরে ঝরে পড়তে চাইছে। সর্দার আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আমি বুঝতে পারছি, প্রচণ্ড উত্তেজনায় সর্দারের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে সর্দার যে কেমন করে তার বুকের সব ভালোবাসা আমাকে উজাড় করে দেবে, বুঝি ভেবে পাচ্ছে না। মুখের কথা যেন মুখেই হারিয়ে গেছে সর্দারের। শুধু চোখের জল উপচে পড়ে, আমার কপাল ছুঁয়ে বার-বার যেন বলছে, 'এতদিন তুই কোথা ছিলি, কোথা ছিলি আবু? তুই যে আমার বুকের ধন, তুই আমার স্বপ্নের রাজপুত্তুর। তোর জন্য এতদিন ধরে মনের ভেতর শুধুই কেঁদেছি আমি। বল, বল, আমাকে একবার বাবা বল। একটিবার আমায় বাবা বলে ডাক!'

সর্দারের সেই কান্না-ভেজা মুখখানা একদৃষ্টে অবাক হয়ে দেখছিলুম আমি। দেখতে-দেখতে আমারও চোখ ছলছলিয়ে উঠল। আমার মুখ দিয়ে আপনা-আপনি অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে এল, 'বাবা!'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কী বলব, সঙ্গে-সঙ্গে কী জোরে হেসে উঠল সর্দার! হাসির সঙ্গে আর চোখের জলের সঙ্গে সর্দারের সেই ভীষণ গম্ভীর মুখখানা কেমন যেন একটি ছোট্ট ছেলের মতো আনন্দে উছলে উঠল। আমায় দু-হাত দিয়ে কোলে তুলে নিল সর্দার। তারপর প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে হেঁকে উঠল, 'আমার ছেলেকে আমি ফিরে পেয়েছি! আমার ছেলেকে আমি ফিরে পেয়েছি।' সর্দার যেন পাগল হয়ে গেল!

রুবানা-বোন এতক্ষণ বোবার মতো অবাক চোখে চেয়ে-চেয়ে দেখছিল সব। এবার তার চোখেও জল গড়াল। শুধু কাঁদতে-কাঁদতে থমকে গেছে আমার মা। রুবানা-বোন আমার মায়ের কাছে এগিয়ে গেল। বলল, 'মন খারাপ কোরো না মা। আবু তোমায় মা বলে ডেকেছে। তুমি আমায় মেয়ে বলে ডেকো।'

বাবা এগিয়ে গেল সর্দারের কাছে। বলল, 'সর্দার, আপনি আপনার ছেলে ফিরে পেয়েছেন। এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে! আপনি এবার ছেলে নিয়ে ঘরে যান। তাকে নিয়ে আপনার স্বপ্নের রাজত্ব গড়ে তুলুন। এবার আমাদের ছুটি।'

সর্দার আমাকে তার কোল থেকে নামাল। নামিয়ে বাবার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'বন্ধু আমি তোমাদের চিনতে পারিনি। আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো। কে বলেছে, তোমাদের ছুটি। কে বলেছে, আবু আমার ছেলে। যারা তাকে মরুর বুক থেকে তুলে এনে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, যারা তাকে তাদের বুকের রক্ত দিয়ে বড়ো করে তুলেছে, তারা তার আপন, না আমি? আমি দস্যু! আমি হিংস্র! আমি নিষ্ঠুর। বন্ধু, ছুটি তোমাদের না, ছুটি আমার। আবু তোমাদের ছেলে। আবু তোমাদেরই থাকবে। আবুকে আমি নিয়ে যেতে আসিনি। আবুকে তোমাদের কাছে দিয়ে যেতে এসেছি।'

আমরা সবাই কেমন থ হয়ে গেলুম সর্দারের এই কথা শুনে।

তারপর সর্দার আবার বলল, 'আর একটি জিনিস তোমাদের কাছে আমি রেখে যেতে চাই, তোমরা কি তা রাখবে?'

আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম তার মুখের দিকে। ভাবলুম, কী জিনিসের কথা বলছে সর্দার!

সর্দার রুবানা-বোনের দিকে চাইল। তাকে ডাকল, 'রুবানা!' সর্দারের এ-ডাকে সে-হুংকার আর নেই। ভারি মিষ্টি, ভারি নরম।

রুবানা-বোন এগিয়ে গেল সর্দারের দিকে। সর্দার তার মাথায় হাত রাখল। রুবানা মুখ তুলে চাইল বাবার দিকে। সর্দার বলল, 'এই আমার মেয়ে। আমি কোনোদিনও পারিনি আমার মেয়ের মনটি আমার সব আদর দিয়ে ভরিয়ে তুলতে। আমি পারিনি আমার বুকের যত্নে তাকে গড়ে তুলতে। আমি দস্যু। তোমরাই বলো, এই একটা হিংস্র দস্যুর আস্তানায় এমন একটি গোলাপ-কুঁড়ির মতো মেয়ে, সে কি ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারে?' বলতে-বলতে চুপ করে গেল দস্যু-সর্দার। তারপর মেয়ের হাতটি ধরে আমার মায়ের কাছে গেল। মাকে বলল, 'বোন, আবুকে যেমন তোমরা

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

বুকে-পিঠে করে গড়ে তুলেছ, আবুকে যেমন মনে করেছ তোমাদেরই ছেলে, তেমনি আমার মেয়েও আজ থেকে তোমাদেরই। তোমাদেরই হাতে আমার রুবানাকে তুলে দিয়ে গেলুম। তোমরা কি তাকে আপন করে নিতে পারবে না?'

মা সে-কথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে বোনকে জড়িয়ে ধরল। রুবানা-বোন মাকে জড়িয়ে ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠে ডাক দিল, 'মা!'

মা-ও যেন বুকের সব আদর উজাড় করে ডেকে উঠল, 'রুবানা।'

'আঃ!' দীর্ঘশ্বাস পড়ল সর্দারের। রুবানা-বোনের মা-ডাকার সঙ্গে-সঙ্গে তার যেন মনের সব বোঝা হালকা হয়ে গেল।

'আবু!' সর্দার এবার ডাকল আমায়। আমি এগিয়ে গেলুম। সর্দার তার খাপে ঢাকা সেই তরোয়ালটি বার করল। আমার হাতে তুলে দিল। বলল, 'আবু, এই তরোয়াল তোমারই। আমি তোমায় ফিরিয়ে দিলুম। এ-তোমার বীরত্বের পুরস্কার। আমি জানি, এই তরোয়াল নিয়ে তুমিই পারবে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে, তাকে জয় করতে। তারপর রুবানা-বোনের কাছে এগিয়ে গেল সর্দার। বলল, 'এই নাও তোমার সেই হার। এই হারই তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছে তোমার ভাইকে। রুবানা, আমি এবার যাব। যাবার আগে বলে যাব, তোমার ভাইকে নিয়ে তুমি আনন্দে থাকো। তোমার খুশি দিয়ে, তুমি এ-বাড়ি ভরিয়ে রাখো। রুবানা, তোমরা আরও সুন্দর হও।' তারপর বাবাকে বলল, 'বন্ধু, এবার আমি যাই।' মাকে বলল 'বোন, বিদায়।' বলতে-বলতে দস্যু-সর্দার হাত তুলল। রুবানা-বোনের হাত ধরে আমি ছুটে গেলুম তার কাছে। আমরা দুজনে তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে মাথা নোয়ালুম। আমাদের মাথায় হাত রাখল দস্যু-সর্দার, তারপর ছুটে ঘরের বাইরে চলে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে ঘোড়া। উঠে পড়ল তার পিঠে। ঘোড়া পা ফেলল। বাইরে অপেক্ষা করছিল পঁচিশটা ঘোড়ার পিঠে আরও পঁচিশজন দস্যু। তারাও চলল সর্দারের পেছনে-পেছনে।

দূরে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সোনালি বালির ওপর। সর্দারের ঘোড়া বালির গভীরে, আরও গভীরে হারিয়ে যায় একটু-একটু করে। আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম। চেয়ে রইলুম সেই পথের দিকে। তারপর কেঁদে ফেললুম আমরা দুজনে, আমি আর আমার বোন রুবানা।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ইতিমিচি সাহেব

খুব সম্প্রতি ইতিমিচিসাহেব গান ছেড়েছেন। কালামাটা শহরে গলা-আঁটা কোট পরে তিনি যখন তিন হাজার গান-পাগল লোকের সামনে শেষ গানটি গাইলেন, তখন সমবেত শ্রোতা 'ওহো-ওহো' করতে করতে চোখের জলে ভিজে গেল। অবশ্য এ-কথা বলা খুবই শক্ত যে, শ্রোতারা তাঁর গান শুনে চোখের জলে ভাসল না, তিনি গান ছাড়লেন বলে তাদের এ-কান্না।

ইতিমিচিসাহেব গাইয়ে কোনোদিনই ছিলেন না। ইতিপূর্বে তিনি সার্কাস পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। সাইকেলে খেলা-দেখানোর চাকরি নিয়ে নানান দেশ ঘুরতে-ঘুরতে তিনি যখন এ-দেশে এলেন, তখনই তাঁর মাথায় গান চাগাড় দিয়ে উঠল। অবশ্য তার আগে খেলা দেখাতে গিয়ে, তিন দেশে, তিনবার তিনি সাইকেল থেকে ডিগবাজি খেয়ে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচেছেন। কিন্তু শেষবার যখন বেটাল হয়ে চিতপাত হলেন, তখনই তাঁর আক্কেল গুড়ুম। তাঁর জোড়া-পা খোঁড়া হল এবং তিনি চার মাস খোঁড়া-পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে পড়ে রইলেন।

ইতিমিচিসাহেব যে কোন দেশের লোক এ-কথা কেউ জানে না। তিনিও কাউকে জানতে দেন না। হঠাৎ বুঝি একবার তিনি কবুল করেছিলেন, দেশ তো একটাই, আর সে-দেশের নাম, তামাম দুনিয়া এবং তখনই তিনি ভূত দেখলেন। না, না, ঠিক বলা হল না, তিনি ভূতের নাম শুনলেন। শুনলেন, এই দুনিয়ায় মানুষের সঙ্গে যেমন গোরু-ভেড়া বাস করে, তেমনি বাস করে ভূত/ আশ্চর্য কথা এই, ইতিমিচিসাহেব তো আর কচি-খোকাটি নন, অথচ ভদ্রলোক ভূতের নাম শুনলেন এই প্রথম/ শুনতে-শুনতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তিনি শুনলেন, ভূত দেখা যায়, অথচ ধরা যায় না। কথা বলে, অথচ শোনা যায় না। তিনি আরও শুনলেন, ভূত এমন একটি চিজ তার সুনজরে পড়লে দেখে কে/ রকেট ছুড়ে চাঁদে যেতে হবে না/ হুকুম করলেই হল, ভূত নিজেই চাঁদটিকে বগলদাবায় তুলে এনে তোমার হাতে সঁপে দেবে। আর যদি ভূত একবার চটিতং, তবে হাজারটা হ্যাপা/ তখন তিনি ঘুমের ঘোরে নাকে চিমটি কাটবেন। নয়তো পেটে কাতুকুতু দেবেন। আর তা নইলে মুখে হেঁচে দেবেন। ইস/

ঠিক এই কারণেই ইতিমিচিসাহেব গান ছাড়লেন এবং তিনি ঠিক করলেন, ভূত ধরবেন। চাঁদ তাঁর চাই না। তিনি ভূতের সঙ্গে দোস্তি করে তার পিঠে চেপে ঘুরে-ঘুরে হাওয়া খাবেন।

অবশ্য একদিক থেকে ইতিমিচিসাহেবের খুব বাঁচোয়া, পিছু টানের, বালাই নেই। মানুষটি এক্কেবারে একা। বউ নেই, ছেলেপুলে নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। যাকে বলে ঝাড়া হাত-পা। বিয়ে অবিশ্যি করেছিলেন তিনি, কিন্তু অকালেই যে বউটি তাঁকে ছেড়ে স্বপ্নে চলে যাবে, এ-কথা তিনি আগে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি। শুধু যাবার সময় তার শেষ ইচ্ছেটি জানিয়ে গেছে, 'আমি

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

মরলে তুমি কেঁদো না গো/ তাতে আমার দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। তারচেয়ে বরং আমি মরে গেলে তুমি পদ্য লেখা শুরু কোরো। যত লিখবে, তত নাম হবে। তাতেই আমার শান্তি।'

জন্মে ইস্তক পদ্য লেখার কথা ইতিমিচিসাহেবের মগজে কোনোদিনই ঠাঁই পায়নি। পদ্য যে কেমন, কী করে লিখতে হয় কস্মিনকালেও এ-কথা তিনি ভাবেননি। কিন্তু ভদ্রলোক করেন কী/ আহা/ যতই হোক মরণকালে বউ-এর ইচ্ছা, সে কি আর ফেলা যায়/

সুতরাং পদ্য লিখতে-লিখতে ইতিমিচিসাহেবের ফর্সা চামড়া হলদে হয়েছে। গোঁফ ঝুলেছে, দাড়ি গজিয়েছে। চাই কি, মাথার ঠিক মাঝ-বরাবর একটি টাক পড়ব-পড়ব করেছে। শেষকালে অনেক কসরত করতে-করতে একটি পদ্যের একটি লাইন তিনি লিখে ফেললেন। লিখে, তাঁর সে কী নিজের মনে মুচকি-মুচকি হাসি/ আনন্দে নিজেই 'ওহো' করে উঠলেন। তারপর নাকের ভেতর খড়কে গুঁজে হাঁচতে-হাঁচতে পড়তে লাগলেন/ যাই বলো আর তাই বলো পদ্য লিখে একটু হাঁচতে না-পারলে যেন লেখাটা জমে ওঠে না/

হাঁচির আরামটা ঠায় তিনদিন নাকের ভেতর সুড়সুড়ি দিল। আর সে এমনই সুড়সুড়ি যে, শেষমেশ পদ্য লেখা তাঁর মাথায় উঠল। সুড়সুড়ির ঠেলায় তিনি সুড়সুড় করে খাতা-কলম গুটিয়ে রেখে শুধু হাসতেই লাগলেন। হাসতে-হাসতে বেদম হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'ঘাট হয়েছে বাবা, আর কাজ নেই। এক লাইন লিখেই যখন সুড়সুড়িনির এত ঠেলা, তবে না-জানি দশ লাইন লিখলে কী হয়/' এই কথা ভেবেই তিনি পদ্য লেখায় ক্ষান্তি দিলেন।

কিন্তু থাক সেসব কথা। বলতে গেলে আরব্য রজনীর আর এক সহস্র গল্প-কাহিনি লেখা হয়ে যাবে। তবে কিনা শেষকালে যে ইতিমিচিসাহেব একটি আস্ত ভূত-পাগল হয়ে উঠবেন, এই কথাটা ভাবলেই গা শিরশির করে ওঠে। যেন বিশ্বাসই করতে চায় না মন। তা বাপু বিশ্বাস না করলে আমি আর কী করতে পারি/ কথাটা তো চেপে রাখা যায় না/ কেননা, ব্যাপারটা তো আর হেঁজিপেঁজি বলে উড়িয়ে দেবার নয়, একেবারে স্বয়ং ভূতকে নিয়ে অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা/ মশাই, পাগল বলে পাগল/ শেষকালে ভূতের খোঁজে তিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনই দিয়ে বসলেন। বিজ্ঞাপনে বেরুল

.

একটি ছোটোখাটো ভূত অথবা মোটাসোটা ভূত অথবা ঢেঙা-বেঁটে ভূতের সঙ্গে দোস্তি করিতে চাই। আমার দোস্তি নকল না বিকল এটি পরখ করিবার জন্য আমার ভূত-দোস্ত প্রথমেই আমার নাকে চিমটি কাটিতে পারেন, কিছু বলিব না। পেটে কাতুকুতু দিতে পারেন, হাসিব না। মুখে ফ্যাঁচ করিয়া হাঁচিয়া দিতে পারেন, নাক সিঁটকাইব না। এবং এইসব কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পারিশ্রমিক দিতেও অপ্রস্তুত থাকিব না। সত্বর যোগাযোগ করিলে, কাজটিও চটপট হইতে পারে।

সত্যি কথা বলতে কী, খবরের কাগজে এমন ভূতের বিজ্ঞাপন দেখে অদ্ভুত সেই লোকটির খোঁজে কত লোকই না হা-পিত্যেশ করেছে। কিন্তু লোকটির হদিশই কেউ করতে পারল না। কেননা,

ইতিমিচিসাহেব বিজ্ঞাপন করলেন বটে, কিন্তু কাগজে তাঁর নাম-ঠিকানা দিতেই ভুলে গেলেন। সুতরাং কারো-কারো ভূতের খোঁজ জানা থাকলেও, তাঁকে সেই খোঁজ দিতে কেউ এল না এবং কাউকে তাঁর খোঁজে আসতে না দেখে, ইতিমিচিসাহেব নিজেই কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। অথচ তাঁর নিজেরও একবার খেয়াল হল না, 'হায়/ হায়/ বিজ্ঞাপনে এই ঠিকে ভুলটা করে বসেছি/'

আহা/ ভদ্রলোকের বড্ড আশা ছিল, খবরের কাগজে প্রথম যেদিন বিজ্ঞাপন বেরুবে, সেইদিনই তিনি ভূত দেখবেন। দেখতে দেখতে একটি পছন্দমতো ভূতকে তিনি সঙ্গী করবেন। তারপর তার পিঠে চেপে হাওয়া খাবেন। কিন্তু সব গুবলেট হয়ে গেল। তিনি মনে মনে বড্ড যাতনা পেলেন। যাতনাটা যখন বড্ড হতে হতে আরও বড্ড হল, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। 'কী করা যায়, কী করা যায়', ভাবতে-ভাবতে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে লাগলেন। এমন করে মাথা খুঁড়লে যে মাথাটি ফেটে-ফুটে ফুটি-ভাটা হতে পারে, এ-কথাটি তিনি ভাবলেন না। তিনি খুঁড়েই চললেন। মাথা যখন তাঁর ঠিক ফাটব-ফাটব করছে, তখনই তাঁর দরজায় ঠেলা পড়ল। দেওয়াল ছেড়ে তিনি দরজায় ছুটে গেলেন। দরজা খুলে দেখেন, একজন পোস্টম্যান। পোস্টম্যান হাতটি এগিয়ে বলল, 'চিঠি'। ইতিমিচিসাহেবের তর সইল না। ধাঁ করে পোস্টম্যানের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে আনন্দে খলখলিয়ে বলে উঠলেন, ভূতের চিঠি, ভূতের চিঠি।'

পোস্টম্যানের তো চক্ষু কপালে। চিঠি-ফিটি ফেলে দে-লম্বা/

ইতিমিচিসাহেব ঝটপট চিঠির খাম খুলে ফেলে চটপট পড়তে লাগলেন .

প্রিয় বিজ্ঞাপনদাতা মহাশয়,

খবরের কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে আপনার কোনো ঠিকানা না থাকায়, আপনার সহিত যোগাযোগে বিলম্ব ঘটিল। অনেক হাঁটাহাঁটি, খাটাখাটি ও লাঠালাঠির পর আপনার ঠিকানাটি দৈবক্রমে জোগাড় করিতে পারিয়াছি। আপনি ভূতের সহিত দোস্তি করিতে চান জানিয়া যারপরনাই উৎসাহিত হইয়াছি। শুনিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবেন, আমরা ভূতের কারবার করিয়া থাকি। ভূত সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের প্রভূত অভিজ্ঞতা। আপনার কী ধরনের ভূতের প্রয়োজন সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার জন্য আমাদের কারবারস্থলে আপনাকে একটি ইন্টারভিউ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। আগামী রবিবার সকাল দশটায় অতি অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন। মনে রাখিবেন, শনি-মঙ্গলবারে কোনো ইন্টারভিউ আমরা নিই না। কারণ ওইদিনে ভূতেদের মেজাজের ঠিক থাকে না। কারণে, অকারণে ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং একবার চাপিলে নামিতে চায় না। যাহা হউক, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ধন্যবাদ,

ইতি

নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি

চিঠি পেয়ে ইতিমিচিসাহেব আহ্লাদে আট দুগুণে ষোলোখানা হয়ে নাচলেন, হাসলেন, চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করলেন। তারপর যথাদিনে তিনি যথাস্থানে ছুটলেন।

তাঁকে বেশি কষ্ট করতে হল না। ঠিকানাটা তাঁকে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিল। এবং দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, পাঁচ-পাঁচজন লোক তাঁর জন্যে ঘরের মধ্যে হাঁ করে বসে আছেন। ঢুকেই তিনি মধ্যিখানে যে লোকটিকে দেখলেন, মনে হল, ইনিই দলের কর্তা। কেননা, ইতিমিচিসাহেব ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে কর্তা-ব্যক্তিটি চোখের চশমা খুলে ফেলতেই, তার দেখাদেখি সবাই চশমা খুলে ফেলল। কর্তা-ব্যক্তিটি ইতিমিচিসাহেবের মুখের দিকে কটমট করে তাকাতে, সবাই কটমট করে চাইল। তারপর কর্তা-ব্যক্তিটি আচমকা দাঁত বার করে হি-হি করে হেসে উঠলেন। অমনি সবাই দাঁত বার করল, হি-হি করে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি শুনে ইতিমিচিসাহেব হকচকিয়ে গেলেন। এবং অনেকটা হাঁদার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন তাদের মুখের দিকে। তারপর তাঁর নিজেরই হাসি পেয়ে গেল। তিনিও হেসে ফেললেন। হি-হি করে না হেসে তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। একঘর অচেনা লোকের সামনে, এভাবে হাসাটা উচিত, না অনুচিত, সঠিক, না বেঠিক এ-সব কথা তিনি না-ভেবেই হো-হো করতে লাগলেন। হঠাৎ কর্তা-ব্যক্তিটির মুখের হাসি দাঁতের ফাঁকে আটকে গেল। তিনি ভীষণরকম ধমক মেরে লাফিয়ে উঠলেন। ইতিমিচিসাহেব ধমক খেয়ে ভড়কে গেলেন। যাঃ বাবা/

কর্তা-ব্যক্তিটি তেমনি করে আবার ধমক মেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইন্টারভিউ দিতে এসে অমন হ্যা-হ্যা করে হেসে, নাচন-কোঁদন করতে আপনার লজ্জা করছে না?'

ইতিমিচিসাহেব কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিলেন, 'আপনারাও হাসলেন তো, তাই/'

কর্তা-ব্যক্তিটি তেমনি খ্যাঁকখেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের হাসির কারণটা জানা আছে?'

ইতিমিচিসাহেব চটপট উত্তর দিলেন, 'আছে বইকি/ হাসি পাচ্ছে বলেই তো হাসছেন।'

কর্তা-ব্যক্তিটি নাকের ভেতর দিয়ে ফোঁস করে একটা শব্দ বার করে বললেন, 'অতই সোজা/ এ কী মশাই রসগোল্লার হাঁড়ি। খিদে পাচ্ছে আর টপটপ করে গালে পুরছি। হাসি পেলে তো সবাই হাসে। কিন্তু শুনে রাখুন, হাসি পাচ্ছে না বলেই আমরা হাসছি।'

ইতিমিচিসাহেব একেবারে সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমারও বোধ হয় তাই। যতক্ষণ হাসি পাচ্ছিল, হাসিনি। যেই পেল না, হেসে ফেললুম।'

'চোপ/' হঠাৎ কর্তা-ব্যক্তিটি ভয়ংকরভাবে চোখ রাঙিয়ে কড়কে উঠলেন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ইতিমিচিসাহেব কড়কানিটা সামলাতে গিয়ে চমকে উঠলেন। অতগুলো লোকের সামনে ধমক খেয়ে চমকে ওঠাটা খুবই লজ্জার কথা/ সুতরাং তাঁর চমকানোর বহরটা কেউ দেখে ফেলল কি না, এইটা দেখার জন্যেই তিনি ঠারে-ঠারে এর-ওর মুখের দিকে উঁকি মারলেন। তিনি হঠাৎ দেখলেন, ওই পাঁচজনের একজন, ইতিমিচিসাহেবের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। লোকটা নিজের গালদুটো ফুলকো লুচির মতো ফুলিয়ে একেবারে ভোম্বলদাস হয়ে আছে। ইতিমিচিসাহেব তাকে দেখে তো অবাক। ও বাবা/ বলা নেই, কওয়া নেই লোকটা ইতিমিচিসাহেবেরই মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর গাল-ফোলা ভোম্বলদাসমশাই ফোলা গালের হাওয়াটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফুস-ফুস করে ছাড়তে-ছাড়তে মুখে এমন একটা বিটকেল শব্দ করে উঠল, যেন মনে হল, মাঝ-রাস্তায় এই মাত্তর একটা মিনি বাসের চাকা ফেটেছে/ ইতিমিচিসাহেবের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া/ তিনি ভীষণ আঁতকে উঠেছেন। আঁতকে উঠে সেই কর্তা-ব্যক্তিটির একেবারে কোলের ওপর হুমড়ি খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যে কর্তা-ব্যক্তিটি এতক্ষণ তিরিক্ষি মেজাজে ছিলেন টং, ইতিমিচিসাহেব তাঁর কোলের ওপর হুমড়ি খেতেই, তিনি কোলের দোলনা দুলিয়ে-দুলিয়ে গান ধরলেন। যেমন করে মায়েরা ছেলেকে ঘুম পাড়ান তেমনি করে, তেমনি সুরে .

দোল দোল দুলুনি,
যেন হাই তুলুনি,
দুধ খাবে এখুনি,
ঝোলে ঝাল মেখুনি।
মারব গাঁট্টা,
করলে ঠাট্টা/

ইতিমিচিসাহেব দুলতে-দুলতে গান শুনতে লাগলেন এবং বেশ খানিকটা অবাক হয়েই ভাবতে লাগলেন, 'এ কী রে বাবা, এ আবার কী ধরনের ইন্টারভিউ/'

কর্তা-ব্যক্তিটি যতই গান গাইছেন, অন্য সবাই ততই তালি বাজাচ্ছে। সেইসব দেখতে দেখতে ইতিমিচিসাহেবের হঠাৎ এমন সুড়সুড়ি লেগে গেল/ লাগল-লাগল একেবারে গোঁফের খাঁজে। ইতিমিচিসাহেব গোঁফটাকে খামচে ধরে চুলকাতে যাবেন কী, কর্তা-ব্যক্তিটি গান থামিয়ে তাঁর হাতটা ধরে ফেললেন। তারপর ইতিমিচিসাহেবের দাড়ির ভেতর আঙুল গলিয়ে আদর করলেন, 'ও আমার ফুলকপি রে, ওরে আমার বিশ্বনাথের—'

ইতিমিচিসাহেব আদরের ঠেলায় পাগল হলেন প্রায়। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'থামুন মশাই, আমার গোঁফ চুলকাচ্ছে।'

কর্তা-ব্যক্তিটি ইতিমিচিসাহেবের হাতটা তেমনি চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কতখানি?'

https://boierhut.com/fb

ইতিমিচিসাহেবের মেজাজ গেল বিগড়ে। বললেন, 'কতখানি কী মশাই/ ভীষণ চুলকাচ্ছে।'

তবু কর্তা-ব্যক্তিটি ইতিমিচিসাহেবের হাত ছাড়লেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'ভীষণটা কেমনতর? জলের মতন তরল, না, বরফের মতো ঠান্ডা?'

ইতিমিচিসাহেব আরও রেগে গেলেন। বললেন, 'কী সব আলতু-ফালতু বলছেন/'

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আলতু-ফালতু কত বড়ো?'

থাকতে না পেরে ইতিমিচিসাহেব বলে বসলেন, 'আপনার নাকটা যত বড়ো।'

'আমার নাকের ওজন ক- হাত, জানেন?'

''আপনার নাকটা কি মশাই মার্কিন কাপড় যে পাল্লা দিয়ে ওজন করে হাত দিয়ে মাপব? পাগলামির জায়গা পাননি। হাত ছাড়ুন, গোঁফ চুলকাই।'

অমনি একঘর লোকের মাথায় যেন বাজ পড়ল। একসঙ্গে সব কজন কর্তা-ব্যক্তিটিকে চিৎকার করে নালিশ করল, 'স্যার, আপনাকে পাগল বলল/'

কর্তা-ব্যক্তিটি অমনি ইতিমিচিসাহেবের দাড়ির ভেতর থেকে হাত সরিয়ে লম্বা গোঁফটা খচাং করে খামচে ধরলেন। তারপর তেড়েমেড়ে টানতে-টানতে বললেন, 'ইন্টারভিউ দিতে এসে পাগল বলা/'

একঘর লোক হই-হই করে উঠল। ইতিমিচিসাহেব গোঁফের টানে দাঁড়িয়ে উঠে, তিড়িং তিড়িং লাফাতে লাগলেন আর যন্ত্রণায় চেঁচাতে লাগলেন। এমন হাল হল, মনে হল, এই বুঝি তাঁর গোঁফজোড়া উপড়ে পড়ে। শেষে থাকতে না পেরে লোকটার পেটে ধাঁই করে এক ঢুঁ মারলেন। লোকটা যেই না ঢুঁ খাওয়া, আর দেখতে/ পলকে ইতিমিচিসাহেবের গোঁফ ছেড়ে, নিজের নাক টিপে বসে পড়লেন। অমনি সঙ্গে-সঙ্গে অন্য কজন হা হা করে উঠল। কর্তা-ব্যক্তিটির ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে চেঁচাতে লাগল, 'কী হয়েছে স্যার, কোথা লাগল স্যার, কী টিপব স্যার, কোথা টিপব স্যার?' ঢুঁ খেয়ে লোকটা যদিও বাঁচে, কিন্তু তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ন্যাকামির ঠেলায় ভদ্রলোকের প্রাণপাখিটি এই বুঝি খাঁচা ছেড়ে উড়ে পালায়।

প্রাণপাখি না পালালেও তাল বুঝে ইতিমিচিসাহেব পালাবার ফাঁক খুঁজতে লাগলেন। ফাঁক তিনি পেলেন এবং পালাতেও গেলেন। কিন্তু পারলেন না। কেননা, যাঁর পেটে তিনি ঢুঁ মারলেন, সেই কর্তা-ব্যক্তিটিই তাঁকে দেখে ফেললেন। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে নিজের নাক ছেড়ে ইতিমিচিসাহেবের প্যান্টের পকেটটা খপ করে খামচে ধরলেন। তারপর লেগে গেল টানাটানি।

এ-কথা কে না জানে, ইতিমিচিসাহেব এখন পালাবার যতই চেষ্টা করুন তিনি পালাতে পারছেন না। একঘর লোক যখন হুড়মুড় করে তাঁর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাঁকে পাকড়াও করে ফেলল, তখন তাঁর ট্যাঁ-ফুঁ করার ক্ষমতাই রইল না। তিনি বিনা বাধায় ধরা পড়লেন এবং ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন, তারপর ভাবতে লাগলেন, 'এরপর বোধ হয় তাঁর গর্দান যাবে/'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

তাঁর গর্দান অবিশ্যি গেল না। কিন্তু সেই কর্তা-ব্যক্তিটি যে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, সে কথা বোঝা গেল/ লোকটার মুখখানা দেখেই তো ইতিমিচিসাহেবের চক্ষু কপালে/ তিনি যেন ফুঁসছেন/ সববশরীর থরথর করে কাঁপছে/ রক্ত-রাঙা চোখ দুটো তাঁর কটমট করছে/ লোকটা ঝট করে ইতিমিচিসাহেবের গলাটা খামচে ধরে বলে উঠলেন, 'আমার পেটে মারিস ঢুঁ—থু/ তোর মাথায় মারব গাঁট্টা—চোট্টা/'

চোট্টা বলতেই ইতিমিচিসাহেব তো ভীষণ খাপ্পা। তেড়ে-ফুঁড়ে বলে উঠলেন, 'খবরদার/ চোট্টা বললে থাপ্পড় মেরে গালে দোক্তা পুরে দেব।'

'দে/ দেখি কত ক্ষমতা/'

'দেবই তো/'

তারপর আবার ধস্তাধস্তি লেগে গেল। ধস্তাধস্তি করতে-করতে নিজেদের মধ্যে কথার তুবড়ি ছুটতে লাগল।

ইনি বলেন, 'তবে রে/'

উনি বলেন, 'কী করবি তুই/'

ইনি বলেন, 'আমায় চোট্টা বলা/'

উনি বলেন, 'আমার পেটে ঢুঁ মারা/'

'ধুত তেরি/' বলে, ধাঁ করে ইতিমিচিসাহেব গলার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইস্টুপিট, চোরাকারবারি করার জায়গা পাস না/ ভূতের লোভ দেখিয়ে আমায় ছিনতাই করতে চাস/ দেব ঠাস করে এক চড়। যত সব অসভ্য ছেলে/'

অসভ্য বলতে কর্তা-ব্যক্তিটি ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন। তিনি গলা ফাটালেন, 'কী, আমরা অসভ্য ছেলে/ কোলে বসিয়ে আদর করে গান শোনালুম, এই তার পুরস্কার/ এই তোর ঘাড় মটকালুম/'

ইতিমিচিসাহেবও ছাড়বার পাত্তর নন, তিনিও চেঁচালেন, 'এই তোর নাক কামড়ালুম/'

আবার শুরু হয়ে গেল চেল্লাচেল্লি।

ওদের ঝগড়াটা যখন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে, মুখ থাকতে যখন আবার হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল, তখন হল আর এক কাণ্ড। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে একজন ভদ্রলোক ঢুকলেন। তিনি ঢুকেই ধমক দিলেন, 'থামোশ, থামোশ।'

কেউ থামল না। তাঁর কথাটা কেউ কানেই নিল না।

তখন তিনি আবার হাঁকলেন, 'অর্ডার, অর্ডার।'

তাঁর ইংরিজি-হাঁক শুনে ঘরসুদ্ধ লোক চটপট শান্ত হয়ে গেল। ইতিমিচিসাহেব নতুন লোকটির দিকে তাকিয়ে অনেকটা ক্ষিপ্ত বাঘের মেসোর মতো চক্ষু রক্তবর্ণ করে হাঁপাতে লাগলেন। সেই

https://boierhut.com/fb

রক্ত-চক্ষুর ফাঁক দিয়ে ইতিমিচিসাহেব দেখলেন, নতুন এই লোকটির সারা গায়ে কালো রঙের জোববা ঝোলানো। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আঁটা একটা টুপি।



আই অ্যাম জজসাহেব।আই লাইক নো মারামারি।

তিনি ঘরের মাঝখানের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। তারপর আবার ইংরিজিতে বলতে শুরু করলেন, 'হোয়াট কাণ্ডকারখানা/ আই অ্যাম জজসাহেব। আই লাইক নো মারামারি। ডোনট ঘাবড়াও/ আই ডু সব ঠিকঠাক/'

জজসাহেরের ইংরিজি শুনে ইতিমিচিসাহেবের তো চক্ষুচড়কগাছ। তিনি তো সারা দুনিয়ায় ঘুরেছেন, কত ইংরিজি শুনেছেন, কত বলেছেন/ সুতরাং জজসাহেবের মুখে এই খিচুড়ি-মার্কা ইংরিজি শুনে তিনি বোমফাটার মতো হা-হা করে হেসে উঠলেন।

একঘর লোক সেই হাসি শুনে তো ভয়ে তটস্থ। এই রে, সববনাশ করেছে/ মাননীয় জজসাহেবের সামনে হাসছে/ নিশ্চয়ই এক্ষুনি লোকটার ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবে/ হবে কী, এই হল বলে/

জজসাহেব সত্যিই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই, হোয়াই আমার সামনে হাসি?'

ইতিমিচিসাহেব একটুও ভয় না-পেয়ে বলে ফেললেন, 'ইউ আর যে স্যার ইংরিজির কাঁসি/'

জজসাহেব বসে ছিলেন, তিড়িং করে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'হোয়াট, আই কাঁসি/ দেন ইউ আর একটি রাধাকেষ্টর বাঁশি।'

ইতিমিচিসাহেব তেমনি ঠান্ডা মাথায় বললেন, 'আপনি তা হলে স্যার বাঁশির ফুটো/'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

এবার জজসাহেব রেগে আগুন, তেলে বেগুন। রাগটা এমন সাংঘাতিক আকার ধারণ করল যে, জজসাহেবের মুখ দিয়ে আর কথা বেরয় না। কথা বলতে গিয়ে ''আই-আই'' করে তাপ্পি খেতে লাগলেন আর ইতিমিচিসাহেবের দিকে আঙুল উঁচিয়ে মুখ-চোখ লাল করে ফেললেন। আঁতে ঘা লেগেছে তো/ যতই হোক জজসাহেব বলে কথা। তাঁকে ফুটো বলা/

জজসাহেবের সেই রেগে কাঁই চেহারা দেখে ইতিমিচিসাহেব আরও হেসে উঠলেন। আর দেখতে, জজসাহেবও উত্তেজনায় ফটফট করতে লাগলেন। এই রে, এই বুঝি ফেটে পড়েন/ এক্ষুনি বুঝি মুচ্ছো যান/ মুখের কথা মুখে আটকে গিয়ে তাঁর যেন দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। জজসাহেবের উদবেগজনক অবস্থাটা দেখতে পেয়েই সেই কর্তা-ব্যক্তিটি জজসাহেবকে জাপটে ধরতেই জজসাহেব সিধে বাংলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লোকটার নাম কী রে?'

'ইতিমিচি।'

'লোকটার বাড়ি কোথা রে?'

'ধাপার মাঠ।'

'লোকটা শোয় কোথা রে?'

'চিড়িয়াখানায়।'

'লোকটা খায় কোথা রে?'

'স্পেশাল বাসের ছাতে।'

এই না-শুনে জজসাহেব নিজের জিবটি একবার বার করেন, আবার মুখের ভেতর টেনে নেন। আবার বার করেন, আবার টানেন। পাঁচবার এমনি করে জিব দেখিয়ে, জিব ঢুকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন। করতে-করতে জজসাহেবের মুখখানা ভয়ে চ্যাপটা হয়ে গেল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লোকটা ভূত রে/' বলেই চৈতন্য হারালেন।

অমনি সবাই সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ে ইতিমিচিসাহেবের দিকে আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ভূত/ ভূত/'

ইতিমিচিসাহেব ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন।

'ভূত/ ভূত/'

ইতিমিচিসাহেবের চোখ দুটো ভূতের মতো চাকা-চাকা হয়ে গেল।

'ভূত/ ভূত/'

ইতিমিচিসাহেব আঁতকে উঠলেন।

'ভূত/ ভূত/'

ইতিমিচিসাহেব যতবারই ভাববার চেষ্টা করলেন, তিনি ভূত না, ততবারই লোকগুলো তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠছে, 'ভূত/ ভূত/'

https://boierhut.com/fb

ইতিমিচিসাহেবের কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। হঠাৎ যেন তাঁর বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। ভূত যে কী, তা তিনি আগে দেখেননি বলে তাঁর মনে হল, হয়তো-বা হবে তিনিও একটি ভূত/ তাঁর মনে হল, তিনি বোধ হয় এখন ভূতের মতোই ভাবছেন। তিনি হেসে উঠলেন। ভাবলেন, ভূত বোধ হয় এমনি করেই হাসে। তিনি নাচলেন। তাঁর হাত-পাগুলো কিলবিল করে উঠল। তিনি হাত-পা ছুড়ে চিৎকার শুরু করে দিলেন, হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ/ আপাতত তিনি যেন সতি-সত্যি ভূত হয়ে গেলেন। তাই না দেখে ঘরসুদ্ধ লোক, ভয়ে মারল হাঁক, 'ভূত/ ভূত/'

ইতিমিচিসাহেব ছাড়লেন ডাক, 'আমি ভূত/ আমি তোদের পেট খামচাব, পিলে ফাটাব, নাকের ভেতর লঙ্কা গুঁজে দেব/'

আর যায় কোথা/ চিৎকার-চেঁচামেচিতে হঠাৎ জজসাহেবের চৈতন্য ফিরে এসেছে। 'ওরে বাপ রে, মা রে' বলে দিলেন ছুট। ছুটতে-ছুটতে চেঁচালেন, 'ঘরে শেকল এঁটে ভূতটাকে আটকে রাখ, নইলে ঘাড় মটকাবে/'

অমনি সবাই পড়িমরি ঘর থেকে দুমদাম বেরিয়ে পড়ে, বাইরে থেকে শেকল তুলে, ইতিমিচিসাহেবকে বন্দি করে ফেলল। ইতিমিচিসাহেব ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে ধাঁই-ধপাধপ ঘরের দোরে ধাক্কা মারতে লাগলেন, আর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন।

এখন তিনি খুবই ঘাবড়ে গেলেন। কেননা, ভূতের খোঁজ নিতে এসে তিনি নিজেই এখন ভূত হয়ে ধরা পড়েছেন। একেই বলে কপাল/ অবিশ্যি তিনি যদি জ্যোতিষঠাকুর হতেন তবে নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ আগেই জেনে ফেলতেন/ যাকগে যাক, সে যা হবার তাই হয়েছে। কিন্তু এখন তিনি ঘর-বন্দি হয়ে কী করেন। তিনি বন্দি-ঘরে হাঁপিয়ে উঠলেন। একবার ঘরের দোর ঠেলেন। একবার জানলায় কান পাতেন। টেবিলের ওপর লাফিয়ে ওঠেন। চেয়ার টানেন। মাটির ওপর শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি খান। কিছুতেই কিছু হল না। শেষে তাঁর খিদে পেয়ে গেল। এবং তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দরজা খোলো, আমার খিদে পেয়েছে।'

কোনো সাড়া নেই, শব্দও নেই। কারো রা-ও নেই, ফিসফাসও নেই। তিনি বুঝলেন, তাঁকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে সবাই কেটে পড়েছে/ তখন তাঁর হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। কিন্তু তিনি কাঁদলেন না। ভাবলেন, কাঁদাটা কি ঠিক হবে/ একটা এত বড়ো সমর্থ-ভূত ঘরের মধ্যে কাঁদছে, এটা শুনলেই বা লোকে বলবে কী। সুতরাং তিনি না-কেঁদে ঘরের মধ্যে নাচতে-নাচতে হাসতে লাগলেন।

কতক্ষণ তিনি নাচানাচি আর হাসাহাসি করলেন তিনি নিজেই জানেন না। তিনি শুধু মালুম পেলেন তাঁর খিদেটা বেড়েই যাচ্ছে। অগত্যা তিনি থামলেন এবং শিউরে উঠলেন। তিনি যেন হঠাৎ শুনতে পেলেন ফুটফাট শব্দ। তিনি কান খাড়া করলেন। শব্দটা আবার শুনতে পেলেন। তিনি

দরজার দিকে চমকে তাকালেন। কেউ বুঝি দরজা খুলছে/ তিনি ঝুপ করে ঘরের কোণে লুকিয়ে পড়লেন। আর ঠিক তক্ষুনি টুপ করে তাঁর মাথার ওপর একটি টিকটিকি পড়ল। ও হরি, ইনিই সেই অকস্মের ধাড়ি/ টিকটিকিটা তাঁর মাথায় পড়তেই তাঁর বুকের ভেতরটা ভয়ে ধক করে কেঁপে উঠল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে বাবা রে/' তারপর টিকটিকিটা মাথা থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়তেই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। অবিশ্যি টিকটিকিটাকে দেখে তাঁর বুকের ধকধকানিটা রাগে ফোঁসফোঁসিয়ে উঠল। তিনি টিকটিকিটাকে ধরতে গেলেন। টিকটিকিটা মাটি ছেড়ে দেওয়ালে মারল ছুট। তারপর ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে ভোঁ-কাট্টা/ তিনিও টেবিলের ওপর মারলেন লাফ। লাফ মেরে ঘুলঘুলির ভেতর চোখ গলিয়ে দিলেন। যাঃ চ্চলে/ একী কাণ্ড/ এ যে রাত হয়ে গেছে/ তিনি তোথ। মানে, তিনি তাহলে ঘরের ভেতর অতক্ষণ আটকে আছেন/ সেই সকাল থেকে এখন রাত কটা হল তিনি জানেন না। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ। তবে কতক্ষণ হলে যে অনেকক্ষণ হয় তিনি তার হিসাবও করতে পারছেন না। তাই তিনি হিসাব না-করে, ঘুলঘুলির ফাঁকে চোখ গলিয়ে বাইরেই চেয়ে রইলেন। এতক্ষণ চোখদুটো তাঁর চার দেওয়ালের বন্ধ ঘরে অন্ধকারে আটকে ছিল। যাক, যাক, তবু ভালো, এখন একটু খোলা হাওয়ার ফুরফুরুনি নাকের গর্তে খেলতে পারছে। আঃ/ কিন্তু খিদে সে তো বাগ মানছে না। ভূতের খিদে তো/ খোলা আকাশের বাতাস নাকের গর্তে ধাক্কা মারলেই, পেটের ভেতরটাও খাই-খাই করে ওঠে। তিনি ঘুলঘুলিতে মুখ ঠেকিয়ে খিদের চোটে উঁঃ/ উঁঃ/ করে কোঁকাতে লাগলেন। কিন্তু কপাল এমন, আশ-পাশের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি সবই ঠাওর হচ্ছে, অথচ একটিও প্রাণী নজরে পড়ছে না। আর নজরে পড়লেই-বা কী/ ডাকলে যে সাড়া দেবে, তারই-বা ভরসা কোথায়/ ভূতের নাম শুনলেই লোকের হাত-পা সেঁধোয় পেটের মধ্যে, ডাক শুনলে আর রক্ষে আছে/ তাই বলে তো আর পেটে খিদে আর মুখে লাজ নিয়ে বসে থাকা যায় না।

দ্যাখো, বলতে-বলতেই রাস্তা দিয়ে একটি ছেলে যাচ্ছে/ হায়/ হায়/ গেল-গেল শেষকালে একটা এঁটকুলে ছেলে গেল। মানে নেহাতই বাচ্চা ছেলে/ ছেলেটা বেঁটকুলে হলেও কথা ছিল। অন্তত খানিকটা তো কাজে আসত/ তাই বলে তো আর গাছের পক্ষী হাতে বসলে শখ করে কেউ ভোর আকাশে উড়িয়ে দেয় না। তাই তিনি এঁটকুলে ছেলেটাকে ডেকেই বসলেন, 'ও ভাই এঁটকুলে—থুড়ি/ ও ভাই, ও ভাই।'

ও-ভাই চমকে ঘুরে দাঁড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে সবদিক ফাঁকা। সুতরাং সে আবার চলতে শুরু করল।

তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'আমি ইদিকে, ইদিকে।'

ছেলেটি আবার দাঁড়াল। বলল, 'কোন দিকে? কোন দিকে?'

'আমি এই যে।'

'দেখতে পাচ্ছি না।'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আমি এই যে ঘুলঘুলি/'

যে-ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তিনি ডাকছিলেন, ছেলেটি সেই ঘুলঘুলির দিকে তাকাল। তিনি এবার ছেলেটির মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। না, ছেলেটিকে নেহাতই এঁটকুলে মনে করে তিনি বোধ হয় এতক্ষণ ভুল করে এলেন। তিনি স্পষ্ট দেখলেন, ছেলেটি এঁটকুলেও নয়, বেঁটকুলেও নয়। ছেলেটি ছেলেরই মতো। তাঁর ভারী ভালো লাগল। তিনি ভাবলেন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছেলেটিকে ভোলালে, নিশ্চয়ই তাঁর কথা শুনবে। তাই তিনি নিজের হাতটা ঘুলঘুলির ফোঁকর দিয়ে বার করে বললেন, 'আমায় দেখা যাচ্ছে?'

ছেলেটি খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, 'ও-হো-হো, তাই বলুন/ ওখানে কী করছেন?''

'হাওয়া খাচ্ছি।'

'ঘুলঘুলি দিয়ে?'

তিনি বললেন, 'এখানকার হাওয়াটা বেশ ইয়ে, মানে, হাওয়ার মতন/'

ছেলেটি হাসতে-হাসতেই বলল, 'ঘুলঘুলির হাওয়া তো/ সে-হাওয়া ঘুলঘুলির মতনই তো হবে। তা ডাকছেন কেন?'

ইতিমিচিসাহেব এবার আমতা-আমতা করে বললেন, ''ইয়ে, আমি তো ভূ—' বলতে গিয়েই থমকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না—।' ইস/ এক্ষুনি তিনি বলে ফেলেছিলেন, তিনি ভূত।

ছেলেটি বলল, 'ওকি/ অমন 'না' বলে আঁতকে উঠলেন কেন?'

তিনি এবার কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিলেন, 'ও আমার এমনি মাঝে-মাঝে হয়।'

'অসুখ?' ছেলেটি জিজ্ঞেস করল।

'না।' তিনি উত্তর দিলেন।

'তবে?'

তিনি কথাটা ঘোরাবার জন্যে অন্য কথা বললেন, 'না, আমি তো ঘরে ঢুকলুম।'

ছেলেটি বলল, 'তাতে কী হয়েছে?'

তিনি বলেই চললেন, 'আমি চেয়ারে বসলুম।'

ছেলেটি বলল, 'চেয়ার থাকলে, তো সবাই বসে।'

'আমি বইপত্তর পড়তে লাগলুম। তারপর হঠাৎ হল কী, আমার ঘরের দরজায় শেকল আটকে গেল। আর আমি এই ঘরে আটকা পড়ে গেলুম।'

ছেলেটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শেকলটা আপনা-আপনি আটকে গেল/'

তিনি বললেন, 'তাই তো।'

ছেলেটি বলল, 'এ যে তাহলে দেখছি ভূতুড়ে কাণ্ড/'

'ভূতুড়ে কাণ্ডই তো/ নইলে আমার খিদে পেয়ে যায়/' তিনি উত্তর দিলেন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ছেলেটি এবার হেসে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'খিদে পেলে সেটা আবার ভূতুড়ে কাণ্ড হতে যাবে কেন?'

তিনি আবার বলে ফেলছিলেন, 'আমি যে ভূ—' থমকে গেলেন। তারপর জিব কেটে নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন, 'ইস/ আর একটু হলেই আবার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছিল/'

ছেলেটি তাঁকে থামতে দেখে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? আবার থামলেন কেন?'

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না তো, থামিনি তো। জিব কামড়ে ফেলেছি।'

'কেটে গেল নাকি?'

'না, না।'

'তাহলে কী বলছিলেন?'

'বলছিলুম,' ইতিমিচিসাহেব একটু থামলেন, ভাবলেন, তারপর আবার বললেন, 'বলছিলুম, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে?'

'কী সাহায্য?'

'ঘরের শেকলটা যদি একটু খুলে দাও/'

'তাতে আমার কী লাভ?'

'তুমি হেঁটে যাচ্ছ, কষ্ট হচ্ছে। তোমায় পিঠে নিয়ে পৌঁছে দেব।'

'আপনার কষ্ট হবে না?'

'ও আমার অভ্যেস আছে।'

'ঠিক তো?'

'মিথ্যে বলি না আমি।'

'তবে দেখি, খুলতে পারি কি না।' বলেই ছেলেটি দরজা খুলতে ছুটে এল।

ইতিমিচিসাহেব টেবিল থেকে নীচে লাফিয়ে দাঁড়ালেন। দরজার শেকল ঝনাত করে খুলে গেল। তিনি দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। বাইরে বেরিয়ে তিনি ছেলেটির দিকে একবার তাকালেন, তারপর মারলেন দৌড়।

ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল, 'ও মশাই, ও মশাই, পালাচ্ছেন কেন?'

মশাই-এর বয়ে গেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দে-লম্বা/

ছেলেটিও ছুটল। কিন্তু ধরতে পারল না। তবু থামলও না।

ইতিমিচিসাহেব অনেকটা ছুটে এসে ভাবলেন, 'যাক, বাঁচা গেল। ঘর থেকে মুক্ত হলুম, ছেলেটাকেও ভড়কি দিলুম।' ভেবে তিনি দম নিলেন। কেননা, এতটা ছুটে এসে তিনি হাঁপিয়ে পড়েছেন। একটু জিরোবেন বলে দাঁড়ালেন।

'কী মশাই?' আচমকা ছেলেটির গলার স্বর।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ইতিমিচিসাহেব চমকে উঠেছেন। ঘুরে দেখেই তিনি আবার পালাতে গেলেন। ছেলেটি ঝট করে তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'আমি তো জানি, ভদ্রলোকের এক কথা। তা আপনি কেমন ভদ্রলোক মশাই? আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছেন?'

তিনি গলাটাকে একটু চড়িয়ে, একটু খিঁচুনি-খিঁচুনি সুরে বলে উঠলেন, 'কে বলেছে আমি ভদ্রলোক/ আমি ভূত/'

ছেলেটি হেসে ফেলল।

তিনি চটে উঠলেন। এতক্ষণ তিনি ছেলেটিকে 'তুমি-তুমি' করছিলেন, এবার 'তুই-তুই' করতে শুরু করে দিলেন। এবং ধমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যে এমন খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে কথা বলছি, তোর ভয় করছে না? তুই ঘুমোস কখন?'

সে বলল, 'যখন ঘুম পায়।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কখন তোর ঘুম পায়?'

সে উত্তর দিল, 'তা কী করে বলব, ঘুম পেলেই ঘুম পায়।'

তিনি বললেন এবং বেশ ভয় দেখিয়ে বললেন, 'তুই এক্ষুনি ঘুমো, আমি তোর নাকে চিমটি কাটব। আমি ভূত/'

'আপনি মশাই ভারী চালাক। ভয় দেখিয়ে কথা ঘুরুচ্ছেন।'

'হিঁ-হিঁ-হিঁ/' হঠাৎ দন্ত বিকশিত করে, নাকিসুরে হেসে উঠলেন।

ছেলেটি একটুও ঘাবড়ে না-গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'একি মশাই/ ভূতেরা বুঝি এমনি করে মুখ ভ্যাংচায়?'

তিনি লাফিয়ে উঠলেন, 'আলবত। তোর পেটে কাতুকুতু দেব। সরে যা আমার সামনে থেকে/'

ছেলেটি বলল, 'না সরব না। আপনার ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে হুড়কুষ্টি করতে চাইছেন। কথা ছিল, আপনার ঘরে শেকল খুলে দিলে আপনি আমায় পিঠে করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু এখন আপনি উলটো-পালটা কথা বলছেন। আমাকে পিঠে নিন।'

'না নেব না,' বেশ ঝাঁঝিয়ে তিনি উত্তর দিলেন। 'এখন আমার খিদে পেয়েছে, আমি খাবার খুঁজব।'

ছেলেটিও তেমনি টরটরিয়ে উত্তর দিল, 'খুঁজতে হবে না। আপনি আমায় পিঠে নিয়ে চলুন। খাবার আমার কাছে আছে।'

'সত্যি নাকি রে,' বলে তিনি একেবারে খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কই? কই?'

ছেলেটি বলল, 'এই তো, আমার থলিতে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সত্যিই তাই। তার পিঠে যে একটা থলি বাঁধা ছিল, এতক্ষণ সেটার দিকে তাঁর নজরই পড়েনি। ছেলেটি থলির ভেতর হাত পুরতেই দুটো ডালপুরি উঁকি মেরেছে/ তিনি খপ করে খামচে নিয়েই। গপগপ করে গিলতে লাগলেন।

ছেলেটি মুচকি-মুচকি হাসতে-হাসতে বললে, 'ও কী করছেন? ও কী করছেন?' অমন হ্যাংলার মতো গিয়েছেন কেন?'

একটা ডালপুরি পুরে হাউ-হাউ করে তিনি বললেন, 'ভূতেরা এমনি করেই খায়/'

ছেলেটি বলল, 'আপনি যেরকম ছটফট করে খাচ্ছেন, গলায় না আটকে যায়/ আপনার স্থির হয়ে বসে ধীরে-সুস্থে খাওয়া উচিত।'

''খিদে পেলে ওসব উচিত-অনুচিত মনে থাকে না। যদি আর এক-আধখানা তোর থলিতে থাকে তো দিতে পারিস। ডালপুরিটা হয়েছেও ভালো, আর খিদের মুখে লাগছেও দারুণ।'

ছেলেটি বলল, 'থাকতে পারে, দেখছি।' বলে থলিতে হাত গলিয়ে আর একটি ডালপুরি বার করে আনল, বলল, 'এই নিন।'

ইতিমিচিসাহেব আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভেরি গুড। বাঁচালি/ উঃ/ যা খিদে পেয়েছিল।' বলে তিনি ডালপুরিটা তারিয়ে-তারিয়ে খেতে লাগলেন।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'কীসের?'

'ওই ঘরটায় আটকা পড়লেন কেমন করে?'

'আসলে কী জানিস, আমি একটা ভূতের খোঁজে এসেছিলুম এখানে। যাদের কাছে এসেছিলুম, তারা ভূতের কারবার করে। কিন্তু এসে জানতে পারলুম, আমি নিজেই ভূত। এখন তারা আমায় ঘরে বন্দি করে ফেলল। আমাকে নিয়ে ব্যবসা করার মতলব ছিল তাদের, বুঝলি না/'

ছেলেটি হি-হি করে হেসে উঠল।

হাসি শুনে ইতিমিচিসাহেব বললেন, 'এবার তোর নিশ্চয়ই ভয় লাগছে।'

'মোটেই না।' ছেলেটি উত্তর দিল।

'না আবার/ ভয়টাকে চাপবার জন্যে হাসছ বাছা, সে যেন আর আমি বুঝছি না/'

ছেলেটি তেমনই হাসতে-হাসতে বলল, 'আপনি ভূত হলেও, আপনাকে ভয়-পাওয়া ভূতের মতো মনেই হচ্ছে না/'

'আমি যদি এক্ষুনি তোর ঘাড়ের ওপর চেপে বসি/'

'বসবার আগেই আপনার হাতে আর একটি ডালপুরি ধরিয়ে দেব।'

বলতেই তিনি হেসে উঠেছেন, ছেলেটিও হেসে উঠল। তারপর তিনি হাসতে-হাসতেই বললেন, 'থাকে যদি তবে তাই দে। আর একখানা ডালপুরি খাওয়া যাক।'

https://boierhut.com/fb

আর একখানা ডালপুরি থলি থেকে বার করে, তার হাতে তুলে দিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'জানতে পারি, আপনি কী ধরনের ভূত? প্রেত, না পেঁচো? বিশাচ, না দানোব?'

তিনি ছেলেটির প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গেলেন। মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'উঁ' সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আমি ইতিমিচিভূত/'

ছেলেটি এবার হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'এমন ভূতের কথা আমি কখনও শুনিনি।'

তিনি তখনও ডালপুরিটা চিবুচ্ছেন। চিবুতে-চিবুতে বললেন, 'তুই ছোটো ছেলে তো। সব ভূতের কথা সব ছোটোদের জানার কথা নয়/'

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল। বলল, 'তাই বুঝি/' তারপর একটু থেমে ইতিমিচিসাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'হয়তো তাই হবে। সে যাই হোক, পেট ভরেছে?'

'খানিকটা। ভয় নেই আর চাইছি না।' বলে হাসলেন ইতিমিচিসাহেব।

'চাইলেও আর পাচ্ছেন না। থাকলে তবে তো/'

'তুই খাবি না?'

'কী আক্কেল আপনার/ নিজের পেট ভরে যাবার পর জিজ্ঞেস করছেন/ আপনিই তো সব খেয়ে নিলেন।' বলেই ছেলেটি হেসে উঠল।

তিনি লজ্জা পেলেন। তারপর লজ্জায় 'ছিঃ ছিঃ' করে উঠলেন।

ছেলেটি তেমনি হাসতে-হাসতেই বলল, 'আপনার লজ্জার কিছু নেই। আমি আগে খেয়েছি। আমার পেট ভরতি।'

'সত্যি বলছিস?'

'সত্যি।'

'তবে এবার আয়, আমার পিঠে চাপ। আমি তোকে পৌঁছে দিই।'

'পারবেন?'

'যাঃচ্চলে/ আমি ভূত পারব না কী রে/ চাপ না/'

ছেলেটি বলল, 'বেশ দেখি তবে। দেখবেন, আবার ফেলে দেবেন না যেন/' বলে, তাঁর পিঠের ওপর ছেলেটি লাফিয়ে বসল। বসতেই তিনি আচমকা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

'কী হল?'

'কাতুকুতু লেগে গেছে।'

ছেলেটি তড়াং করে পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে বলল, 'ভূতের আবার কাতুকুতু লাগে নাকি? আপনি তো আচ্ছা ভূত/'

তিনি তখনও খিলখিল করছিলেন। খিলখিল করতে-করতেই বললেন, 'তুই যে আমার সুড়সুড়ির জায়গাটা খামচে ধরলি/ নে, আবার ওঠ/'

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আবার ছেলেটি উঠল। উঠতে-উঠতে বলল, 'দেখবেন, হাসতে-হাসতে আমায় আবার ধপাস করে না দেন/'

না, এবার আর তেমন কিছু হল না। তিনি আর হাসলেন না। ছেলেটিকে পিঠে নিয়ে হাঁটলেন। ছেলেটি বলল, 'আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো?'

'দুর, তুই একদম ফুরফুরে হালকা।'

মনে হচ্ছিল, অনেক রাতই হয়েছে। কারণ অনেক রাতের মতোই এখন চারিদিক নির্জন, শুনশান। কেউ যেমন নেই, কোনো সাড়াও তেমন নেই। তবে চাঁদ উঠেছে। আকাশ ভরতি আলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলেটিই আবার কথা বলল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কবে মরলেন?'

প্রশ্নটা শুনে ইতিমিচিসাহেব থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি মরিনি তো/'

ছেলেটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'সে কী, না-মরলে ভূত হলেন কী করে?'

তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, 'এই জন্যেই তোদের কচি-কাঁচা শিশু বলে। আরে বাবা, মরলেই কি মানুষ ভূত হয়? ভূত হয়েও তো মানুষ মরতে পারে।'

ছেলেটি মুচকি হেসে উত্তর দিল, 'ও, তাই বুঝি/'

'তাই।'

'তাহলে ভূত হবার আগে আপনার নাম কী ছিল?'

'ইতিমিচি ইত্যাদি।'

'সে আবার কী ধরনের নাম/ বিশ্রী।'

'তোর নামের ধরনটা শুনি?'

'আমি রিগি।'

তিনি এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তোর নামের ধরনটাই বা কী এমন সুশ্রী/'

'আমার নামটা ভালো লাগল না আপনার?'

'তুই ছেলেটা যত সুশ্রী, তোর নামটা ততই ছিঃ-ছিরি/'

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'আমার মা রেখেছে।'

ইতিমিচিসাহেব থমকে গেলেন। তারপর হেসে উঠলেন। বললেন, 'না রে, তোর নামটা খুব ভালো। মায়ের দেওয়া নাম কখনো বিশ্রী হয়/ বল, এখন কোথায় যাবি?'

'আপনি তো আমায় কিছু জিজ্ঞেস না করে নিজের মনেই হেঁটে চলেছেন/'

'তাও তো বটে।'

ছেলেটি হেসেই বলল, 'আপনি শুধু ভূত না, পাগল।'

তিনি বললেন, 'এই তো, দুমফট করে মন টক-করা কথা বলে বসলি/ ভূতকে ভূত বল, তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু ভূতকে পাগল বললে আমার ভীষণ খেপে যাবার কারণ থেকে যাচ্ছে।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'আচ্ছা বাবা আর মন টক-করা কথা বলছি না। আপনার খেপে কাজ নেই/ কিন্তু কোথায় চলেছেন, সেটা তো ঠিক করতে হবে।'

'চাঁদে যাবি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

ছেলেটি যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'চাঁদে?'

'হ্যাঁ রে বাবা।'

'চাঁদে মানে ওই আকাশে?'

'আকাশে নয় তো, চাঁদ কি তোমার শোবার ঘরে পাশ বালিশে পা জড়িয়ে হাই তুলছে?'

ছেলেটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যেতে পারবেন?'

'হুঃ/' এমনভাবে হুঃটি তিনি উচ্চারণ করলেন, যেন তাঁর কাছে চাঁদে যাওয়াটা কিচ্ছু না। তুড়ি মারছেন আর উড়ে যাচ্ছেন। 'তা' ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'চাঁদে যাওয়ার রাস্তা জানেন?'

'তুই একদম বোকা/ চোখের সামনে তো দেখতে পাচ্ছিস, জ্বলজ্বল করছে। মারব লাফ, ধরব চাঁদ।'

ছেলেটি হি-হি করে হেসে উঠল।

'হাসলি কেন?' একটু যেন রেগেমেগেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'না', ছেলেটি বলল, 'তাহলে লাফ দিন।'

'দেবই তো/ আমার গলাটা শক্ত করে জড়িয়ে থাকবি। আমি মারছি লাফ। এই মারলুম, ওয়ান, টু, থ্রি।' বলেই ছেলেটিকে পিঠে নিয়ে তিনি লাফালেন। ছেলেটি সিঁটিয়ে উঠল—'ই-ই-ই।' কিন্তু লাফিয়ে মাটি থেকে তাঁর পা দুটি বড়ো জোর এক হাত ওপরে উঠল। তিনি একটুও ঘাবড়ে না-গিয়ে বললেন, 'ইস/ একদম মাটি করে দিলি। অমন চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠলি কেন? চেঁচালি বলেই তো আমার পা ফসকে গেল। নে, এবার সামলে ধরে শান্ত হয়ে বস। আমি আবার লাফ মারছি, ওয়ান—'

ছেলেটি হঠাৎ ব্যস্ত-গলায় বলে উঠল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান।'

'আবার কী হল?'

'দেখছেন না, চাঁদ মেঘে ঢেকে গেছে?'

'তাই তো/' তিনি মেঘের দিকে খানিক তাকিয়ে রইলেন, তারপর একটু চিন্তান্বিত হয়েই বললেন, 'লক্ষণটা ভালো ঠেকছে না।'

'কেন?'

'মনে হচ্ছে, আমাদের চাঁদে যাওয়াটা চাঁদ পছন্দ করছে না।'

'তাহলে?'

'চ, আজকের রাতটা তোর বাড়িতেই কাটিয়ে আসি।'

https://boierhut.com/fb

ছেলেটি বলল, ''মুশকিল তো সেইটাই।''

'কেন?'

'কদিন হল আমি বাড়ির পথ হারিয়ে ফেলেছি। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছি।'

'বলিস কী রে, পথ হারিয়ে ফেলেছিস? পথটা কোনদিকে হারাল?'

'এবার কিন্তু আপনি সত্যিই ভূতের মতো প্রশ্ন করেছেন/'

'কেন? কেন?'

'পথটা কোনদিকে হারিয়ে গেছে সেটাই যদি বলতে পারব, তবে বাড়িটা কোনদিকে হারিয়ে আছে, সেটাও তো খুঁজে পাব।'

তা বটে/ বলে ইতিমিচিসাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে এখন কী করা?'

'চলুন তো এগিয়ে যাই?'

'তাই চ। বলে তিনি ছেলেটিকে পিঠে নিয়েই এগিয়ে চললেন। চলতে চলতে নিজেই বললেন, 'তোর বাপ-মা না জানি কত ভাবছে/'

'কার না-ভাবে বলুন? আপনার?'

'দুর বোকা/ আমি তো ভূত/'

'ভূতের বুঝি বাপ-মা থাকে না?'

'আমার তো নেই। অন্য ভূতের কথা বলতে পারব না/'

'কোনোদিন আপনি মাকে 'মা' বলে ডাকেননি?'

ইতিমিচিসাহেব কেমন যেন চমকে উঠলেন। দাঁড়ালেন।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'দাঁড়ালেন কেন? পিঠে লাগছে? নামব?'

তিনি একটু থেমে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। বললেন, 'না রে লাগছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।' তাঁর গলায় যেন বিষণ্ণতার সুর।

'কী মনে পড়ে গেল?'

'আমার সেই ছোটোবেলার কথা। হ্যাঁ, হ্যাঁ দ্যাখ, আমার চোখের ওপর ভেসে আসছে আমার সেই ছোটোবেলার দিনগুলি।' হাঁটতে-হাঁটতে কেমন যেন ছটফট করে উঠলেন ইতিমিচিসাহেব। আবেগে গলা তাঁর ভার হয়ে গেছে। তিনি বলেই চললেন, 'ওই দ্যাখ, তখন আমি তোর মতো ছোট্ট। দ্যাখ, সোনার আলো-ভরতি আকাশের নীচে আমি কেমন আমার বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছি/ দেখতে পাচ্ছিস, কী দুরন্ত আমার আনন্দ? দ্যাখ, দ্যাখ, আমি কেমন হাসছি, দ্যাখ আমি কেমন আনন্দে লাফাচ্ছি। আমি যেন একটা জীবন্ত হরিণ। দেখতে পাচ্ছিস না, আমার মাকে? ওইতো আমার বাবা। ওই তো তারা দাঁড়িয়ে আছে বর্ষায় জল-ছোঁয়া ধান খেতের ওপর। ধানের চারাগুলি

https://boierhut.com/fb

দ্যাখ, আকাশ-আলোয় মাথা তুলে কেমন দুলছে/ মাঠের ওপর লাঙল চালিয়ে বাবা-আমার জমি চষেছে। সেই মাটিতে সোনা-ধানের চারা বুনেছে আমার মা একটি-একটি করে। চারাগুলি আজ কত বড়ো হয়েছে দ্যাখ। আমার মা, আমার বাবার মুখ দুটি কেমন খুশিতে উছলে উঠেছে/ কদিন পরে ওই সবুজ-চারায় ধানের ফসল ভরে উঠবে। আরও কদিন পরে পাকা ধানে মরাই ভরে যাবে। তাদের আশা পেট ভরে দুটো খেতে পাবে তাদের ছেলে। ছেলের জন্যে নতুন জামা কিনবে তারা। নতুন জামা পরে ছেলে তাদের স্কুলে যাবে। নতুন ধানের গন্ধ বুকে নিয়ে সে বই পড়বে। পড়তে-পড়তে বড়ো হবে। তারপর বাপ-মা যেদিন বুড়ো হবে, সেদিন তাদের ছেলে এসে বলবে, 'মা, বাবা, তোমরা সারা জীবন যুদ্ধ করেছ মাটির সঙ্গে, মেঘের সঙ্গে। এবার আমি বড় হয়েছি। এবার তোমাদের হাতের অস্ত্রগুলি আমার হাতে এগিয়ে দাও। আমার যুদ্ধ শুরু হল। বর্ষার জল ডিঙিয়ে তোমাদের আর মাঠে যেতে হবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আর তোমাদের কষ্ট করতে হবে না। এবার তোমাদের মুখে খাবার দেব আমি। তোমাদের নতুন পোশাকে সাজিয়ে দেব আমি। আমি তোমাদের ছেলে। আমি না দেখলে, বুড়োবয়সে মা-বাবাকে কে দেখবে?' বলতে-বলতে ইতিমিচিসাহেব একটু থামলেন। উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন। শরীর কাঁপছে তাঁর।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'থামলেন যে? বলা শেষ হয়ে গেল?'

'না, এ বলা শেষ হয় না।' তিনি একটু সামলে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

ছেলেটি বলল, 'তবে বলুন?'

'না থাক। ভূতের মুখে গল্প তো/ হয়তো ভাবছিস, যত সব অদ্ভুতুড়ে, আজগুবি।'

ছেলেটি যেন এই কথায় কষ্ট পেল। সে বলল, 'ওকথা কেন বলছেন? আমি জানি আপনার সব কথা সত্যি। আজগুবি কথাকে বানিয়ে-বানিয়ে সত্যি বলে চালিয়ে দেওয়া খুব সোজা। তবুও সেটা আজগুবি। কিন্তু সত্যিকথাকে আজগুবি বলে চালালেও সেটা কোনোদিনই মিথ্যে হয় না।'

ছেলেটির মুখে এ-কথা শুনে তাঁর চোখ ছলছল করল। অবশ্য ছেলেটি তা দেখতে পেল না। কারণ সে তো পিঠের ওপর বসে আছে। তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। বললেন, 'তবে বলি/'

ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ বলুন।'

'তারপর একদিন আমাদের দেশে যুদ্ধ এল। কতদিন ধরে শুনে আসছি, শত্রুরা আমাদের দেশ আক্রমণ করবে। কিন্তু যুদ্ধ যে কী, আমি তা জানতুম না। জানার মতো আমার তো তখন বয়েস হয়নি। কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে ঝাঁকে-ঝাঁকে শত্রুপক্ষের উড়োজাহাজ উড়ে এল। আমি দেখলুম আকাশ থেকে মাটিতে বোমা পড়ছে বুক-কাঁপিয়ে। আগুন জ্বলে উঠেছে চারিদিকে। আমি শুনতে পেলুম অসংখ্য মানুষের চিৎকার, কান্না। আমি দেখতে পেলুম, ভীষণ আতঙ্কে আমার বাবা-মা আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। তারা আমাকে বাঁচাতে চায়। তারপর শুনতে পেলুম, সেই পাকাধানের খেতের ওপর দিয়ে মেশিনগানে গুলি ছুড়তে-ছুড়তে ঘড়ঘড় করে দানবের মতো ট্যাংক

ছুটে আসছে। আমার বাবা আমার মা আমাকে নিয়ে ছুটল। তারা ভুলে গেল, আকাশের ওই উড়ন্ত দানবগুলোর কোনো দয়া নেই। তারা শুধু ছিনিয়ে নিতে পারে প্রাণ। নিরীহ মানুষের শেষ সম্বল।

'অনেকটা ছুটে এসে থমকে দাঁড়াল আমার বাবা। আমার মা-ও। হাঁপাচ্ছে তারা। কী করবে তারা ভেবে পাচ্ছে না। দানবের কালো হাত এক্ষুনি হয়তো গুঁড়িয়ে ফেলবে আমাদের। সেই আতঙ্কে শিউরে উঠছে তারা। আমার মা শিয়রে হাত দিল। তারপর কেঁদে ফেলল।

বাবা চাপা-গলায় বললে, 'আঃ/ এখন কান্নার সময় নয়। বিপদের সময় বল-ভরসা হারালে ছেলেকে বাঁচাব কেমন করে? এসো, যতক্ষণ পারি ছুটে চলি।' বলে, বাবা এক হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর এক হাত মায়ের হাতে রেখে আবার ছুটল।

'এবার আমি নিশ্চিত দেখতে পেলুম, ওই যুদ্ধদানবগুলো আকাশে অনেকখানি গোল হয়ে ঘিরে-ঘিরে বোমা ফেলছে। আমাদের পালাবার আর পথ নেই। সামনের ধানখেতের মধ্যে আমাকে আড়াল করে আমার আমার-বাবা লুকিয়ে পড়ল। বাঁচার শেষ চেষ্টা।



বাবা চাপা-গলায় বললে, ‘আঃ/এখন কান্নার সময় নয়...’

'কিন্তু হঠাৎই বোমার শব্দ থেমে গেল। মনে হল, আকাশের ওই দানবগুলো বোধ হয় নিস্তার দিল কিছুক্ষণের জন্যে। তখন সেই ধানখেতের জলকাদা ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলুম আমরা। আর একটু এগিয়ে গেলে, মনে হয় যেন একটা উঁচু জমিতে আমরা দাঁড়াতে পারব। অনেকটা লুকিয়ে-ছাপিয়ে আমরা সেইদিকেই এগিয়ে গেলুম। পৌঁছেও গেছি। সামনে একটা গর্ত দেখা গেল। বাবা তাড়াতাড়ি

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

সেই গর্তের মধ্যে আমায় লুকিয়ে ফেলল। তারপর সেই গর্তের পাশে নিজেরা মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে লুটিয়ে রইল।

'আমিও ভয়ে বোবা হয়ে গেছি। এই ভীষণ অন্ধকার গর্তটার মধ্যে বসে থাকতে-থাকতে যেন আমার দম আটকে আসছিল। আমি ডাকলুম, 'মা।'

'কী বলছ বাবা?' মা চুপিসারে জিজ্ঞেস করল।

আমি বললুম, 'আমার কাছে এসো।'

মা বলল, 'এই তো বাবা, কাছেই আছি।'

আমি বললুম, 'এখানে ভীষণ অন্ধকার।'

বাবা হাত বাড়িয়ে আমার মাথাটা ছুঁয়ে বলল, 'ভয় কোরো না বাবা। আমরা এখানেই আছি।'

'আমি চুপটি করে গর্তের মধ্যেই বসে রইলুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লুম জানি না।

'কী ঘুম যে পেয়েছিল আমার/ যখন জেগে উঠলুম, তখন রোদ উঠে গেছে। আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়লুম। দাঁড়ালুম। মুখ বাড়ালুম। তারপর শিউরে উঠলুম। এ কী/ আমার মা, বাবা কাউকে দেখছি না তো/ কোথা গেল তারা? আমি চিৎকার করে লাফ মারলুম গর্তের ভেতর থেকে বাইরে। দেখতে পেলুম, গর্তের বাইরে এবড়ো-খেবড়ো জুতোর ছাপ। দেখতে পেলুম, খালি পায়ের চিহ্ন আর ধস্তাধস্তির খাবলা-ওঠা মাটি। আমি বুঝতে পারলুম আমার মা-বাবার কী হয়েছে/ বুঝতে পারলুম, ওই যুদ্ধ-পিশাচগুলোর শিকার হয়েছে তারা। আমি দিশেহারা হয়ে ছুটলুম। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলুম আর কেঁদে উঠলুম, 'মা-মা-আ/ বাবা-আ-আ/'

'আমি খুঁজে পেলুম না তাদের। আমি অনেকদিন ধরে তাদের খুঁজে বেড়ালুম। কতদিন, তা বলতে পারব না। তারপর আমি নিজেই একদিন হারিয়ে গেলুম।

'একদিন হঠাৎ-ই এক ভদ্রলোকের নজরে পড়ে গেলুম। হয়তো আমার চেহারা দেখে, অথবা আমায় রাস্তার ছেলের মতো একা-একা ঘুরতে দেখে তাঁর দয়া হল। লোকটি অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিলেন আমাকে। শেষমেশ লোকটি আমার কাছে এলেন। ভদ্রলোকটিকে কাছ থেকে দেখে মনে হল বেশ কেতা-দুরস্ত। বয়সে যে খুব বেশি, তা মনে হল না। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমার নাম ছাড়া আমি আর কিছুই বলতে পারলুম না। লোকটি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তোকে কাজ দেব।'

'আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কী কাজ?'

'তিনি বললেন, 'জাহাজের কাজ?'

'আমি চমকে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।'

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

'তিনি বললেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? হ্যাঁ রে, আমার অনেক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ আছে। আমি তো গোল্ড মার্চেন্ট, মানে সোনার ব্যবসায়ী। ব্যবসার জন্যে আমায় প্রায় জাহাজে চেপে দেশ-বিদেশে যেতে হয়। সেই কারণেই আলাপ আর কি/'

'জাহাজের কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। জাহাজ, সমুদ্র, দিনের পর দিন ভেসে চলা সবই কেমন যেন রোমাঞ্চে-ভরা রহস্যময়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে বললুম, 'ঠিক আছে।'

'তখন তিনি বললেন, 'বেশ তাহলে চ আমার সঙ্গে। কালই আমি জাহাজে চেপে আর এক দেশে যাব। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তোর পরিচয় করে দেব।'

'পরের দিন সত্যিই আমি জাহাজে চাপলুম। আশ্চর্য কথা এই, আমি যখন জাহাজের ভেতরে ঢুকলুম, দেখলুম কী বিরাট সেই জাহাজ। নীচে ইঞ্জিন চলছে, কত বড়ো বড়ো মেশিন। ওপরে কত থাকবার কেবিন, ডেক। একেবারে এলাহি কাণ্ড। কিন্তু ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে যখন সমুদ্রের দিকে তাকালুম, তখন মনে হল, এই অনন্ত সমুদ্রের বুকে এই বিরাট জাহাজটা যেন একটা খড় কিংবা কুটো। জাহাজের একটা কেবিনে ছিলেন সেই সোনার ব্যবসায়ী। আমি অবশ্য ছিলুম ডেকে। ব্যবসাদার বলেই বোধ হয় তাঁর কেবিনটাও ছিল ভারী ছিমছাম। ডেকে তো আমি একা নই, আরও কত লোক। আমি ছোটো বলে আমাকে কেউ কেয়ারই করত না। তাই আমি বড়ো একা। আমি অবাক হয়ে যাই, অত যাত্রীর কেউ একজনও এসে আমার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল না। নাই করুক। আমার একা-একা এই সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে খুব ভালো লাগত। ভেসে চলে জাহাজ। আর নতুন অচেনা দেশের কথা ভেবে আমার মনে দোলা লাগে।'

এই পর্যন্ত বলে ইতিমিচিসাহেব থামলেন। তাঁর পিঠের ওপর ছোট্ট বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

ছেলেটি বলল, 'না, না, ঘুমুব কেন? শুনছি। বলুন/'

ইতিমিচিসাহেব আবার বলতে শুরু করলেন, 'সেই সোনার ব্যবসায়ী দিনে অন্তত পাঁচ-সাতবার আমায় তাঁর কেবিনে ডাক দিতেন। এটা-ওটা কত কথা বলতেন। বোধ হয় দেখতেন আমার মনখারাপ লাগছে কি না। তাই মাঝে-মাঝে জিজ্ঞেস করতেন, 'কী রে, কেমন লাগছে?' যেহেতু আমার খারাপ লাগছে না, সেইকারণে আমার খারাপ লাগছে এ-কথা তো বলতে পারি না।

'কথা ছিল, সোনার ব্যবসায়ী ভদ্রলোক জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে একটি কাজ জুটিয়ে দেবেন। কিন্তু এখনও তিনি তা করেননি। ইতিমধ্যে একদিন আমাদের জাহাজ এক নতুন পোর্টে এসে ভিড়ল। সেই পোর্ট থেকে আর এক ভদ্রলোক উঠলেন। এবং তিনি সোজা ওই সোনার ব্যবসায়ীর কেবিনে ঢুকে কী যে কথাবার্তা শুরু করলেন, আমি জানি না।

https://boierhut.com/fb

'সেই নতুন ভদ্রলোকটি আসার পর আরও তিনদিন কেটে গেল। অবশ্য ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার তেমন আলাপ না-হলেও প্রায়ই দেখতুম তিনি আমায় দূর থেকে লক্ষ করছেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন আমার ডাক পড়ল সেই সোনার ব্যবসায়ীর কেবিনে। এ আর এমন কী কথা/ ডাক তো রোজই পড়ে। আজ কিন্তু তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি একা নন, সেই নতুন ভদ্রলোকটিও রয়েছেন। ঘরে ঢুকতেই সেই সোনার ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি বললেন, 'শোনো ইতিমিচি, আমি তোমাকে জাহাজের যে-ক্যাপ্টেনের কথা বলেছিলুম, ইনিই সেই ক্যাপ্টেন। তোমার কাজ পাকা হয়ে গেছে। তুমি কালই ওঁর সঙ্গে চলে যাবে। কাল ভোরবেলাতেই জাহাজ নতুন পোর্টে পৌঁছুবে। উনি তোমাকে নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে?'

'আমি ঘাড় নাড়লুম। সেই ভদ্রলোকটির দিকে তাকালুম। এতদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দূর থেকে চোখাচোখি হয়েছে। আজ একেবারে কাছ থেকে দেখলুম। আমার কেমন ভালো লাগল না ভদ্রলোকটিকে।

'সোনার ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমি কথা শেষ করে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে আসতেই তিনি কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এখন কেবিনের মধ্যে তিনি আর সেই নতুন ভদ্রলোকটি। যাকে আমি জেনেছি জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে। হয়তো দুজনের মধ্যে এখন কিছু গোপন কথাবার্তা হবে। কিন্তু কী সে-কথা/ আমাকে নিয়েই কি? আকাশ-পাতাল কিছুই ভেবে পেলুম না। ঠিক একদিন আগে এরকম একটা সন্দেহজনক ঘটনা আমার যেন সব কিছু গোলমাল করে দিল। যেতে-যেতে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। লোকটা কি সত্যিই জাহাজের ক্যাপ্টেন, না, অন্য কেউ? তাকে আর একবার দেখার জন্যে আমার মনটা ছটফট করে উঠল। তাকে অন্তত আর একবার চোখের দেখা দেখতে পেলেও মনটা শান্ত হয়। সুতরাং আর অন্য কিছু না-ভেবে, সোনার ব্যবসায়ী সেই ভদ্রলোকের কেবিনের দরজায় ঠেলা দিলুম। কিন্তু দরজা খুলল না। ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমার কানে এল, দুজনে ভেতরে তখন অস্পষ্ট স্বরে ফিসফিস করে কথা বলাবলি করছে। আমার তখনই ঝট করে মাথায় এল, কী কথা হচ্ছে, শুনলে তো হয়/ আমি কৌতূহল সামলাতে পারলুম না। কেবিনের দরজায় কান ঠেকালুম। এতক্ষণ যে-কথাগুলো খুবই অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল, কানে আড়ি পাততেই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি শুনতে পেলুম সেই সোনার ব্যবসায়ী এবং অন্য লোকটির আলোচনা।

'সোনার ব্যবসায়ী লোকটির গলা, 'দেখুন, আমাদের সমস্ত কাজ খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে।'

'অন্য লোকটি উত্তর দিল, 'আমি স্যার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'ছেলেটি আমার পরিচয় জানে, আমি একজন সোনার ব্যবসায়ী বলে। ঘুণাক্ষরে না-জানতে পারে আমরা ডাকাত।'

'সে জানার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'কাল পোর্টে জাহাজ ভেড়ার পর একদম সময় নষ্ট করবেন না। ছেলেটিকে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন।'

'স্যার, যদি শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে যেতে না চায়?'

'ভয় নেই। আমি এতদিন যা দেখেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, ছেলেটি ধূর্ত নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে।'

'আপনি পোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে সিধে রেল স্টেশনে হাজির হবেন। আপনি জানেন, সেখান থেকে সকাল আটটা নাগাদ একটা ট্রেন ছাড়ে। সম্ভবত তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। তবু আপনি সঠিক সময় আর প্ল্যাটফর্ম নম্বরটা একবার চেক করে নেবেন। আমাদের গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছুলে ছেলেটি একটু ভয় পেতে পারে। কারণ চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গলে-ঘেরা এই জায়গাটা দেখলে ছোটোদের ভয় পাওয়াটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। সময় নেবেন না। স্টেশনে পৌঁছেই জঙ্গলে ঢুকে পড়বেন। ওখান থেকে আমাদের আস্তানা যাবার সোজা পথটা কখনোই ধরবেন না। পথটা চিনে ফেললে, ভবিষ্যতে পালাতে পারে। আস্তানায় পৌঁছাবার আগে জঙ্গলে হাঁটতে-হাঁটতে ও আপনাকে হাজারটা প্রশ্ন করতে পারে। এমনও হতে পারে ছেলেটি জঙ্গলে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। ওকে সব সময় বলবেন, আপনি জাহাজের ক্যাপ্টেন। বলবেন, সমুদ্রের জাহাজে চাকরি করতে গেলে, জঙ্গলে ট্রেনিং নিতে হয়।'

ঠিক এই সময় সেই নতুন লোকটি একটু সন্দিহান গলায় বলল, 'যদি স্যার এ-কথাটা বিশ্বাস না করে? যদি জিজ্ঞেস করে জাহাজ তো জলে ভাসে, ট্রেনিংটা জঙ্গলে কেন?'

'সোনার ব্যবসায়ী হেসে উঠলেন। বললেন, 'আরে মশাই ছোটোদের ছেলেমানুষ বলে কি এই বড়োমানুষি প্রশ্ন করবে বলে?'

'অন্যজন বলল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

'তবে যদি ছেলেটি একান্তই বেঁকে বসে, তবে এই নিন, এই পিস্তলটা। আপনার কাছে রাখুন। মনে হয় না দরকার লাগবে, তবু তৈরি থাকাই ভালো। আমার এই ছেলেধরার উদ্দেশ্যটা আজ আর আপনার কাছে গোপন রাখব না। যেহেতু আপনি আমার ঘনিষ্ঠ অনুচর। আমার উদ্দেশ্য এইসব ছোটোদের খুব কম বয়সে ধরে নিয়ে গিয়ে ডাকাত তৈরি করা। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এরা যখন পাকা ডাকু হয়ে উঠবে, তখন আমাদের দল হবে ভারী। আর আমাদের কাজও তখন হবে হালকা। এই ডাকুদলকে কাজে লাগিয়ে আমরা আরামে আর নিরাপদে দিন কাটাতে পারব। ওরা ডাকাতি করবে, আর আমরা ওদের ওপর করব সর্দারি। আমাদের জীবনের ভয় কমবে, অথচ বাড়বে অর্থ। ছেলেটি যেন ঘুণাক্ষরেও টের না-পায় আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের জঙ্গলের আস্তানায় পৌঁছেই, ও সব কিছু আঁচ করার আগেই, ওকে অন্ধকার ঘরটায় বন্দি করে ফেলবেন। তারপর যা করার আমি

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গিয়ে করব। আমার যেতে হয়তো দু-চারদিন দেরি হবে। কারণ এ-কদিন আরও কজন ছেলেকে ধরে আমাদের আস্তানায় চালান করার জন্যে আমি বিশেষ ব্যস্ত থাকব। সুতরাং যতদিন না আমি যাই, ততদিন খুব সাবধান। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে স্যার।'

'আমি ভীষণ ভয়ে আঁতকে উঠলুম। সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, আমার পায়ের থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। হঠাৎ কেবিনের দরজা খোলার শব্দ আমাকে সজাগ করে দিল। আমি চকিতে লুকিয়ে পড়লুম কেবিনের আড়ালে। আমি কাঁপছি। লোকটা বেরিয়ে চলে গেল। আমার দৃষ্টি তার মুখের দিকে নয়, তার প্যান্টের পকেটে। কেননা, আমার মনে হয়েছিল পিস্তলটা প্যান্টের পকেটে রাখা ছাড়া, এখন সে অন্য কোথাও রাখতে পারে না। বুঝতে পারলুম, সোনার ব্যবসা করার মিথ্যে পরিচয় দিয়ে লোকটা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ডাকাত। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলুম, আমি ভয়ংকরের কবলে পড়েছি। লোকটার ওপর আমার যেমন ঘৃণা হল, তেমনি রাগ। রাগে বুকের ভেতরটা আমার ফুঁসতে লাগল। আমি ঠিক করলুম আমাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ধরে আনার আমি প্রতিশোধ নেব এবং আজই। সুতরাং আমার ওই পিস্তলটা চাই।

'চাই বললেই তো আর আমার হাতে সেটি কেউ তুলে দিচ্ছে না। আমাকে সেটি ছিনিয়ে নিতে হবে। আমি ছেলেমানুষ বলে অবিশ্যি একটা বিশেষ সুবিধা আছে। এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করলেও চট করে কেউ সন্দেহ করে না। সেই সুযোগটাই আমায় কাজে লাগাতে হবে। মনে-মনে মতলব আঁটলুম ওই লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে হবে এবং ফাঁক বুঝে পিস্তলটা গাপ করতে হবে। এই ভেবেই আমি কেবিনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে, আমার রাগ আর ভয় দুটোকেই মুখ থেকে মুছে ফেললুম। দিব্যি সহজ হয়ে ঘোরাফেরা, খাওয়া-দাওয়া করতে লাগলুম।'

আবার ইতিমিচিসাহেব থামলেন।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'থামলেন কেন?'

'বোধ হয় তোর ভয় করছে,' ইতিমিচিসাহেব উত্তর দিলেন।

'ভয় করবে কেন?'

'মনে হচ্ছে।'

'ধ্যাত/ আপনি বলুন তো/'

ইতিমিচিসাহেব আবার বলতে শুরু করলেন, 'এখন উঠতে-বসতে আমার ভাবনা পিস্তলটা হাতাব কেমন করে/ অনেক ভেবে ঠিক করলুম, যার কাছে পিস্তলটা আছে, তার কেবিনেই আমি যাব। তার সঙ্গে আলাপ করব। সেই তক্কে সে পিস্তলটা কোথায় রেখেছে সেটারও হদিস করে নেব। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। আমি ছুটলুম তার কেবিনে।

https://boierhut.com/fb

'কেবিনের বাইরে হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর চোখের পলকে নিজেকে সামলে নিল। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'হ্যালো, এসো, এসো।'

'আমিও ঠোঁটে হাসি টেনে বললুম, 'এসে পড়লুম। সারাদিন একা তো। আপনার কাছে গল্প শুনতে এলুম। আপনি তো জাহাজে চেপে অনেক দেশ ঘুরেছেন।'

'তা ঘুরেছি। তবে তোমাকে বলার মতো আমার গল্প তেমন জানা নেই।'

'একটাও না?' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'সমুদ্র, জাহাজ?'

'জাহাজ/ সমুদ্র/' সে যেন তোতলাতে লাগল।

'আমি বললুম, 'আপনি জাহাজের ক্যাপ্টেন অথচ সমুদ্রের গল্প জানেন না?'

'সে চট করে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি কিছু গল্প জান না?'

'আমি উত্তর দিলুম, 'আমি ম্যাজিক জানি।'

'ম্যাজিক/' লোকটা যেন অবাক হয়ে গেল।

'হ্যাঁ।'

'একটা দেখাবে নাকি?' সে জিজ্ঞেস করল।

'আপনার পকেটে একটা টাকা হবে? একটা টাকার ম্যাজিক দেখাব।'

'লোকটা বলল, 'দেখছি আছে নাকি।' বলে লোকটা প্যান্টের পকেটে হাত পুরল। এবং যে-পকেটে পিস্তলটা ছিল, সেই পকেটটাই হাতড়াতে লাগল। আমি পিস্তলটা দেখতে না পেলেও বুঝতে পেরেছি, এই পকেটেই সেটি আছে। আমি হুট করে বলে বসলুম, 'কী আছে আপনার পকেটে?'

'লোকটা থতমত খেয়ে আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইল। তারপর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কেন?'

'দেখছি পকেটটা ঝুলে আছে। মনে হয় কোনো ভারী জিনিস পকেটে রেখেছেন। এক্ষুনি ছিঁড়ে যাবে।'

'লোকটা বলল, 'না, তেমন কিছু না।' বলেই সে দু-পকেটের দু-পাশটা একটু নেড়েচেড়ে বলল, 'না, টাকা নেই। কটা খুচরো পয়সা পড়ে আছে।'

'আমি বললুম, 'তাহলে আর কী করা?' বলে আমি আর কথা না-বাড়িয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলুম। এবং এখন আমি নিশ্চিত যে, পিস্তলটা প্যান্টের পকেটেই আছে।

'আমার ছটফটানি কমল না। কিন্তু পিস্তলটা যে কেমন করে হাতানো যায় সেটা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। আমি জানি, এরপর লোকটা পিস্তলটা পকেট থেকে বার করে তার স্যুটকেসের মধ্যে লুকিয়ে ফেলবে। তখন মুশকিল। অবশ্য তখন স্যুটকেসটা হাতাতে পারলেও কাজ হয়। তখনই আমার মনে হল, এ-কাজটা করতে গেলে আমায় গভীর রাতের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। তখন লোকটা ঘুমিয়ে পড়বে, আমিও সহজে কাজটা হাসিল করতে পারব। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর একটা সমস্যার কথা আমার মনে উঁকি দিয়ে উঠল, লোকটা রাতে যখন শোবে তখন তো সে কেবিনে দরজা এঁটেই শোবে/ ঢুকব কেমন করে?

'এই কথাটা মনে হতেই, সঙ্গে-সঙ্গে একটা মতলব আমার মাথায় এসে গেল। আমি আবার ছুটে গেলুম সেই লোকটার কাছে। দেখলুম, সে তখন কাগজ-কলম নিয়ে কী লিখছে। আমায় দেখে লেখা থামিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলে, 'কী ব্যাপার? আবার?'

'আমি বললুম, 'আপনাকে একটা কথা বলতে এলুম।'

'কী কথা?'

'কাল তো ভোরবেলাতেই আমরা পোর্টে পৌঁছে যাব?'

'হ্যাঁ, সকাল ছটা।'

'এখন থেকে তো আমিই আপনার সঙ্গী।'

'সে যেন আমায় একটু মিথ্যে তারিফ করেই বলল, 'সঙ্গীটি আমার খুবই ভালো।'

'কী করে বুঝলেন?'

'যে-সঙ্গীকে ভালো লাগছে, তাকে খারাপ বলি কেমন করে?'

আমিও সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলুম, 'আমারও খুব ভালো লাগছে আপনাকে।'

'তাই নাকি?'

'আজ রাতটা আপনার কেবিনেই আপনার সঙ্গে থাকব। গল্প শুনব।'

'লোকটা একটু হকচকিয়ে গেল আমার এই প্রস্তাবে। আমার মুখের দিকে চট করে তার চোখদুটো বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'গল্প শুনবে?'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ ঘুম না-আসে।'

'ঠিক আছে।' সে সায় দিল।

'সে এত সহজে রাজি হয়ে গেল দেখে, আনন্দে আমার হাত-পাগুলো কেমন যেন শিরশির করে উঠল। আমি বললুম, 'আমার তাহলে জিনিসপত্তরগুলো এখানে নিয়ে আসি?'

'লোকটার মনে ইচ্ছে না-থাকলেও, আমার কাছে সেই অনিচ্ছা লুকিয়ে রেখে খুব সহজভাবেই বলল, 'হ্যাঁ, নিয়ে এসো।'

'আমি ছুটলুম এবং আমার সম্পত্তি বলতে দু-একটা যা জামা-প্যান্ট ছিল, নিয়ে চলে এলুম। কিন্তু আসল ব্যাপারটাই এতক্ষণ আমার মনে আসেনি। আমি যদি পিস্তলটা তার প্যান্টের পকেটে না পাই, যদি সেটা স্যুটকেসেই রাখে, তবে স্যুটকেসটা নিয়ে আমি যাব কোথায়/ এই জাহাজেই তো আমায় থাকতে হবে/ স্যুটকেসটা চাবি দেওয়া থাকলে, সেটা ভেঙে পিস্তলটা বার করতে গেলে সময় তো লাগবেই। তখন যদি ধরা পড়ি/ সুতরাং এই জাহাজেই এমন একটা জায়গা খুঁজে রাখতে হবে, যেখানে আমি লুকিয়ে থাকতে পারব। এই উদ্দেশ্যে তখনই আমি জাহাজের এ-কোণ, ও-

https://boierhut.com/fb

কোণ ঘোরাঘুরি করতে লাগলুম। এ তো খুবই স্বাভাবিক যে, আমাকে এভাবে ঘুরতে দেখলে লোকে সন্দেহ করবেই। সুতরাং আমি যতদূর সম্ভব, সেই লুকিয়ে থাকার গোপন জায়গাটা খুঁজতে-খুঁজতে এর-তার সঙ্গে কথা বলে আমার মতলবটা গোপন রাখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু এত করেও একটা লুকিয়ে থাকার মতো জায়গা আমি পছন্দ করতে পারছি না। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, কদিন আগে, জাহাজের গায়ে একটা খুব মোটা চেন ঝুলে থাকতে দেখেছি। ওই চেনটা জাহাজের নোঙর করার সময় কাজে লাগায় ওরা। আমার মনে হল, বিপদে পড়লে, জলের ওপর জাহাজের গায়ে ঝুলে থাকা ওই চেনটা ধরে আমিও ঝুলে-ঝুলে লুকিয়ে থাকতে পারব। আমায় কেউ দেখতে পাবে না। তারপর জাহাজ পোর্টে ভেড়বার আগেই আমি জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাতে পারব।

'সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকঠাক রেখে আমি রাতে লোকটার কেবিনেই শুয়ে পড়লুম। সত্যি কথা বলতে কী, লোকটার সঙ্গে গল্প করার মতো আমার মনের অবস্থা তখন মোটেই ছিল না। আমি ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ভাবছিলুম, লোকটা কখন ঘুমুবে/ যখন দেখলুম, সে কিছুতেই ঘুমুচ্ছে না, তখন আমি নিজেই ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে রইলুম। দেখি, খানিক বাদে লোকটা সত্যি-সত্যিই নাক ডাকাতে শুরু করে দিল। আমি নিঃশব্দে উঠে পড়লুম। অত্যন্ত সতর্ক হাতে কেবিনের দরজাটা খুলে রাখলুম। কারণ লোকটার যদি অতর্কিতে ঘুম ভেঙে যায়, আমার পালাবার পথটা তো পরিষ্কার রাখতে হবে/ লোকটা তার প্যান্টটা কোথায় খুলে রেখেছে, সেটা আমি আগেই দেখে রেখেছি। সুতরাং প্রথমেই আমি নিঃসাড়ে, তার প্যান্টের পকেটেই হাত পুরে দিলুম। যাঃ/ আমি যেটা ভয় করছিলুম ঠিক তাই হল, পিস্তল পকেটে নেই। এখন যে সেটা স্যুটকেসেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আর কার সন্দেহ থাকে/ আমি স্যুটকেসটাই হাতে নিয়ে ধীর পায়ে ডিঙি মেরে কেবিনের দরজা ডিঙিয়ে পালাতে গেছি, আর ঠিক সেই সময়েই আচমকা চিৎকার, 'হলট'। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। বুকের ভেতরটা চমকে ধক করে উঠল। ঝটপট পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখি, লোকটা আমার পেছনে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি নিশ্চল হয়ে থমকে রইলুম। লোকটা যে মোটেই ঘুমোয়নি, নিজের কাছে পিস্তলটা রেখে আমার ওপর যে সে নজর রাখছিল, এখন সেটা বুঝতে আমার কোনো কষ্ট হল না। আমি আরও বুঝতে পারলুম, বড়োদের বুদ্ধির কাছে, আমি সত্যিই ছেলেমানুষ/ ধরা তো পড়েই গেছি/ সুতরাং ভয় পেয়ে আর লাভ কী/ বাঁচা-মরার ভাবনা না ভেবে, অন্য ভাবনা আমার মাথায় এসে গেল ঠিক তক্ষুনি। লোকটা চোখের পলক ফেলার আগেই, আমিই স্যুটকেসটা ধাঁই করে ছুড়ে দিলুম লোকটার মুখের ওপর। ছুড়ে দিয়েই কেবিন থেকে দে-ছুট/ গভীর রাত বলে সবাই ঘুমুচ্ছে। কিন্তু জাহাজ সে তো থেমে নেই। সে তো যথারীতি গভীর সমুদ্রে ঢেউ তুলে দ্রুত ভেসে চলেছে। লোকটা প্রথম চোটের ধাক্কাটা সামলেই বেরিয়ে এসেছে। আবার চিৎকার করে উঠল, 'হলট।' তখন কে আর তার কথার ধার ধারে। আমি থামলুম না। তার পিস্তল থেকে গুলি ছুটল, দুম/ লক্ষ্য তার ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য তার সফল হয়েছে। তার চিৎকারে

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আর পিস্তলের আওয়াজে ঘুমন্ত সেই জাহাজটা হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। শুরু হয়ে গেল, হইচই, হুল্লোড়/ আমি কোনোরকমে সকলের চোখকে ধুলো দিয়ে যেকানে জাহাজর চেনটা ঝুলছে সেই জায়গাটায় এসে পড়লুম। তারপর ঝটপট সেই মোটা চেনটা ধরে, তরতর করে জাহাজের কিনারায় পা দিয়ে ঝুলে পড়লুম বাইরে, গভীর সমুদ্রের জলের ঠিক ওপরে। আমি এখন মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছে গেছি। বুঝতে পারছিলুম, এখন জাহাজের ওপর তোলপাড় চলছে। এবং আমাকে খুঁজে বার করার জন্যে এখন গোটা জাহাজটা তন্ন-তন্ন করে নিশ্চয়ই তল্লাশি চালাচ্ছে সবাই। শেষ পর্যন্ত আমার কী হবে, আমি জানি না।'

ইতিমিচিসাহেবের পিঠের ওপর বসে এগোতে এগোতে সেই ছেলেটি এবার যেন খানিকটা উত্তেজনায় বলে উঠল, 'তারপর কী হল আপনার?'

ইতিমিচিসাহেব হেসে ফেললেন। বললেন, 'ভাবছিস বোধ হয় মরে গেলুম?'

'তবে কী হল?' সে তেমনি উত্তেজিত স্বরেই জিজ্ঞেস করল।

ইতিমিচিসাহেব বললেন, 'না, মরিনি। তবে সেই ঝুলন্ত অবস্থায় আমি যে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, সেটা আমি হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছিলুম। আমার নিজের ভারটাই আমার নিজেরই কাছে তখন ভীষণ অসহ্য লাগছিল। আমি পারছি না। তবু প্রাণপণে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছি। আমার মনে হচ্ছিল, আমি হয়তো এখুনি গভীর সমুদ্রে হাত ফসকে পড়ে তলিয়ে যাব। তখন কী হবে/ সাঁতার আমি জানি বটে, কিন্তু কতক্ষণ?

'সেই ঝুলন্ত অবস্থাতেই আমার যেন হঠাৎ নজরে পড়ল, দূরে সমুদ্রের কিনারে দু-একটা বিন্দুর মতো আলোর রেখা চিকচিক করছে। আমার চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল। আমি কি ঠিক দেখছি/ তবে কি সমুদ্রের কিনারা দিয়ে জাহাজটা বয়ে চলেছে/ হ্যাঁ, ঠিক তাই। এখন আমি নিশ্চয়ই ঝাপসা দেখছি না। আলোর স্পষ্ট বিন্দুগুলি আমার চোখের তারায় উছলে উঠছে। তাহলে জাহাজটা বোধ হয় পোর্টের কাছাকাছি এসে পড়েছে। আনন্দে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলুম। আর ঠিক তখনি কী যে হল, সেই লোহার চেন ফসকে আমি সমুদ্রের জলের ওপর ছিটকে পড়লুম। অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে বাঁচার তাগিদে সাঁতার কাটতে লাগলুম। সমুদ্র-জলে ভাসতে-ভাসতে আমি দেখবার চেষ্টা করলুম, জাহাজটা এখন কোথায়/ জাহাজ আমায় পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন তীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমি জাহাজের ঢেউ আর সমুদ্রের জল মাথায় নিয়ে ভেসে-ভেসে এগিয়ে চললুম তীরের দিকে। সেই শয়তানদের হাত থেকে বাঁচলুম বটে, কিন্তু এখন সমুদ্রের হাত থেকে কেমন করে বাঁচব, জানি না। কেননা, যতই আমি তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, সমুদ্রের ঢেউ ততই উত্তাল হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে, কখনও আমি পাঁচতলা, সাততলা ওপরে উঠে যাচ্ছি, আবার ঢেউয়ের সঙ্গে ঘুরপাক খেতে-খেতে নীচে নামছি। আতঙ্কে ভাবছি, আর বোধ হয় বাঁচা হল না আমার।

https://boierhut.com/fb

'আমি এমনি করেই এগিয়ে এসেছিলুম, সমুদ্রতীরের অনেকখানি কাছেই। মনে হচ্ছিল, অন্ধকারটা অনেকখানিই কেটে গেছে। ভোরের আলো ফুটছে সমুদ্রের বুকে। আমি নিশ্বাস নিচ্ছি ভোরের বাতাসে। তারপর কেমন যেন ধীরে-ধীরে আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। আমি আর সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর বাঁচার জন্যে ছটফট করত পারছি না। আমার যেন দম ফুরিয়ে আসছে। আমি বোধ হয় হারিয়ে গেলুম। আর কিছুই মনে নেই।'

এমন সময় হঠাৎ ছেলেটি ইতিমিচিসাহেবকে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি আপনি হারিয়ে গেলেন?'

ইতিমিচিসাহেব হেসেই বললেন, 'তুই একদম বোকা, হারিয়ে গেলে এখন তোকে পিঠে নিয়ে কে হাঁটত?'

ছেলেটিও হেসে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তারপর কী হল'?

'তারপর? তারপর হয়তো অনেকক্ষণ কেটে গেছে। হঠাৎ আমি চোখ চাইলুম। আমার মুখের ওপর সূর্যের তাপ। আমি যে এখন জলের ওপর হাবুডুবু খাচ্ছি না, সেটা বুঝতে পারলুম। উঠতে গেলুম, কষ্ট হল। আমার দেহের অর্ধেকটা বালির নীচে চাপা পড়েছে। এমন অবস্থা কী করে হল, বুঝতে পারছি না। তারপর কোনোরকমে বালি সরিয়ে, আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম। তখন আবার সমুদ্রের গর্জনটা ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কানে। আমি বুঝতে পারলুম, আমি পড়ে আছি সমুদ্রসৈকতে। ওই ঢেউয়ের সঙ্গে ঘুরপাক খেতে-খেতে হয়তো আমি এখানেই আছড়ে পড়েছি। তারপর—'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান।' ইতিমিচিসাহেবের কথা শেষ হবার আগেই ছেলেটি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল।

থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন ইতিমিচিসাহেব। দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর তিনিও ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল রে?'

ছেলেটি তেমনি ছটফট করে বলল, "আমায় নামিয়ে দিন আপনার পিঠ থেকে। এ আমার চেনা জায়গা/'

ইতিমিচিসাহেব বললেন, 'এখানে তোদের বাড়ি?'

তেমনি অস্থির হয়ে সে বলল, 'না।' তারপর ইতিমিচিসাহেবের পিঠ থেকে প্রায় লাফিয়ে নেমে পড়ল। তাঁর হাতটা চেপে ধরে ছুটতে-ছুটতে বলল, 'আপনি আসুন আমার সঙ্গে/'

এতক্ষণ একটি নদীর বাঁধ ধরেই হাঁটছিলেন ইতিমিচিসাহেব। তিনি এতক্ষণ খেয়াল করেননি যে, নদীর চারদিকে ঘন জঙ্গল। জঙ্গল-ঘেরা সেই নদীর বাঁধের ওপর দিয়েই ছেলেটি তাঁর হাত ধরে ছুটল। ইতিমিচিসাহেব কিছু বলার আগেই ছেলেটি একটা জায়গায় এসে দাঁড়াল। যেন এক অজানা উত্তেজনায় সে ভীষণ হাঁপাচ্ছে। মাটিতে উপুড় হয়ে বসে পড়ল। তারপর সেই অন্ধকার

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

রাতে, আবছা চাঁদের আলোয়, চোখের দৃষ্টিটাকে মাটির ওপর স্থির রেখে তীক্ষ্ণভাবে কী যেন দেখতে লাগল।

ইতিমিচিসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দেখছিস?'

ছেলেটি কান্না-ভরা গলায় উত্তর দিল, 'আপনিও দেখুন/' বলে ইতিমিচিসাহেবের হাত ধরে টান দিল। ইতিমিচিসাহেবও বসে পড়লেন।

সে কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, 'রক্ত/'

'এবার আসুন আমার সঙ্গে/'

'কোথায়?'

'কাছেই।' বলে ছেলেটি একটু এসে আবার দাঁড়াল।

ইতিমিচিসাহেব দেখতে পেলেন, দূরে একটা ভাঙাচোরা কোঠাবাড়ি। জঙ্গলের গাছ-পালার আড়াল থেকে খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

ছেলেটি রোষে গুমরে উঠে বলল, 'ওরা ওইখানেই থাকে/'

ইতিমিচিসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'কারা?'

ছেলেটির মুখের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। প্রতিহিংসায় চোখদুটো জ্বলে উঠল। তার গলার স্বরটা চাপা-গর্জনে ফুঁসে উঠল, 'ওরাই তো, ওরাই তো আমার বাবাকে, আমার মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।'

ইতিমিচিসাহেবের বুকের ভেতরটা কে যেন মুচড়ে দিল মুহূর্তে। তিনি প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠলেন, 'কেন?'

'ওরা যে খুনি, লুটেরা।' বলতে-বলতে ছেলেটির গলা কাঁপতে লাগল। সেই কাঁপা-গলায় সে বলল, 'আশ্চর্য লাগছে ভাবতে, আপনার গল্প শেষ হবার আগেই আমার গল্প এসে গেছে। সেদিন তখন গভীর রাত। আমরা ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাবা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। শুনতে পেলেন, পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর আর্তনাদ। দেখতে পেলেন, ওই দুশমনের দল তাদের সর্বস্ব লুঠ করে পালাচ্ছে। তাদের হাতে বন্দুক। বাবা ভয় পেলেন না। দুর্জয় সাহস বুকে নিয়ে তিনি তাদের পেছনে ধাওয়া করলেন। তারা গুলি ছুড়ল। সেই ভীতু পলাতকের দল বাবাকে আঘাত করতে পারল না। ভয় পেলেন না বাবা। তাদের তিনি ধরবেনই এবং নিশ্চিত বিপদকে তুচ্ছ করে তিনি একজনকে ধরেও ফেললেন। তার হাতেও বন্দুক ছিল। কিন্তু বন্দুকটা কাজে লাগাবার মতো, তখন আর তার ক্ষমতা নেই। বাবা তার ঘাড়টা ধরে টান মারতেই সে একটা ভীত মেষশাবকের মতো চিৎকার করে উঠল, তার সঙ্গীদের সাহায্যের জন্যে। কিন্তু সেই কাপুরুষের দল সঙ্গীর বিপদে সাড়া দিল না। তারা পালাল দিগবিদিকজ্ঞান হারিয়ে। তবু এই দুশমনটা বাঁচার তাগিদে বাবার সঙ্গে

https://boierhut.com/fb

লড়াই শুরু করে দিল। কিন্তু বাবার এক প্রচণ্ড ঘুষিতে সে ছিটকে পড়ল মাটিতে। ছুটে গিয়ে বাবা তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীষণ রোখ চেপে গেছে বাবার। মনে হল, বুঝি-বা লোকটাকে মেরেই ফেলেন। রক্ষে, ঠিক এই সময়েই পুলিশ এসে পড়েছিল। লোকটাকে পাকড়াও করে নিয়ে চলে গেল পুলিশ।

'আসলে এতেই হল ওই দুশমনদের বাবার ওপর আক্রোশ। তাদের সে-আক্রোশের কথা আমরা জানতে পারিনি। আমরা জেনেছিলুম, গোটা দলটাকে পাকড়াও করার জন্যে পুলিশ জোর তল্লাশি চালাচ্ছে। জেনেছিলুম, যে-লোকটা ধরা পড়েছে, সে কবুল করে ফেলেছে সবকিছু। সুতরাং তাদের দিন এগিয়ে এসেছে। ধরা তারা পড়বেই।

'কিন্তু ঘটনা ঘটল উলটো। একদিন গভীর রাত্রে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অতর্কিতে আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল এই শয়তানের দল। নিঃশব্দে তারা আমাদের শোবার ঘরে গিয়ে, ঘুমন্ত আমার মাকে, বাবাকে আর আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছিল। তারপর ধরে নিয়ে এসেছিল ওই ভাঙা বাড়িটায়। ওইখানে তিনদিন আমাদের ফেলে রেখেছিল। তারপর যে কী করেছিল তার সাক্ষ্যি তো ওই-রক্তই।' বলে ছেলেটি কেঁদে ফেলল।

ইতিমিচিসাহেব উত্তেজনায় হঠাৎ নিজেই ছেলেটির হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'কাঁদিস না। তুই এখানে একটু দাঁড়া আমি আসছি।'

ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, 'কোথা যাচ্ছেন?'

'সেই দুশমনের চেহারাগুলো একবার দেখতে যাচ্ছি/'

'আপনাকে খতম করে ফেলবে/'

'খতম হওয়ার আগে আমি বুঝতে চাই, আমি সত্যিই ভূত, না, মানুষ/'

ছেলেটি কোনো কথা বলল না। ইতিমিচিসাহেব অন্ধকারে একাই এগিয়ে গেলেন। একটু গিয়েই ক্ষণেক থামলেন। তারপর আবার বললেন, 'এখান থেকে যাস না কোথাও। আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি। সাবধান ওরা না তোকে দেখতে পায়/'

ছেলেটি এবারও মুখ খুলল না।

ইতিমিচিসাহেব চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ভাঙা বাড়িটার দিকে এগিয়ে চললেন। যেতে-যেতে তিনি বুঝলেন, দুশমনের আস্তানা গড়ার এটা উপযুক্ত জায়গাই বটে/

এই ঘন-জঙ্গল-ঘেরা অন্ধকারে দৃষ্টি যতই সতর্ক হোক, পাশে যদি কেউ ওত পেতে বসে থাকে, টের পাওয়া খুবই মুশকিল। সুতরাং বিপদ প্রতি পদে-পদে। এতক্ষণ ছেলেটির মুখে তার দুর্ভাগ্যের যে-কথা তিনি শুনলেন, তা শুনে তিনি যে শুধু মনে মনে জ্বলে উঠেছেন, তা-ই নয়/ প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি দুশমনের মুখোমুখি দাঁড়াবেন, তাদেরও রক্ত দেখবেন। সুতরাং এই অন্ধকারটা, অথবা অন্ধকারে এই ভয়াবহ জঙ্গলটা এখন তাঁর বুকের মধ্যে ভয়ের কামড় ফোটাবার ফুরসত

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

পাচ্ছে না। তিনি ভাঙাবাড়ির সামনে পৌঁছে গেলেন। দেখলেন, বাড়ির মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলো। তিনি পিছনদিকে চলে গেলেন। পিছনে বাড়ির দেওয়ালে একটা ফাটল দেখতে পেলেন। ফাটল দিয়ে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। তিনি ফাটলে চোখ রেখে উঁকি মারলেন। দেখতে পেলেন, চারজন লোক মুখোমুখি বসে জমিয়ে গল্প করছে। আর থেকে-থেকে হো-হো করে হেসে উঠছে। তাদের চেহারা দেখলে মনে করা খুবই শক্ত তারা লুটেরা বা দুশমন। অবশ্য চারজনের পাশেই চারটি বন্দুক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই অন্ধকার রাতে, জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙাবাড়িতে বন্দুক নিয়ে যারা গজাল্লি করছে, তারা নিশ্চয়ই ধোয়া তুলসীপাতা নয়/ দেখতে-দেখতে হঠাৎ ইতিমিচিসাহেবের চোখটা যেন ধাঁধিয়ে গেল। ওই চারজন লোকের মধ্যে একজনকে যেন তাঁর খুবই চেনা লাগছে/ লোকটাকে যেন কোথায় তিনি দেখেছেন/ তাঁর মাথাটা ঘুরে গেল/ এ যে সেই লোকটা/ সেই যে সোনার ব্যবসায়ী বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল জাহাজে করে। তিনি আরও ভালো করে দেখলেন। আরও খানিকক্ষণ। হ্যাঁ, এবার তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর চিনতে কোনো ভুল হল না। লোকটার চেহারায় অবিশ্যি বয়সের ছাপ পড়েছে। পাক ধরেছে চুলেও। ধরবেই/ কেননা, যখন কার কথা এখন তাঁর মনে পড়েছে, তখন ইতিমিচিসাহেব কত ছোটো। খুব বেশি হলে তখন ইতিমিচিসাহেবের বয়স ছিল এগারো। এখন কদিন পরে তিনি চল্লিশের ঘরে পা দেবেন। সুতরাং তখন লোকটার বয়েস যদি খুব বেশি ধরি তিরিশ, তাহলে এখন তারও তো প্রায় ষাট হতে চলল। কিন্তু দেখে বোঝা ভার। যদিও বয়েস হয়েছে, তবুও বলতে পারা যায় না, শরীরটা ভেঙে পড়েছে। এখনও বেশ শক্তপোক্ত তরতাজাই লাগছে। তাহলে ইনিই সেই কীর্তিমান দুশমন/ ইনিই এখানে সেই ছোট্টো ইতিমিচিকে ধরে আনার মতলব এঁটেছিলেন/

তাকে চিনে ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে ইতিমিচিসাহেবের দেহের রক্ত যেন একসঙ্গে টগবগ করে ফুটে উঠল। সেই অন্ধকারে ভাঙাবাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে রাগে তিনি ফুঁসতে লাগলেন। অবশেষে ঠিক করলেন লোকটার সামনে তিনি যাবেন। দরজাটার কাছে এলেন আবার। আলতো-হাতে ঠেলা মারলেন দরজায়। অবশ্যই দরজা বন্ধ। শয়তান কি আর অতই মুখ্যু যে, রাতদুপুরে ঘরের দরজা হাট করে খুলে, খোশগল্প করবে। তাহলে এখন ইতিমিচিসাহেব কী করেন? জোরে দরজায় ঠেলা মারবেন, না, অন্য কোনো পথের খোঁজ করবেন?

https://boierhut.com/fb



খবরদার/বন্দুক নেবার চেষ্টা কোরো না, খতম করে ফেলব/

ইতিমিচিসাহেব তাই করলেন। খুঁজতে লাগলেন, ভিতরে ঢোকার অন্য পথ। কিন্তু ভাঙাবাড়ির চারকোণে চক্র মেরেও তিনি কোনো পথেরই হদিস করতে পারলেন না। সুতরাং ঝুটমুট চোরের মতো ঘুরঘুর না করে, বুকে সাহস এনে তিনি দরজাতেই ধাক্কা দেবেন ঠিক করলেন।

ইতিমিচিসাহেব তাই করলেন। খুঁজতে লাগলেন, ভিতরে ঢোকার দরজা।

এমনই সময় হঠাৎ হাঁটতে গিয়ে একটা গর্তের মধ্যে তাঁর পা পড়ে গেল। তিনি হোঁচট খেলেন। গর্তটা তিনি একদম ঠাওর করতে পারেননি। গাছ পাতায় এমনভাবে ঢাকা পড়ে আছে যে, খেয়াল করাই শক্ত। ঠিক বাড়ির গায়ে লাগোয়া গর্তটা দেখে তাঁর কেমন যেন সন্দেহ হল। এটা কোনো সুড়ঙ্গ নয়তো/ দুর্বৃত্তদের পালাবার পথ/ এটা মনে হতেই তিনি ভাবলেন, তাহলে তো একবার পরখ করে দেখতে হয়/

কিন্তু এই অন্ধকারে সুড়ঙ্গ পরখ করা কেমন করে সম্ভব? এ-কথা জেনেও তিনি অন্ধকার মানলেন না। প্রথমে তিনি গর্তটার মধ্যে উঁকি দিলেন। তারপর ধীরে ধীরে নিজের পাদুটিকে এগিয়ে দিলেন গর্তের গহ্বরে। কোমরটা ভেঙে তিনি ঘাড় হেঁট করলেন। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললেন। হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে, সত্যিই এটা সুড়ঙ্গ। কেননা, এগিয়ে চলতে তিনি কোনো বাধা পাচ্ছেন না। অবিশ্যি ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। সুতরাং হাতড়ে-হাতড়ে তাঁকে হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে। এবং অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে ঢুকে পড়ছেন।

হং, শেষমেশ সত্যি-সত্যিই তিনি সেই ভাঙাবাড়ির অন্দরমহলে ঢুকে পড়তে পারলেন। ইতিমিচিসাহেব ওই দুশমনদের মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে আর একবার উঁকি মারলেন। তিনি এখন পরিষ্কার চিনতে পারছেন সেই ভুয়ো সোনার ব্যবসায়ীকে। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। চার

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

দুশমনের কেউ টেরও পেল না। গল্পে মশগুল তারা। এই তক্কে তিনি তাদের পাশে রাখা একটা বন্দুক তুলে নিলেন নিঃশব্দে। তাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে আচমকা চিৎকার করে উঠলেন, 'হ্যালো, গোল্ড-মার্চেন্ট/'

চার দুশমনের বুকের ধুকধুকি আঁতকে উঠল। চমকে তাকাল সেই রাতের অতিথিটির দিকে। দেখল, অতিথিটি তার হাতের বন্দুক তাক করে তাদের দিকে চেয়ে হাসছে/ প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েই চার দুশমন প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা বন্দুক তুলতে গেল। ইতিমিচিসাহেব আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'খবরদার/ বন্দুক নেবার চেষ্টা কোরো না, খতম করে ফেলব/'

তারা থমকে ইতিমিচিসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

ইতিমিচিসাহেব তেমনি হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'আমাকে মারবার দরকার হবে কি? আমি তো আপনার খুবই চেনা। চিনতে পারছেন না আমাকে?'

ইতিমিচিসাহেবকে তার পক্ষে এখন চেনা কেমন করে সম্ভব/ তাঁর বয়সও হয়েছে, একটি-দুটি চুলে পাকও ধরেছে, গলার স্বরও ভারী হয়েছে। তাছাড়া সেই ছেলেবেলার মুখখানা তাঁর এখন দাড়ি-গোঁফে ঢাকা পড়ে গেছে। তাঁর গলার স্বরটাও আর সেই ছেলেমানুষি সুরে ফিনফিন করছে না। অনেকটা গম্ভীর। চেহারাটাও ভারিক্কি হয়েছে। সুতরাং শত চেষ্টা করলেও তাঁকে এখন চেনা যাবে না। দুশমন তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে। ইতিমিচিসাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চেনা যাচ্ছে? আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। মনে পড়ছে না, সেই ছোটো-ছেলেটির কথা? জাহাজে চাকরি করে দেবার লোভ দেখিয়ে যাকে নিয়ে আপনি ভাগছিলেন? হ্যাঁ, আমিই সেই ছোটোবেলার ইতিমিচি, এখন আপনার যম।'

সেই লোকটি বোবা-মুখে ইতিমিচিসাহেবের চোখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল। তারপর কাঁপা-গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি?'

'যদি বলি আপনার রক্ত/' উত্তর দিলেন ইতিমিচিসাহেব।

লোকটা বোধ হয় এতক্ষণ মনে-মনে আঁটছিল কী করবে। তাই মুহূর্তে গলা ফাটিয়ে হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। ইতিমিচিসাহেব থতমত খেয়ে গেছেন। আচমকা তো/ আর ঠিক সেই তক্কে চার দুশমন দরজা খুলে মারল ছুট।

ইতিমিচিসাহেবের চোখে যেন ধাঁধা গেলে লেদা। তিনি যদিও নিজেকে চোখের পলকে সামলে নিয়ে বন্দুক তুলে তাক করেছিলেন, কিন্তু তার আগেই তারা হাওয়া। তিনি ধাওয়া করলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে সাবধান করলেন, 'দুশমন, পালালে গুলি করব/'

কিন্তু সে-কথা কখনও শোনে তারা/ তারা ছুটল জঙ্গল-ঢাকা সেই নদীর বাঁধের ওপর দিয়ে। ইতিমিচিসাহেবও বাঁধের ওপর ছুটে এলেন। তিনি আন্দাজেই একটি গুলি ছুড়লেন। নিস্তব্ধ বনটা বন্দুকের শব্দে যেন শিউরে উঠল। তাদের কারো গায়েই যে লাগেনি, এটা ইতিমিচিসাহেব খুব

https://boierhut.com/fb

ভালোই বুঝেছিলেন। আর একবার বন্দুক ছুড়লেন। এবার তিনি শুনতে পেলেন, নদীর জলে ঝপ করে যেন কী আছাড় খেয়ে পড়ল। তিনি দাঁড়ালেন না। কারণ তিনি বুঝলেন, নির্ঘাত গুলি খেয়ে নদীর জলে ডুবেছে এক দুর্বৃত্ত। তিনি চেঁচালেন, 'দুশমন, তোমরা আমার নিশানার মধ্যে আছ। সুতরাং মিথ্যে পালাবার পথ খুঁজছ/ দাঁড়াও, নইলে সবকটাকে খতম করে ফেলব।' এখন তিনি প্রায় তাদের কাছাকাছি চলে এসেছেন। সেই দুর্বৃত্তের দল বুঝতে পারল, তাদের সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু তারা মৃত্যুর হাতছানি দেখতে পেয়েও দাঁড়াল না। কিন্তু তারা যখন বুঝল, ছুটে আর রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সেই দুশমন-সর্দার, মানে সেই নকল সোনার ব্যবসায়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হয়েছিল, হয়তো বা বয়সের ভারে সে ক্লান্ত, তাই বুঝি সে ইতিমিচিসাহেবের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু না, ছুটতে-ছুটতে ইতিমিচিসাহেব তার মুখোমুখি হতেই, লোকটা একেবারে অতর্কিতে ইতিমিচিসাহেবের মুখের ওপর ঘুষি চালিয়ে দিল। ইতিমিচিসাহেবে টাল খেলেন। তাঁর হাতের বন্দুকটা নিশান থেকে ছুটে গেল। তবু কেমন আশ্চর্য সাহসে বন্দুকের গুলি তিনি ছুড়তে পারলেন। ছুড়েই তিনি গড়িয়ে পড়লেন নদীর জলে ওই বাঁধের ওপর থেকে। শুনে মনে হচ্ছে, না-জানি কী মস্ত ঘটনা কিন্তু ঘটে গেল চোখের পলকে। সেই ভারী বন্দুকটা এরই মধ্যে ইতিমিচিসাহেবের হাত থেকে ছিটকে গেছে এবং তিনি জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তিনি জানতেও পারলেন না, সেই দুশমন সর্দারটার কী হল/

বাঁধের ঢালু দেওয়ালে গড়াতে-গড়াতে যদিও ইতিমিচিসাহেবের হাত পা কেটেছে, তবু মারাত্মক কিছু হয়নি। তিনি নদীর স্রোত কাটিয়ে আবার বাঁধে উঠতে পারলেন ঠিকই, কিন্তু জলে ভিজে ভারী অস্বস্তি লাগছে তাঁর। তিনি উঠে প্রথমেই বন্দুকটা খুঁজলেন। কিন্তু সে কী আর পাওয়া যায়/ সেটাও বোধ হয় নদীর জলে ডুবেছে। তবু তিনি তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজতে-খুঁজতে তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন, বন্দুকের গুলি সেই দুশমনের বুকেই লেগেছে। দুশমন মাটির ওপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে। দেখে ইতিমিচিসাহেবের বুকখানা যেন দশ হাত ফুলে উঠল। তিনি মনে মনে ভাবলেন, না আর দরকার নেই বন্দুকের। তিনি আনন্দে উদবেল হয়ে ছুটে গেলেন সেই ছেলেটির কাছে। গেলেন, যেখানে সে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু থমকে গেলেন ইতিমিচিসাহেব/ কই এখানে তো ছেলেটি নেই/ ইতিমিচিসাহেব এধারে-ওদারে ঘুরে ফিরে দেখলেন। না, তবু দেখতে পেলেন না। তখন চাপা গলায় তার নাম ধরে ডাকলেন, 'রিগি।' তিনি সাড়া পেলেন না। তিনি আরও একটু দূরে, আরও একটু দ্রুত হেঁটে গেলেন। খুঁজলেন, এবারও দেখতে পেলেন না। আবার ডাকলেন, তবুও সাড়া পেলেন না। তিনি তখন কেমন যেন, ভয় পেলেন। তবে কী দুশমনের হাতে ধরা পড়ল। তিনি তখন ভর্য়াত-কণ্ঠে চিৎকার করে ডাকলেন, 'রি—গি/ দুশমন খতম হয়েছে। তুমি কোথায় গেলে? রি—গি/'

'আমি হারিয়ে গেছি/' যেন একঝলক হাওয়ার শব্দে ভেসে এল সেই ছেলেটির কণ্ঠ।

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

চমকে তাকালেন ইতিমিচিসাহেব। জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী বলছ রিগি?'

'ঠিক বলছি সাহেব/' আবার হাওয়ার শব্দে ভেসে এল তারই উত্তর, তখন ওই যে দেখলেন একঝলক রক্ত, আমার মা-বাবাকে আমার কাছ থেথে কেড়ে নিয়ে, এখন বলি, ও রক্ত আমার। আমি মৃত। আমাকেও হত্যা করেছে ওই দুশমন। এতদিন আমার আত্মা ওই দুশমনের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ছটফট করে ঘুরেছে খালি। আজ আমি তৃপ্ত। আজ আমি জেনেছি, আমার সাহসী বন্ধু সে কাজটা করেছে। আজ আমার ভালোবাসা, শুধুই ভালোবাসা ছাড়া আর তো কিছুই দিতে পারব না আপনাকে। এর জন্যে যে-দুঃখ, সে তো আমারই। আজ শুধু বলে যাই, সত্যিকারের বন্ধু আপনি, সত্যিকারের মানুষ। আমার সঙ্গে আর দেখা না হলেও মনে রাখব বন্ধু আপনাকে। আপনার সাহসকে আপনার ভালোবাসাকে।' বলে হারিয়ে গেল সেই শব্দ।

নিমেষে যেন আকাশ থেকে বাজ পড়ল ইতিমিচিসাহেবের বুকের ওপর। সমস্ত বিশ্বাসটা যেন তাঁর খান-খান হয়ে গেল একমুহূর্তে। তিনি আর কথা বলতে পারেন না। কী যে করবেন, তা-ও ভেবে পান না। ধীর-পায়ে তিনি এগিয়ে যান সেই রক্ত-চিহ্নের সামনে। নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন সেইদিকে চেয়ে। তারপর মাথা হেঁট করেন। হঠাৎ যেন দু-ফোঁটা চোখের জল উপছে পড়ে ছড়িয়ে গেল সেই রক্তের ওপর। অভিমানে তাঁর গলাটা সেই মুহূর্তে আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'তবে কেন এসেছিলি? তবে মিথ্যে কেন দুদণ্ডের এই হাসি, এই আনন্দ/ এই ভালোবাসা?'

উত্তর পাননি ইতিমিচিসাহেব।

কিন্তু হঠাৎ একটি পাখির ডাক শুনতে পেয়েছিলেন ইতিমিচিসাহেব। চমক ভাঙল তাঁর। চোখের জল মুছে আকাশের দিকে তাকালেন। এ কী/ আকাশে যে ভোরের আলো ফুটেছে। সেই আলো নদীর জলে ভাঙা ভাঙা ঢেউয়ের ওপর দোল খাচ্ছে। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সেই জলের দিকে। নদীর জলে নিজের মুখের ছায়া দেখলেন। তারপর আঁজলা ভরে জল নিয়ে সেই মুখে ছড়িয়ে দিলেন। আবার হাঁটলেন। হাঁটতে-হাঁটতে হারিয়ে গেলেন।

https://boierhut.com/fb

বইয়ের হাট
দুনিয়ার পাঠক এক হও

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ

যাদুর দেশে জগন্নাথ
আনন্দ, মার্চ ১৯৮১

স্বপ্নের যাদুকরী
আনন্দ, অগস্ট ১৯৮১

টোরা আর বাদশা
আনন্দ, মে ১৯৮২

খুদে যাযাবর ইসতাসি
আনন্দ, জুন ১৯৮৩

আবু ও দস্যু সর্দাব
আনন্দ, নভেম্বর ১৯৮৩

ইতিমিচি সাহেব
আনন্দ, মার্চ ১৯৮৪

https://boierhut.com/fb